আল-কুরআনে অর্থনীতি

আল-কুরআনে অর্থনীতি

দ্বিতীয় খণ্ড

[ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' প্রকল্পের গবেষকগণ কর্তৃক প্রণীত, সমীক্ষিত ও সম্পাদিত]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আল-কুরআনে অর্থনীতি (২য় খণ্ড)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগের ১৯৮৫-৯০ সালের গবেষণা কর্মসূচীর আওতায় দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও আলিম বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রণীত, সমীক্ষিত ও সম্পাদিত।

ইফাবা গবেষণা ঃ ৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬৬৮/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৮
ISBN-984-06-0703-X

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯০

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ ১৪০৯
জিলকদ ১৪২৩
জানুয়ারি ২০০৩

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
আজিজুর রহমান

মুদ্রণ ও বাঁধাই

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

মূল্য ঃ১৫৪.০০ টাকা মাত্র

AL-QURAN E ARTHANITI (Economics in the Holy Quran) : Compiled by a Board of Renowned Ulema and Economists of the country under Research Programme of 1985-90, published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1207.

January 2003

Price : Tk 154.00; US Dollar : 5.00

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এই কিতাবে রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী সকল মানুষের হেদায়েত ও সঠিক জীবন-যাপনের দিক-নির্দেশনা। আল-কুরআন হচ্ছে মানুষের সার্বিক উন্নতি ও প্রকৃত সফলতার পথ-নির্দেশক। অর্থ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং আল-কুরআনে মানব-জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও আলোচনা রয়েছে। মহানবী (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামের আর্থিক বিধি-বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের যে সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির সোনালী অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল তা গোটা বিশ্বের জন্য অনুসরণযোগ্য উদাহরণ। আজকের সমাজের কেউ কেউ কেবল আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনকেই সার্বিক দীনি কাজ বলে মনে করেন; বৈষয়িক কার্যক্রমকে তাঁরা ভাবেন দীনের পথের অন্তরায় হিসেবে। অথচ এ ধরনের ভাবধারা কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী।

মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনে যে ব্যর্থ হয়েছে, তা আজ প্রমাণিত। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের কল্যাণমুখী উৎপাদন ও সুষম বন্টন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থা রয়েছে তার জ্ঞান লাভ ও বাস্তবায়নের তাগিদে এবং পবিত্র কুরআনের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির উপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন তীব্রভাবে অনুভব করে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশের কয়েকজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, প্রথিতযশা আলেমে দীন ও পণ্ডিতবর্গের সমন্বিত প্রচেষ্টায় 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। তাঁরা অর্থনীতি সম্পর্কিত আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ ও আধুনিক অর্থনীতির আলোকে পর্যালোচনা করে এতে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটি যেমন ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে গবেষকগণের কাজে প্রভূত সাহায্য করবে, তেমনি তা কুরআনভিত্তিক অর্থনীতি চর্চাকারীদেরও বেশ সহায়ক হিসেবে কাজে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের জাতীয় জীবনে ইসলামী বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। সে কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন

www.pathagar.com

বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার মাধ্যমে মানুষের মনে ইসলামের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে আসছে। আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপকরণের অপ্রতুলতা থাকলেও আমরা বর্তমান গ্রন্থটিকে আন্তর্জাতিক মানের করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা আশা করি 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে আমি উক্ত গ্রন্থের গবেষক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের আন্তরিক ত্যাগ ও শ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বর্তমান বিশ্ব অবাধ তথ্য প্রবাহ ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের ফলে মানব সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অকল্পনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়ে চলেছে। এর পরিণতিতে মানুষ তার মানবীয় শক্তির উপর বিপুলভাবে আস্থাশীল হয়ে উঠছে। তাই বহু কিছুই মানুষের কাছে আজ আর অসাধ্য নয়। এর পাশাপাশি আশ্চর্যজনকভাবে এটাও প্রমাণিত হয়ে চলেছে যে, মানবীয় শক্তি ও সামর্থ্যের এ ঈর্ষণীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও অদৃশ্য এক মহাশক্তির কাছে মানুষ এখনো অসহায়। ইসলাম মানুষের এই অহমিকা ও শক্তিমদমত্ততার বিরুদ্ধে বরাবরই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে এসেছে। উপরন্তু ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, উদারতা, ন্যায়বিচার ও সহিষ্ণুতা যে এ বিশ্বসমাজে অনন্য-তাও বারংবার প্রমাণিত হয়ে চলেছে। ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়-ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের জীবনাচরণ, শিক্ষা, দর্শন, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের অনুপম দিক-নির্দেশনা নেই। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কুরআন মানুষের জন্য একমাত্র নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয় খোদায়ী বিধি-বিধানের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

বর্তমান সমাজে অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী অর্থনীতি অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু মুসলমানদের দুর্বলতা ও অধঃপতনের সুযোগে ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ও মুক্তবাজার এবং তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিধি-বিধান বিশ্ব সমাজকে ব্যাপকভাবে গ্রাস করে ফেলছে। ফলে পবিত্র কুরআন যে অর্থনৈতিক বিধি-বিধান দিয়েছে-মুসলমানগণ তা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। সাম্প্রতিককালে, বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহে ব্যাপক ও বিচিত্র পরিবর্তন ঘটার প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্ব সমাজ উপলব্ধি করছে।

ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে মুসলিম অর্থনীতিবিদরা কুরআন ও হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাসের আলোকে এ পর্যন্ত বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, বহু মুসলিম দেশেই ইসলামী অর্থনীতি অস্তিত্বশীল নয়। এ ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনাপূর্বক ইসলামিক

www.pathagar.com

ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআনের অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ সংকলন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে প্রচেষ্টারই ফসল হিসেবে ১৯৯০ সালে 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' শীর্ষক বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। দ্রুত আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার পাশাপাশি কুরআনভিত্তিক অর্থনীতির একটি আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থ হিসেবে এটি সুধী পাঠকসমাজের বিপুল প্রশংসা অর্জন করে। বর্তমানে এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এ মূল্যবান গ্রন্থটি আগের মতোই পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকল ভাল কাজে সহায় হোন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আল-কুরআনে অর্থনীতি গবেষণা প্রকল্পের সদস্যবৃন্দ

১. মু. আযীযুল হক	চেয়ারম্যান-গবেষক
২. ড.কে.টি. হোসাইন	ভাইস-চেয়ারম্যান-গবেষক
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	সদস্য-গবেষক
৪. অধ্যাপক রায়হান শরীফ	সদস্য-গবেষক
৫. ড. নঈম উদ্দীন চৌধুরী	সদস্য-গবেষক
৬. ড. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ	সদস্য-গবেষক
৭. শাহ্ আবদুল হান্নান	সদস্য-গবেষক
৮. নূর মোহাম্মদ আকন	সদস্য-গবেষক
৯. মো. জহুরুল ইসলাম	সদস্য-গবেষক
১০. ড. এ. এইচ. এম. সাদেক	পর্যবেক্ষক-গবেষক
১১. ড. আলী.আহমদ রুশদী	পর্যবেক্ষক-গবেষক
১২. এ. কে. এম. আবদুল্লাহ	সমন্বয়কারী
১৩. মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবু জাফর	সদস্য-গবেষক (আমন্ত্রিত)
১৪. মাওলানা শামসুল আলম খান	সদস্য-গবেষক (আমন্ত্রিত)
১৫. আবুল হাসনাত দেওয়ান	সদস্য-গবেষক (আমন্ত্রিত)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সূরার নাম	আয়াত	প্রবন্ধকারের নাম	পৃষ্ঠা
ভূমিকা			১৩-৩০
সূরা আল-মায়েদা	১	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	৩৩-৪২
ঐ	৪২	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	৪৩-৪৫
ঐ	৫১	ড. এ. এইচ. এম. সাদেক	৪৬-৪৮
ঐ	৬৫-৬৬	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	৪৯-৫৯
সূরা আল-আন'আম	৬	ঐ	৬০-৬৬
ঐ	১৪	ঐ	৬৭-৭২
ঐ	৩২	শাহ্ আবদুল হান্নান	৭৩-৭৫
ঐ	৯৯	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	৭৬-৮২
ঐ	১৪১	ঐ	৮৩-৮৬
ঐ	১৫১-১৫২	শাহ্ আবদুল হান্নান	৮৭-৯২
ঐ	১৬০	নূর মোহাম্মদ আকন	৯৩-৯৮
সূরা আল-আ'রাফ	১০	মোঃ জহুরুল ইসলাম	৯৯-১০৩
ঐ	৩১-৩৩	শাহ্ আবদুল হান্নান	১০৪-১০৮
ঐ	৫৭-৫৮	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	১০৯-১১৮
ঐ	৭৪	ড. কে. টি. হোসাইন	১১৯-১২১
ঐ	৮৫	ড. এ. এইচ. এম. সাদেক	১২২-১২৯
ঐ	১৮৯	নূর মোহাম্মদ আকন	১৩০--১৩৩
সূরা আল-আনফাল	১	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	১৩৪-১৪২
ঐ	২৭-২৮	শাহ্ আবদুল হান্নান	১৪৩-১৪৬
ঐ	৩৬	ড. এ. এইচ. এম. সাদেক	১৪৭-১৫২
সূরা আত-তাওবা	২৪	শাহ্ আবদুল হান্নান	১৫৩-১৫৫
ঐ	২৮-২৯	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	১৫৬-১৬৬
ঐ	৫৩-৫৫	ঐ	১৬৭-১৭৩
ঐ	৮৮	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	১৭৪-১৮০
সূরা আত-তাওবা	১৯-২০	ড. কে. টি. হোসাইন	১৮১-১৮৩
ঐ	৩৪-৩৫	ড. সালাহ্ উদ্দিন আহমদ	১৮৪-১৮৬
ঐ	১০৩	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	১৮৭-১৯১
সূরা ইউনুস	৫	ড. আলী আহ্মদ রুশদী	১৯২-১৯৪

www.pathagar.com

সূরার নাম	আয়াত	প্রবন্ধকারের নাম	পৃষ্ঠা
সূরা ইউনুস	১৪	শাহ্ আবদুল হান্নান	১৯৫-১৯৭
ঐ	২২-২৫	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	১৯৮-২০৫
সূরা হূদ	৬	ঐ	২০৬-২১৬
ঐ	১৫-১৬	এ. এ. রুশদী	২১৭-২১৮
ঐ	২৭-৩১	শাহ্ আবদুল হান্নান	২১৯-২২২
ঐ	৩৭-৩৮	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	২২৩-২২৯
ঐ	৮৪-৮৫	ঐ	২৩০-২৩৭
ঐ	৮৭	শাহ্ আবদুল হান্নান	২৩৮-২৪০
সূরা ইউসুফ	২২	ড. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ	২৪১-২৪৩
ঐ	৪৬-৪৯ এবং ৫৫-৫৬	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	২৪৪-২৫৪
সূরা রা'দ	৩-৪	এম. জহুরুল ইসলাম	২৫৫-২৫৯
ঐ	১১	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	২৬০-২৬৮
ঐ	২২	শাহ্ আবদুল হান্নান	২৬৯-২৭০
ঐ	২৬	ঐ	২৭১-২৭৩
সূরা ইবরাহীম	৩	নূর মোহাম্মদ আকন্দ	২৭৪-২৮৩
ঐ	২৪-২৭	শাহ্ আবদুল হান্নান	২৮৪-২৮৭
ঐ	৩২-৩৩	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	২৮৮-২৯৪
ঐ	৩৪	শাহ্ আবদুল হান্নান	২৯৫-২৯৬
সূরা হিজর	১৯-২১	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	২৯৭-৩০০
সূরা নাহল	৫-৮	শাহ্ আবদুল হান্নান	৩০১-৩০৪
ঐ	১০-১৪	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	৩০৫-৩০৮
ঐ	১৮	ড. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ	৩০৯-৩১০
ঐ	৬৫-৭২	মোঃ জহুরুল ইসলাম	৩১১-৩১৭
ঐ	৯০	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	৩১৮-৩২৬
সূরা নাহল	১১৪-১১৭	ঐ	৩২৭-৩৩৩
ঐ	১২-১৫	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	৩৩৪-৩৪২
সূরা বনী ইসরাঈল	১৮-২১	ঐ	৩৪৩-৩৪৭
ঐ	২৯-৩১	অধ্যাপক রায়হান শরীফ এবং শাহ্ আবদুল হান্নান	৩৪৮-৩৫৪
ঐ	৬৬	শাহ্ আবদুল হান্নান	৩৫৫-৩৫৬
ঐ	৭০	নূর মোহাম্মদ আকন	৩৫৭-৩৬১
সূরা কাহ্ফ	২৮	মোঃ জহুরুল ইসলাম	৩৬২-৩৬৪

www.pathagar.com

সূরার নাম	আয়াত	প্রবন্ধকারের নাম	পৃষ্ঠা
সূরা কাহ্ফ	৩২-৩৫	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	৩৬৫-৩৭২
ঐ	৪৫-৪৬	নূর মোহাম্মদ আকন	৩৭৩-৩৭৭
ঐ	৯৪-৯৬	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	৩৭৮-৩৮২
সূরা আম্বিয়া	১৬-১৯	ঐ	৩৮৩-৩৮৫
ঐ	৯২-৯৩	শাহ্ আবদুল হান্নান	৩৮৬-৩৮৭
ঐ	৪৭	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	৩৮৮-৩৯১
ঐ	৯-১৫, ৪৪	মোঃ আবুল হাসনাত দেওয়ান	৩৯২-৩৯৬
সূরা হজ্জ	১১	হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর ও মোঃ শামসুল আলম খান	৩৯৭-৪০০
ঐ	৪১	শাহ্ আবদুল হান্নান	৪০১-৪০৪
ঐ	৫০	মোঃ জহুরুল ইসলাম	৪০৫-৪০৭
ঐ	৭৮	শাহ্ আবদুল হান্নান	৪০৮-৪১০
সূরা মু'মিনুন	১৮-২২	মোহাম্মদ শামসুল আলম খান এবং শাহ্ আবদুল হান্নান	৪১১-৪১৩
ঐ	৫১	মোহাম্মদ শামসুল আলম খান এবং নূর মোহাম্মদ আকন	৪১৪-৪১৯
ঐ	৫৫-৫৬	মোঃ জহুরুল ইসলাম	৪২০-৪২৪
সূরা ফুরকান	২	শাহ্ আবদুল হান্নান	৪২৫-৪২৬
সূরা নূর	৩২-৩৩	ঐ	৪২৭-৪৩০
সূরা ফুরকান	৭-১০	মোহাম্মদ শামসুল আলম খান	৪৩১-৪৩৭
সূরা ফুরকান	৫৩	ঐ	৪৩৮-৪৩৯
ঐ	৬৭	ঐ	৪৪০-৪৪৬
সূরা শু'আরা	১৮১-১৮৩	হাফেজ মোঃ জাফর	৪৪৭-৪৪৮
সূরা নামল	৬৪	হাফেজ মোঃ জাফর	৪৪৯-৪৫০
সূরা কাসাস	৬০	ঐ	৪৫১
ঐ	৭৬-৭৭	ঐ	৪৫২-৪৫৭
সূরা আনকাবুত	১৭	মোহাম্মদ শামসুল আলম খান	৪৫৮-৪৬০
সূরা রুম	৩৭-৪০	হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর	৪৬১-৪৬৫
সূরা আহ্যাব	২৮-২৯	ঐ	৪৬৬-৪৬৯
সূরা সাবা	৩৪-৩৯	ঐ	৪৭০-৪৭৬
সূরা ফাতির	৩	শাহ্ আবদুল হান্নান	৪৭৭-৪৭৯
ঐ	২৯-৩০	ঐ	৪৮০-৪৮৩

www.pathagar.com

সূরার নাম	আয়াত	প্রবন্ধকারের নাম	পৃষ্ঠা
সূরা ইয়াসীন	৩৩-৩৫	মোঃ জহুরুল ইসলাম	৪৮৪-৪৮৯
ঐ	৮০	শামসুল আলম খান	৪৯০-৪৯২
সূরা মু'মিন	৬৪	নূর মোহাম্মদ আকন এবং শামসুল আলম খান	৪৯৩-৪৯৬
সূরা শূরা	৪	হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর	৪৯৭-৪৯৮
ঐ	১২	ঐ	৪৯৯-৫০০
ঐ	১৯	ঐ	৫০১
ঐ	৪৯-৫০	ঐ	৫০২-৫০৩
সূরা যুখরুফ	১০-১২	ঐ	৫০৪-৫০৭
ঐ	৩২-৩৫	ঐ	৫০৮-৫১০
সূরা দুখান	৩৮-৩৯	শাহ্ আবদুল হান্নান	৫১১-৫১৩
সূরা আর-রাহমান	৭-৯	হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর	৫১৪-৫১৫
সূরা মুলক	১৫-১৭	মোঃ আবুল হাসনাত দেওয়ান	৫১৬-৫১৯
সূরা কালাম	১৭-২৭	শামসুল আলম খান	৫২০-৫২৩
সূরা নূহ	১১-১২	শাহ্ আবদুল হান্নান	৫২৪-৫২৬
সূরা মুযযাম্মিল	২০	নূর মোহাম্মদ আকন এবং শামসুল আলম খান	৫২৭-৫৩১
সূরা দাহ্র	৮-৯	শাহ্ আবদুল হান্নান	৫৩২-৫৩৪
সূরা আবাসা	২৪-৩২	নূর মোহাম্মদ আকন	৫৩৫-৫৩৭
সূরা মুতাফফিফীন	১-৩	ঐ	৫৩৮-৫৪১
সূরা বালাদ	১১-১৭	হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর	৫৪২-৫৪৪
সূরা আদ-দোহা	৮-১১	ঐ	৫৪৫-৫৪৭
সূরা আলাক	৬	মোঃ জহুরুল ইসলাম	৫৪৮-৫৪৯
সূরা তাকাছুর	১-২	ঐ	৫৫০-৫৫২
সূরা হুমাযা	২-৪	ঐ	৫৫৩-৫৫৫
সূরা কুরায়শ		মোঃ শামসুল আলম খান	৫৫৬-৫৫৮
পরিশিষ্ট		অধ্যাপক রায়হান শরীফ	৫৫৯-৫৬৮
শব্দসূচী			৫৬৯-৫৮৩

www.pathagar.com

ভূমিকা

১. উপস্থাপনা

সৃষ্টির পরিকল্পনা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ই করেছেন। সে পরিকল্পনার বাস্তবায়নেই শুরু হয়েছে সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং সৃষ্টি রূপ রূপান্তরের বিকাশ আর বিবর্তন। বিশ্ব বলতে আমরা যা বুঝি তার আর মানুষ, প্রাণী, জড়-অজড় বস্তু সবকিছুর বিবর্তনই তার অন্তর্গত। এ বিবর্তনে অন্তর্নিহিত রয়েছে মহান সৃষ্টিকর্তার বিধি-বিধানের নিয়ন্ত্রণের প্রতিফলন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার সঞ্চিত করেছে, তা মানুষের অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের ফসল। মানুষের বিশেষ ক্ষমতাবলেই গবেষণা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের পদ্ধতি অবলম্বন করে নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ আহরণ করে চলেছে ও নতুন নতুন সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু আদি উৎসের সঙ্গে যে যোগসূত্র সৃষ্টিকর্তারই পরিকল্পিত, তাকে অনুসন্ধান ও গবেষণা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তিবাদ থেকে পথচ্যুত হয়েছে অনেকে। মানুষ সৃষ্টির সেরা 'আশ্‌রাফুল মাখ্‌লূকাত' হয়েও অনেক যুগের অনেক ইতিহাসকে ধ্বংসমুখী গর্ব ও অহংকার দিয়ে কলংকিত করেছে। মানব প্রকৃতির মধ্যে অনেক গুণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দুর্বলতাও রয়েছে। সে দুর্বলতাই অহংকার ও ক্ষতির কারণ। মহাকালের লিখিত এবং অলিখিত ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে।* কালস্রোতে মানুষের ভাগ্যের ভাঙ্গা-গড়া ও নানা জাতির উত্থান-পতন। ইহকাল পরকালের সমন্বিত কল্যাণের লক্ষ্যই মানুষের জন্য প্রকৃত বাঞ্ছিত লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের দিকে জীবনের পরিচালনার বিধি-বিধানকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে 'সত্য সরল পথ।' সে পথে আহবান করে মানুষকে আদিকাল হতে শুরু করে ধ্বংস

---

* আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার একটি সংক্ষিপ্ত বাণী সে সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

وَالْعَصْرِ اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ.

"মহাকালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে থাকে, তবে যারা বিশ্বাসী ও (বিধি-বিধান অনুযায়ী) উত্তম কাজ করে তারা ব্যতীত। – সূরা আল-আস্‌র

www.pathagar.com

থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন সৃষ্টিকর্তারই প্রেরিত মহাপুরুষ নবী-রাসূলগণ। শেষ পর্যায়ে প্রেরিত হন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁরই কাছে অবতীর্ণ হয় মানুষের সমন্বিত কল্যাণের উপযোগী পূর্ণ বিবর্তিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাণী 'আল-কুরআন।' স্থান-কাল নির্বিশেষে মানুষের জন্য এ জ্ঞান-ভাণ্ডারের খনিই হলো সঠিক পথপ্রদর্শক। আল-কুরআনের আরেকটি নাম হলো 'আল-ফুরকান' অর্থাৎ অসত্য থেকে সত্যকে পার্থক্যকারী জ্ঞান। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নতুন নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উপরোক্ত কষ্টিপাথর প্রয়োগের অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করার নতুন ইতিহাস সৃষ্টিতে। সে নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানুষের প্রয়োজনীয় সত্যপথের বহুমুখী আদর্শবাদ, আর নির্মিত হয়েছিল বৈপ্লবিক ভাবমর্যাদার ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কারনীতি।*

উক্ত বাস্তবায়িত রূপের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শনের ইতিহাস দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে স্তিমিত হয়ে যায়। অথচ তখনো ইসলামী জ্ঞান বিপ্লবের গ্রন্থ ও পুস্তক শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপীয় দেশে পাঠ্য পুস্তকরূপে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন দ্বারোদ্ঘাটনে মন্থর গতি এবং নতুন প্রতিযোগিতাশীল রাষ্ট্রশক্তিগুলোর সঙ্গে মুকাবিলা করা থেকে শৈথিল্যই এনে দেয় ইসলামী সভ্যতার অবনতি। ক্রমে ক্রমে আসে পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে ক্ষমতা যুদ্ধে ব্যর্থতা। তারই পরিণতিতে আসে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দুর্গতি আর ইসলামী আদর্শবাদের বাস্তবায়নে বর্তমান কালের সংকট। সংকটকাল থেকে পুনরুজ্জীবনে উত্তরণই বর্তমান কালের ইসলামী আত্মচেতনার বিকাশের লক্ষ্য।

আল-কুরআনকে ভিত্তি করে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ তাফসীর জ্ঞান সম্ভার আমাদের অতুলনীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে রয়েছে, তার আকর্ষণ ও আবেদনকে সাধারণ মানুষ প্রধানত আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও দীনী শিক্ষার আলোরূপে গ্রহণ করতে ঐতিহ্যবাহী ধারায় অভ্যস্ত। এ জ্ঞানের প্রচলিত সাধারণ প্রচারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্ব এবং তথ্যের বিকাশ ও বিশ্লেষণ বিরল। অথচ বর্তমানের সংকটকালে এমনি বিকাশ ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান প্রেক্ষিত ও সংকটকে উপলব্ধি করার জন্যেও প্রয়োজন। সংকটের সমাধান ও প্রেক্ষিতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

---

* তাতে প্রমাণিত হয়েছে আল-কুরআনের একটি বাণীর সত্যতা ঃ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ. আমাদের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে এমন এক জাতি (উম্মাত) রয়েছে, যারা সত্যের সাহায্যেই অন্যদেরকে পথপ্রদর্শন করে এবং সেভাবে ন্যায়বিচারও পরিচালনা করে। সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮১

www.pathagar.com

বর্তমান কালে যে কোন দেশের অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতি শিক্ষার্থীদের ভূমিকা জাতি ও সমাজ গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁদেরই গ্রহণ করতে হয় উন্নয়ন কাজের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সাহায্য করার এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ভূমিকা। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিরোধ ও ত্রুটিকে সংশোধন ও সমন্বয়াধীন করে মানব কল্যাণকে ও সমাজকল্যাণকে সর্বোত্তম করার ভূমিকাও তাঁদের। ইসলামী অর্থনীতিবিদ শুধু অর্থনীতিবিদই নন, তাঁকে ইসলামী ঈমানের অধিকাঠামোতে অধিষ্ঠিত থেকে ইসলামী সমাজনীতি, ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির সংযুক্ত এবং সুসমন্বিত জ্ঞান কাঠামোর সাহায্যেই সমাজ ও অর্থনীতি নির্মাণ করতে প্রয়াসী হতে হয়। তেমনি অর্থনীতিবিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও প্রামাণ্য পুস্তক রচনাকে দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম সাহায্যে সম্ভব করা প্রয়োজন।

সুতরাং 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' প্রকল্পটির গবেষকবৃন্দ সমষ্টিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এ প্রকল্পের গবেষণা ফলকে দু' পর্যায়ে প্রস্তুত করা ও প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। সে উদ্দেশ্যে কার্যক্রম এ ভাবে পরিচালিত হয় ঃ

প্রথম পর্যায় ঃ এ পর্যায়ে আল-কুরআনের প্রথম সূরা থেকে শুরু করে অধ্যয়ন ও বিবেচনা মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতের নির্বাচন করা হলো প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপর নির্বাচিত একটি বা একাধিক আয়াতকে ভিত্তি করে গবেষণামূলক কর্মপত্রের খসড়া রচনা করা হয়। গবেষকবৃন্দের সমষ্টিগতভাবে অনুমোদিত নীতিমালা অনুসরণেই নির্ধারিত এক বা একাধিক গবেষক উক্ত খসড়া কর্মপত্র রচনা করার পরে তাঁদের সমষ্টিগত অধিবেশনে বিশদভাবে আলোচিত হয় এবং উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কর্মপত্রটির পরিশোধন, পরিবর্তন ও সমৃদ্ধকরণ করা হয় যে ক্ষেত্রে অনুমোদিত কাঠামোর সীমিত পরিসরে কর্মপত্রটিতে পূর্ণ বিশ্লেষণ পরিবেশন সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু পরিশিষ্ট রচনা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় পর্যায়ে গবেষকদের লক্ষ্য হবে নির্বাচিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করে গবেষণা ফলকে পুস্তক অথবা মনোগ্রাফ পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি তৈরী করা। এ উদ্দেশ্যে গবেষকগণ একক অথবা যৌথভাবে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময়কালের মেয়াদে সম্পূর্ণ করবেন।

বর্তমান ভূমিকাতে প্রথম পর্যায়ের গবেষণাকর্মের প্রথম খণ্ড প্রকাশনার উদ্দেশ্যে যে পাণ্ডুলিপি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, তারই উপস্থাপনা করা হচ্ছে। এ প্রথম খণ্ডে সূরা আল-বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসার অন্তর্গত নির্বাচিত আয়াতগুলোকে

www.pathagar.com

ভিত্তি করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের গবেষণার ফল অন্তর্ভুক্ত করা হলো। তার প্রেক্ষিত হিসেবে আল-কুরআনের জ্ঞান সম্পদের বৈশিষ্ট্য আল-কুরআন ভিত্তিক জীবন বিধান, জীবন ও সমাজ বিধানের ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির কাঠামোতে ইসলামী অর্থনীতির কিছু প্রধান দিক নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

২. আল-কুরআন ঃ ইসলামী মৌল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রন্থ

আল-কুরআন নিয়ে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আল-কুরআন শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, এ হলো মানবতার প্রয়োজনীয় মৌল জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ-যে গ্রন্থকে ওহীর মাধ্যমে পেয়েছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আর অপরিবর্তিত মহান আল্লাহ প্রদত্ত বাণী গ্রন্থ হিসেবে সংরক্ষিত ও সমাদৃত হয়ে এসেছে সারা বিশ্বে। এ জ্ঞানগ্রন্থের জ্ঞানের অনুসরণ এবং জীবন বিধান-সমাজ বিধানে বাস্তবায়ন ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন পরিচালনা আর রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা মাধ্যমে। এ বাস্তবায়নের পর্যায়ভুক্ত অনুসৃত জ্ঞান-ভাণ্ডারকেই বলা হয় সুন্নাহ্। আল-কুরআনের মৌল জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রমাণিত বিশুদ্ধ সুন্নাহ্ মিলিয়ে ইসলামী মৌল জ্ঞান সম্পদ। কুরআনী জ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও নীতিমালা তৎকালীন প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণভাবে দিকনির্দেশনার ভূমিকা পালন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মানব কল্যাণোপযোগী সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি নির্মাণের কালনিরপেক্ষ নির্ভরযোগ্য ভিত্তি করেছে। সে ভিত্তি অবলম্বন করেই ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যৎ কালের ইসলামী ইতিহাস সৃষ্টিও সে ভিত্তির কালনিরপেক্ষ তত্ত্ব ও নীতিমালাকে স্বীকৃতি দিয়েই করে যাবে। উপযোগী গবেষণা ও গবেষণা ফলের ব্যবহারই সে স্বীকৃতির যুক্তিবাদ সৃষ্টি করবে। আল-কুরআনের প্রধান বৈশিষ্ট্য সূরা ইয়াসীনের আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে ঃ يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ভাষায়। এতে রয়েছে যেমন রচনা-কৌশলের হিক্‌মত, তেমনি রয়েছে জ্ঞান, বিজ্ঞান, তত্ত্ব, তথ্য ও মানবিক কল্যাণ প্রয়োগের প্রযুক্তি সম্পদের দিকনির্দেশনা। এতে রয়েছে মহান স্রষ্টার সকল বিধি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের অসীম রহস্য উদ্‌ঘাটন ও নতুন নতুন প্রয়োগ সাহায্যে নতুন নতুন মানব কল্যাণের যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ভাবন এবং নির্মাণ করার কৌশল আয়ত্ত করারও হিক্‌মত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা বাইবেলে অথবা তাওরাত আর যাবূরে সে হিক্‌মতের সন্ধান না পেয়েই বিজ্ঞানের জ্ঞানশক্তিকে মানুষের নিজস্ব শক্তি ধরে নিয়েছেন এবং বিজ্ঞানের ধ্বংসরূপী পথে জ্ঞানানুসন্ধান আর সমাজকে ও মানব প্রকৃতিতে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য

www.pathagar.com

গবেষকদের মধ্যে বিজ্ঞানের অলৌকিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের তত্ত্ব আর তথ্যের আলোচনা পরীক্ষা করে আধুনিক কালের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি বলছেন ঃ "বৈজ্ঞানিক নীতি-বিধির যুক্তিবাদের দিক থেকে বাইবেলের অনেক উক্তি অসঙ্গতিপূর্ণ আর আল-কুরআনের অনেক আয়াতকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করছে।" অর্থাৎ আল-কুরআনের আয়াতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাধনা আরো অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে মানুষের করায়ত্ত করতে সক্ষম হবে।*

৩. আল-কুরআনভিত্তিক জীবন বিধানের বাস্তবায়ন

আল-কুরআন কালজয়ী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আদর্শবাদের ভিত্তিতে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার দিকনির্দেশনা দিয়েছে। সে কারণেই বর্তমানকালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের প্রেক্ষিতে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ আশাবাদী এবং নতুন উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন। ইসলামী জীবন বিধান ও সমাজ বিজ্ঞান এখন আর অতীতকালের তত্ত্ববাদ ও আনুষ্ঠানিকতা নয়। সর্বতোমুখী গবেষণার সাহায্যে বর্তমান কালের উপযোগী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করাই মুসলিম মনীষার কাছে যুগের দাবী। সে লক্ষ্যের অনুসরণে কর্মপন্থার বাস্তবায়নে সাফল্য যে সুনিশ্চিত তার আভাস আল-কুরআনের বাণীতেই বিদ্যমান। যেমন ঃ

ক. আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাণী ও আদেশই দিকনির্দেশনা দেয় ঃ اِقْرَأْ। بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ — অধ্যয়ন কর, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (সূরা আ'লাক ঃ ১)। অধ্যয়ন, অনুশীলন ও বিশ্লেষণই গবেষণা প্রক্রিয়ার দিক-নির্দেশনা।

খ. গবেষণা ও গবেষণাফলকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরূপে মানবিক কল্যাণে প্রয়োগই জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য। প্রথম ধাপটিই তার মধ্যে হলো আল্লাহ্র

* Maurice Bucaille, The Bible, The Quran and Science (Translated from the French by Allastair Pannel and the author), P. 221. তিনি সূচনা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন ঃ "I know from translations that the Quran often made allusions to all sorts of natural phenomena, but I only had a summary knowledge. It was only when I examined the text very closely in Arabic that I kept a list of them, at the end of which I had to acknowledge the evidence in front of me : The Quran did not contain a single statement that was assailable from a modern scientific point of view." (p. 14)

www.pathagar.com

অসীম সৃষ্টি নিয়ে এবং মানুষের সৃষ্টি নিয়ে জ্ঞানের সন্ধান এবং গবেষণা ফলকে মানুষেরই কল্যাণে প্রয়োগ।

গ. আল্লাহ্‌র সৃষ্টির নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীর জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, আকাশে, বাতাসে, প্রকৃতিতে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে, গ্রহতারা, নক্ষত্র, সূর্যের জ্যোতিষ্ক-পুঞ্জের অসীমতায়। এ সকল নিদর্শন হলো সুস্পষ্ট নিদর্শন, যাকে আল-কুরআনে বলা হয়েছে 'আয়াতুল মুবীন'। এ ক্ষেত্রটি অসীম অনন্ত। তার সীমিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন সাহায্যে মানুষ গবেষণা জ্ঞান রচনা করেছে জোতির্বিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, আনবিক, পারমাণবিক বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পশুবিজ্ঞান, মৎস্য বিজ্ঞান, খনিজ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি। আর ব্যবহারিক দিক থেকে কল্যাণময় উদ্ভাবন হয়েছে বিজ্ঞানের প্রয়োগ। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিরূপে মুসলিম বিজ্ঞানীদেরও এ সকল ক্ষেত্রে অবদান সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর এবং সে সকল অবদান অনেক কাল অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতির ভিত্তি হিসেবে সহায়ক ভূমিকা অবলম্বন করেছে।

ঘ. আল্লাহ্‌র অনেক নিদর্শন রয়েছে সমাজ ও জাতির উত্থান-পতনে, তাদের কল্যাণে সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জনের বিপরীত পথ অনুসরণে এবং সত্যের অবমাননা থেকে বিরত হওয়ার সতর্কতাকে উপেক্ষার পরিণতি ধ্বংসবরণে। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীর পৃষ্ঠে।* সে সবের অধ্যয়ন, অনুশীলন ও বিশ্লেষণ থেকে বিবর্তিত হয়েছে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির মূল্যায়ন, নৈতিকতা ও সমাজ গঠনের সমস্যা ইত্যাদি দিকে বিশিষ্ট জ্ঞান।

ঙ. আল-কুরআনের কিছু কিছু মৌলনীতি থেকেই পাওয়া যায় মানুষের মনুষ্যত্ব গঠন ও সমাজ সংগঠনের সঠিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকনির্দেশনা। বিশেষ করে নৈতিকতার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোজন ব্যাপারে। সে সংযোজন ব্যক্তি আচরণকে করে ইসলামী মানদণ্ডের অনুসারী (অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তিত্ব-চরিত্র গঠনধর্মী) আর সমাজ সংগঠনকে করে 'আদ্‌ল' ও 'ইহ্‌সান' নীতি-নির্ভর। তার জন্যেই ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'উম্মাতুন ওয়াসাতুন' ভাবমর্যাদা নিয়ে। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তাঁদের গবেষণা ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে সে জন্যেই এ সব ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি মৌল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এমন মৌল পার্থক্যই ইসলামী জীবন ও সমাজ

* আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এ সকল ঐতিহাসিক নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন জাতির পরিণতি; যখন আ'দ, সামূদ, মাদিয়ান, নূহ্ নবীর সম্প্রদায়, ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায়. লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়, ফিরাউনের সম্প্রদায় ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়ে তোলে।

চ. ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা একটি সমন্বয়ভুক্ত সামষ্টিক ব্যবস্থা এবং তার ব্যবস্থাপনাও সামষ্টিক ও সমন্বিত। তার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও পরিচালনা এক্ষেত্রে বিদ্যমান। কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে এবং পারস্পরিক বিরোধ মুক্ত হয়েই বিদ্যমান। সে জন্যেই সমন্বয় সাধনের প্রশ্ন এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সমন্বয় সাধনের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে ইসলামী নৈতিকতা ব্যবস্থার হাতে। আল-কুরআনের ও স্বীকৃত সুন্নাহ্‌র গবেষণালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেই অবশ্য এমনি সামষ্টিক ও সমন্বিত ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালনার নীতিকাঠামো ও কর্মপদ্ধতি বিবর্তিত হবে। এ সম্পর্কে কয়েকটি বিশিষ্ট দিকনির্দেশনা হলো ঃ

১. ইসলামী নৈতিক ব্যবস্থার (Moral System) স্থান হবে কেন্দ্রস্থলে। এ ব্যবস্থার ভূমিকা হলো মৌল প্রকৃতির। অর্থনীতি ব্যবস্থা, রাজনীতি ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সংবিধান ও আইন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যবস্থা সংগঠনেও এ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার ভূমিকা থাকবে, সে সব বিশিষ্ট ব্যবস্থাকে নির্ধারিত সম্পর্ক পরিমণ্ডলে নিয়ন্ত্রণে রাখাও তারই ভূমিকা। এ কেন্দ্রীয় নৈতিকতা ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি নির্মাণ হবে আধ্যাত্মিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক আচরণ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অনুসরণ মাধ্যমেই নির্মিত হবে এ ভিত্তি। বিশেষ করে দিকনির্দেশনা রয়েছে পাঁচটি মৌল বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং আচরণ ও কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে ঃ ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ।*

২. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবস্থা (Self and Family System) সম্পর্কে দিক নির্দেশনা রয়েছে আল-কুরআন ও স্বীকৃত সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে। নৈতিকতার দিক থেকে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও মানদণ্ড অনুসরণের প্রশ্ন রয়েছে এ ব্যবস্থার পরিচালনায়। পরিবারের দায়িত্বশীল কর্তা বা অভিভাবকের পরিচালনা নেতৃত্ব ঐ ক্ষেত্রে উক্ত দিকনির্দেশনা সম্মত হবে। পরিবারের সদস্যদের সঠিক পরিচালনা ব্যাপারে তাই নৈতিকতা ব্যবস্থার সমন্বয় ভূমিকা থাকবে, আবার জাতীয় ইসলামী আইন-কানূন শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণও থাকবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়-বিচারমূলক অধিকার ও দায়িত্ব পালনের প্রশ্নও থাকবে।

---

* কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক নৈতিকতা প্রশিক্ষণে ভিত্তিগতভাবেই রয়েছে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক মানসিকতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানসিকতা সৃষ্টির অপূর্ব সমন্বয়।

www.pathagar.com

৩. রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থা (State and Social System) পরিচালনা ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ বিশেষ দিক-নির্দেশনা। এ ব্যবস্থাটিও প্রকৃতপক্ষে একটি সামষ্টিক ব্যবস্থা। এর অধীনে রয়েছে রাজনীতি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি ব্যবস্থা (অথবা সংগঠিত সরকার ব্যবস্থা), অর্থনীতি ব্যবস্থা ও সমাজনীতি ব্যবস্থা। রাষ্ট্র পরিচালনা ও সরকার পরিচালনা ব্যাপারে এ সকল প্রধান ব্যবস্থার পরিচালনা আর ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করতে হয়। এ সকল ব্যবস্থাকে প্রথমে মৌলভাবে সমন্বিত করে নৈতিক ব্যবস্থা। অতঃপর রাষ্ট্র বা সরকারের কর্তৃত্বে সমন্বিত হয় ব্যবহারিক পদ্ধতিগতভাবে এবং সাংবিধানিকভাবে বিশেষ করে জাতীয় আয়-ব্যয়ের উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কর্মকুশলতার উদ্দেশ্যে।

৪. শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা (Education-Training System) সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা রয়েছে। তা উপরোক্ত তিনটি দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং বিশেষ করে সব রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী সমন্বিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সর্বস্তরের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থাতেও ভিত্তিগত ভূমিকা ইসলামী নৈতিকতা শিক্ষার আর তার নিয়ন্ত্রণাধীন কাঠামোতে থাকবে সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ যার অঙ্গ হলো অর্থনীতি, রাজনীতি ব্যবস্থার নির্মাণ এবং প্রচলন ব্যবস্থার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ। ইসলামী জীবন বিধান ও সমাজ বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং তার উত্তরোত্তর অগ্রগতি বাস্তবায়ন করার মৌল দায়িত্ব, এমনি সুসমন্বিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার উপর ন্যস্ত। তার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করার জন্যই ইসলামী সমাজে একটা উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও প্রচলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে ব্যবস্থাতে ভিত্তিগত প্রথম স্তর হলো প্রত্যেক নর-নারীর আবশ্যিক শিক্ষা। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন স্তরে প্রয়োজন জীবন গঠনের ও সমাজ গঠনের যথাযথ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা।

৪. ইসলামী অর্থনীতির প্রেক্ষিত ও বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইসলামী জীবন বিধান ও সমাজ বিধান একটি একাঙ্গীভূত সমন্বিত ও বাস্তবায়ন-পরীক্ষিত সার্বিক আদর্শবাদ এবং সেজন্যই তার সংশ্লিষ্ট আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রসূত জ্ঞান-বিজ্ঞান সার্বিক নৈতিকতা কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিচ্ছিন্ন করা হলেই সত্য থেকে বিচ্যুতির আশংকা থাকে। আর সত্য থেকে বিত্যুতিই আনে মানসিক, চারিত্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আপাতদৃষ্টিতে (জড়) সমৃদ্ধির সাফল্য ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির অপূর্ব

www.pathagar.com

কৃতিত্বের নিদর্শন সত্ত্বেও বিপর্যয়। সমন্বিত সর্বাঙ্গীণ মানসিক কল্যাণের দিক থেকে বিপর্যয়। এ সর্বাঙ্গীণ কল্যাণমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং সে সকল ক্ষেত্রের গবেষণা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ বিশ্ব মানবতারই লক্ষ্য। এ লক্ষ্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌রই নির্ধারিত। সমন্বয় কাজে মানুষ ব্যর্থ হয়, যদি তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে, পরিবার সংগঠন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে এবং সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি সংগঠনে যদি উক্ত সর্বাঙ্গীন কাঠামোর যুক্তিবাদকে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতাই আনে অসমন্বিত চিন্তার প্রয়াস, আনে ভারসাম্যহীন দৃষ্টিকোণের প্রাধান্য। আর সেখান থেকেই ক্রমে ক্রমে আসে নৈতিকতাহীন অনুশীলন, অনুসন্ধান এবং তারই ফলশ্রুতিতে আসে ধর্মনিরপেক্ষতার যুক্তিহীন প্রীতি। অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ অকল্যাণের দৃষ্টিহারা স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কীর্ণ পথ সন্ধান। ইসলামী সমন্বিত সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিকোণ তা হতে দেয় না। কারণ, এ দৃষ্টিকোণে ঈমান প্রতিষ্ঠিত আকারে ভিত্তি ধরে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি সংগঠনের চিন্তা আর পরিকল্পনা করা হয়।*

সমন্বিত কল্যাণ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয় ইসলামী সমন্বিত সমাজ। আর তারই জন্য সুসংগঠিত হওয়া প্রয়োজন ইসলামী ভিন্নধর্মী অর্থনীতি। এ অর্থনীতিতে হয় কল্যাণ লক্ষ্যের ও সুস্থ শোষণমুক্ত সমাজের অনুসরণ। তার মূল সূত্র প্রথমেই আসে আল-কুরআনের ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা থেকে, যে নির্দেশনাতে রয়েছে প্রকৃতিগত পরিবেশ তথা বিশ্ব সৃষ্টির পবিবেশে আল্লাহ্ প্রদত্ত ভারসাম্য সংরক্ষণ নির্দেশ (সূরা হিজ্‌র ঃ ১৯, ২০, ২১, ও ২২)।

বিশ্বের সকল সম্পদকে মানুষ ব্যবহার করবে সার্বিক কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সমন্বিত জীবনের সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে। সে জন্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত ভারসাম্য সংরক্ষণ উক্ত উদ্দেশ্য ও সাফল্য লাভেরই সাধারণ সার্বিক নীতি কৌশল (Strategy)। সে নীতিকৌশল থেকে বর্তমান কালের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা বিচ্যুত হয়েই সৃষ্টি করেছে বিশ্বের পরিবেশে সমস্যা— পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সমস্যা, সমুদ্র দূষণ সমস্যা, আকাশ -বাতাস দূষণ সমস্যা আর মানব জীবন ধ্বংসী আনবিক-পারমানবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা সমস্যা।

---

* নিদর্শন ও ঈমান, সূরা আলে ইমরান ঃ ৭; বাকারা ঃ ১৭৭; হূদ ঃ ১; নিসা ঃ ৩৬-৩৮। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব, নিসা ঃ ৫৯, ১২৬; তা-হা ঃ ৬; আল-মুল্‌ক ঃ ১। সমন্বিত উম্মত/জাতি (বাকারা ঃ ১২৩, ১৫১; আলে ইমরান ঃ ১০৪, ১১০; আ'রাফ ঃ ১৮১; আনফাল ঃ ৫৩। ইহকাল-পরকালের সমন্বিত কল্যাণ লক্ষ্য, হূদ ঃ ১৫, ১৬, ১৭।

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও বিজ্ঞানী সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার অভাবেই উত্তরোত্তর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে উপরোক্ত সমস্যাগুলোর অকল্যাণমুখী অমানবিক প্রভাব। আল-কুরআন প্রদত্ত নীতিকৌশল এবং সমাজ ও অর্থনীতি সংগঠনের নীতি নির্দেশ অবলম্বন এ সকল প্রভাব ও ধ্বংসের আশংকা থেকে বিশ্বমানবতাকে মুক্ত রাখতে পারত।*

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাগ্য পরিবর্তনের ব্যাপারে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা আজকাল সর্বত্র স্বীকৃত। আল-কুরআনেও সে সত্য স্বীকৃত। কিন্তু যে প্রেক্ষিতে আর যে সার্বিক কল্যাণের যুক্তি কাঠামোতে সে সক্রিয় ভূমিকা মানুষকে অবলম্বন করতে হবে, পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ও সমাজ (পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক) তাকে স্বীকৃতি দেয়নি। বিচ্ছিন্নতার নীতি কৌশলেই স্বীকৃত হয়েছে পাশ্চাত্য জীবনে, সমাজে, অর্থনীতিতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণে। আল-কুরআন মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রেক্ষিত ও নৈতিকতার যুক্তি কাঠামোতে স্বাভাবিকভাবেই সন্নিবেশিত করেছে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা এবং প্রকৃতি ও বিশ্বের উপর ক্ষমতা আর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ। মানুষের ব্যবস্থাপনার সাফল্যকে বিচ্ছিন্নতাহীন সার্বিক কল্যাণ সংশ্লিষ্ট সক্রিয় প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল করেছে আল-কুরআন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ঃ

ক. প্রকৃতির ও বিশ্বের শক্তি ও সম্পদকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে। (সূরা জাসিয়া ঃ ১২-১৩)

খ. সারা বিশ্বের পরিচালনা ব্যবস্থাকে আল্লাহ্ মানদণ্ডের অর্থাৎ ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষকে ও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তা না হলে মানুষই বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (সূরা আর-রাহমান ঃ ৭-১০)

গ. মানদণ্ড বা ন্যায়বিচারকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে মানুষকে শুধু উপদেশ -নির্দেশই দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে বিশেষ উপযোগী শক্তির

---

* وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ আর তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও; সুতরাং তুমি শুধু এ কুরআনের সাহায্যেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপদেশ দাও, যারা আমার সতর্কীকরণকে ভয় করে তাদেরকে। -সূরা ক্বাফ ঃ ৪৫

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ আর আমরা এ কুরআন উপদেশ দানের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত এমন কেউ আছে কি?

-সূরা ক্বামার ঃ ২২

www.pathagar.com

সম্পদ (যেমন লৌহ)। (সূরা হাদীদ ঃ ২৫) এ শক্তিকে সামরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক শক্তির সম্মিলিত প্রয়োগ ও ধরা যেতে পারে।

ঘ. মানুষের 'রিযিক' আকাশ-বাতাস ও পৃথিবীর সম্পদ থেকে উপার্জন করার আর সে সবের চাবি আল্লাহ্র হাতে। অর্থনৈতিক সাফল্যের মাত্রা তারই 'রিযিক' দানের উপর নির্ভরশীল। সে মাত্রাকে অপরিসীম উন্মুক্ত করা হলে মানুষ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র বিদ্রোহী হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করার আশংকা থাকে। (সূরা আশ্-শূরা ঃ ১২ ও ২৭)

ঙ. ইহলোক ও পরলোকের সমন্বিত কল্যাণের সাফল্য লাভই যে মু'মিন মানুষের লক্ষ্য, তাঁদের আচরণে ও কর্ম প্রয়াসে প্রতিফলিত হয় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অর্থনীতি, সমাজনীতি ও তার সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকার নির্বাচনের যুক্তিবাদ। যেমন ঃ ইহকালের জীবনোপকরণ শুধু জীবন যাপনের স্থায়িত্বহীন সুযোগ সুবিধার জিনিস অথচ আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশিত জিনিস বা কল্যাণ হলো শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর স্থায়ী। শেষোক্ত পথ নির্বাচন তারাই করবে যারা ১. বৃহত্তর অপরাধগুলো অর্থাৎ কবীরা গুনাহ্গুলো বর্জন করে. ২. ক্রুদ্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা প্রদর্শন করে, ৩. আল্লাহ্র বিধি-বিধান মান্য করে এবং নিয়মিত 'সালাত' সম্পাদন করে, ৪. সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত করে, ৫. আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে দান ও ব্যয় করে, ৬. অত্যাচারিত হয়েও নতি স্বীকার না করে পরস্পরকে সাহায্য করে ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। (সূরা আশ-শু'আরা ঃ ৩৬-৩৯)

উপরোক্ত উদাহরণ গুলোতে বিশেষ করে শেষোক্ত উদাহরণটিতে স্পষ্ট বোঝা যায় ইসলামী অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির একাঙ্গীভূত ব্যবস্থারই অন্তর্গত একটি ব্যবস্থা। বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিন্যাসের ভাবধারণা থেকেই তাকে একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থার পর্যায়ে ফেলা যায় এবং ইসলামী অর্থনীতি বলা যায়। এভাবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করতে গেলেও স্মরণ রাখা অপরিহার্য যে এ ব্যবস্থা একটি সামগ্রিক জীবন-ব্যবস্থারই অঙ্গীভূত। সামগ্রিক ব্যবস্থারূপ থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থার রূপ দেওয়া এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন রূপ দেওয়া নয়। বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থাটির বিধি-বিধান শুধু সে ক্ষেত্রটিতে প্রযোজ্য, এ ধরনের ভাবধারণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিক থেকে করণীয় হতে পারে। জীবন আর সমাজের বাস্তব রূপের সম্পর্ক ভাল এবং তার অন্তর্গত সম্পর্কগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিন্যাসের দিক থেকে কিন্তু তেমনি কল্পনা বাস্তবতাহীন। শুধু বাস্তবতাহীন নয়, অসত্যভিত্তিক। অসত্যভিত্তিক বলেই ইসলামী চিন্তা ও বিশ্লেষণ তা স্বীকার করে না। ইসলামী

www.pathagar.com

অর্থনীতি ব্যবস্থা ঃ স্থান-কাল-নিরপেক্ষভাবে মানুষের সর্বোপযোগী অর্থনীতি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার অধীনে অর্থনৈতিক প্রগতি অথবা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া (ভোগের প্রক্রিয়া ও উৎপাদনের প্রক্রিয়া) জীবনের লক্ষ্যকে অর্জন করার সাফল্যকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করার উপায় মাত্র। অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করা জীবনেরও লক্ষ্য নয়, ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য নয়। অর্থনীতিকে সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে ইসলামই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে পথভ্রষ্ট হতে দেয় না। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ তাদের অর্থনীতিকে প্রকৃত মানবিক জীবন থেকে এবং প্রকৃত মানবিক সমাজ থেকে বিচ্যুত করেছে। আর সেজন্যই বিভ্রান্তিকর মত ও পথের বিশৃঙ্খলা এবং সংঘাত সৃষ্টি করেছে নানা ধরনের মতবাদের সংমিশ্রণে। পুঁজিবাদী মতবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদী মতবাদের অধীনে অর্থনীতির রূপ তার জন্যই বিপরীতধর্মী হয়েছে। নৈতিকতাহীন মানবতার উপযোগী জীবনবোধহীন ও সমাজবোধহীন হয়ে সে মতবাদ দু'টি সহিংস স্বার্থপরতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। আর অর্থনীতিকে মানুষের জীবন ও সামাজিক কল্যাণের বিরোধী জ্ঞানযন্ত্রে পরিণত করেছে।

৫. ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থার প্রধান প্রধান দিক-নির্দেশনা

ক. সামগ্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত অর্থনীতি ব্যবস্থা

প্রথম দিক-নির্দেশনাটি হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মৌল সম্পর্ক নিয়ে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রথমে মানুষের ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদর্শকে ভিত্তি করে। এ আদর্শ মানুষকে মু'মিন হিসেবে সুসমন্বিতভাবে সংগঠিত ও বিবর্তিত ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করে। তার ব্যক্তি জীবন পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিকোণের অর্থনৈতিক মানুষ (Economic man) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ইসলামী জীবনের অধীনে ব্যক্তি-মানুষ আদর্শবাদের নৈতিকতা ও বিধি-বিধানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পূর্ণ মানুষ, আংশিক সংকীর্ণ মানুষ নয়। এ সকল পূর্ণ মানুষই আবার সংগঠন করে সুসমন্বিত সমাজ সত্তা ও সামাজিক আচরণ। সামাজিক ইসলামী নৈতিকতা ও বিধি থেকেই আসে প্রশিক্ষণ। সংগঠিত হয় শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সংগঠিত হয় উম্মাহ্‌র রাষ্ট্ররূপ ও সরকার। প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রতিনিধিত্ব করে ব্যক্তি চরিত্রের গুণমর্যাদা। যাঁরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে আসীন হবেন পারস্পরিক আলোচনা, পরামর্শ নীতি ('শুরা বাইনাহুম') অনুসরণে তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করবেন সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের সংকল্পকে -যার নির্দেশ আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে উদ্ভূত। (যেমন-সূরা আন্-নিসাঃ

www.pathagar.com

৫৯-এ* উল্লেখ আছে)। সে সংকল্প প্রশিক্ষণ ও পূর্ণ জ্ঞান থেকেই উদ্বুদ্ধ হবে। রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মকর্তাগণ দায়িত্বে নিযুক্ত হবেন দায়িত্ব পালনের জন্য। ক্ষমতা ভোগ বা ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য নয়। দায়িত্বে আসীন অবস্থায় যে ক্ষমতা তাঁরা ব্যবহার করবেন, তা হলো আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-প্রসূত বিধি প্রয়োগের যোগ্যতার ক্ষমতা। অর্থনীতি ব্যবস্থার বিধি প্রয়োগের যোগ্যতার ক্ষমতাও তার অন্তর্গত।

খ. অর্থনীতি ব্যবস্থার পরিচালনা শক্তি

উপরোক্ত প্রধান দিক নির্দেশনার সামগ্রিক ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তার অন্তর্গত অর্থনীতিকে ইসলামী জীবন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা অথবা অনুশীলন, বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কখনো আধুনিক অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে অনুশীলন বিশ্লেষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা হলেও সামগ্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কের যুক্তিবাদের কাঠামোর শাসন অনুশাসন স্বীকার করেই তা করতে হয়। সে জন্যই ইসলামী অর্থনীতি পাশ্চাত্য ধরনের অর্থনীতি নয়। এ কাঠামোর শাসন-অনুশাসনকে স্বীকৃতিদানে প্রথম পদক্ষেপ হলো মানুষের ভিন্নধর্মী ভূমিকাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করা। ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষের ভূমিকা পূর্ণ-মানুষ হিসেবে। মানুষ শুধু শ্রম নয়। শ্রমের পরিমাণ বা শ্রমশক্তিই মূল্য বা মর্যাদার উৎস নয়। মানুষের ভূমিকা কেন্দ্রীয় শক্তি–যে শক্তি মানুষকেও গড়ে, সমাজকেও গড়ে, আবার অর্থনীতিকেও গড়ে। মনোবল, বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল, উদ্যোগবল এবং শ্রমবল মিলিয়ে মানুষ এসব গড়ে। আর তার ফলেই গড়া হয়ে যায় সভ্যতা আর অগ্রগতির ইতিহাস আর তারই উপযোগী হয় মানুষের কাজকর্ম ও আচরণ। সে কাজকর্ম ও আচরণ কাঠামোভুক্ত থেকেই হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ইসলামী কাজকর্ম ও আচরণ। তারই মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং প্রবাহিত হয় প্রক্রিয়া ও প্রগতির স্রোতধারা। মানুষ ও স্রোতধারার নির্মাণকর্তা আবার নির্মিত প্রতিনিধি; বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ্র প্রতিনিধি। বিশ্ব স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করতে হয় বিশ্ব স্রষ্টার বিধানের প্রয়োগ সাহায্যে আর প্রকৃতির শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদকে বিশ্ব স্রষ্টার

---

* "শাসক ও শাসিত অর্থাৎ সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্তৃপক্ষ (সাধারণ নাগরিকের প্রতিনিধি) উভয়কেই কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের বিধিগত ক্ষমতা লাভ করতে হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। কোন বিরোধ ঘটলে তার সমাধানও হবে সে বিধির-বিধান থেকে। দ্রষ্টব্য ঃ "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ্র বিধি পালন কর, রাসূল (স.)-কে অনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের দায়িত্বে আসীন তাদের আদেশ পালন কর। তোমরা যদি কোন কিছু নিয়ে মতবিরোধে পৌছ, তাহলে তাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে বিচারের জন্য পেশ কর।"

www.pathagar.com

আমানত বলে গণ্য করে। এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতিতে প্রধান মৌলনীতি হলো ঃ

১. শ্রম, প্রয়াস ও উদ্যোগ ছাড়া কিছু গড়া হয় না আর গড়া না হলে মানুষের পাওয়ার বা অর্জন করার কিছু নেই। لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى

২. পৃথিবীর সব সম্পদ মানুষ সন্ধান করবে, আহরণ করবে ও অর্জন করবে শুধু তাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। অবশ্য তার সাথে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনকে ভুলে না যাওয়ার জন্য। (সূরা কাসাস ঃ ৭৭) সে উদ্দেশ্যেই বিশ্ব স্রষ্টা মানুষকে কর্তৃত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং পৃথিবীতে দিয়েছেন জীবনকে সফল করার সব পাথেয়। (সূরা আ'রাফ ঃ ১০)

৩. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের মালিকানা ইসলামী সংজ্ঞায় হবে আমানতদারী, তত্ত্বাবধানের সংকীর্ণ মালিকানা-নিরংকুশ মালিকানা নয়। আকাশ বাতাসের, প্রকৃতির, সমুদ্রের, পর্বতের অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল সম্পদ ও শক্তিকে আল্লাহ্ মানুষের ব্যবস্থাপনার অধীন করেছেন, যাতে মানুষ স্রষ্টার দান থেকেই পার্থিব সম্পদ নির্মাণ, উৎপাদন ও বিতরণ করতে পারে এবং অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন অর্থনীতি ব্যবস্থা ও তার অধীনে সমৃদ্ধি গড়ে তোলার জন্য নিজেকে প্রকৃত সম্পদোপকরণের স্রষ্টার আমানতদার হিসেবে মনে করে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধি ও সাফল্য সে কারণেই মানুষের চরিত্রে দুনীর্তি বা অহংকার আসতে দেয় না। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১২-১৩)

গ. ভোগের প্রক্রিয়া

ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থাতে ভোগের প্রক্রিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য অর্থনীতি হতে ভিন্ন প্রকৃতির। পাশ্চাত্য অর্থনীতির পুঁজিবাদী রূপের মধ্যে ভোগই সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর নিয়ন্ত্রক। বলা হয় "ভোগই অর্থনীতির রাজত্ব শাসন করে" (Consumer is the king)। কারণ ভোগের মাত্রা ও প্রকার থেকেই চাহিদা সৃষ্টি আর চাহিদা সৃষ্টি থেকেই উৎপাদনের উদ্যোগ আর ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ ও বিতরণ। ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগের প্রক্রিয়া ও জীবন যাপনের মান 'শরী'আ'হর বিধির অধীন। ভোগের মাত্রা ও ভোগের পণ্য 'শরী'আ'হর বিধি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। পণ্য শুধু অর্থনৈতিক সংজ্ঞার ব্যবহার্য বস্তু নয়। এখানে পণ্য ভোগের যোগ্য হবে যদি তা 'হালালান তাইয়্যেবান' হয় (অর্থাৎ ইসলামী সংজ্ঞায় যদি হালাল ও পবিত্র হয়)। সুতরাং যা হালাল নয় ও পবিত্র নয় তা মুসলিম ভোক্তার চাহিদা ও ভোগের অন্তর্গত নয়। ভোগ ও চাহিদা সে পরিমাণে হবে সীমিত। জীবন মানও সে কারণে ভিন্নধর্মী। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৮ ও ১৭২) ভোগ এ ক্ষেত্রে শুধু জৈব প্রক্রিয়া নয়। এ হলো

www.pathagar.com

ইসলামী জীবনবাদী প্রক্রিয়া, যার অধীনে মানুষ এক নির্ধারিত পরিমিত ভোগ করে এবং সে সুযোগের জন্য মৌল অর্থনৈতিক সম্পদ স্রষ্টা আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নিয়ন্ত্রিত ভোগই এভাবে ভিত্তি স্থাপন করবে নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের ও বিতরণের।

ঘ. উৎপাদনের প্রক্রিয়া

ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থাতে উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কয়েকটি প্রধান দিকে নীতিকৌশল প্রয়োগ রয়েছে, যার ফলে পণ্য ও সেবার উৎপাদন হবে ইসলামী ভোগ প্রক্রিয়ার অনুসারী এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়া হবে সামাজিক কল্যাণমুখী ও শোষণমুক্ত। 'হালালান তাইয়্যেবান' ভোগ্য পণ্য ও সেবা সরবরাহ করাই হবে উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠনের কাজ। তেমনি সংগঠন ও উদ্যোগকে সফল করা পাশ্চাত্য পদ্ধতির নিছক প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থ ও নানা কৌশলের শোষণ নীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। সে জন্যই ইসলামী উৎপাদনের পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, সংগঠন ও অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী উপাদান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রথমত, যেখানে ভোগ শরীয়াহ্ বিধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এবং অপচয় ও বিলাসের সমর্থন অবাঞ্ছিত, সেক্ষেত্রে অর্জিত আয়ের ব্যয় ও বন্টন হবে উৎপাদনমুখী (সঞ্চয়ের প্রেরণা ও অর্থনৈতিক ব্যবহার মাধ্যমে)। প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় এখানে বিধি বহির্ভূত* অথচ 'ইন্‌ফাকের' উপর রয়েছে বিপুল উৎসাহ-ইসলামী বিধিরই ব্যাপক প্রয়োগ।

দ্বিতীয়ত, অর্জিত উদ্বৃত্ত আয় ব্যয় করা হবে সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে যাকাত ও সাদাকা বন্টন মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনে পুঁজি ব্যবহার মাধ্যমে। এ পুঁজি ব্যবহার সঞ্চয়ের নিজস্ব উদ্যোগের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে হলে বেসরকারী উদ্যোগ প্রাধান্য লাভ করতে পারে আর প্রগতির স্বল্পতার স্তরে নিজস্ব উদ্যোগ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে পশ্চাদপদ থাকলে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার অধীনে সঞ্চয়ের পুঞ্জীভূত ব্যবহার হতে পারে।

তৃতীয়ত, বৃহদাকার উদ্যোগে পুঞ্জীভূত সঞ্চয়ের তহবিলকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা আধুনিক পরিস্থিতিতে অনিবার্য। সে তহবিল সুদহীন ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অর্থাৎ সুদহীন ঋণ বা পুঁজি শেয়ার হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সুদভিত্তিক লেন-দেন ইসলামী উৎপাদন ব্যবস্থাতে হারাম-অবৈধ। এর তাৎপর্য হলো ইসলামী নীতির মাধ্যমেই সামাজিক শোষণের একটি বিরাট হাতিয়ারকে বর্জন করা হয়েছে। জাতীয় আয়ের এ

* ব্যয় করতে হবে কতটুকু সামাজিকভাবে ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত। (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)

www.pathagar.com

অংশ সুদ বর্জিত উৎপাদন প্রক্রিয়াতে আয় বৃদ্ধি করবে সব শ্রেণীর কর্মীর। বর্ধিত শ্রম মজুরী হিসেবে এবং বর্ধিত মুনাফার অংশ দায়িত্ব বন্টন মাধ্যমে, যার ফলে আবার সঞ্চয় প্রক্রিয়া ও উদ্যোগ প্রক্রিয়া শক্তিশালী হতে থাকবে। এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতির উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিবাদী শোষণ নীতির বিপরীতধর্মী। ক্ষুদ্র আয়তনের অর্থনৈতিক উদ্যমে নিজস্ব উদ্যোগেই গড়ে উঠবে শোষণহীন আরেকটি স্তর। সে ক্ষেত্রেও স্বল্পসংখ্যক শ্রমনির্ভর কর্মী থাকলে তাদের মজুরীকে ন্যায়বিচার ভিত্তিক করার জন্যই রয়েছে বিধি। কোন প্রতারণামূলক তত্ত্বের ব্যবহারে শ্রমের মজুরীর সামান্যতম অংশকেও উদ্যোক্তা নিজস্ব মুনাফা বলে আদায় করতে পারবে না। তাছাড়া সমাজের সচ্ছল নাগরিক হিসেবে উৎপাদনের উদ্যোক্তাগণও যাকাত এবং সাদাকা বন্টন করে শ্রমিকদের মজুরীলব্ধ আয়কে বর্ধিত করার প্রক্রিয়া ও সম্পূরক ভূমিকা নিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসে নিরাপত্তা ও সাম্যধর্মিতা আনয়ন করে। এ সকল ধরনের নীতি অবলম্বন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের যুক্তিবাদে নেই বলেই মার্কসবাদ, পুঁজিবাদের তত্ত্বে শোষণের প্রক্রিয়া পেয়েছে এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছে ভুল সংশোধনের লক্ষ্যে। অথচ এক ভুল সংশোধন করতে যেয়ে বিরাট অন্য ভুলের ভিত্তিতেই সৃষ্টি করেছে সমাজতন্ত্রবাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অর্থনীতি। যার অধীনে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়, আত্মার সঙ্গে এবং স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে শৃঙ্খলিত শ্রমজীবীত্ব গ্রহণ করে। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার সাহায্যে মানুষেরই কল্যাণের সমন্বিত সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, যার মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণের ভুল থাকবে না এবং সমাজতন্ত্রবাদী মানবতাহীনতার সুযোগ থাকবে না। স্রষ্টার বিধান ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক অর্থনীতি মানবিক কল্যাণপূর্ণ সর্বকালীন আদর্শবাদের অর্থনীতি।

উপসংহার

আল-কুরআনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো, মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তার বিধি হিসেবে তাঁরই প্রদত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধারণ সত্যকে সর্বকালের উপযোগী করে বাণী ও নির্দেশরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সে কারণেই উক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশদ বিশ্লেষণ বর্তমান কালের অথবা তার পূর্ববর্তী কালের বৈজ্ঞানিক বা দর্শন গ্রন্থের পদ্ধতিতে পরিবেশিত হয়নি। সামাজিক বিজ্ঞানের এবং অর্থনীতির পদ্ধতির বিশ্লেষণ ও আল-কুরআনের পরিবেশিত মৌল সত্যের বাণী ও নির্দেশনার মধ্যে সাযুজ্য আশা করা যাবে না। বিশেষ করে এ কারণে যে বিজ্ঞানের চেয়ে সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতির অনুসন্ধান ক্ষেত্র অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের অনেক সত্যের তত্ত্ব ও তথ্য

www.pathagar.com

সম্পর্কে আল-কুরআনের উক্তি রয়েছে। সে সব উক্তির তাৎপর্যও ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের পরবর্তীকালে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক, গবেষক মরীস বুকাইলী গবেষণা তথ্য ভিত্তিতে বলেছেন ঃ "অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে এ কথা যে আল-কুরআনে এমন একটি উক্তিও নেই যার বিরোধিতা দেখা যাবে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে। এতে এমন কোন ধারণাও নেই, যার মধ্যে পাওয়া যাবে বর্ণনাধীন বিষয়ের কালের প্রচলিত ভাবধারণার প্রতিফলন। তাছাড়া অবশ্য আল-কুরআনে অনেকগুলো তথ্য উল্লিখিত আছে যা আধুনিককাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।"* অন্যদিকে সমাজ ও মানুষের চিরন্তন কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা, আধুনিককালের অর্থনীতি-বিদগণেরও সম্ভব হয়নি। অর্থনীতির বর্তমান রূপের প্রতি কল্যাণকামী দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ শুমেকার তাই বলেছেন ঃ "দৈত্যকার প্রতিষ্ঠান ও স্বয়ংক্রিয়তার অর্থনীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর অবস্থার এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার অবশিষ্টাংশ মাত্র। আর এ অর্থনীতি বর্তমান কালের প্রকৃত সমস্যাগুলোর কোন সমস্যা সমাধানের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। এখন প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা ব্যবস্থার, যে ব্যবস্থার মনোযোগ হবে মানুষের প্রতি, পণ্যের প্রতি নয়। অর্থনৈতিক চিন্তা প্রক্রিয়া যদি এ ব্যাপারটিকেই ধাতস্থ করতে না পারে, তাহলে তা নিরর্থক।" শুমেকার প্রশ্নও রেখেছেন ঃ "সময়ের নিদর্শনগুলো কি যথেষ্ট হয়ে উঠেনি যে এ ব্যাপারে নতুন যাত্রা শুরু প্রয়োজন।** প্রকৃতপক্ষে আল- কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে ভিত্তি করে যে সমাজ ও অর্থনীতি গড়ার পরিকল্পনা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতির মাধ্যমে পনের শতাব্দী পূর্ব থেকে চিন্তিত ও বিবর্তিত হয়েছিল তা অক্ষুণ্ন থাকলে বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোথাও নতুন যাত্রা শুরু করার জন্যে প্রশ্ন তুলতে হতো না।

কিন্তু ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অবসানে কালের অগ্রগতির সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিকে সমুন্নত রাখা মুসলিম উম্মাহ্‌র পক্ষেও সম্ভব হয়নি। ইসলামী অর্থনীতির বর্তমান কালের উপযোগী রূপকে তাই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে উদ্ভাবন ও পুনরাবিষ্কার করতে হবে। নতুন উদ্যমের অনুসন্ধান, অধ্যয়ন, অনুশীলন, বিশ্লেষণ ও গবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে প্রক্রিয়ার পথ ধরে বাংলাদেশের ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও চিন্তাবিদগণ উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টিতে কর্মলিপ্ত। তাঁদের সে

* Maurice Bucaille: The Bible, The Quran and Science, (transl. from the French), Allastair Pennel and author Maurice Bucaille, Preface, P.4.

** E. F. Schumacher: Small is Beautiful, Abacus, London, 1974 (Reprint 1978) pp. 61-62.

www.pathagar.com

প্রয়াসকে ফলপ্রসূ করার জন্য আর সাধারণভাবে সর্বস্তরে নতুন জ্ঞানালোকের দিক-নির্দেশনার প্রতীক হিসেবে প্রচার করার জন্য এ দীর্ঘ কর্ম সম্ভারকে প্রকাশনাধীন পাণ্ডুলিপির খণ্ড দ্বিতীয় হিসাবে তৈরী করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ, পৃষ্ঠপোষকতা দান করার জন্য গবেষকমণ্ডলী আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত কর্মপত্রগুলো নির্বাচিত গবেষকগণ নিজ দায়িত্বে রচনা করেছেন। তবু তাঁরা সমষ্টিগতভাবে সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে খসড়া কর্মপত্রকে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে চূড়ান্ত পর্যায়ে অগ্রসর করার সুযোগ পেয়েছেন। সম্পাদনা কাজ প্রথমে একটি সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে এবং পরবর্তীকালে সম্মিলিত অধিবেশনের অধীনে একাধিক সদস্যের পরিচালনায় সম্পন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

গবেষক সদস্যবৃন্দ
আল-কুরআনে অর্থনীতি
গবেষণা প্রকল্প

www.pathagar.com

আল-কুরআনে অর্থনীতি

দ্বিতীয় খণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল-কুরআনে অর্থনীতি
সূরা আল-মায়িদা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.

হে মু'মিনগণ! তোমরা অংগীকার সমূহ পূর্ণ কর। সূরা আল-মায়িদা ঃ ১

শাব্দিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

১. 'اوفوا' তোমরা পূর্ণ কর। 'وفى' ও 'اوفى' এ দু'টি থেকে নির্গত, অর্থ অভিন্ন। এখানে শব্দটি আদেশমূলক। যা পূরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, (ফিক্হর নিয়ম অনুযায়ী) তা পূরণ করা অবশ্য কর্তব্য বা ফরয। তবে তাফসীরকারগণ বলেছেনঃ কেবলমাত্র তা-ই পূরণ করা ফরয যা কুরআন ও সুন্নাহ্র সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন আর যা তার পরিপন্থী তা প্রত্যাখ্যান-যোগ্য, তা পূরণ করা তো নয়ই বরং তা পূরণ না করাই ফরয।

২. العقود। এক বচনে عقد অর্থ الربط। বন্ধন। আরবী ভাষায় বলা হয় عقدت العهد والحبل। "আমি ওয়াদা শক্ত করে বেঁধেছি, যেমন বলা হয়, আমি রশি শক্ত করে পাকিয়েছি।" এ বন্ধন যেমন বস্তুগত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তেমনি ব্যবহৃত হয় তাৎপর্যগত বা চিন্তা, বিশ্বাস ও আদর্শগত ক্ষেত্রেও। বাংলায় প্রতিশব্দ 'চুক্তি' এবং ইংরেজীতে প্রতিশব্দ 'contract' ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বন্ধনকে রক্ষা করতে ও তা ছিন্ন না করতে আদেশ করেছেন। হাসান বসরী (রা.) বলেছেনঃ উক্ত আয়াতে 'العقود' বলে প্রধানত 'عقود الدين' যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেন পর্যায়ে চুক্তি বুঝিয়েছেন। এর মধ্যে তাও শামিল, যা ব্যক্তি

www.pathagar.com

নিজের উপর কর্তব্য করে নেয়। এ ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা বা কেরায়ার দেয়া-নেয়া, বিয়ে তালাক, চাষাবাদ , সন্ধি, মালিক বানিয়ে দেওয়া বা ব্যবহারাধিকার দান ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে পারস্পরিক ওয়াদা প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত শুধু এতটুকু যে, তা কোনক্রমেই শরীয়াত বহির্ভূত বা শরীয়াত পরিপন্থী হতে পারবে না। এ শর্তের ভিত্তিতে সব চুক্তি, ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পূর্ণ করা ফরয।

এ ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদত-আনুগত্য পর্যায়ে হাজ্জ, সিয়াম, ই'তিকাফ, মানত ইত্যাদি যা নিজের কর্তব্য বলে ঘোষণা করে, তা এর মধ্যে শামিল, তাও পূরণ করা তার কর্তব্য।

' عقد' শব্দের শাব্দিক অর্থের দিক দিয়েই একটা জিনিসকে অপর একটি জিনিসের সহিত শক্ত করে বাঁধার প্রেক্ষিতে শরীয়াত আরোপিত সমস্ত কর্তব্য এবং দীনি হুকুম-আহকাম যা পালন করা বান্দাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। আমানত ও পারস্পরিক কার্য পর্যায়ের সমস্ত 'ওয়াদা বা চুক্তি' (pact or agreement) এ সবই এ আদেশের আওতার মধ্যে।[১]

নাযিল হওয়ার ক্ষেত্র, উপলক্ষ এবং তাৎপর্য

মনীষী ইবনুল আরাবী (র) বলেছেন ঃ আয়াতটি আহলি-কিতাবদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা তাদের প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ.

স্মরণ কর আল্লাহ্ যখন আহ্লি-কিতাব লোকদের নিকট থেকে এ অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা অবশ্যই তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করে রাখবে না। -সূরা আল ইমরান ঃ ১৮৭

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি বিশেষভাবে আহলি-কিতাবদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

তবে সত্য কথা হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতের প্রয়োগ সাধারণ, সকলেরই জন্য; কোন বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে নয়। কেননা। الذين امنو। 'যারা ঈমান এনেছে' এর মধ্যে যেমন উম্মাতে মুহাম্মদ (স) শামিল , তেমনি শামিল হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর উম্মতাও। অন্যতম প্রধান মুফাস্‌সির কুরতুবী (র) এ মতই প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

বিশেষ করে হযরত মূসা (আ)-এর উম্মাত আলোচ্য আদেশের লক্ষ্য এজন্য যে, আল্লাহ্ এবং তাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর গুণ পরিচিতির উল্লেখ ছিল - যা তাদের নিকট ছিল আমানত তা প্রকাশ করা ছিল তাদের কর্তব্য। কিন্তু তারা গোপন করে এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণের পরিবর্তে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর বিরোধিতা করে। আলোচ্য আয়াতে উক্ত ওয়াদা পুরোপুরিভাবে পূরণ করে এবং পালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, যা হারাম করেছেন, যা ফরয করেছেন এবং যার সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এ সমস্ত বিষয়ই যথাযথ রূপে পালন করা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই কর্তব্য। মুজাহিদ প্রমুখও এ মত প্রকাশ করেছেন।

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেছেন ঃ হযরত আমর ইব্‌ন হয্‌ম (র)-কে যখন নাজরান এর গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন, তখন নবী করীম (স) তাঁকে যে লিখিত ফরমান দিয়েছিলেন, তা আমি পাঠ করেছি। তার শুরুতেই লেখা ছিল ঃ

هذا بيان للناس من الله ورسوله : يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট থেকে লোকদের জন্য এ সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ হে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা! তোমরা চুক্তি ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর।"

আল-জাস্‌সাস (র) এ আয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলেছেন, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যে চুক্তি রয়েছে আর তোমরা পারস্পরিকভাবে যা যা কর, সাধারণ-ভাবে তা সবই এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়ে এটাই সহীহ্ কথা। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ المؤمنون عند شروطهم। "মু'মিনরা তাদের ধার্যকৃত শর্তসমূহের সহিত বন্দী।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كانه مائة شرط شرط

"আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই (সমর্থিত নয়) এমন প্রত্যেকটি শর্তই বাতিল, তা একশ'টি শর্তই হোক না কেন।" এর অর্থ হচ্ছে ঃ শর্ত বা চুক্তি ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি যা পূরণ করা ফরয তা কেবলমাত্র তা-ই যা আল্লাহ্‌র কিতাব আল্লাহ্‌র দীনের সহিত

www.pathagar.com

সঙ্গতি সম্পন্ন। তাতে কুরআন, সুন্নাহ্ পরিপন্থী কিছু থাকলে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যেমন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

"যে লোকই এমন কাজ করবে যা'র সমর্থনে আমার কাজ পাওয়া যাবে না, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।"

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, কুরাইশ গোত্রসমূহ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদয়ান-এর ঘরে একত্রিত হয়। পরে তারা এ কথার উপর পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয় যে, মক্কায় যে-ই মাজলুম হবে সে নিজের লোক হোক কি ভিন্‌দেশী ভিন্ গোত্রীয়, সকলে তারই পক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তার উপর কৃত জুলুম দূর করা হবে। কুরাইশ্‌রা এ চুক্তিরই নাম দিয়েছিল 'হিলফুল ফুযুল' এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ "আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদয়ান-এর ঘরে অনুষ্ঠিত এ চুক্তি হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম এবং তা আমার নিকট রক্তিম বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয় ব্যাপার ছিল। ইসলামেও অনুরূপ চুক্তির প্রতি আমাকে আহবান জানানো হলে আমি তাতে অবশ্যই সাড়া দেব।" এ পর্যায়ে রাসূলের এ কথটিও ঃ

وايما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة :

"ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াতের সময় যেসব চুক্তি হয়েছে, ইসলাম তা রক্ষার বাধ্যবাধকতা অধিক তীব্র ও কঠিন করে দিয়েছে, তা বাতিল করেনি।" তার কারণ মজলুমের জুলুম মুক্তি ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান ইসলামী শরীয়াতসম্মত কাজ, তবে সে সব ওয়াদা-চুক্তি ফাসেদ বা বাতিল, যেমন জুলুম ও লুট-পাট ইত্যাদি করার চুক্তি, ইসলাম তা খণ্ডন করে দিয়েছে।

ইমাম শাওকানী (র) হাদীসের বহু কয়টি বর্ণনা সনদের ভিত্তিতে বলেছেন ঃ সর্বসম্মতভাবে সূরা আল-মায়িদা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ সূরা আল-মায়িদা ও সূরা আল-ফাতাহ্ সর্বশেষে নাযিল হওয়া সূরা। রাসূলে করীম (স) এ সময়ে তাঁর জন্তু-যানের পিঠে আরোহী ছিলেন। ওহীর দুর্বহ ভারে জন্তুটি তাঁকে আর পিঠের উপর বহন করতে পারছিল না। তাই তিনি নিচে নেমে এসেছিলেন। রাসূলে করীম (স) নিজেই বলেছেন ঃ

المائدة من اخر القران تنزيلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها "সূরা আল-মায়িদা কুরআন নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে সর্বশেষ।

www.pathagar.com

অতএব তাতে যা হালাল ঘোষিত, তোমরা তাকে হালাল জানবে এবং তাতে যা হারাম ঘোষিত, তোমরা তাকে হারাম জানবে।" তার অর্থ সূরার কোন একটি আয়াতও মানসূখ হয়নি। (যদিও কোন কোন হাদীস বর্ণনাকারী এ সূরারও কোন কোন আয়াত মানসূখ হয়েছে বলে দাবী করেছেন)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ নবী করীম (স) তাঁর খুত্‌বায় সূরা আল-মায়িদা ও সূরা আত্‌-তাওবা পাঠ করেছেন।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানীপত্তি (র) লিখেছেন ঃ العقد। অর্থ العهد الموثق। সুদৃঢ় ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি। এর আসল অর্থ ঃ দু'টি জিনিসকে একত্রিত করা এমনভাবে যে, সে দু'টি জিনিসকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। আর ايفاء। ওয়াদা পূরণের চূড়ান্ত মাত্রার তাকীদপূর্ণ নির্দেশ বুঝায়। আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেছেন ঃ এ নির্দেশ সার্বজনীন। এর মধ্যে আল্লাহ্ বান্দাদের উপর যে সব কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন, সে প্রথম রূহানী জগতে রূহ্-এর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত শরীয়াতের যাবতীয় হুকুম আহ্‌কাম সবই শামিল রয়েছে।[৩]

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) তাঁর তাফসীরে সূরা আল-মায়িদার পর্যায়ে বিস্তারিত ভূমিকা প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচনার অবতারণা করেছেন। তার সারনির্যাস হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের কলবে কুরআন নাযিল করেছেন একটি সুসংগঠিত, সুসংবদ্ধ আদর্শ উম্মাহ্ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যা কুরআন ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে। এ রাষ্ট্র ও সরকারই জনগণকে তাদের মন ও বিবেক-বুদ্ধিকে সঠিকভাবে কুরআন অনুযায়ী লালন, প্রবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ দান করতে পারে। সমাজের সকল ব্যক্তিকে কঠিন বন্ধনে পরস্পরকে সম্পৃক্ত করে দিতে পারে। সে রাষ্ট্র ও সরকারের সহিত অপরাপর রাষ্ট্র ও সরকারের সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, পারে সে উম্মাহ্‌র সহিত অন্যান্য সব উম্মাহ্‌র সম্পর্ক গড়ে তুলতে। এ সবকে একটি কঠিন বন্ধনে বাঁধতে পারে। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রগুলোকে একত্রিত ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। একই উৎসের সহিত সংযুক্ত করে দিতে পারে, একমুখী ও একই সার্বভৌমত্বের অধীন বানাতে পারে। আর এটাই দীন ইসলামের লক্ষ্য। আল্লাহ্ও তাই চান। সূরা আল-মায়িদায় আমরা অসংখ্য বিষয়ের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। সে বিষয়সমূহের মধ্যে একটা সম্পর্কের বন্ধন রয়েছে, যার লক্ষ্য কুরআনের আসল লক্ষ্যেই প্রতিভাত। আর তা হচ্ছে একটি উম্মাহ্ গড়ে তোলা। একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি সমাজ গঠন করা একটি বিশেষ আকীদার ভিত্তিতে। সে

www.pathagar.com

আকীদা হচ্ছে, আল্লাহ্ এক, লা-শরীক, ইলাহ্, রব্ব, কাওয়াম, সুলতান তিনি একাই। জীবন পথ, জীবন বিধান ও মূল্যমান আইন-কানুন সবই কেবল তার নিকট থেকেই অবতীর্ণ।[৪]

আহ্মাদ মুস্তফা আল-মারাগী (র) আলোচ্য আয়াতের সূরা আল-মায়িদা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ এ সূরাটির 'আল-মায়িদা' ছাড়া আরও দু'টি নাম আছে তা' হচ্ছে-'সূরাতুল উকূদ' ও 'সূরাতুল মুনকিযাত'-মানে চুক্তি সংক্রান্ত সূরা ও নিষ্কৃতি দানকারী সূরা। সূরাটিতে আলোচিত বিষয়াদির প্রেক্ষিতে এ নাম দু'টি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সূরাটি হিজরাতের পরে নাযিল হয়েছে বলে তা মাদানী সূরার মধ্যে গণ্য, তা মক্কায় হলেও। বুখারী ও মুসলিমের হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ "আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।" এ আয়াতটি বিদায় হজ্জকালে জুমু'আর দিনে বিকালের দিকে নাযিল হয়েছিল। উক্ত আয়াতটি এ সূরাতেই সন্নিবেশিত।

আল-মায়িদা ও আন্-নিসা এ সূরা দু'টি পরস্পর বিন্যস্ত। এ দু'টির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। প্রথম সূরা আন্-নিসায় অনেকগুলো চুক্তির কথা স্পষ্ট ও আনুসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বিয়ে, মাহরানা, হল্ফ, সন্ধি ও নিরাপত্তা দান পর্যায়ের চুক্তির কথাগুলো স্পষ্ট। আর অসীয়াত, আমানত, ওকালতি ও ইজারাদান পর্যায়ের চুক্তিগুলোর কথা আনুসঙ্গিক। দ্বিতীয় সূরা আন্-নিসায় মদ্যপান হারাম করার প্রাথমিক পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। আর সূরা আল-মায়িদায় তা চূড়ান্ত ও অকাট্যভাবে হারাম করার ঘোষণা রয়েছে। ফলে এ সূরার আয়াত পূর্ববর্তী সূরার চূড়ান্ত কথার পরিপূরক পূর্ণত্ব বিধায়ক। এবং তৃতীয়, সূরা আল-মায়িদায় বেশীর ভাগ কথা ইহুদী ও নাসারাদের সহিত পারস্পরিক বিতর্ক, আলোচনা ও যুক্তি দান পর্যায়ের। যদিও সে সাথেই মুনাফিক ও মুশরিকদের সম্পর্কেও রয়েছে। আর সূরা আন্-নিসায় এগুলোরই উল্লেখ হয়েছে বারবার। তার শেষের দিকে তো অনেক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। বিন্যাসে সূরা আন্-নিসাকে অগ্রে রাখার কারণ হচ্ছে, সূরা আন্-নিসায় يَاَيُّهَا النَّاسُ। হে জনগণ' সম্বোধন দিয়ে শুরু হয়েছে। বহু কয়টি স্থানেই এ সম্বোধন উচ্চারিত হয়েছে। আর এটা মক্কী সূরার সম্বোধনের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সূরা আল-মায়িদা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا। "হে ঈমানদার লোকগণ, এ সম্বোধন দিয়ে শুরু হয়েছে। তা মাদানী সূরায় উচ্চারিত সম্বোধনের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ আর মাদানী সূরা তো মক্কী সূরার পরে বসাই স্বাভাবিক, ক্রমিকধারা অনুসারে।

www.pathagar.com

উদ্ধৃত আয়াতটির তাফসীরে العقود। সম্পর্কে লিখেছেন ঃ এর অর্থ সে সব ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি যা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাগণের মধ্যে হয়েছে। ইমাম রাগেবের বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ এ চুক্তি তিন ভাগে বিভক্ত।

১. আল্লাহ্ ও বান্দাদের মধ্যকার চুক্তি।

২. বান্দার নিজের সহিত নিজের চুক্তি এবং

৩. বান্দার নিজের চুক্তি অন্যান্য মানুষের সহিত।

এর প্রত্যেকটি চুক্তিই এমন যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র রক্ষিত বিবেকবুদ্ধি তাকে বাধ্যতামূলক করে সহজাত ও জন্মগতভাবে পাওয়া বুদ্ধিমত্তাই এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করে কিংবা একটু চিন্তা করলেই তার যৌক্তিকতা বুঝতে পারা যায়। কুরআনের এ আয়াতটি তার যথার্থতার প্রমাণ।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا.

আর স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করে তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন এবং তাদের নিজেদের উপরই তাদেরকে সাক্ষী করলেন এ কথায় যে আমি কি তোমাদের রব্ব নই? তারা সকলেই বলল ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা নিজেরাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

–সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৭২

অথবা সে চুক্তি পালন বাধ্যতামূলক করে শরীয়াতের বিধান। আর তা হচ্ছে সে সব যা কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল (স) থেকে প্রমাণিত।

বস্তুত ইসলামে সমস্ত চুক্তি পালনের ভিত্তি হচ্ছে এ আদেশ ঃ "তোমরা সমস্ত চুক্তি পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত কর।" এর দরুনই প্রত্যেক মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে কথা বা কাজের পর্যায়ের যে কোন চুক্তি পূর্ণ করা অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে আল্লাহ্ ঘোষিত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা হবে না।[৫]

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

উপরোক্ত প্রেক্ষিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে আলোচ্য সংক্ষিপ্ত আয়াতটির তাৎপর্য মৌলধর্মী এবং মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দিকের সঙ্গে ভিত্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবন যাপনে সঠিক নীতি

www.pathagar.com

ও পন্থা অবলম্বনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে রয়েছে উপযোগী সংবিধান রচনার প্রয়োজন ও তারই অধীনে উপযোগী সরকার গঠনের প্রয়োজন, যাতে আল্লাহ্ ও রাসূল (স)-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ শরীয়াতের বিধান পালনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা, নীতি ও আইনকে প্রবর্তন ও কার্যকর করা যায়। কারণ এসবের কাঠামোতেই মু'মিন ঈমানের ওয়াদার শর্তসমূহ পালন বা পূর্ণ করতে সমর্থ হবে। সে কাঠামোর অধীনেই প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী আদর্শবাদের জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা যাতে সম্ভব হবে ইসলামী নীতির ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক আচরণ। পারস্পরিক বিশ্বাস ও পারস্পরিক কল্যাণ বিবেচনার দৃষ্টিকোণ আর মানসিকতা। সুস্থ ও কল্যাণ ভিত্তিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে সব পর্যায়ে আলোচনা, ত্যাগ স্বীকার, সম্পদের সুসম বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণের পথ সন্ধান।

সুতরাং ইসলামী নীতি সামাজিক, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবায়নের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েই সংগঠিত হয় ইসলামী অর্থনীতি। এ অর্থনীতিতে পারস্পরিক কল্যাণের সাহায্যে সমাজের সার্বিক কল্যাণ অর্জন করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিযোগিতা নয়। পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ইসলামী মানব কল্যাণ অনুসরণ নীতির পরিপন্থী। তাই উৎপাদন প্রক্রিয়াতে শ্রমের ব্যবহারের চুক্তি ইসলামী ব্যবস্থাতে হয় মানব-কল্যাণ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি। ব্যবসায় পরিচালনা কাজে দু'টি ব্যক্তি বা দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তিও তেমনি অর্থনৈতিক কল্যাণের ন্যায় ভিত্তিক অংশ গ্রহণের চুক্তি। চুক্তি সম্পাদনের সময়েই ন্যায়নীতির প্রয়োগ হবে ইসলামী ন্যায়নীতি (আদ্ল ও ইহ্সান) অবলম্বনে সমর্থিত পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণে। কাজেই শর্তগুলো অবশ্যই পালনীয়। অবশ্য সার্বিকভাবে অভাবনীয় ও কল্পিত অনিশ্চয়তার কারণে চুক্তি পালনে অসামর্থ্যকে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট আইনেই বিবেচনা করা হয়। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা অব্যবস্থাপনার জন্য প্রত্যাশিত কল্যাণ সৃষ্টি সম্ভব না হলে তার জন্যে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করা যায়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের কারণে শর্তাপালন সম্ভব না হলে তার জন্যে বিশেষ বিবেচনার সুযোগ আইনের অধীনে চুক্তিতেই বিধিবদ্ধ রাখা যেতে পারে। চুক্তির অধীনে মুনাফার অংশ নির্ধারণ এবং সুদহীন ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে মুনাফা বন্টনের চুক্তি নির্ধারণ সে জন্যই দেশটির সাধারণ পরিস্থিতি ও তার ঝুঁকি অনুশীলন বিশ্লেষণ করেই করা সম্ভব। তবু অবশ্য কিছু ঝুঁকি বহন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে উদ্যোক্তাদের ভূমিকারই অংশ। ইসলামী অর্থনীতিতেও সে স্বাভাবিক

www.pathagar.com

প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে যথাসাধ্য কল্যাণ সৃষ্টি এবং কল্যাণের অংশ গ্রহণকে চুক্তির শর্তাধীন করা সমীচীন। ঝুঁকিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে পুঁজিকে ব্যাংকে সঞ্চিত রেখে তার ব্যবহারকে ঝুঁকিহীন করে সকল প্রকার পরিস্থিতিতেই অব্যাহতভাবে পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ অর্জনের অধিকারও সেজন্য ইসলামী অর্থনীতি দেয়নি। ইসলামী ব্যাংকও তেমনি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে না। ব্যবসায়ী ঋণ গ্রহীতাকেও সুদ দিয়ে পুঁজি গ্রহণ করে ব্যবসায়ের উদ্যোগে ঝুঁকি বহন করতে দিতে পারে না।

প্রধানত' অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতে যেখানেই লেন-দেনের প্রশ্ন, সেখানেই ওয়াদা বা চুক্তির প্রশ্ন মৌল। সে চুক্তি অলিখিত, মৌখিক হতে পারে এবং লিখিত, বিধিবদ্ধও হতে পারে। অলিখিত হলে বিশ্বাসই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অলিখিত লেন-দেন যথেষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে শিক্ষার হার যে দেশে কম এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যাপক নয়, সে ক্ষেত্রে অলিখিত চুক্তির ক্ষেত্র যথেষ্ট। সে ক্ষেত্রে মানুষের বিবেক ও নৈতিকতাই শুধু বিশ্বাসের ভিত্তি। মু'মিন ঈমানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্‌র সংগে কৃত চুক্তিকেই বিবেকের চুক্তি স্বীকার করে নেবে এবং লেনদেনের দায়দায়িত্ব পালন করে যাবে। সে ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক আচরণ মিথ্যা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা এড়িয়ে চলবে। যে ক্ষেত্রে সম্ভব এবং আইনানুগ কাজের শৃঙ্খলার জন্যে প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই লিখিত চুক্তিপত্র আবশ্যক। আধুনিক অর্থনীতিতে তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয় সারা বিশ্বে। ইসলামী অর্থনীতি ও কুরআনের নির্দেশ ভিত্তিতেই সে গুরুত্ব দিয়েছে। শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই নয়, আন্তর্জাতিক লেন-দেন ব্যাপারে অথবা বিনিময় ব্যাপারে লিখিত চুক্তিপত্র ও ব্যাংকের সমর্থন বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তার প্রবর্তন ও প্রচলনও ইসলামী অর্থনীতিতে ঈমানের ভিত্তিতে অতীতেও হয়েছিল, বর্তমানেও সমৃদ্ধ আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হতে পারে। চুক্তির শর্ত পালন আইন অনুসারেই বাধ্যবাধকতাপূর্ণ। বর্তমান যুগের আধুনিক বাণিজ্যিক আইন সে ভাবেই দেশে দেশে প্রণয়ন করা হয়। বিচার প্রণালীর অন্তর্গত নিয়মে বিচারালয়ে সে সব সংক্রান্ত অভিযোগের বিচারও হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থাও আছে এবং এসব ব্যাপারে সৃষ্ট ক্ষতির আশংকা হ্রাস করার বীমা পন্থা/গ্যারান্টি পন্থা ইত্যাদি অবলম্বন করা হয়। ইসলামী অর্থনীতির অধীনে এসকল ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সহজতর হবে এবং ক্ষতির আশংকা অনেক হ্রাস পাবে। কারণ মানুষের তৈরী আইনের বাধ্যবাধকতাই শুধু নয়, তার পশ্চাতে ঈমান ভিত্তিক মৌল

ওয়াদা রক্ষা এবং শরীয়াহ্ বিরোধী আচরণ বর্জনই বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা অনেক সংকুচিত করে দেবে।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

প্রমাণপঞ্জি

১. লুগাতুল কুরআন (উর্দূ) আবদুর রশীদ নু'মানী।

২. তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, শাওকানী।

৩. তাফসীরে আল-মাযহারী, সানা উল্লাহ্ পানীপত্তি।

৪. ফী-যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ।

৫. তাফসীরে আল-মারাগী, আহ্‌মাদ মুস্তফা আল-মারাগী।

www.pathagar.com

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ -وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا -وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

তারা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম মাল ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; কাজেই তারা যদি তোমার নিকট (নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে) আসে তবে তোমার ইখ্‌তিয়ার রয়েছে ইচ্ছা করলে তাদের বিচার কর, অথবা অস্বীকার কর। অস্বীকার করলে তারা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর বিচার ফয়সালা করলে ঠিক ইনসাফ মোতাবেকই করবে, কেননা আল্লাহ্‌ ইনসাফকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন। —আল-মায়িদা ঃ ৪২

প্রেক্ষিত

এ আয়াতটি হতে সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পটভূমি ও তার বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিত স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ফালাহ্‌-ই-আম ট্রাস্ট প্রকাশিত মাওলানা মওদূদীর তরজমায় কুরআন মজীদের বাংলা অনুবাদ থেকে উক্ত পটভূমি ও বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এরূপ ঃ

হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষভাগে অথবা ৭ম হিজরীর প্রথমভাগে সূরা মায়িদা নাযিল হয়েছে মনে করা যায়। তার অব্যবহিত পূর্বকালের ইতিহাস মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে ও পরিচালনায় অনেক অগ্রগতি আনয়ন করে। ওহুদের যুদ্ধের পরে মুসলমানদের ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সাধনা নিজেদেরকে সংগঠিত করতে সাহায্য করে এবং তাতে করে শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা হয়। তাদের সংহতি ও শক্তির কাছে মদীনার চতুর্দিকে বিরোধী গোত্রগুলো বশ্যতা স্বীকার করে। তাতে ইহুদী গোত্রগুলোই প্রধান। অতঃপর হেজাজের অন্যান্য স্থানের ইহুদী গোত্রগুলোও বশ্যতা স্বীকার করে। মক্কার কোরায়েশরাও খন্দকের যুদ্ধে পরীক্ষা করে প্রমাণ পেল ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তির। তা ছাড়া নতুন বিপ্লবী নীতির অনুসরণে এ রাষ্ট্রের পরিচালনা এবং শরীয়াহ্‌ ভিত্তিক প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ এতটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো যে ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরাও ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য আসতে শুরু করলো। তারই প্রেক্ষিত আলোচ্য আয়াতটির বিষয়বস্তুর তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝা যায়।

আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক তাৎপর্য

আয়াতটির আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য উপরোক্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের সংগেই সংশ্লিষ্ট। ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকদের বিচার প্রার্থনা সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করা সংগত হবে সে ব্যাপারেই এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোন আচরণের প্রশ্ন প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। রাষ্ট্র-বহির্ভূত প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সংগে বিশেষ করে ইহুদী সম্প্রদায়ের মানুষের সংগে প্রশাসনিক দিক থেকে কি ধরনের ব্যবহার করার নীতি মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে সংগত তারই প্রশ্ন এখানে। ইহুদী সম্প্রদায়ের অথবা ইহুদী জাতি সম্পর্কে বহুকালের ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সে ইতিহাস হলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূলদের প্রত্যাখ্যান, রাসূলদের প্রচারিত আল্লাহ্ তা'আলার বাণীকে প্রত্যাখ্যান, সম্মুখে এক রকম শপথ, পশ্চাতে শপথের অবমাননার সাহায্যে প্রতারণা, খেয়াল খুশি মতো আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত বাণী ও বিধি নিষেধের পরিবর্তন ইত্যাদি ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। সে বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে প্রধান দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতটিতে। ১. তারা মিথ্যা নিয়েই কাজ করতে ভালবাসে, মিথ্যা বিবরণ শোনে এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চায় এবং ২. তারা নিষিদ্ধ দ্রব্য অথবা জীবিকা আহার করে। প্রথমটিতে তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। মিথ্যা ও প্রতারণার সাহায্যে তারা বারবার মূসা আলাইহিস্ সালামের সংগে অন্যায় ব্যবহার করেছে এবং মুনাফেকীর পথে অচল অটল রয়েছে। ঈসা (আ)-এর সংগে মারাত্মক প্রতারণা করেছে এবং নিষ্ঠুরতম আচরণ করেছে। যাদের শত শত বছরের ইতিহাস এ ধরনের, তাদের সংগে কতটা বিশ্বাসের সংগে অথবা আন্তরিকতার সংগে আচরণ করা যেতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই সন্দেহ জাগে, সতর্কতার প্রশ্ন এখানে স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত' তাদের কাছে প্রেরিত আসমানী গ্রন্থের বিধি-নিষেধকেও তারা শ্রদ্ধা করে না, ব্যবহারিক জীবনে মেনে চলে না। সুদের উপার্জন খাওয়া ও অন্যান্য হারাম দ্রব্য খাওয়া থেকে শুরু করে আপন সম্প্রদায়ের মানুষকেও যারা অন্যায়ভাবে শোষণ করতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা বিচার চাইলে ন্যায়পরায়ণতার আদর্শকে অনুসরণ করা যাবে কি যাবে না সে বিবেচনাতেও দ্বন্দ্ব আসতে পারে। সেজন্যই স্পষ্ট নীতি নির্দেশ প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নীতি নির্দেশ আসলো। সে নীতি নির্দেশে কয়েকটি স্পষ্ট সমাধান রয়েছে ঃ

১. ইহুদীরা যদি তাদের সমস্যা নিয়ে বিচার পেতে আসেও তা হলে মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে দু'টি পথ খোলা থাকবে–বিচারের আবেদন গ্রহণ করা আর আবেদন নাম ্র করা। অর্থাৎ যথেষ্ট চিন্তা ও বিবেচনা করে সমীচীন মনে হলেই আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রার্থীর সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও ব্যাপারটির পূর্ব মূল্যায়ে্র মাধ্যমে ন্যায়-বিচারের সুযোগ ও সম্ভাবনা দৃষ্টে আবেদন গ্রহণ করা যাবে। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করার পরে।

২. আবেদন গ্রহণ না করলে ইহুদীরা কোন ক্ষতি করতে পারে সে রকম ভয় করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন প্রশ্ন নেই। সে রকম ভয়ের গুরুত্ব দিলে নিজেদের মূল্যায়ন বিশ্লেষণেরই মর্যাদা থাকে না এবং ন্যায়-বিচারের মাপকাঠি প্রয়োগেরও সুযোগ থাকে না। তাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, আবেদন অগ্রাহ্য করলে ইহুদীরা উক্ত কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৩. গৃহীত আবেদনের বিচার ইসলামী আদর্শের বিধি অনুসারে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার মাপকাঠিতেই করতে হবে। মুসলিম সমাজের কেউ নয়, অন্য সমাজের লোকের সমস্যা বলে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ নিয়ে ন্যায়পরায়ণতার মানদণ্ডকে অবনত করা চলবে না।

৪. বিচার ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার আইন অনুসারে, একই রকম ন্যায়পরায়ণতার মানদণ্ডে পরিচালনা করার যুক্তি হলো আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্য।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ- وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

হে মু'মিনগণ, ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা নিজেরা একে ওপরের বন্ধু, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ জালিম জনগোষ্ঠিকে হিদায়াত করেন না। —আল-মায়িদা ঃ ৫১

গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

এ আয়াতটির اولياء এবং يتولهم শব্দদ্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। اولياء হলো ولى শব্দের বহুবচন। ولى শব্দটি নানাবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–বন্ধু, সাহায্যকারী, মুরব্বী, নৈকট্য অর্জনকারী ইত্যাদি। কোন স্থানে অবস্থানের দিক দিয়ে নিকটবর্তী হওয়ার বেলায় যেমন এটি প্রযোজ্য তেমনি আদর্শগত দিক দিয়ে নিকটবর্তী হওয়া এবং বৈষয়িক বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহযোগিতার দিক দিয়ে নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রেও এ শব্দটি প্রযোজ্য। يتول বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল বোধক শব্দরূপ; মূল হলো تولى এটি ولى এর সমর্থক ক্রিয়ারূপ। يتول অর্থ হবে "সে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে করবে, ইত্যাদি। من يتولهم অর্থ হবে "যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, করবে ইত্যাদি।

তাফসীর ভিত্তিক প্রেক্ষিত

তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত ইব্ন জরীর আত্-তাবারী (রা) বলেন যে, আয়াতটি একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনায় আগমনের পর সেখানকার ইহুদী ও খৃষ্টানদের সংগে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তি অনুযায়ী কোন পক্ষই অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না এবং অপর পক্ষের শত্রুর সংগেও কোন প্রকার সহযোগীতা করতে পারবে না। ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ চুক্তির শর্ত ভংগ

www.pathagar.com

করে মক্কার কাফেরদের সংগে গোপন আঁতাত ও সহযোগিতা করতে থাকে। আবার এদিকে মুসলমানদের সংগেও বাহ্যত ঃ সদ্‌ভাব রক্ষা করে চলতো। বাহ্যতঃ তারা মুসলমানদের সংগে চুক্তিতে ও বন্ধুত্বে আবদ্ধ, অথচ কার্যতঃ মুসলমানদের ক্ষতির জন্য ব্যস্ত। এ প্রসংগে আয়াতটি নাযিল হয়। তবে প্রেক্ষিত নির্দিষ্ট হলেও আয়াতটির বক্তব্য ব্যাপক ও সাধারণ।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বের অমুসলিম বৃহৎ শক্তিগুলো বাহ্যতঃ আলাদা আলাদা শক্তি। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে "তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু।" অপরদিকে মুসলিম উম্মাহ্‌র অবস্থা অত্যন্ত করুন। কোন মুসলিম দেশ খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বানিয়েছে, কেউ ইহুদীদেরকে বন্ধু করে নিয়েছে। আবার কেউ খোদা-দ্রোহী নাস্তিক বিশ্বের বন্ধুত্বের আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং এক মুসলিম দেশ অন্য মুসলিম দেশের স্বার্থের হানি করে অমুসলিমদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে আছে। এ ভাবে এক একটি মুসলিম দেশ কোন না কোন অমুসলিম শক্তির সংগে তথাকথিত বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাদের লেজুড় হয়ে ঝুলছে।

এরূপ বন্ধুত্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিণতি ভয়াবহ। আমরা শুধু অর্থনৈতিক ব্যাপারেই এখানে আলোচনা করব।

কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার নিজ ক্ষমতা ও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অমুসলিম শক্তির সংগে অসম ক্ষতিকর অর্থনৈতিক চুক্তি ও বন্ধুত্বে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। এতে করে সংশ্লিষ্ট সরকারের ক্ষমতা হয়তো কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়, কিন্তু দেশের মুসলিম জনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ভাবে অমুসলিম দেশের সংগে গোপন আঁতাত ও বন্ধুত্ব করার জন্য দেশের মুসলিম জনতা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে সব দেশের সংগে সীমান্ত-বাণিজ্য চুক্তি ও মুসলিম দেশে উৎপন্ন রপ্তানী-যোগ্য দ্রব্যের রপ্তানীর চাবিকাঠি অন্যের হাতে তুলে দেয়া, মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বার্থের হানি করে অমুসলিম শক্তির সংগে অর্থনৈতিক চুক্তি করা ইত্যাদির বেলায় আলোচ্য আয়াতের নির্দেশ প্রযোজ্য।

অমুসলিম দেশগুলো সাধারণ বাজার ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে "তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু" হওয়ার প্রমাণ দিচ্ছে। পৃথিবীতে মুসলিম সংখ্যা কম নয়, মুসলিম দেশও অনেক, তাদের সম্পদ কম নয়, কিন্তু তারা কেন পরস্পরে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করতে পারবে না?

www.pathagar.com

এ আলোচনার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, অমুসলিমদের সংগে অর্থনৈতিক চুক্তি বা বন্ধুত্ব করা যাবে না। তাদের সংগে ভাল ব্যবহার করা, সহযোগিতা করা ইত্যাদির নির্দেশ রয়েছে। যে অর্থনৈতিক চুক্তি ও সহযোগিতায় মুসলিম জনতার উপকার হয়, তাও করা যাবে এবং করা উচিত। সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ্ পাক অমুসলমানদের সংগে কি আচরণ করা হবে সে প্রসংগে ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না এ কাজ হতে যে সে লোকদের সংগে কল্যাণময় ও সদাচারণ করবে যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই। সুবিচারকারীদের ত আল্লাহ্ পসন্দ করেন"। (আয়াত ঃ ৮) (বিঃ দ্রঃ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ঐ আয়াতের আলোচনা প্রসংগে করা হবে)। কিন্তু প্রতিটি চুক্তি ও বন্ধুত্বের বেলায় মুসলিম উম্মাহ্র অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর এর সুদূর প্রসারী প্রভাবগুলো ভালভাবে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। যা ক্ষতিকর বলে মনে হবে, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

ডঃ এ. এইচ. এম. সাদেক

www.pathagar.com

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ.

(বিদ্রোহ মূলক তৎপরতার পরিবর্তে) আহ্লি কিতাবগণ যদি ঈমান আনত ও তাক্ওয়া অবলম্বন করত, তা'হলে আমরা তাদের সব দোষ-ত্রুটি ও অন্যায় তাদের থেকে দূর করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামত পূর্ণ বেহেশ্তে দাখিল করে দিতাম। হায়! কতই না ভালো হত যদি তারা তাওরাত, ইন্জীল এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তা কায়েম করত, তা হলে তারা তাদের উপরের দিক থেকেও খাদ্য লাভ করত, লাভ করত তাদের পায়ের তলা থেকেও। তাদের মধ্যে একদল এমন রয়েছে যারা সত্য পথে আছে কিন্তু তাদের অনেকেই যা করে তা নিকৃষ্ট!

– সূরা আল-মায়িদা ঃ ৬৫-৬৬

তাফসীর লেখকগণের আলোচনা

১. ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (র.) উদ্ধৃত আয়াত দু'টির পূর্ববর্তী আয়াতের আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন ঃ ইহুদীরা নবী করীম (স.)-এর নবূয়ত অকাট্য দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও মেনে নিতে অস্বীকার করছিল হিংসা এবং নিজেদের মান-সম্মান, ধন-মাল ও নেতৃত্ব খোয়াবার ভয় ও সে সবের অতিরিক্ত মায়ার কারণে। আল্লাহ্ দেখলেন, ওরা পরকালের উপর ইহকালকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তখন আল্লাহ্ ওদেরকে দীন পালনের সৌভাগ্য থেকে যেমন বঞ্চিত করলেন ঠিক তেমনি দুনিয়ার জীবনের সৌভাগ্য থেকেও ওদেরকে বঞ্চিত করে দিলেন।... ... এ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ ওরা যখন তাওরাত কিতাবের বিরোধিতা করল, তখন আল্লাহ্ ওদের উপর জালেম বাদশা বখ্ত নসরকে চাপিয়ে দিলেন। পরে ওরা উচ্ছৃংখলতা করলে ওদের উপর রোম্যান শাসক 'পিটাসন' (بطرس) কে বসিয়ে দিলেন। পরে আবার

www.pathagar.com

উচ্ছৃংখলতা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করলে ওদের উপর অগ্নিপূজক গোষ্ঠীকে বিজয়ী করে দিলেন। এরপর আবার পূর্বের ন্যায় বিপর্যয় মূলক কাজ করার পরে ওদের উপর মুসলমানদের জয়ী ও কর্তৃত্বশালী বানিয়ে দিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র বাণী হল ঃ واللّه لا يحب المفسدين. "আল্লাহ্‌ ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন না, ভালো বাসেন না।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা আল্লাহ্‌র কঠিন ও তীব্র অসন্তুষ্টির কারণ। এরপরই উদ্ধৃত আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয়।

এ আয়াত দু'টির বক্তব্য সম্পর্কে ইমাম রাযী'র কথা হচ্ছে ঃ ওরা যদি ঈমান আনত ও তাক্‌ওয়ার জীবন অবলম্বন করত, তা হলে ওরা ইহ্‌কাল ও পরকাল, দুনিয়া ও আখিরাত, উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারত। পরকালীন সৌভাগ্য দু'প্রকারে সীমিত। এক. আযাব না দেয়া, আর দুই. সাওয়াব পৌঁছে দেয়া। আযাব না দেয়ার কথাটি বলা হয়েছে يكفر عنهم سيأتهم -এ। আর সাওয়াব তথা শুভ প্রতিফল দানের কথা রয়েছে لادخلناهم جنت النعيم-এ। আয়াতে যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ, সে ঈমান পরিণত হতে হবে তাক্‌ওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয় তাঁর বিধান পালনে। উপস্থিত অপর কিছু সাওয়াব পাওয়ার গরজে নয়। এ আয়াতে যেহেতু পরকালীন সৌভাগ্যের কথা বলা হয়েছে, তাই পরবর্তী আয়াতে ইহ্‌কালীন সৌভাগ্যের কথা বলা হয়েছে। তা লাভ করা তাওরাত, ইন্‌জীল ও আর যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তা কায়েম করার শর্তাধীন। এ প্রসংগে তিনটি দিকের উল্লেখ করা যায় ঃ

ক. তারা সে সব কাজ-ই করবে যা আল্লাহ্‌র সহিত কৃত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য করা প্রয়োজন, নবী করীম (স.) এবং নবূয়ত প্রমাণকারী সব দলীল তারা পুরাপুরি মেনে নিবে ও স্বীকার করবে।

খ. তাওরাত, ইনজীলকে কায়েম করবে। তাওরাত ও ইনজীলের আইনকানুন ও অনুশাসন সমূহ বাস্তবায়িত করবে। সে সব যা যা দাবী রাখে যথাযথভাবে তা সবই করবে। যেমন সালাত কায়েম করার জন্য তার যাবতীয় ভেতর ও বাইরের শর্তসমূহ পূরণ করতে হয়। এ-ও ঠিক তেমনি এবং

গ. তাওরাতকে তারা তাদের চোখের সামনে এমন ভাবে উজ্জ্বল করে রাখবে, যেন কোন এক মূহূর্তে তার নির্ধারিত ও ঘোষিত সীমা সমূহ লংঘন না করে।... ... ... মোটামুটি তাওরাত কায়েম করার কাজটি এভাবেই করতে হবে। "আর যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে" বলতে কুরআনকে বুঝান হয়েছে, অথবা কুরআনসহ অন্যান্য অবতীর্ণ সব কিতাব-ই।

www.pathagar.com

"ওরা ওপর থেকে ও পায়ের তলা থেকে আহার্য পাবে" এ পর্যায়ে লিখেছেন ঃ ইহুদীরা যখন নবী করীম (স.) কে অমান্যই করে যাচ্ছিল, তখন ওদের উপর দূর্ভিক্ষ, কঠোর ও কষ্টকর জীবন চেপে বসেছিল। এ অবস্থার মধ্যে পড়েই তারা বলতে শুরু করেছিল يد الله مغلولة। "আল্লাহ্‌র হাত বন্দী।" অর্থাৎ তিনি কৃপণ। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ উদ্ধৃত আয়াত দু'টি নাযিল করেন।[১]

২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) লিখেছেন

এ আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্ তা'আলা একটা বড় ঈমানী মৌলনীতি উপস্থাপিত করেছেন, তা হচ্ছে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দীন কায়েম করার তাৎপর্য হ'ল, মু'মিনদের এ জীবনে ও পরজীবনে সমানভাবে কল্যাণ ও সাফল্যের প্রতিষ্ঠা করা। দীন ও দুনিয়া বা দুনিয়া ও আখিরাত এ দু'য়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা নেই। দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য একই পদ্ধতি দীনের যা নিয়ম, দুনিয়ারও সে নিয়ম। এ বড় ঈমানের কথাটি এসেছে আহ্‌লি কিতাব লোকদের আল্লাহ্‌র দীন পরিহার, তাদের হারাম খাওয়া, বৈষয়িক হীন স্বার্থে আল্লাহ্‌র কালামে তাদের বিকৃতি সৃষ্টি প্রভৃতির প্রসংগে।

এ দু'টি আয়াত ইসলামী ধারণার একটি বড় মৌলনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। মানব জীবনের প্রেক্ষিতে এ দু'টি আয়াতের বাণী এক মহাসত্যের প্রতীক।

আল্লাহ্ আহলি কিতাব লোকদের অতীব সত্য বলেছেন যে, তারা যদি ঈমান আনত ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন করত, তা হলে তিনি তাদের সব মন্দ, দুর্দশা ও দুর্ভাগ্য দুর করে দিতেন এবং তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করতেন। এ হল পরকালীন শুভ প্রতিফল আর তারা যদি তাদের বৈষয়িক জীবনে তাওরাত ও ইন্‌জীলে আল্লাহ্‌র ঘোষিত নিয়ম পদ্ধতি সমূহ বাস্তবায়িত করত, তা ছাড়া আরও যা তিনি তাদের জন্য নাযিল করেছেন, এবং তাতে কোনরূপ বিকৃতি না আনত, তা হলে তাদের বৈষয়িক জীবনও কল্যাণময় হত। তাদের রিয্‌ক হত বিপুল ও পূর্ণমাত্রায়। তাদের উপর থেকে ও পায়ের নীচ থেকে তারা রিয্‌কের প্রবাহ লাভ করত। বিপুল উৎপাদন হত, সুন্দর বন্টন হত, জীবনের সমস্ত ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হত। কিন্তু তারা ঈমান আনেনি, তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেনি, আল্লাহ্‌র পদ্ধতিও তারা বাস্তবায়িত করেনি।

আয়াত দু'টি থেকে এ কথাই জানা যায় যে, ঈমান, তাক্‌ওয়া এবং বৈষয়িক জীবনের বাস্তবতায় আল্লাহ্‌র নাযিল করা পদ্ধতি বাস্তবায়ন শুধু সংশ্লিষ্ট লোকদের কেবলমাত্র পরকালীন জীবনের কল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণ করে না, যদিও তা-ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও চিরন্তন। বরং অনুরূপভাবে দুনিয়ার জীবনের সামষ্টিক কল্যাণেরও

www.pathagar.com

বিধান করে। এ সবের একটা তাৎক্ষণিক শুভ ফলও রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বিপুল প্রবৃদ্ধি। নিঃখুত, নিরপেক্ষ বন্টন ও রিয্কের নিরাপত্তা দান। আল্লাহ্‌র কথা ঃ لأكلوا من فوقهم ومن ارجلهم "তারা নিঃসন্দেহে খাবার লাভ করত তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিম্নদেশ থেকে।" এ থেকে উক্ত কথাটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে।

একালের মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস, মন-মানসিকতা ও তাদের বাস্তবতায় ইহকাল ও পরকালের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এ কালের চিন্তায় নিমজ্জিত মানুষ সাধারণভাবে বিভ্রান্ত। এ দু'টি পথের কোথায় ও কোন এক বিন্দুতেও মিলিত হওয়া সম্ভব বলে তারা মনে করে না। এর বিপরীতটাই বরং তাদের মন মগযে বদ্ধমুল হয়ে রয়েছে। এ কারণেই প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, লোকেরা হয় ইহকালের পথ অবলম্বন করছে এবং পরকালীন পথ তাদের হিসেবের খাতা থেকেই সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে রেখেছে অথবা এর বিপরীত পরকালীন পথ অবলম্বন করছে, দুনিয়ার পথ একেবারেই পরিহার করে চলেছে। এ দু'টি পথের একত্রিত মিলিত হওয়ার কথা তাদের ধারণায় আসছে না। কেননা একালের জীবন দর্শন সেভাবেই গড়ে উঠেছে, লোকদেরকে তার-ই শিক্ষা দিচ্ছে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, বর্তমান পথভ্রষ্ট জীবন ধারা মহান আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কহীন, তাঁর দেয়া জীবন ও পথ থেকে অনেক দূরে। এ জীবনধারা দুনিয়ার পথ ও পরকালের পথকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে, দু'টির মধ্যে বিরাট দুরত্ব এনে দিয়েছে। এ জীবনধারা সমাজের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশকামী ও বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা লাভের মাঠে উপার্জন ইচ্ছুকদেরকে পরকালীন পথ থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য করে, দীনের জন্য ত্যাগ-তিতীক্ষা গ্রহণ, উন্নত পবিত্র নৈতিক চরিত্র ধারণ এবং দীনের তাকীদে উচ্চতর চিন্তা-ভাবনা ও পরিচ্ছন্ন আচার-আচরণ পরিহার করে চলার জন্য উৎসাহ জোগায়। পরকালীন নাজাত পেতে চাওয়ার লোকদের এ দুনিয়ার ধারা প্রবাহের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলে, এ ক্ষেত্রের মলিনতা এড়িয়ে চলা তাদের পক্ষে সম্ভবই হচ্ছেনা। যে সব অবাঞ্ছিত অন্যায় প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে সমাজ-ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ হয়, দুনিযার ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব লাভ সম্ভব হয়, তা যতই যুলুম, শোষন মূলক ও মানবতা বিরোধী হোক, তাকেই করতে বাধ্য করে। সে উপায় ও প্রক্রিয়া কখনই পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয় না, হয় না দীনী চরিত্র সম্মত। তার প্রতি থাকতে পারে না মহান আল্লাহ্‌র একবিন্দু সন্তুষ্টি।

www.pathagar.com

বর্তমানে এ অবস্থা থেকে মুক্তির কোন পথ দৃশ্যমান নয়, দুনিয়ার পথ ও আখিরাতের পথ এক ও সমন্বিত হবে, তারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু দুনিয়া ও পরকালের মধ্যেকার এ দুরত্ব ও বিরোধ দুনিয়ার পথ ও পরকালের পথের মধ্যে এ বিচ্ছিন্নতা কখনই চূড়ান্ত সত্য হতে পারে না। বর্তমানের এ অবস্থা পরিবর্তন যোগ্য নয়। বরং বর্তমান জীবনের প্রকৃতির সহিত এ অবস্থা মূলতঃই সামঞ্জস্যশীল নয়। এ একটা অস্থায়ী অবস্থা। চিন্তা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগী ও জীবন-দর্শনের সর্বাত্মক বিকৃতির কারণেই এটা ঘটেছে।

বস্তুতঃ মানব-প্রকৃতির মূলসূর ও তাকীদ হচ্ছে দুনিয়ার পথ ও আখিরাতের পথের পূর্ণ সমন্বয়। পরকালীন কল্যাণের পথটিকেই হতে হবে ইহকালীন কল্যাণের পথ। পৃথিবীতে সাধিত কাজে-কর্মে, উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি ও বিপুলতা-ই পরকালীন লাভের উপায় হতে হবে, যেমন তা দুনিয়ার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা নিয়ে আছে, তা-ই হবে পরকালীন মুক্তি লাভের উপায়। ঈমান, তাক্ওয়া ও নেক-আমল-ই হবে বিশ্ব-সভ্যতা নির্মাণের মৌল উপকরণ, তা-ই হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালীন কল্যাণ লাভের উপায়।

মানব জীবনের প্রকৃতিতে নিহিত এটাই মৌল সত্য। কিন্তু এ মৌল সত্য বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে কেবল তখন, যখন এ দুনিয়ার সমগ্র জীবনটা মানুষের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত পথে চলবে ও যাপিত হবে। এ পদ্ধতিই মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি কাজকেই 'ইবাদাত' বানিয়ে দেয়। দুনিয়ার বুকে খিলাফত, শরীয়াত মুতাবিক বানায় আর খিলাফত হচ্ছে ব্যাপক নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতা উৎপাদনশীলতা, ফসল ও পণ্যের প্রবৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাচুর্য। সম্পদ বন্টনে ন্যায়পরণতা, নিরপেক্ষতা, সকলকেই রিয্ক দান উপর থেকে ও পায়ের তলা থেকেও, যেমন আয়াতে বলা হয়েছে।

ইসলামী জীবন ধারণা পৃথিবীতে মানুষের সকল কাজকে আল্লাহ্র খিলাফতে গণ্য করে। এ খিলাফতই আল্লাহ্র অনুমতিপ্রাপ্ত। তা আল্লাহ্ আরোপিত শর্তের ভিত্তিতে পালনীয়। এ জিনিসই উৎপাদনমূলক ফলপ্রসূ কার্যক্রম, পৃথিবীর বুকে অবস্থিত সকল উপাদান, উপকরণ, কাঁচামাল ও আমদানীর সহযোগিতায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ব্যাপক সচ্ছলতা বিধান খিলাফতের দায়িত্ব পালন। বিশ্ব প্রকৃতির বুকে প্রচ্ছন্ন সব শক্তিকেও এ কাজে লাগানো খিলাফতের দায়িত্বভুক্ত। আল্লাহ্র পন্থা ও বিধান অনুযায়ী খিলাফতের শর্তের অনুসরণে এ দায়িত্ব পালনই আল্লাহ্র আনুগত্য। মানুষ এ বৈষয়িক কাজের ফলেই পরকালীন সাওয়াব পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত। এরূপ কাজের ফলেই মানুষ

www.pathagar.com

পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণ লাভে ধন্য হতে পারে, আল্লাহ্ ত সে কল্যাণসমূহকে মানুষের জন্যই সংরক্ষিত করেছেন। এরূপ কাজ ও জীবন যাপনের দরুণই উপর থেকে রিয্ক বর্ষিত হয়, পায়ের তলদেশ থেকেও রিয্ক উৎসারিত হয়ে উঠে। এটাই হচ্ছে কুরআনী ধারনার যথার্থ ব্যাখ্যা।

এ ধারনা অনুযায়ী যে লোক পৃথিবীতে নিহিত প্রাকৃতিক সম্পদ উৎস সমূহ মানুষের রিয্কের ব্যবস্থায় আবিষ্কারে এবং প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে সে কাজে ব্যবহার করে না, সে ত না-ফরমান, গুনাহ্গার, আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যে দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে, তা অমান্যকারী। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وسخر لكم ما فى السموت وما فى الارض جميعا منه "এবং তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন বানিয়ে রেখেছেন যা কিছু আকাশ মণ্ডলে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তার সব কিছু।"

এরূপ অবস্থায় বান্দাদের জন্য আল্লাহ্র দান এ রিয্ক-এর উৎসকে যারাই অনুদ্‌ঘাটিত ও অব্যবহৃত বেকার ফেলে রাখবে, তারা যেমন পর-কালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি এবং এ কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইহজীবনেও।

একটি প্রশ্ন অনেককেই বিভ্রান্ত করে। তা হচ্ছে, দুনিয়ার বহু জাতি ও জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের ঈমান ও তাক্ওয়া নেই, জীবনে আল্লাহ্র পন্থা বাস্তবায়িত নয়। তা সত্ত্বেও তাদের জীবনে কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ অফুরন্ত, উৎপাদনের বিপুলতা, ব্যাপকতা এবং সুবিপুল সচ্ছলতা, ভোগ-সম্ভোগ। না, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। বর্তমানের প্রবৃদ্ধি-বাহ্যিক প্রকাশ, মানবতা বিরুদ্ধ, মিথ্যা প্রতারক। এ সচ্ছলতা সাময়িক, প্রতিষ্ঠিত নিয়ম রীতি যতক্ষণ চলছে শুধু ততক্ষণের জন্য, আল্লাহ্ প্রদত্ত পদ্ধতির মোতাবেক বস্তুগত উদ্ভাবনের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতা ও পার্থক্য পুরা মাত্রায় প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্তই থাকবে। বর্তমানে ত বহুরূপে তার লক্ষণসমূহ প্রকাশমান ও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

বর্তমান বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে সম্পদ বন্টনের ত্রুটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে বিভিন্ন জাতি ও সমাজ চরম দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে পড়েছে, পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠেছে। এ সব কারণে সম্ভাব্য আত্মকলহ, বিবাদ ও বিসম্বাদ ও আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ, বিপ্লবের ভয়ে মানবতা আতংকিত ও কম্পিত। সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিপুলতা সত্ত্বেও এ এক কঠিন অপ্রতিরোধ্য মহাবিপদ। এমন এক বিপদ, যার দরুন মনে একবিন্দু শান্তি ও স্বস্তি নেই, রাত্রির নিশ্চিন্ত নিদ্রাও তাদের ভাগ্যে

www.pathagar.com

জুটছে না। মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক পর্যায়ে বিপর্যয় প্রকট হয়ে উঠেছে, যার ফলে বস্তুগত জীবন ও ধ্বংসের করাল গ্রাসে নিপতিত হচ্ছে।

তার কারণ হ'ল কর্মতৎপরতা, উৎপাদন ও বন্টন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই নৈতিক নিরাপত্তা ও নির্ভরতা থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রচলিত আইন-বিধান সে নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা উপস্থাপনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। খোদাহীন সমাজ সভ্যতার সর্বত্র তা-ই দেখা যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের জাতি সমূহ যে স্নায়ুবিক অস্থিরতা ও বিচিত্র ধরনের রোগে ভুগছে, বিশেষ করে বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ ধন্য উন্নত-জাতি সমূহ, তা তো সকলেরই জানা। তার ফলে মেধাও সম্ভাবনার মান অনেক নেমে যাচ্ছে। আর তদ্দরুন কাজ ও উৎপাদনের মানও হ্রাস পাচ্ছে। বস্তুগত সচ্ছলতা ও অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পৌঁছে যাচ্ছে। এগুলো বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের ব্যর্থতার সুস্পষ্ট অকাট্য প্রমাণ, এদিকে বিশ্ববিবেকের দৃষ্টি সম্প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। মানুষ প্রতি মূহুর্তে এক বিশ্বব্যাপী মহাধ্বংসের আশংকায় থরথর করে কাঁপছে। মানবীয় স্নায়ু ও এর দরুন কঠিনভাবে-প্রভাবিত হচ্ছে, তা তারা অনুভব করতে পারুক, কি নাই পারুক, এরই দরুন নানাবিধ স্নায়ুবিক রোগে মানুষ ভুগছে।

এ কারণে ঈমান, তাক্ওয়া ও মানুষের বাস্তব জীবন-ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত পদ্ধতির প্রবর্তন এবং কাজ, শ্রম, উৎপাদন ও দুনিয়ায় খিলাফতের দায়িত্ব পালন এ দু'য়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধান একান্তই্ বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে আহ্লি কিতাবের জন্য বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানব প্রজাতির জন্য এ সমন্বয় সাধনেরই শর্ত আরোপ করেছেন এ বলে যে, তারা যদি সমন্বয় সাধনকে সত্য করে তুলতে পারে, তা হলে তারা উপর থেকেও খাবার পাবে, পাবে পায়ের তলা থেকেও। তাদের সব মন্দ ও খারাপ অবস্থা দূর হয়ে যাবে এবং পরকালে নিয়ামত ভরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈমান, তাক্ওয়া এবং বাস্তব জীবনে রাব্বানী জীবন পদ্ধতি বাস্তবায়ন কর্ম,উৎপাদন, উন্নয়ন ও জীবনের বিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। তবে আল্লাহ্র সহিত গভীর সম্পর্ক জীবনের স্বাদটাকেই পরিবর্তন করে দেয়, জীবনের মূল্যমানকে উন্নত ও উচ্চতর করে। জীবনের সমস্ত মানদণ্ডকে ভারসাম্যপূর্ণ করে। বস্তুতঃ ইসলামী ধারণায় ও ইসলামী পদ্ধতিতে এটাই হচ্ছে মূলকথা। এছাড়া আর যা কিছু তা এর অধীন ও শাখা-প্রশাখা মাত্র। তারপর সমগ্র ব্যাপারে সম্পূর্ণ না লাভ করে দুনিয়া ও আখিরাতে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও বিণ্যাসের মধ্যে।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে একথাও স্মরণীয় যে, ঈমান, তাক্ওয়া, ইবাদাত, আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক এবং জীবনে আল্লাহ্র শরীয়াত প্রতিষ্ঠা এ সব কিছুরই ফল মানুষের জন্য, মানুষের জীবনের জন্য। কেননা আল্লাহ্ তার এক বিন্দু মুখাপেক্ষী নহেন। এ ভিত্তিতে ইসলামী পদ্ধতি যখন শক্ত হয়ে দাঁড়াবে সমস্ত কর্ম ও তৎপরতার ভিত্তিই হবে তা। যে সব কাজ ও তৎপরতা এ ভিত্তিক নয়, সে সব প্রত্যাখ্যাত হবে।

হাদীসে কুদসী হযরত আবু যার (র.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) আল্লাহ্র এ কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

"হে আমার বান্দাগণ ! আমি আমার নিজের উপর যুলুম হারাম করেছি। তোমাদের পারস্পরিক ক্ষেত্রেও উহা হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা পারস্পরিকভাবে যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট যাকে আমি হেদায়েত দিয়েছি সে ছাড়া। অতএব, তোমরা আমার নিকট হেদায়েত চাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, আমি যাকে খাইয়েছি সে ছাড়া। অতএব, তোমরা সকলে আমার নিকট খাবার চাও, আমি তোমাদের খাবার দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বিবস্ত্র (উলঙ্গ) আমি যাকে কাপড় দিয়েছি সে ছাড়া। অতএব তোমরা সকলে আমার নিকট বস্ত্র চাও আমি তোমাদেরকে পোষাক দেব। হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা তো রাত দিন অনেক ভুল ত্রুটি, গুনাহ্ করো আমি তোমাদের সব গুনাহ্ মাফ করে দেব। অতএব তোমরা আমার নিকট মাগফিরাত চাও, আমি তোমাদের মাফ করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতিসাধন পর্যন্ত কখনই পৌঁছতে পারবে না, তাই কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, তোমরা আমাকে কোন রূপ ফায়দা দান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, অতএব কোন ফায়দাও দিতে পারবেনা। হে আমার বান্দাগণ ! তোমাদের প্রথম দিকের ও শেষ দিকের সব লোক, তোমাদের সব মানুষ, সব জ্বিনও যদি তোমাদের মধ্যকার যে কোন একজন সর্বাধিক তাক্ওয়া সম্পন্ন ব্যক্তির মত হয়, তা হলেও আমার রাজ্য-সাম্রাজ্যে এক বিন্দু বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দাগণ ! তোমাদের প্রথম দিকের ও শেষ দিকের এবং তোমাদের সব মানুষ, সব জ্বিন তোমাদের সর্বাধিক পাপি ব্যক্তির দিলের মত হয়, তা হলেও আমার রাজ্য-সাম্র্রাজ্যের একবিন্দু ক্ষতি হবে না। হে আমার বান্দাগণ ! তোমাদের প্রথম দিকের ও শেষ দিকের তোমাদের সব মানুষ সব জ্বিনও যদি একটি উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে, আর আমি প্রত্যেককে তার প্রার্থনা পরিমাণ দান করি, তা হলে আমার নিকট যা আছে তা থেকে কিছুমাত্র হ্রাস পাবেনা। হ্রাস পাবে শুধু অতটুক যতটুকু সমুদ্রে সুঁচ ডুবিয়ে তুলে নিলে পানিতে

কমতি পড়ে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের নিজেদের আমলই আমি তোমাদের জন্য একত্রিত করি, পরে তা তোমাদেরকেই পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়ে দেই। এ ব্যবস্থায় যে লোক ভাল কিছু পেয়ে গেলে, সে যেন আল্লাহ্‌র হামদ করে আবশ্যকীয়ভাবে। আর যে তার বিপরীত কিছু পাবে, সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই তিরস্কৃত না করে।---মুসলিম।

এ হাদীসের আলোকে ঈমান, তাকওয়া, ইবাদত, জীবনে আল্লাহ্‌র পদ্ধতি বাস্তবায়ন এবং আল্লাহ্‌র শরীয়াত অনুযায়ী শাসন-প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এ সব কিছুই মূলতঃ আমাদের মানুষের নিজেদের কল্যাণে ইহকালও পরকালে। এ উভয় জগতে মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য তা একান্তই জরুরী।

এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আল্লাহ্‌র এ শর্ত আরোপ কেবলমাত্র আহলি কিতাব লোকদের জন্যই নয়। এ শর্ত যাদের প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, তাদের জন্যও প্রযোজ্য অধিক আবশ্যিকভাবে। যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে, তারা যেহেতু তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা তাদের নিজেদের প্রতি নাযিল হয়েছে সে সব কিছুর প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য। তাদের প্রতি নাযিল হওয়া শরীয়াত পালন করতে তারা যেমন বাধ্য তেমনি বাধ্য তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি নাযিলকৃত শরীয়াতের প্রতিও যতক্ষণ তা মানসূখ না হয়েছে। কেননা এরা ত সে দীনের ধারক ও বাহক যে দীন ব্যতীত অন্য কিছু আল্লাহ কর্তৃক গ্রহণীয় নয়। তাদের পর্যন্ত এসে সব দীন নিঃশেষ হয়ে গেছে। অতঃপর আর কোন দীনের প্রশ্নই ওঠেনা।

অতএব, আয়াত দৃষ্টিতে উল্লেখিত ও ঘোষিত শর্ত মুসলমানদের জন্য ও প্রযোজ্য, তাদের জন্য রয়েছে। আল্লাহ্ তাদের যে কাজে রাযী বা সন্তুষ্ট তাদের উচিৎ তাতেই রাযী ও সন্তুষ্ট হওয়া। আয়াতদ্বয়ে মন্দ, খারাপ সমূহ বিদূরিত করণ এবং পরকালে জান্নাতে প্রবেশের যে শর্ত আল্লাহ্ করেছেন এবং উপর থেকে ও পায়ের তলদেশ থেকে খাবার পাওয়ার যে ওয়াদা রয়েছে, তা গ্রহণ করে শুভফল পেয়ে ধন্য হওয়া বাঞ্ছণীয়।

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম দেশে তারা যে ক্ষুধা, রোগ, ভয়-ভীতি, সংকীর্ণ কষ্ট কর অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছে, এ অবস্থায় তাদের উচিৎ আল্লাহ্ আরোপিত শর্ত পূরণ করে তাঁর ওয়াদা পূরণের ক্ষেত্র তৈরি করা ও তার ফলে সে সুখ সুবিধা লাভ করা যার ওয়াদা আল্লাহ করেছেন।[২]

www.pathagar.com

অর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

প্রথম আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, আহ্লি কিতাব লোকের যদি সর্বশেষ নবী রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রতি ঈমান গ্রহণ করে ও তাকওয়ার জীবন যাপন করে, তা হলে আল্লাহ দ্বিবিধ প্রতিফল দিবেন। প্রথম ইহকালে তাদের দৈন্য* দূর করে দেবেন। এ দৈন্যের মধ্যে যেমন নৈতিক ও ধর্মীয় দিক রয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকও। বস্তুতঃ কুরআন উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণে প্রকৃত ঈমান ও সত্যিকার তাকওয়ামূলক জীবন সকল প্রকার নৈতিকতা হীনতা ও গুনাহ্ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, সে সাথে রাজনৈতিক গোলামী, অর্থনৈতিক অভাব-অনটন, অকর্মণ্যতা, অনুউৎপাদন, দূর্নীতি, সম্পদের লুট-পাট ও অসম বন্টন জনিত দুর্দশা থেকেও নিস্কৃতি দিতে পারে। আর মানুষের পরকালীন মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ যে কেবলমাত্র ঈমান ও তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল সে ত সাধারণ সত্য হিসেবে ইসলামী জীবনে স্বীকৃত আছেই।

বস্তুতঃ একই কাজের দ্বিবিধ প্রতিফল ইসলামী ধারণার বিশেষ অবদান। সে ধারণায় ইহজীবন ও পরজীবন দু'টি সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন জীবন নয়। বরং একই অব্যাহত জীবনের ধারা, বাহ্যিকতায় প্রথম পর্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায় মাত্র। ঈমান ও তাক্ওয়া ভিত্তিক জীবনের শুভ প্রতিফল যেমন এ দুনিয়ায় পাওয়া যাবে সর্ব প্রকারের দুর্দশা থেকে মুক্তির মাধ্যমে, তেমনি পরকালে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে। অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির মৌলনীতিকে সমন্বিতরূপে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটির বক্তব্য হল, তাওরাত, ইন্জীল ও অন্য যা কিছু তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে তা কায়েম করলে তারা বৈষয়িক ফল হিসেবে উপরের দিক হতে ও নিম্নের যমীন থেকে বিপুল খাবার পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। প্রচলিত বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় এর যথার্থতা বোধগম্য না হলেও ইসলামী দৃষ্টিকোণে এর ব্যাখ্যা সহজ। আর তা হচ্ছে , আল্লাহ্র দীন পালনের ও দীন অনুযায়ী জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদি জীবনের কাজ সম্পন্ন করা হলে খাদ্যাভাবের পরিবর্তে রিয্কের বিপুলতা অনিবার্য। কোন মু'মিন ব্যাক্তির এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কুরআনের দাবী শুধু এতটুকুই নয় যে, ঈমান, তাক্ওয়ার জীবন ও দীন কায়েমের ফলে খাদ্যাভাব তথা অর্থনৈতিক অভাব-অনটন দূরীভূত হবে। বরং অর্থনৈতিক অভাব, অনটন ও দুর্দশা দূরীভূত হবে কেবলমাত্র তখনই যখন ঈমান ও

---

* 'সাইয়েআত' শব্দের ব্যাপক তাৎপর্য প্রকাশের জন্য 'দৈন্য' বাংলা শব্দটি ব্যবহার করা হলো।

www.pathagar.com

অভাব, অনটন ও দুর্দশা দূরীভূত হবে কেবলমাত্র তখনই যখন ঈমান ও তাক্ওয়া ভিত্তিক জীবন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা হবে বাস্তবভাবে। অর্থাৎ ইসলামী জীবনাদর্শের অধীনে ইহকাল ও পরকালের জন্যে এমন সুসমন্বিভাবে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন, সমাজ গঠন ও অর্থনীতি গঠন সম্ভব যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সর্বস্তরে প্রতিফলিত হবে। ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক শক্তি ও ভাবমূর্তি সবকিছুই জীবনাদর্শের সমন্বিত প্রভাবে উন্নতি ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারই ফলে বাস্তবরূপ প্রকাশ পাবে ইসলামী জীবনাদর্শের সামগ্রিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আর জীবনের নানা ক্ষেত্রে।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

প্রমাণপঞ্জি

১. তাফসীরে কবীর, ফখরুদ্দীন আর-রাযী, ১২শ খণ্ড, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা।

২. ফী-যিলালিল কুরআন, সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ. ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৫-২৩৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-আন‘আম

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ.

ওরা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জনগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি, যাদেরকে আমরাই তাদের নিজ নিজ সময়ে অতিশয় প্রভাবশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত বানিয়েছিলাম। তাদেরকে আমরা যমীনের বুকে এতখানি কর্তৃত্বশালী বানিয়েছিলাম যতটা ক্ষমতাবান আমরা তোমাদেরকে করিনি। তাদের জন্য আমরা উর্দ্ধলোক থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করেছি। তাদের নিম্নভূমি থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি। কিন্তু তারা যখন আমার দেয়া নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপরাধ করল, তখন তাদের এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের স্থলে পরবর্তী পর্যায়ের জনগোষ্ঠী সমূহকে গড়ে তুললাম।

–সূরা আল-আন আম ঃ ৬

কতিপয় শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

قرن এক সময়ের একটা জনগোষ্ঠী, একবচন, বহুবচনে قرون এক সময়ের সমগ্র বিশ্বমানব, لاقتران। থেকে গৃহীত। এক কালের পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত জনগণ। কোন কোন তাফসীরকারের মতে আয়াতে قرن শব্দের পূর্বে اهل। শব্দটি ছিল, পরে সেটি

www.pathagar.com

উহ্য করা হয়েছে। যেমন, কুরআনের আয়াত ঃ واسال القرية মূলতঃ واسال اهل القرية। ছিল। اهل শব্দটি সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এদিক দিয়ে অর্থ হবে, কালের একটি সময়। আর এ সময় হচ্ছে, ষাট বছর, কিংবা সত্তর বছর, অথবা আশী বছর। কারো মতে, একশ' বছর। অধিকাংশ হাদীস-বিদ্‌দের মতে একশ' বছর। এর প্রমাণ হিসেবে রাসূলে করীম (স.)-এর একটি কথা পেশ করা হয়েছে। তিনি একজনকে বলেছিলেনঃ تعيش قرنا তুমি এক 'করণ' বাঁচবে। লোকটি একশ' বছর বেঁচে ছিলেন। আসলে قرن শব্দের আভিধানিক অর্থ জন্তুর শিং বা যা উর্ধ্বে উদীয়মান। قرين পার্শ্ববর্তী সহচর, একই সময় বসবাসকারী জনগণ।

مكناهم ، تمكين থেকে। মূল مكين স্থান।تمكين অর্থ কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা, ক্ষমতাবান বানানো, কর্তৃত্ব চালানোর সুযোগদান, কর্তৃত্ব সম্পন্ন বানিয়ে দেয়া, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। مكان 'মাকান' স্থান বা স্থানে স্থিতি কিংবা অবস্থান গ্রহণ। আর مكين অর্থ متمكن ذى قدر ومنزلة মর্যাদা ও শক্তিশালী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।[১]

তাফসীর লেখকদের বিশ্লেষণ

১. ইব্‌ন কাসীর (র.) লিখেছেন ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে নবী অমানাকারীদের প্রতি কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই তাদেরকে প্রাচীন-কালীন নবী আমান্যকারীদের পরিণতির কাহিনী শুনানোর প্রয়োজনবোধ হয়েছে। এ আয়াতে তাদেরকে নসীহত করা হয়েছে ও ভয় দেখিয়ে সতর্ক করতে চাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রাচীনকালের বহু জনগোষ্ঠী শক্তি সামর্থ্য ও ধন-জনের দিক দিয়ে অনেক উন্নত, অগ্রগণ্য এবং বলিষ্ঠ ছিল। তা সত্বেও তাদের নাফরমানীর কারণে তাদের উপর এ বৈষয়িক জীবনেই কঠিন-কঠোর আযাব এসেছে। এ প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি পাঠনীয়।

২. ইমাম কুরতুবী (র) লিখেছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র অফুরন্ত শক্তি, সামর্থ্য, ধন-সম্পদ ও নিয়ামত প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীও যখন কুফরী করে ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাদের এ কুফরী ও গুনাহের প্রতিশোধ লওয়া হয় এবং সে নিয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৩]

৩. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র.) লিখেছেন ঃ (আয়াতের বক্তব্য হ'ল) ওরা কি অতীত হয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী সমূহের পরিণতি দেখতে পায় না ? আল্লাহ্ তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শক্তি ও কর্তৃত্ব আধিপত্যের এমন সব উপায় উপকরণ তাদেরকে তিনি দিয়েছিলেন, যা হে মক্কাবাসী,তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। তাদের উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হ'ত, ফলে চতুর্দিক সবুজ শস্য-শ্যামল হয়ে উঠেছিল

www.pathagar.com

এবং বিপুল রিয্ক তাদের জন্য উজাড় করে দেয়া হয়েছিল। পরে কি হয়েছে ? তারা তাদের রব্ব-এর নাফরমানী করেছে। ফলে তাদের গুণাহের জন্য আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেছেন। অতঃপর তাদের স্থানে এক নবতর জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিয়েছেন। তারাই তাদের স্থানকে দখল করে নিয়েছে। এভাবে নবী অমান্যকারী, সত্য দীন প্রত্যাখ্যানকারী লোকেরা মহাশক্তি ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র নিকট খুবই অক্ষম ও শক্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। পরে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। পৃথিবী নিজ স্থানে থেকে তার ভূমিকা অব্যাহতভাবে পালন করে গেছে। যেমন পূর্বে ছিল,তেমনই রয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, সেখানে বসবাসকারী যেন ইতিপূর্বে কেউ ছিল না। পৃথিবীর আবর্তনে নতুন করে জীবনের প্রবাহ চলতে লাগল, যেন পূর্বে এখানে কোন জীবনই অবস্থিত ছিল না।

বস্তুত এ এমন একটি মহাসত্য, যা আল্লাহ্ যখন কোন জনগোষ্ঠীকে এখানে প্রতিষ্ঠা দান করেন, তখন তারা তা বেমালুম ভুলে যায়। তারা একথাও ভুলে যায় যে, তাদের এ প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সম্ভবপর হয়েছে এবং তা হয়েছে তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, তারা আল্লাহ্‌র সহিত কৃত চুক্তি রক্ষা করে কি না তা দেখার জন্য। সে চুক্তি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব করার ও একমাত্র তাঁরই অনুগত হয়ে জীবনযাপন করার। কেননা দেশ, শক্তি ও প্রতিপত্তির একমাত্র নিরংকুশ মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষ তাঁর খলীফা হিসেবে তাঁর নিকট থেকে এসব সাময়িকভাবে প্রাপ্ত হয়। এগুলো পেয়ে তারা নিজেদেরকে 'তাগুত' বানায় না কি, আল্লাহ্য়ী কর্তৃত্ব ও 'উলুহিয়াত'-এর দাবিদার হয় না কি, আল্লাহ্‌র দেয়া 'খিলাফত' কায়েম রাখে, না নিরংকুশ মালিকত্বের অহংকারে 'আল্লাহ' হয়ে বসে, তাও তাদের পরীক্ষার বিষয়।

কিন্তু মানুষ এসব ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত চুক্তি লংঘন করে, আল্লাহ্‌র কায়েম করা সুন্নাতকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। এর নির্মম পরিণতির কথা প্রথমে তাদের মনে আসে না। ফলে ধীরে ধীরে বিপর্যয় শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পরিণতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্‌র ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়ে পড়ে।

এ নির্মম পরিণতির রূপ বিভিন্ন হয়ে থাকে। কখনও আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেন কঠিন আযাবে তারা মূলোৎপাটিত হয়ে যায়। আযাব আসে উপর থেকে, আসে তাদের পায়ের তলদেশ থেকে। এভাবে বহু প্রাচীন জনগোষ্ঠীই নিঃশেষিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার কখনও তাদের পাকড়াও করেন কঠিন বিপদ-আপদ, লোক ক্ষয় ও ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। এভাবেও বহু জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তি ঘটেছে। কখনও একই জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে গোটা

www.pathagar.com

গোষ্ঠীই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক পক্ষ অপর পক্ষকে কঠিন কঠোর আঘাবে নিমজ্জিত করে, একে অপরকে ধ্বংস করে। এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাদের সামষ্টিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ্ তাঁর অপর বান্দাদেরকে তাদের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন করে প্রতিষ্ঠিত করেন। ..... যারা বুঝতে পারে, এটাই আল্লাহ্র নিয়ম, এটা আল্লাহ্র পরীক্ষা এবং আল্লাহ্র অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে, তারাই সৌভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যারা এ মহাসত্য বিস্মৃত হয়ে পড়ে, মনে করে তাদের করায়ত্ত যা কিছু তা একমাত্র তাদের বিবেক, বুদ্ধি ও কর্ম শক্তির জোরে অর্জিত। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়াই তারা নিজেরাই তা কেড়ে নিয়েছে, তাদের মত হতভাগ্য বনে আর কেউ নেই।

আল্লাহ্দ্রোহী, দুষ্কৃতিকারী, নাস্তিক কাফেররা অবস্থার তাৎক্ষণিক কোন পরিবর্তন না দেখে কঠিনভাবে প্রতারিত হয়, মনে করে আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করবেন না বা পাকড়াও করতে পারবেন না। ওরা খুব শিগগিরই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে, পথের শেষ বিন্দু ওদের দৃষ্টির আড়ালেই পড়ে থাকে। যখন তারা নিঃশেষ ও নির্মূল হয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পায়, তখনই পরবর্তীকালের লোকেরা বুঝতে পারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আসল কারণ। কুরআন মজীদ এ আয়াত এবং এ ধরনের আরও অসংখ্য আয়াত দ্বারা এ সব আত্মপ্রতারিত জনগোষ্ঠীকে সতর্ক করে দিতে চাচ্ছে। তাদের সম্মুখে নাফরমান জনগোষ্ঠীর শেষ পরিণতির কথা স্পষ্ট করে দিয়ে এখনই তাদেরকে সতর্ক হয়ে উঠতে বলেছে।

বস্তুত ঃ فاهلكناهم بذنوبهم "অতঃপর আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের গুনাহ সমূহের কারণে"। এ আয়াতটি এবং এ ধরনের আরও বহু আয়াত কুরআন মজীদে বার বার উচ্চারিত হয়ে একটি মহাসত্যকে মানুষের সম্মুখে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত করেছে, তা থেকে আল্লাহ্র 'সুন্নাত' যেমন জানা যায়, তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ইসলামী ব্যাখ্যাও বুঝতে পারা যায়। আর তাহ'ল. গুনাহ গুনাহকারীকে ধ্বংস করে। গুনাহগারদেরকে তাদের গুনাহের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেন, এটাই আল্লাহ্র চিরন্তন 'সুন্নাত'।[৪]

৪. আহ্মাদ মুস্তফা আল-মারাগী (র.) লিখেছেন ঃ আয়াতটির সারকথা হচ্ছে, প্রাচীন জনগোষ্ঠীসমূহকে দৈহিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, কাজ-কর্মে বিপুল ও ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা, ধন-মালের প্রাচুর্য এবং দুনিয়ার স্বাদ-আস্বাদনের অফুরন্ত দ্রব্য-সামগ্রী দেয়া হয়েছিল, যা এখনকার লোকদেরকে দেয়া হয়নি। কিন্তু তা তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। তারা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহকে আল্লাহ্র দানরূপে মেনে নেয়নি,

www.pathagar.com

তাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী-রাসুলগণ যে সত্য বিধান নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি তারা ঈমান আনেনি বরং তাঁকে তারা অমান্য করেছে, অগ্রাহ্য করেছে। ফলে তারা কঠিন আযাব পাওয়ার যোগ্য হয়েছে এবং পেয়েছে। তাদের পরিণতি এ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদের গুনাহের কারণে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর তাদের পর তাদের স্থানে অন্য লোকদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে সব গুনাহ ধ্বংস অনিবার্য করে দেয় তা দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

১. আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলগণের সহিত শত্রুতা করা, তাঁদের নীতি ও আদর্শের বিরোধিতা করা, অহংকার-গৌরবে মেতে উঠা, অনাধিকার চর্চা করা, সীমা লংঘন করা এবং দীনকে অগ্রাহ্য করে চলা।

২. আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামতসমূহকে অসন্তুষ্টি সহকারে অস্বীকার করা, সত্য দীনকে ঘৃণা করা, দুর্বল লোকদের উপর যুলুম করা, শক্তিমানদের প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়া, অন্যায় ও নাফরমানীর কাজে আল্লাহ্‌র দেয়া ধন-সম্পদ ব্যয় করা, অপচয় করা, ধন-ঐশ্বর্য পেয়ে গর্ব ও অহংকার করা।[৫]

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আয়াতটি যদিও তদানীন্তন মক্কা ও আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের আল্লাহ্ ও রাসূল অমান্য অগ্রাহ্যকারীদের তাদের এ কাজের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করণ পর্যায়ের; তথাপি এতে মানবতার জন্য চিরন্তন ও শাশ্বত তত্ত্ব বিধৃত রয়েছে। তা হ'ল এ বিশ্বলোকের স্রষ্টাও নিয়ন্ত্রক পরিচালক রয়েছেন শুধু তাই নয়, তিনি এক ও একক, লা-শরীক। তিনিই এ পৃথিবীতে মানুষকে জীবন সামগ্রী দিয়েছেন,দিয়ে থাকেন, যারা এ দীনকে কোন না কোনভাবে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে, তাদের এ অস্বীকৃতি ও অগ্রাহ্য করণের অপরাধের অনিবার্য শাস্তি ও প্রতিশোধ স্বরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। এক কথায় এ আয়াতটি তাওহীদ ও রিসালাতের যেমন বলিষ্ঠ প্রবক্তা, তেমনি আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচিতির উপস্থাপকও বটে। আর তা হচ্ছে কুরআন অনুযায়ী গঠিত সমাজের ভিত্তি।

সাধারণভাবে সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন একটি প্রকৃতি উর্ধ্বতত্ত্বের (Metaphysical thought); উপরোক্ত তত্ত্বই হচ্ছে তা। এর বিপরীত তত্ত্বও রয়েছে, যাকে ভিত্তি করেও সমাজ গঠিত হয়। কিন্তু কুরআন উপস্থাপিত মানবতার ইতিহাস নিঃসন্দেহে ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন উপস্থাপিত তত্ত্বকে অস্বীকার করে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিংবা কুরআন উপস্থাপিত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত সমাজ যখনই সে তত্ত্ব হারিয়ে বা তা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপরীত তত্ত্বকে গ্রহণ করে,

www.pathagar.com

তখনই সমাজ কঠিন বিপর্যয়ের গ্রাসে নিঃপতিত হয় এবং চরমভাবে ধ্বংস, নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে উক্ত স্থানে নতুন এক মানব বংশ (New generation) গড়ে উঠে। মানবতার অগ্রগতি এ ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করেই চলেছে এ সত্য শাশ্বত; অতীতে তা হয়েছে, বর্তমান সময়েও তা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা হবে। এর ব্যতিক্রম হওয়া কক্ষনই এবং কোনদিনই সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে সমাজ সমষ্টিই কোনরূপ শক্তি সামর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে ঐশ্বর্য, বৈভবের বা বিপুল প্রাচুর্যের অধিকারী হয় তা সবই সে এক ও একক মহান স্রষ্টার অনুগ্রহের দান। বাহ্যিকভাবে যদিও তা সে সমাজের লোকদের সামষ্টিক যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা এবং মেধা ও প্রতিভার ফসল মনে হয়; কিন্তু মূলতঃ তা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র দান ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোচ্য আয়াতে স্রষ্টার সে দানের দু'টি প্রধান দিক উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত। একটি রাষ্ট্রীয়, অপরটি অর্থনৈতিক। যখন কোন সমাজ প্রবল পরাক্রান্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারী হয়, তখন বাহ্যিকভাবে তা তাদের নিজস্ব সংগ্রামের ফলশ্রুতি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা একমাত্র আল্লাহ্‌রই দান। আল্লাহ্‌র এ দানকে একমাত্র তাঁরই দান রূপে স্বীকার করা ও মেনে নেয়াই প্রকৃত সত্য ও তত্ত্বকে স্বীকার করা, মেনে নেয়া। এ রাষ্ট্র শক্তির সাথে সাথে সে সমাজ বিপুল ঐশ্বর্য লাভেও ধন্য হয়। কিন্তু এ ঐশ্বর্য প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অনুকুল্য ব্যতীত লাভ করা কখনই সম্ভব হয় না। এ ঐশ্বর্যই সে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি। বৃষ্টিপাত না হলে ফসল উৎপাদন হয় না। খাল-বিল, নদী-নালায় পানির প্রবাহ না হলে, মাটির তলদেশে সদা প্রবাহমান পানির ফল্‌গুধারার অস্তিত্ব না থাকলে সেচ কার্যের সাহায্যেও পানির প্রয়োজন পূরণ হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কেননা পানিই হচ্ছে ফসল ও ফলের মূল উৎস। আর এ ফল ও ফসলই অর্থনীতির ভিত্তি বা প্রধান উপকরণ। উৎপাদন যন্ত্রও তা না হলে চলতে পারে না। এ ভিত্তি না থাকলে রাষ্ট্র প্রাসাদের ভিত নিমিষে ধ্বসে পড়া অনিবার্য। স্বাধীন রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দারিদ্রের গ্রাসে নিঃপতিত হলে স্বাধীনতা হারিয়ে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দি হওয়া অবধারিত। আয়াতটি বলিষ্ঠ কণ্ঠে এ মহা সত্য ঘোষণা করছে যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ওতোপ্রোত এবং অপরিহার্য। আর এ দু'টির প্রকৃত দাতা হচ্ছেন মহান আল্লাহ্। এ সত্যকে স্বীকার করা ও বাস্তবে মেনে নেয়া হলেই অন্য কথায় রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ নিরংকুশ কর্তৃত্ব (Sovereignty) ও ধন-ঐশ্বর্যের মৌলিক মালিকত্ব (Wonership) একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর নয়, এ তত্ত্ব ও পরম সত্যকে মেনে নিলেই সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ হতে পারে। কিন্তু যখন অস্বীকার করা হবে আল্লাহ্‌র নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে এবং তাদের নিজের

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব বলে দাবি ও প্রয়োগ করা হবে আল্লাহ্‌র নিরংকুশ মালিকানাকে নিজের মালিকানা মনে করে অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য ও অচল করে নিজের ইচ্ছামত রচিত নীতি-নিয়ম অনুযায়ী ধন-সম্পদ আয়-ব্যয়, উপার্জন-বিনিয়োগ ও ব্যবহার করা হবে, তখনই কুরআনের উপস্থাপিত মহা সত্যকে অস্বীকার করা হবে। আর তখনই আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ গ্রহণ নীতি কার্যকর হবে, যার ফলে সমাজ সমষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধ্বংসের রূপ বিভিন্ন হতে পারে, যেমন সাইয়্যেদ শহীদের বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে ধ্বংস হঠাৎ করে ও তাৎক্ষণিকভাবেই হয়ে যাবে এমন কথাও নয়। বিশেষ করে আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ গ্রহণ ধীরে ও বিলম্বেই হয়ে থাকে, তিনি মানুষকে সতর্ক ও সাবধান হওয়ার অবকাশ দেন বলে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে তা মনে করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু সে প্রতিশোধ যখন চূড়ান্তভাবে এসেই পড়ে, তখন নিমেষের মধ্যেই তা কার্যকর হয়। তখন যেমনি মুহূর্তের অবকাশ পাওয়া যায় না তেমনি ক্ষমা পাওয়ারও সুযোগ থাকে না। সত্য কথা হচ্ছে, বিশ্বলোক ও মানব সমাজের ধন-সম্পদেরও প্রকৃত সার্বভৌম মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ মানুষ তা মানুক আর নাই মানুক, তাতে সে সত্য মিথ্যে হয়ে যাবে না।

– মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

গ্রন্থপঞ্জি

১. الجامع لاحكام القران تفسير المراغي ، مفردات راغب

২. تفسير القران العظيم ج ٣ ص ١٢٤

৩. الجامع لاحكام القران للقرطبى ج ٦ ص

৪. ফী-যিলালিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ১২৯-১৩০ পৃষ্ঠা।

৫. তাফসীর আল-মারাগী, ৭ম খণ্ড, ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

বল হে নবী! আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক, পৃষ্ঠ-পোষকরূপে গ্রহণ করবো, যে আল্লাহ্ আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর নব-উদ্ভাবনকারী ? তিনি-ই ত জীবিকা দান করেন অথচ তাঁকে কেউ জীবিকা দান করে না। বল, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি-ই হব সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী, এ আদেশ ও হয়েছে যে, তুমি কখনই মুশ্‌রিকদের মধ্যে শামিল হবে না। – সুরা আল-আন'আম ঃ ১৪

কতিপয় শব্দের ব্যাখা

ولى – الولاء، – التولى। দু' বা তার বাইরে থেকে ততোধিক সংখ্যক জিনিস লাভ করা, স্থান, বংশ-সম্পর্ক, দীন, আন্তরিক বন্ধুতা, সাহায্য আস্থার দিক দিয়ে নিকটবর্তী। ولاية কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ। এ কারণে মু'মিন বক্তিকে আল্লাহ্‌র 'ওলী' বা আল্লাহ্‌কে ঈমানদার ব্যক্তিদের 'ওলী' বলা হয়। রব্ব্ মা'বুদ, মালিক ও মাওলা, সাহায্যকারীও অর্থ হয়।

فاطر সর্ব প্রথম সৃষ্টিকারী। فطر শব্দের মূল অর্থ الشق। দীর্ণ করা আর তা থেকেই সৃষ্টি করা অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব فاطر অর্থ নমুনাহীনভাবে কোন কিছুকে অস্তিত্ব দান করা; এমন জিনিস সৃষ্টি করা যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

يطعم খাদ্য দেয়, অর্থাৎ রিয্‌ক সৃষ্টি করেন, সৃষ্টিকুলকে রিয্‌ক দান করেন। কোন কোন অভিধান রচয়িতা طعام অর্থ করেছেন 'গম'। কেননা তা অন্যতম প্রধান খাদ্য। অথচ শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক, যে কোন খাদ্য বা খাবার জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত।[১]

www.pathagar.com

নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত

মক্কার মুশরিক লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বলেছিল আমরা বুঝতে পেরেছি, তুমি যে নতুন মত প্রচার করতে শুরু করেছ, তা শুধু এ জন্য যে, তুমি অর্থ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছ এবং এ পথে কিছু উপার্জন করতে চাচ্ছ। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা তোমার জন্য আমাদের ধন-মাল স্তূপীকৃত করে তোমাকে দেব, তুমি আমাদের মধ্যে বড় ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাযিল হয়।[২]

তাফসীর লেখকদের ব্যাখ্যা

১. ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেছেন ঃ বান্দাগণকে রিয্ক আল্লাহ্-ই দান করেন। কিন্তু তিনি নিজে কারুর মুখাপেক্ষী নন। সৃষ্টি স্রষ্টার নিকট থেকে জীবিকা পাওয়ার জন্য মুখাপেক্ষী। কিন্তু প্রকৃত প্রভু, অভিভাবক, রব্ব্ মাবুদ যিনি,তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন না, কেউ তাঁকে খাওয়ায় না। তাঁকে খাওয়ানো বা তাঁর খাদ্য গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি নিজেও নিজেকে খাদ্য দেন না, যারা তাঁকে রব্ব মানে তারাও তাঁকে খাদ্য খাওয়ায় না। অথচ গোটা সৃষ্টি খাদ্য খেয়েই বাঁচতে পারে, খাদ্য না হলে বাঁচে না। অতএব মানুষ আসমান-যমীনের স্রষ্টা ও খাদ্য দাতাকেই ওলী ও মা'বুদ রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য। তাঁকে বাদ দিয়ে কাউকে ইলাহ্ বা মা'বুদ রূপে গ্রহণ করতে পারে না। তা হলে শিরক্ হবে।[৩]

২. শায়খ আবু আলী তাব্‌রাসী (র.) লিখেছেন ঃ এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ওলী, রব্ব, মা'বুদ রূপে গ্রহণ করব না। নেতিবাচক কথার পরিবর্তে প্রশ্নবোধক বাক্য এসেছে এজন্য যে, তা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়। আয়াতে জীবিকার কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, সৃষ্টি তার প্রতি কঠিনভাবে মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ্ জীবিকার মুখাপেক্ষী নন। দেহ সম্পন্ন সৃষ্টির জীবন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। এ কথা বলে আল্লাহ্ কাফেরদের বিরুদ্ধে তাওহীদের উপস্থাপনা করেছেন। কেননা তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যেকার সব জিনিস নতুন উদ্ভাবন করেছেন, তার ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করেছেন, তাতে অবস্থানকারীদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। এরা সকলেই তাঁর উপর নির্ভরশীল তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। সকলেই জানে যে, তাঁর মত কিছুই নেই, কেউ নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী, চিরন্তন, মুখাপেক্ষীহীন। তাঁকে এভাবে যে জানে ও চিনে তাঁর উচিৎ নয় তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রব্ব, ওলী বা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা, অন্য কারুর দাসত্ব বা ইবাদত করা। আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (স.) কে নির্দেশ

www.pathagar.com

দিয়েছেন সকলের আগে তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করতে; খালেসভাবে তাঁরই দাসত্ব কবূল করতে।[৪]

৩. জালালুদ্দীন আল-কাসেমী (র.) লিখেছেন, আয়াতের অর্থ হ'ল আমি এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ওলী বা মা'বুদ রূপে গ্রহণ করবো না। কেননা তিনিই হচ্ছেন আসমান-যমীনের স্রষ্টা, পূর্ব নমুনা না দেখেই সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টিকর্তা। সমস্ত কল্যাণ তাঁরই নিকট থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি নিজে তা থেকে কোন কল্যাণ গ্রহণ করেন না। তাই তাঁর দেয়া নিয়ামত সমূহের শুকুর স্বরূপ কেবল তাঁর-ই ইবাদাত করা কর্তব্য। না চাইতেই তিনি সব প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন।[৫]

৪. আহ্মাদ মুস্তফা-আল-মারাগী (র.) লিখেছেন, আয়াতের বক্তব্য হল আমি আল্লাহ্র ছাড়া কারুর নিকট কোন কিছুই চাই না; না লাভ; না ক্ষতি; তা মানুষের সাধ্যের ঊর্ধ্বে। অবশ্য মানুষের পারস্পরিক সহায্য সহযোগিতা চাওয়া বা গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। মূর্তি পূজারী মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী, নেক বান্দাদেরকে নিজেদের ওলী ও মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কেননা ওরা মনে করতো যে, সাধারণ কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ ছাড়াই বাঞ্চিতকে অর্জন করা এসব মা'বুদ ও আল্লাহ্র সম্মিলিত ইচ্ছা ও অনুগ্রহের ফল। আলোচ্য আয়াতটি তারই প্রতিবাদ। সে সাথে মুশরিকদের মূর্তি পূজার প্রতি বিদ্রুপও রয়েছে। কেননা তাদের মা'বুদরা উপাসকদের ভোগ দেয়ার মুখাপেক্ষী। ভোগ দেয়া ছাড়া মূর্তিপূজা হয় না। অতএব ওদের দেবতারা ওদের ভোগ দেয়ার মুখাপেক্ষী। ভোগ দিয়ে পূজা করলেই তবে ওদের দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ভোগ দিয়ে পূজা না করলে মূর্তিগুলো সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কিন্তু মুহাম্মদ (স.)-এর যিনি মা'বুদ, তিনি কারুর ভোগ দেয়ার মুখাপেক্ষী নয়। বরং জীবিকা পাওয়ার জন্য সকল মানুষ ও জীব তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি খাদ্য দেন, নিজে গ্রহণ করেন না। আর ওদের-মা'বুদকে খাদ্য দিতে হয়, মা'বুদরা খাদ্য দিতে সক্ষম নয়।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

খাদ্য মানুষের, সমস্ত জীবজন্তু ও প্রাণীর স্বাভাবিক প্রয়োজন। খাদ্য না খেয়ে কোন জীব, প্রাণী বা মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এ খাদ্য কে দেয়, কোথা থেকে কেমন করে পাওয়া যায়, তা খাদ্য নির্ভর সৃষ্টিকূল বিশেষ করে মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি তত্ত্ব কথা লাভ করা যায়।

এক. খাদ্যের প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ খাদ্যদাতার যেকোন বাস্তব পন্থায়ই তা দিন না কেন- মুখাপেক্ষী। যে খাদ্য দেয় না, মানুষ তার মুখাপেক্ষী নয়।

www.pathagar.com

দুই. প্রকৃত খাদ্যদাতা তিনি, যিনি নিজে খাদ্যের মুখাপেক্ষী নন। খাদ্যের মুখাপেক্ষী নন কেবলমাত্র এক আল্লাহ্। তিনি ছাড়া গোটা সৃষ্টি লোক, দেব-দেবী, মানুষ খাদ্যের উপর নির্ভরশীল একান্তভাবে। অতএব তারা কেউই মা'বূদ বা রব্ব্ ও ওলী হওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

মানুষের রব্ব, ওলী মা'বূদ কে, সে প্রশ্ন মৌলিক। তার মীমাংসা হতে পারে খাদ্যের, প্রয়োজন পূরণের দিক দিয়ে। যে সত্তা মানুষের খাদ্য প্রয়োজন পূরণ ও তার ব্যবস্থাপনা করেন সে সত্তাই মানুষের রব্ব্, ওলী মা'বূদ হবে। যে তা করে না সে মানুষের মা'বূদ ও রব্ব্ হতে পারে না।

এ দৃষ্টিতে কেবল মাত্র সারে জাহানের, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর একক সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকারী যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্, অতএব উচিত কেবল তাঁকেই মা'বূদরূপে গ্রহণ করা, তাঁরই দেয়া আইনের ভিত্তিতে জীবন, সমাজ-রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করা। সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ-ই মানুষকে জীবিকা দেয় না, কেউ ই জীবিকা প্রয়োজনের উর্ধে নয়, সকলকেই খাদ্য খেয়ে জীবন বাঁচাতে হয়। অতএব তারা কেউ-ই মানুষের মা'বূদ, রব্ব্ বা ওলী হতে পারে না। দেবদেবীরাও মানুষের নিকট থেকে ভোগ গ্রহণের মুখাপেক্ষী। অতএব তারাও মানুষের মা'বূদ হতে পারে না।

খাদ্যের ব্যপারটি গোটা অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী। কুরআনের উক্ত ঘোষণার দৃষ্টিতে বলা যায়, এ খাদ্য ব্যবস্থার ভিত্তিতে শুধু অর্থনীতিই নয়, মানুষের গোটা জীবন, নীতি, ধর্ম, দর্শন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাও গড়ে উঠে। আল্লাহ্ সমস্ত মানুষের জীবিকা পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে যে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, তাকেও সে দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ –

এ কা'বা ঘরের যিনি রব্ব্ তিনিই লোকদের ক্ষুধার অন্ন দেন, তাই ইবাদত কেবল তাঁরই করা কর্তব্য। (সূরা কুরাইশ) এ কারণে ইসলামের অর্থ-দর্শন মহান রব্ব্-এর দাসত্ব বা ইবাদতের ভিত্তিতে শৃংখলিত।

ফলে যারা মানুষকে খাদ্য দেয় না, তাদের কোন অধিকার থাকতে পারে না মানুষের মা'বূদ, রব্ব্ বা ওলী, শাসক বা আইন বিধানদাতা হওয়ার। যদি হয়, তবে তা মিথ্যা প্রতারণা, যোর জবরদস্তির কাজ। তাকে কোনক্রমেই মেনে নেয়া যেতে পারে না। তাকে উৎখাত করে এক আল্লাহ্র রবুবিয়াত প্রতিষ্ঠিত করাই কর্তব্য।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ ইসলামের ব্যাপক পূর্ণাংগ তাওহীদী আকীদার সহিত তার ধর্ম বিধান, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

জীবিকা একমাত্র আল্লাহ্-ই দেন, অন্য কেউ দেয় না। তাই মক্কার তদানীন্তন সমাজ পরিবেশ থেকে উত্থাপিত ও প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে এ আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূলের দারিদ্র্য দূর করার জন্য তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন নি। কেননা তিনি দারিদ্র্য বিদূরণকারী হিসেবে আল্লাহ্‌কে-ই মানেন, দারিদ্র্যের বড় দিক খাদ্য দান, খাদ্য দানকারী ত আল্লাহ্। তাই ইবাদত বন্দেগী কেবল তাঁরই করতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (স.) তা-ই করেছেন।

জীবিকা দান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাজ। যদি ও তিনি সব জীব, প্রাণীর জন্য খাদ্য দানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তবু অনেকে তা থেকে বঞ্চিত থাকে। এর কারণ এ নয় যে, আল্লাহ তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেন নি। তিনি ত ব্যবস্থা করেছেন, তবু না পাওয়ার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার মানুষ কৃত ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য বন্টনের ভুলনীতি, স্বার্থপরতা, আত্মসাত ও দুর্নীতি।

দ্বিতীয়তঃ খাদ্য কেবল আল্লাহ্ দেন কুরআনের এ দাবী বাহ্যিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়। বরং দুনিয়ায় মানুষকেই দেখা যায়, মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে। চাষী জমি চাষ করে খাবার পাচ্ছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা করে, চাকুরীজীবি চাকুরী করে ও শ্রমজীবি শ্রম করে খাদ্য পায়। এর জবাব এ যে, মানুষ যে সব উপায়ে দুনিয়ায় খাদ্য পায়, সে উপায় সমূহও একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি, কোন মানুষের বা দেব-দেবীর নয়। খাদ্য দানকে যারা নিজেদের প্রভুর প্রতিষ্ঠিত হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করতে চায় তারাও প্রকৃতপক্ষে খাদ্যদাতা নয়।

তাই আল্লাহ্‌ই খাদ্য দেন কথাটি পূর্ণ মাত্রায় যথার্থ। একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে বলা যায় ঃ

ইসলামী সিদ্ধান্ত এককের পছন্দ প্রক্রিয়ার একটা অত্যন্ত মৌলিক দিক এ আয়াতে উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামী ভোক্তার উপযোগিতা ফাংশন (Function) এ দু'টো মূল উপাদান আছে। প্রথমটি হলো সে উপযোগিতা যেটা বস্তুগত (Goods) এবং (Service) থেকে আসে। দ্বিতীয়টি হলো বস্তু উর্দ্ধ মানবিক প্রয়াস থেকে উৎসারিত উপযোগিতা।

বস্তুগত সামগ্রী থেকে উৎসারিত উপযোগিতার দিকে ইসলামী এবং অনৈসলামী উভয় ধরনের ভোক্তাই স্বভাবতঃ ধাবিত হয়। কিন্তু বস্তু উর্দ্ধ তথা আল্লাহ্‌র বন্দেগী থেকে উৎসারিত উপযোগিতার অনুসন্ধান করার প্রবণতা শুধুমাত্র ইসলামী সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

এককের বিতর্কাতীত একটি বৈশিষ্ট। সুতরাং এ বিবেচনাটি এ আয়াতের একটি প্রধান অর্থনৈতিক তাৎপর্য।

আর একটি অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো এ যে, আয়াতের দৃষ্টিতে বস্তু উর্দ্ধ উপযোগিতার সামগ্রীগুলো বস্তুগত উপযোগিতার সামগ্রীগুলোর চেয়ে শ্রেয়ঃ। মুশরিক্রা তথা উপযোগদানকারী সামগ্রীর সাহায্যে তাকে একটি বস্তু উদ্ধ্ব প্রয়াস থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে এখানে বস্তু উর্দ্ধ উপযোগ লাভকেই ক্ষণস্থায়ী বস্তুগত উপযোগ লাভ করার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয়ঃ বলে ঘোষণা করেছেন।

– মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

গ্রন্থপঞ্জি

১. মুফ্রাদাতে রাগেব ; লুগাতুল কুরআন; মাজমাউল বয়ান; তাফসীর আল-মারাগী; আল-জামে'লি-আহ্ কামিল কুরআন।
২. আল-জামে'লি-আহ্ কামিল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩৯৬ পৃষ্ঠা; মাজমাউল বয়ান, ৭ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।
৩. ইমান কুরতুবী (র.) আল-জামে'লি-আহ্ কামিল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা।
৪. শেইখ আবূ আলী তাবরাসী (র.) মাজমাউল বয়ান, ৭ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।
৫. জালাল উদ্দীন আল-কাসেমী (র.), মাহাসিনিত্ তা'বীল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ.

আর পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও তামাসার ব্যাপার ব্যতীত কিছুই নয়। যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাঁদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন করনা ? - সূরা আল-আন'আম ঃ ৩২

শব্দের আলোচনা

لهو ও لعب শব্দ দু'টি সমার্থ, কেননা উভয়ই বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে অবান্তর কাজে উৎসাহ দান করে এবং হালাল-হারাম নির্বিশেষে অযথা চিত্ত বিনোদন বা আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত করে।[১]

لعب খেলাধুলা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন يلعب فلان অর্থ অমুক ব্যক্তি খেলছে। لهو বলতে ঐ বস্তুকে বুঝায় যা মানুষকে কষ্টের কাজে লিপ্ত করে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে।[২]

মুফাস্সিরদের মতামত

ক. আল্লামা আলুসী (র.) লিখেছেন, পূর্বের আয়াতে এ পার্থিব জীবনের পিছনে বিপদ সংকুল আর একটি জীবন আছে তা বলার পর এ উভয় জীবনের মধ্যে মূলতঃ কি পার্থক্য আছে এ আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কতটুকু পার্থিব উদ্দেশ্যে, পার্থিব জীবনের কাজ এবং ফলাফল ক্ষণস্থায়ী হওয়ার দৃষ্টিতে ক্রীড়া কৌতুকের সমতুল্য ছাড়া কিছু নয়। এ প্রেক্ষিতে অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে ইবাদত, নেক আমল ও জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম ও শ্রম এ কথার আওতা বহির্ভূত হয়ে যাবে।[৩]

খ. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, "আয়াতের বক্তব্য একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য; কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে জীবনের সংগঠন সহজসাধ্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। ... ... ইসলামী ধ্যান-ধারণা

www.pathagar.com

জীবনের যে জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি পেশ করে তাতে পার্থিব জীবনের কোন অংশ তুচ্ছ ও অবহেলিত হবে না এবং প্রয়োজনীয় কোন কিছুই বর্জন করা হবে না। এ ব্যাপারে সাহাবাদের জীবনকে আদর্শ মনে করতে হবে।... ... ... জীবন সম্পর্কে এরূপ ধারণার অবস্থান লালন ও বাস্তবায়ন তাঁদেরকে সফল করেছিল। ইহলোকের জীবনেও এবং পরলোকের জীবনেও। তাঁরা দুনিয়ায় দাস হয়ে বাস করেননি। দুনিয়ার উপর তাঁরা আরোহন করেছিলেন, দুনিয়া তাঁদের উপর অরোহন করেনি।[৪]

গ. ইমাম ফকরুদ্দীন আর রাযী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, "ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে حيوة অর্থ মুশরিক ও কাফেরদের জীবন, কারণ মু'মিনের জীবন নেক আমল সম্বলিত বিধায় তা ক্রীড়া-কৌতুক তুল্য হতে পারে না।[৫]

সামাজিক তাৎপর্য

ইহকালীন জীবনে মুসলিম জাতির দৃষ্টিভংগী কি হবে এ আয়াত থেকে তার স্পষ্ট দিগ দর্শন পাওয়া যায়। এ জীবন পরকালীন জীবনের তুলনায় নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বার্থের জন্য কোনও মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজ পরকালীন জীবনের কল্যানকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

কুরআনের প্রায় প্রতি সূরাতেই এ ধরনের আয়াত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে. এ হচ্ছে ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা। ইসলামের এ দৃষ্টিভংগী নিঃসন্দেহে মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের বৈষয়িক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হতে হবে। যদি হয়, তা হলে একজন মুসলিম এ দুনিয়ার ভোগ বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করবে না এবং সে জন্য কোনও বাতিল পন্থা বা উপায় অবলম্বন করবে না। মুসলমানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও এ নীতি অবলম্বিত হবে। এ নীতির প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার, সাম্য, ত্যাগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। কেননা পরকালের প্রাধান্য বর্জন ভিত্তিক দর্শন জুলুম, অত্যাচার, অবিচার ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে ব্যক্তিকে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির কারাগার থেকে মুক্ত করে ও সমাজকে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিত দান করে আর্থ-সামাজিক জীবনে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। বর্তমানে তা যে হচ্ছেনা, তার কারণ সমাজে ইসলামী শিক্ষা সঠিকভাবে প্রসার লাভ করেনি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার কোনও প্রতিফলন নেই। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনেও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হয়নি।

এ শিক্ষা এবং আদর্শ বাস্তবায়িত হলে সমাজ ও রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা কায়েম করবে, যাতে কোনও রূপ শোষণ ও জুলুমের মাধ্যমে কেউ ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করতে না পারে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় এরূপ কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে

www.pathagar.com

না, যাতে সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক বিত্তশালী লোকদের ভোগ বিলাসের সামগ্রী যোগানের সুযোগ বেশী হয়। কারণ এ আদর্শ ও শিক্ষা ভোগবাদের মূলোৎপাটন করে একটা সরল ও মধ্যম পন্থী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজকে অনুপ্রাণিত করে।

– শাহ আবদুল হান্নান

গ্রন্থপঞ্জি

১. তাফসীরে রুহুল মা'আনী মাহমুদ আলুসী (র.)
২. আল-মুফরাদাত, রাগেব ইসফাহানী, ৪৫০ ও ৫৪ পৃষ্ঠা।
৩. তাফসীরে রুহুল মা'আনী, মাহমুদ আলুসী (র.) ৭ম খণ্ড, ১৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা।
৪. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র.) ফী-যিলালিল কুরআন, ২য় খণ্ড।
৫. তাফসীরে কবীর, ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (র.) ১২ শ খণ্ড, ২০০-২০২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ-اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ- اِنَّ
فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

আর তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকারের উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করি; অনন্তর উহা হতে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে উহা হতে ঘন-সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হতে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও দাড়িম্বও; এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও ; লক্ষ্য কর উহার ফলের প্রতি যখন ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্য নিদর্শন রয়েছে।১

সূরা আল-আন'আমঃ ৯৯

পটভূমি

গবেষকগণ ধারণা করেন যে সূরা আন'আম রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কা জীবনের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। সে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং মুষ্টিমেয় ঈমানদার মুসলমানদের পক্ষে ভীষণ নির্যাতনের ও কাফেরদের নিষ্ঠুর বিরোধিতার পর্যায়। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের সময়। তারই মধ্যে এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা হিসেবে নিজ সত্ত্বার সত্য ও প্রমাণের নিদর্শনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৌহিদবাণী ও তাঁরই আনুগত্য স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বলে তুলে ধরেছেন। পথভ্রষ্টতার প্রেক্ষিতে দৃঢ় ব্যক্তি চরিত্র গঠনের দিকেই সূরার প্রধান আবেদন। ৯৫ নং আয়াত থেকে শুরু করে ৯৯ নং আয়াত পর্যন্ত পাঠ ও অনুধাবন করলে স্পষ্ট বুঝা যায় তিনটি স্তরে মানুষকে উন্নীত করাই আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলার ইচ্ছা ক. প্রথম স্তর হলো, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রাণিত করা (আয়াত নং-৯৫-৯৭) খ. দ্বিতীয় স্তর হলো, উক্ত জ্ঞান লাভের ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত করা; তার জন্যে প্রয়োজন উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি বিশেষ করে মানুষের সৃষ্টি ও জীবন সম্পর্কে (আয়াত নং ৯৮) গ. তৃতীয় স্তর জ্ঞান ও উপলব্ধি অন্তর্দৃষ্টি মাধ্যমে মানুষকে উপনীত করা ঈমান প্রতিষ্ঠার স্তরে (আয়াত নং-৯৯)। আলোচ্য আয়াতটিতে তাই আকাশ, পৃথিবী ও জীবন সম্পর্কে সৃষ্টির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যকে প্রত্যক্ষ নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরে মানুষকে ঈমানের পূর্ণ পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত করার আহবান রয়েছে। এ পরিণতি মু'মিনদের সম্প্রদায়েরই জন্যে (لقوم يؤمنون)।

মুফাস্‌সিরিনের কিছু অভিমত

ক. আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) ঃ

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব (র.) আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রেক্ষিত এবং পার্থিব জীবনের সমৃদ্ধিতে আকাশ-বাতাস, বৃষ্টি-ধারা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিভাবে বর্ষণের পরে মাটি থেকে গাছপালা, তৃণলতা, শস্য, ফসল ও ফুলফলের অবদান সৃষ্টি হয় অনুধাবন করলে মানুষ সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা ও দয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে, তাঁর সত্তার একত্ব সম্পর্কেও উপলব্ধি লাভ করতে পারে। তাঁর নিদর্শনগুলোর দর্শন ও অধ্যয়নই মানুষকে সে দিকে পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু পূর্ণ উপলব্ধি নিয়ে আল্লাহ্‌র নিদর্শন-গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সে দৃষ্টিপাত থেকেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে মানুষ চেতনা লাভ করতে পারে। অন্তরের ঈমানই সে পরিপূর্ণ উপলব্ধি দান করে। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ। বাণীটির ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেছেন ঃ এ সবের মধ্যে তাদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন (বা প্রমাণ) যাঁরা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার। ঈমান এমন এক উপাদান যা মানুষের অন্তরের চক্ষুকে উন্মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ্‌র সংগে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাঁর সান্নিধ্যে এনে দেয়। যেখানে ঈমানই অনুপস্থিত সে মানুষ ত অন্ধ। আল্লাহ্‌র এ সকল নিদর্শন তার কাছে অসার ও মূল্যহীন।১

খ. আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র.) ঃ

আল্লামা মাহমুদ আলুসীর (র.) বিশ্লেষণে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ "তিনিই সে আল্লাহ্ যিনি আসমান

www.pathagar.com

থেকে পানি বর্ষণ করেন" বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বৃষ্টিকে বাষ্পের উত্থান, মেঘ সংগঠন, বাতাসের প্রতিক্রিয়ায় বিন্দু বিন্দু বারি সৃষ্টি ও পৃথিবীতে পতন ও ধারণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার কথাতেই সন্তুষ্ট হননি। এখানে আল্লাহ্‌র ভূমিকা রয়েছে সে দিকে জোর দিয়ে তাফসিরকার আলুসী (র.) আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণকে আল্লাহ্‌র দান হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন মানুষকে। সে দানের পরিণতিতেই মাটির উর্বরতা, নদী-নালা হ্রদ-সরোবর ও সেচের পানির উৎস সৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে মানুষের জীবনে পানির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। প্রত্যেকটি উদ্ভিদের প্রথম সূচনা থেকে বিভিন্ন স্তরে, পুষ্পপল্লবে, শস্যকণা, ফলমূল ইত্যাদি সৃষ্টিতে পানির সক্রিয় ভূমিকা বিদ্যমান। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, গাছপালা ও শস্য আর ফল-ফুলাদির মধ্যে কিছু কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে সাদৃশ পূর্ণ আবার কিছু কিছু সাদৃশহীন। ফল সম্পর্কে শুরু থেকে পরিপক্কতা স্তর পর্যন্ত বিভিন্নস্তরে বিভিন্ন আকৃতি এবং স্বাদ-গন্ধ ও অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়। এসব ব্যাপারে মানুষকে চিন্তা ভাবনা এবং আলোচনা-গবেষণা, পরিচালনা করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আয়াতটিতে। আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে বুঝার জন্যে। এসবের মধ্যে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও সৃষ্টি নৈপুণ্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাঁর অস্তিত্ব, সার্বভৌমত্ব ও একত্বের প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর। যারা বিশ্বাসী তাদের উপলব্ধিতেই শুধু সে পরিপূর্ণ চেতনা জন্মলাভ করবে।[২]

গ. আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র.) ঃ

আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের (র.) বিশ্লেষণে বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছে, আকাশ থেকে বর্ষিত আল্লাহ্‌র দান পানির মানুষের রিয্‌ক সরবরাহের ব্যাপারে অসাধারণ ভূমিকা। খাদ্যের শস্যকণা এবং ফলের উৎপাদনকে দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন করা হয়েছে এক্ষেত্রে। খেজুর, আংগুর, যায়তুন, আনার ইতাদির নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে আয়াতটিতে। এসব নিদর্শনে গাছের পাতা ও ফলের আকৃতি কোথাও সাদৃশ্যপূর্ণ অপর কোথাও সাদৃশ্যহীন। কিন্তু ফলের স্বাদ ও গুণমাত্রা বিভিন্ন। ফল সৃষ্টির প্রক্রিয়াতেই মানুষের মনে চিন্তা ও বিবেচনা আসা স্বাভাবিক যে ফলের সূচনা হওয়ার আগে পর্যন্ত গাছ তা ছিল শুধুই গাছ, জ্বালানি কাঠের উৎসের মতো, অথচ পরে অস্তিত্বহীনতা থেকেই ফলের অস্তিত্বের আবির্ভাব হলো। মানুষ যদি সঠিকভাবে চিন্তা করে তাহলে হৃদয়ংগম করতে পারবে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মহিমা কেমন অতুলনীয় ও অসাধারণ। সে মহিমার প্রত্যক্ষ নিদর্শনের সাহায্যেই আহ্বান জানানো হয়েছে ঃ হে মনুষ্য জাতি, তোমরা চিন্তা কর এবং ভেবে দেখ এর মধ্যে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত ও হিক্‌মতের প্রমাণ রয়েছে। সে আহ্বান ঈমানদার মানুষের মনের দ্বারেই পৌঁছে।[৩]

www.pathagar.com

ঘ. আল্লামা ইউসুফ আলী (র.) ঃ

আল্লামা ইউসুফ. আলী (র.) আয়াতে বর্ণিত গাছপালা, শস্যকণা ও ফলের নিদর্শনকে মানুষের জীবনের সংগে তুলনীয় প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। রূপক বিশ্লেষণ সাহায্যে তিনি মনে করেন, মানুষও মাটিতে বীজ রোপণ থেকেই যেন জীবন লাভ করেছে অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা থেকে আল্লাহ্ তাকে অস্তিত্বে এনেছেন। মানুষ জন্মলাভের পরে নিজস্ব প্রতিক্রিয়ায় বৃদ্ধি লাভ করে, অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং সাফল্য লাভের সাধনায় লিপ্ত হয় ইহকাল ও পরকালের জন্য সে সাফল্য। তার গতিপথের কর্ণধার হলো ঈমান। ঈমানের পরিচালনায় সে জীবনের পূর্ণ ফসল শস্য-কণা ও ফলের সম্ভারের মতো অর্জন করে। মানুষের উপলব্ধি ও জ্ঞানের স্তরের উপর নির্ভর করে সে ফসলের রূপ ও মাত্রা। সে জন্যই স্তর অনুসারে, সাদৃশ্যও থাকবে, আবার সাদৃশ্যহীনতাও সম্ভব আধ্যাত্মিক ও সার্বিক সাফল্যের ব্যাপার। প্রথমে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে চারপাশের পরিবেশে যা দেখে তাকে বুঝতে হয়; সেখানে আছে আল্লাহ্র নিদর্শন যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্যে (আয়াত নং-৯৭)। পরের ৯৮ নং আয়াতে মানুষের সৃষ্টি এবং জীব সম্পর্কে নিদর্শনের উল্লেখ আছে ; সে নিদর্শন বুঝতে শুধু জ্ঞানই যথেষ্ট নয় প্রয়োজন উপলব্ধির। বর্তমান আয়াতে শেষ পরিণতি হিসেবে জীবনের ফসলকে নিদর্শন বলা হয়েছে। ইহকাল ও পরকালের সাফল্য পুরস্কার ফল যে নিদর্শন, তা হলো যাঁরা বিশ্বাসী (ঈমানদার) তাঁদের জন্যে।[৪]

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আয়াতটির আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যকে ইসলামী জীবন দর্শনের এবং বিশেষ করে মক্কী জীবনের পট ভূমিকায় মানুষের মনে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিগত প্রয়োজনের কাঠামোতে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। উক্ত ভিত্তিগত প্রয়োজনের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও একত্বকে উপলব্ধি করতে হবে মানুষকে। সে উপলব্ধি আসে স্রষ্টার সৃষ্টি মহিমার অতুলনীয় নিদর্শনগুলোর অবলোকন, অধ্যয়ন ও অনুশীলন বিশ্লেষণ থেকে। উপলব্ধির ভিত্তিতে ঈমান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ হয় মু'মিন এবং তার জীবন ও আচরণ হয় ইসলামী বিধানের অনুসারী। সে ইসলামী বিধানের অন্তর্গতই হলো ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনীতি ব্যবস্থা। (তারই বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে)।

www.pathagar.com

প্রথমত ঃ ঈমানের উপলব্ধি মানুষকে দান করে প্রকৃত সত্যের দিকে জ্ঞান আহরণের নির্দেশনা ও প্রেরণা। আকাশ, বাতাস থেকে শুরু করে বৃষ্টি বর্ষণ এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠে ও অভ্যন্তরে বিপুল শোভা, সৌন্দর্য ও সম্পদের অবলোকন, অধ্যায়ন ও বিশ্লেষণ তখন মানুষকে শুধু আনন্দ আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাহীন নতুন জগতেরই সন্ধান দেয় না, তাকে উদ্বুদ্ধ করে কল্যাণ সৃষ্টির কাজে। এ কল্যাণ সৃষ্টি কাজ স্রষ্টার অবতীর্ণ ইসলামী বিধানের নির্দেশ অনুসরণ করেই পরিচালিত হয়। ইহকাল ও পরকালের সামগ্রিক কল্যাণ লাভের লক্ষ্যে অনুসরণ না করলে পরিণতি হবে অকল্যাণকর।*

দ্বিতীয় ঃ ঈমানের ভিত্তিতে ব্যক্তি চরিত্র গঠন করা হলে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে সমাজ সংগঠন করা হলে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনকে সমৃদ্ধি আর সাফল্যের দিকে অগ্রসর করানো যায়। পার্থিব সমৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রকে ও অর্থনীতিকে সেভাবেই সংগঠন ও পরিচালনা করা যায় এবং পরিপূর্ণভাবে পারলৌকিক কল্যাণের দিক থেকে সুসমন্বিত করা যায়। আলোচ্য আয়াতটি তাই স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে অর্থনৈতিক মৌল সম্পদ সম্পর্কে (যেমন ভূমি এবং বৃষ্টি বর্ষণ মাধ্যমে পানি সরবরাহের উৎস সম্পর্কে), তেমনি নির্দেশনা রয়েছে ফলমূল, শস্য, ফসল ও গাছপালার সাদৃশ্য আর সাদৃশ্যহীনতার বিপুল বৈচিত্রের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে। সৃষ্টির মূল উৎসকে (অর্থাৎ স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে) স্মরণ রেখেই তাই মানুষকে করতে হবে সমাজ ও অর্থনীতি নির্মাণ। এ অর্থনীতিতে স্বভাবতঃই থাকবে মানুষের মৌল নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা। তার অন্তর্গত হবে খাদ্য নিরাপত্তা এবং উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা মাধ্যমে একটি সাধারণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কাঠামো।

তৃতীয়ত ঃ মানুষের উপরোক্ত ধরনের আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই আয়াতটিতে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও সম্পদ প্রাপ্তির আর প্রয়োগের দিকে; একেবারে

---

* এ সূরা আন'আমের ১০৪ নং আাতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ ومن عمى فعليها وما انا عليكم بحفيظ. (কেউ যদি অন্ধ হয় সে তারই নিজস্ব ক্ষতি এবং (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন যে তিনি নিরাপত্তা প্রহরী নন)। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আলো দিয়েছেন আল-কুরআন মানুষের কাছে পৌছে দিয়ে, চোখ তুলে দেখা না দেখা আসলে মানুষের দায়িত্ব। না দেখলে এবং জীবনে ও আচরণে বাস্তবায়িত না করলে তার পরিণতি হবে ভিন্নরূপী। সে মানুষকে ভিন্নরূপী ফল ভোগ করতে হবেই। (দ্রষ্টব্যঃ মাওলানা মওদূদী, তরজমায়ে কুরআন মজীদ, বাংলা পৃষ্ঠা ২১৩ পাদটিকা নং-২৭).

www.pathagar.com

হৃদয়গ্রাহী চিত্রাংকন ভিত্তিক ভাষায়। যেমন ঃ ক. আকাশ থেকে বারি বর্ষণ, খ. বীজ থেকে শস্য ও গাছপালার অংকুর উদ্‌গমন, গ. অংকুর থেকে ক্রমবৃদ্ধি ও পূর্ণ বিকাশ, ঘ. জীবনোপকরণরূপে পরিপক্ব শস্য ফসল, নানা জাতীয় ফলমূল ইত্যাদির আত্মবিকাশ ও ঙ. সবুজ থেকে পরিপক্ক রূপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ। অধ্যয়ন অনুশীলন মাধ্যমেই বুঝা যাবে। এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংগঠন করার জন্যেই তাকীদ রয়েছে ইসলামী বিধানে। নিদর্শনগুলোর বিশ্লেষণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগই সাহায্য করবে উক্ত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংগঠনে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হলো এ রকম দিক নির্দেশনার বিশ্লেষণ থেকে আসবে অর্থনৈতিক নীতির পরিকল্পনা ঃ

১. সকল প্রাকৃতিক সম্পদই আল্লাহ্ প্রদত্ত দান। এ সকল দানই মানুষের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতে ব্যবহার্য মৌল উপাদান। আকাশ বাতাসের অর্থাৎ পৃথিবীর বহির্ভূত সৃষ্ট জগতের মৌল উপাদান ও মানুষের ব্যবহারের উপাদান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও অবিষ্কার এ সকল উপাদান নিয়ে এবং পৃথিবীর ভূমণ্ডলের বিবিধ উপাদান নিয়েই চলে আসছে। তার একাংশে শুধু সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান, যার মধ্যে রয়েছে অর্থনীতির জ্ঞান। অন্যান্য জ্ঞানের সংগে অর্থনীতির সংগঠনে অর্থনৈতিক মৌল উপাদানের প্রয়োজন। তা হলো ভূমি এবং পানি সরবরাহ। মানুষও তেমনি আল্লাহ্ প্রদত্ত মৌল সৃষ্টি যার রয়েছে সংগঠনের দায়িত্ব এবং শ্রম ও প্রচেষ্টা সাহায্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে সফল করার দায়িত্ব।

২. উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের উপযোগী মৌল ব্যবস্থাও আল্লাহ্ মানুষের জন্যে দিয়েছেন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। বিশেষ করে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে। প্রত্যক্ষ নিদর্শন দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে শস্য ও খাদ্যের উৎপাদনে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ধারার দিকে। মাটির উর্বরতা, তার সাথে বৃষ্টির অথবা সেচের পানি প্রয়োগ এবং মানুষের শ্রম ও উদ্যোগ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি আনবে। অর্থাৎ Economic growth আল্লাহ্ প্রদত্ত উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপরই নির্ভরশীল। অন্য কথায় তত্ত্ব হিসেবে বলা চলে, Economic growth এর অবকাঠামো হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ। সে কথা স্মরণ রেখেই ব্যবহার করতে হবে অবকাঠামোকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে এবং উক্ত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে সমাজে ও মানুষের কল্যাণে নিয়োগ ব্যাপারে। যথাযথভাবে স্মরণ করলে এবং পরিকল্পনা করলে Economic growth মানুষের চেষ্টায় হতে পারে যথেষ্টভাবে ত্বরান্বিতভাবে যার

www.pathagar.com

ফলে সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষের জন্যে আসবে খাদ্যের নিরাপত্তা এবং সাধারণ নিরাপত্তা কাঠামো। কৃষির সম্পদ ও পণ্য, খনিজ সম্পদ, আল্লাহ্ প্রদত্ত পানির ও ভূমির সম্পদ ইত্যাদিতে মানুষের শ্রম ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রয়োগ মাধ্যমে রচনা করা সম্ভব উক্ত দু'ধরনের নিরাপত্তা। মানুষের পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ অনুসরণ করে ইসলামী বিধান সম্মত সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে।

—অধ্যাপক রায়হান শরীফ

প্রমাণপঞ্জি

১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) ফী-যিলালিল কুরআন, ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৯ বৈরুত পৃষ্ঠা ১১৬০-১১৬১।

২. আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র.) তাফসীর রুহুল মা'আনী, ৭ম খণ্ড, বৈরুত, পৃষ্ঠা ২৩৭-২৪০।

৩. আল্লামা ইব্ন কাছীর (র.) তাফসীরে ইবনে কাছীর, করাচী, ৭ম পারা, পৃষ্ঠা ৯৮-১০০।

৪. আল্লামা ইউসুফ আলী (র.), Glorious Quran, কায়রো বৈরুত, পৃষ্ঠা ৩১৬-৩১৮।

www.pathagar.com

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشَاتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَّالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا
تُسْرِفُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

আর তিনিই যিনি নানা প্রকারের লতাবিশিষ্ট ও স্বীয় কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগান সৃষ্টি করেছেন। যিনি খেজুর গাছ ও শস্য ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন করেছেন, যা হতে নানা প্রকার খাদ্য লাভ করা যায়। যিনি যায়তুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে বাহ্যিক রূপে সাদৃশ্য পূর্ণ কিন্তু স্বাদে সাদৃশ্যহীন। তোমরা তার উৎপন্ন ফল আহার কর যখন সে গাছ ফল ধারণ করে এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) হক আদায় কর যখন এ সকলের ফসল আহরণ করবে। আর তোমরা অপচয় কর না। কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। -সূরা আল আন'আম ঃ ১৪১

প্রেক্ষিত

আয়াত নং ৯৯-এর বিশ্লেষণের সূচনাতেই সূরা আল-আন'আমের প্রেক্ষিত ও পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (স.)-র মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে কঠিন নির্যাতনের মুখে কাফিরদের বিরোধিতা চরম উগ্রবাদিতার সময়ে এ সূরার বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে মানুষের ঈমান প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম হিসেবে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মহত্বের প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালানোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ৯৯ নং আয়াতে ঈমানের প্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়েছে। সৃষ্টি রহস্য এবং আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে জ্ঞান ও উপলব্ধির সংগেই অনুধাবন করতে হয়। এ আয়াতেও শস্যের উৎপাদন ফলের উদ্যান সৃষ্টি এবং বিভিন্ন স্বাদের ফলের ফসলকে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্‌ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দিকে বলে আরো বেশী সুন্দর ও সহজবোধ্যভাবে বৃষ্টি বর্ষণের প্রেক্ষিতকে তুলে ধরা

www.pathagar.com

হয়েছে। পরে ১৪১ নং আয়াতে সরাসরি শস্যের ফসল ও উদ্যানের ফল উৎপাদনকে খাদ্যের উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মানুষের সংগে সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। আর জীবন যাপনের ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্‌ককে পানাহার বা ব্যবহার করতে বলা হয়েছে মিতাচারের সংগে কুসংস্কার বিশৃংখলার পথ পরিহার করে। মধ্যপন্থা অবলম্বনের সাহায্যে ইসলামী আদর্শ ও নীতি অনুসরণের পথ বেছে নিয়ে।

মুফাস্‌সিরীনের সংক্ষিপ্ত অভিমত

ক. আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র.)

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র.) উল্লেখ করেছেন যে, মানুষকে উৎপন্ন খাদ্যের সব রকম ফসল ও ফল থেকে আল্লাহ্‌র হক আদায় করে সমাজ গঠনের দিকে মানসিক পরিচালনা দানের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে জোর দেয়া হয়েছে। তার কারণ হিসেবে ধরা যায় ঃ

১. তখনো 'যাকাত' মক্কী মানুষের সমাজে ফরয বলে প্রতিপালিত হওয়ার পরিস্থিতি আসেনি (দ্বিতীয় হিজরী সালে 'যাকাত' ফরয প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়); ২. ফসল কাটার সময় দরিদ্র আরবরা হাজির হলেও মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে কিছুই উক্ত ফসল বা ফল থেকে দান করতো না। কিন্তু দরিদ্রকে দান করার ব্যাপারেও উৎপন্ন ফসল বা জীবিকার সব কিছু দান করে নিজকে নিঃস্ব করা ও নিরন্ন ভিখারীতে পরিণত করাও দানের উদ্দেশ্য নয় বা ইসলামী সমাজ গঠনেরও নীতি নয়। সে দিকে দৃষ্টি না দিলে সীমা লংঘন করা হবে।[১]

খ. আল্লামা সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র.)

আল্লামা সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র.) বলেছেন যে, মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত খাদ্যের ফসল ও ফল থেকে আর হালাল পশুর মাংস থেকে আহার করতে হবে, আল্লাহ্‌র হকও আদায় করতে হবে এমনভাবে যাতে অপচয় করা না হয়, সীমালংঘন করা না হয় এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করা হয়। বিশেষ করে খাদ্যকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করে তাদের নামে ভোগ বিতরণ করার মাধ্যমে শয়তানের পথ অনুসরণ না করা হয়। তখনকার দিনে পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে সে রকম রীতি প্রচলিত ছিল বলেই তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ শির্‌ক-এর বিরুদ্ধে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এ আয়াতে। 'এস্‌রাফ' (اسراف) সম্পর্কেও সতর্কতা উচ্চারণ করা হয়েছে। এ শব্দটির সাধারণ অর্থে অপরিমিত ব্যয় বা অপব্যয় ধরা হয়। পানাহারে বা ভোগ বিলাসে অতিরিক্ত ব্যয় করে ব্যক্তিগত স্বার্থবাদী ভোগবাদী জীবন ধারার অনুসরণ বুঝায়। আল্লাহ্‌র হক আদায় ব্যাপারে অর্থাৎ অর্জিত রিয্‌ক

www.pathagar.com

থেকে দানকেও তেমনি যুক্তিহীনভাবে সীমাহীন করে নিতে পারে কেউ। কোন সাহাবা পর্যন্ত সে ধরনের অতিরিক্ত দানকে ব্যয়ের আতিশয্য দেখিয়েছেন। আয়াতে সে ধরনের আচরণকে নীতি বা রীতিতে পরিণত করা আল্লাহ্ অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন।[২]

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যণীয় যে, প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে সুস্থ নীতি কি হতে পারে, সেদিকেই মানুষের চিন্তা ও বিবেচনাকে পরিচালিত করার নির্দেশ এ আয়াতটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। কালক্রমে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাস দেখা যায়, উন্নয়নের ঊর্ধগতি কৃষির ভিত্তিকে উন্নত করেই শুরু হয়। সে ভিত্তি বা অবকাঠামো রচনা চিন্তা ছাড়া উৎপন্ন ফসল ও ফলের ভোগ করে যাওয়া হলো একটা দেশের বা অর্থনীতির পক্ষে অদূরদর্শী ভোগ বিলাসের নীতি। উৎপন্ন ফসল, ফল ও পণ্য থেকে ভোগকে যেমন সমর্থন দেয়া প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন উৎপাদন কাঠামোর সংরক্ষণ এবং সে কাঠামোকে উন্নতকরণ। তার জন্যেই প্রয়োজন উৎপন্ন আয় থেকেই উপযোগী সঞ্চয় আর সে সঞ্চয়কে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিতকরণ। সে জন্যেই অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করতে বলা হয়েছে এবং ভোগকে উপযুক্ত সীমার অধীনে সীমিত রাখতে বলা হয়েছে। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে আবার বহুমুখী ও বাণিজ্য নির্ভর করার পন্থাও একই। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে স্তরে স্তরে একই নীতি কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজন। উপরোক্ত নীতি কৌশল একটি সার্বিক ও সাধারণ বিধি। সমাজ সংগঠন ও অর্থনীতির সংগঠন যখন রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুন ও আদর্শের কাঠামোতে আসে, তখন সে নীতি কৌশলের রূপকে বিশদভাবে বিন্যস্ত করতে হয়। সরকারী খাতে সরকারী আচরণকে এবং বেসরকারী খাতে ব্যক্তিগত আচরণকে নিয়ম-শৃংখলার অধীনে আনয়ন করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রধান অপরিহার্য নীতি হলো ব্যক্তিজীবনের অর্থনৈতিক আচরণেও অপব্যয় রোধ করা পয়োজন, আবার সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যনির্বাহ প্রক্রিয়াতেও অপব্যয় রোধ করা পয়োজন। এমনি অপব্যয় রোধ বাজেট নিয়ন্ত্রণ নীতির ব্যাপার । সে নিয়ন্ত্রণ সফল হলে জাতীয় সঞ্চয় উন্নতমানের হয়। সে উন্নতমানের সঞ্চয়কে তখন পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আদর্শ ও নীতির অনুসরণে বিনিয়োগ করা যায়। তারই ফলে আসবে জাতীয় অর্থনীতির উন্নততর স্তরে উত্তরণ।

তৃতীয় আরেকটি দিক হলো ঃ উৎপাদনে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন উৎপাদনের অবদানকে স্বীকৃতিদান করা প্রয়োজন। সে স্বীকৃতি থেকেই জন্ম নেয় আল্লাহ্র হক

www.pathagar.com

আদায় করার দায়িত্বের স্বীকৃতি। সংগঠিত রাষ্ট্র বা সমাজ না হলেও মানুষ হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে ফসল বা পণ্যের উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে দেয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ তাদেরও জীবন ধারণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্র সংগঠিত হলে এবং ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হলে ত আদর্শ বিধান ও 'শরীয়াহ্' অনুসারেই সে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। উৎপাদন ব্যবস্থা, বণ্টন ব্যবস্থা, যাকাত আদায় ও বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যবস্থার পরিচালনাতেই দারিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কার্যকর হবে আল্লাহ্র হককে স্বীকৃতিদান করার ফলশ্রুতিতে।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

প্রমাণপঞ্জি

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৮ম পারা, পৃষ্ঠা ২৩ এবং ২৪।
২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র), ফী-যিলালিল কুরআন, বৈরুত, পৃষ্ঠা ১২২২-২৩।

www.pathagar.com

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا
وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَاِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.
وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ
وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا وَاِذَا
قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ
بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

বলুন, এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে, নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দেই। নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কি অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না, অবশ্য সত্য ও ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝে কাজ কর। ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত দায়িত্বের বোঝা দেই না। আর যখন কথা বল ইনসাফের সাথে কথা বল, যদিও সে আত্মীয় হয়। আল্লাহ্‌র অংগীকার পূর্ণ কর। এসব বিষয়েই আল্লাহ্ তোমাদের হেদায়াত দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। -সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫১-১৫২

www.pathagar.com

আয়াতদ্বয়ের সাধারণ তাৎপর্য

সূরা আন'আমের এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্ পাক নয়টি কাজকে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এসব কাজ হতে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্র উপদেশ মত চলা ও এসব কাজ থেকে বিরত থাকা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। প্রথমতঃ আল্লাহ্র সংগে শির্ক করাকে হারাম করা হয়েছে। শির্ক অর্থ আল্লাহ্র বিশেষ গুণাবলী, আল্লাহ্র ক্ষমতা, ইখ্তিয়ার ও অধিকারে অন্যকে অংশীদার করা। যেমন আল্লাহ্র বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি সব কিছু জানেন ও শোনেন। অন্য কারো সম্পর্কে এ ধারণা করা যে তিনি ও গায়েব জানেন বা সব কিছু শোনেন ও জানেন শির্ক করা হবে। তেমনিভাবে কারো সম্পর্কে ধারণা করা যে, তিনিও অতি প্রাকৃতিক উপায়ে কারো ভাগ্য রচনা বা নষ্ট করতে পারেন বা অতি প্রাকৃতিক উপায়ে কারো উপকার বা অপকার করতে পারেন তা শির্ক বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্র জন্য যেমন আমরা রুকু', সিজ্দা করি বা যে বিনয়ের সংগে তাঁর সামনে দাঁড়াই, অন্যের জন্য এমন করাও শির্ক হবে। তারপর পিতা-মাতার সংগে ভাল ব্যবহারের আদেশ করা হয়েছে অর্থাৎ তাঁদের সংগে খারাপ ব্যবহার করা হারাম। তারপর এ আয়াতে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরবে ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে অনেক সময় জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে নিজ হাতে সন্তানদের হত্যা করা হত।

আল্লাহ্ পাক এ জঘন্য কুপ্রথা হারাম করে দিয়েছেন। তারপর ফাওয়াহেশ বা নির্লজ্জ কাজ কারবার সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যেই হোক কি গোপনেই হোক। কুরআন, হাদীসের পরিভাষায় 'ফাহেশা' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ যার অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী, যাবতীয় বড় গোনাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে যাবতীয় বদঅভ্যাস, মুখ, হাত, পা ও অন্তরের যাবতীয় গুণাহই এর আওতায় এসে যায়। ফাহেশা কাজের নিকটে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মসলিশ ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা ও ঐ সব পন্থা থেকে দূরের থাকা যদ্বারা ঐসব গুণাহের পথ খুলে যায়। তারপর আল্লাহ্ পাক বৈধ কারণ ছাড়া অন্য সব হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন কেউ যদি অন্যকে হত্যা করে তাকে হত্যা করা যাবে। অবশ্য আইন মোতাবেক বিচার ফয়সালার মাধ্যমেই তা হবে। বিনা কারণে মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম অমুসলমানকে হত্যা করা ও তেমনি হারাম। তারপর ইয়াতীমের মাল-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীমদের অভিভাবকদের মূলত সম্বোধন করা হয়েছে যেন তারা অবৈধভাবে ইয়াতীমদের মাল নষ্ট না করে। তবে ইয়ামীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা অভিভাবকের কর্তব্য। অবশ্য বয়ঃপ্রাপ্তির সংগে সংগে অভিভাবকদের এ দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তারপর

www.pathagar.com

সঠিক ওজন ও মাপ দিতে বলা হয়েছে অর্থাৎ ওজন ও মাপে ক্রটি করা ও কম করা হারাম। তারপর কথা বলার সময় ইনসাফের সংগে কথা বলতে আদেশ করা হয়েছে তা যদি আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও হয়। অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা হারাম গণ্য করা হয়েছে। সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালা কারও বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা এবং শত্রুতা ও বিরোধীতার কোন প্রভাব থাকা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকীর সংগে তুলনা করেছেন।[১] রাসূলুল্লাহ (স.) অসত্য ফয়সালাকারী বিচারককে জাহান্নামী বলে উল্লেখ করেছেন।[২] সর্বশেষ আল্লাহ্র সংগে কৃত অংগীকার পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র সংগে কৃত অংগীকার ভঙ্গ করা হারাম। আল্লাহ্র অংগীকার বলা হয়েছে যার অর্থ আল্লাহ্র সংগে কৃত অংগীকার ও আল্লাহ্র নামে করা অংগীকার। ঈমান আনার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্কে সব বিষয়ে মেনে চলার অংগীকার। সৃষ্টির শুরুতেও আদমের সব সন্তানের রুহ আল্লাহ্কে মেনে চলার অংগীকার করেছিল। এসব অংগীকারই রক্ষা করা ফরয। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্র দেওয়া এ সব বিধি-নিষেধকেই সহজ-সরল পথ বলা হয়েছে এবং তা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।[৩]

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ সব আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানবতাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। শিরক না করার আদেশের মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে অর্থনীতি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তার শিক্ষা ও মূলনীতি আল্লাহ্ পাক থেকেই নিতে হবে। এ আয়াত দু'টিতে যে নয়টি বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে, তার প্রত্যেকটিরই আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত শির্ক এড়িয়ে চলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে (বিশেষ করে ইকবাল, মওদূদী, আবুল হাশিম, সাইয়্যেদ কুত্ব, মুহাম্মদ কুতব প্রমুখ আধুনিক চিন্তা নায়কের রচনার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পূর্বতন চিন্তানায়কদের মধ্যে শায়খ আহ্মদ সরহিন্দ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সমধিক খ্যাত)। সমাজ ব্যবস্থা, রুচি প্রভৃতি সব ব্যাপারেই শিরকের প্রভাব এড়িয়ে চলা মুসলিম জীবনে অপরিহার্য। এখানে এটা প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক জীবনেও দৃষ্টিভংগীতে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির জন্য অতিসম্মান ও দৃষ্টিভংগীর সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারীদের বিশেষ অধিকার ও জাঁকজমক এ কারণে সীমিত হবার কথা। এটা একটা উদাহরণ। এর অন্যতম অহেতুক ব্যয়হ্রাস ও যুক্তিসংগতভাবে ক্ষমতা ও জাঁকজমক প্রদর্শন আল্লাহ্র নির্দেশ মত, অন্য রাষ্ট্রের অনুকরণে নয়।

www.pathagar.com

এখানে পিতা-মাতার সংগে সদয় ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। এখানে যে নীতি দেওয়া হয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অন্যান্য বিধি বিধানের আলোকে যে সব পিতা-মাতা তাদের নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে সক্ষম নন তাঁদের ভরণ-পোষণ সন্তানদের উপর ওয়াজিব। ইসলাম এমন এক সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় যেখানে পিতা-মাতারা বিপদাপন্ন হবে না এবং যেখানে সব অক্ষম বৃদ্ধদের চাপ সরকারের উপর নিপতিত হবে না। সরকারের উপর অতিরিক্ত বোঝা কোনো সমাজের জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। তাই ইসলাম সন্তানরা সক্ষম হলে অক্ষম পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানদের উপর দিয়েছে। যদিও এ সব বিষয়ে আমাদের ফিকাহ্‌র গ্রন্থসমূহে অনেক আলোচনা রয়েছে। তথাপি কার্যকরী করার সুবিধার্থে এ ব্যাপারে পার্লামেন্ট কর্তৃক বিস্তৃত আইন রচনা করা প্রয়োজন, যা সহজেই প্রয়োজন হলে এমনকি কোর্টসমূহও কার্যকরী করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে শুধু ভরণ-পোষণের দায়িত্বসূচকই নয়। অধিকন্তু আধুনিক Social Security System অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করার দ্যোতক, যাতে মায়া-মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-দয়া প্রভৃতি মানবিক গুণসহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

তৃতীয়ত, একমাত্র আল্লাহ্‌ই যে রিয্‌কদাতা-এ সত্যের উপলব্ধি মানুষের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন এবং তদানুসারে তাদের আচরণ তাওহীদী যুক্তিবিত্তিক হওয়া উচিত। এটা শুধু পরিবার পরিকল্পনার প্রশ্নে নয়। সর্ববিষয়ের আচরণেরই হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় নীতি ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আচরণ সবই এভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

হত্যা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক নির্দেশের সংগেই বিচার ও কুরআন নির্দেশিত শাসন ব্যবস্থার প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে ইজ্‌তিহাদ প্রয়োজন।

দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা এ আয়াতে সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। তা যেভাবেই হোক। কাজেই জনশক্তি পরিকল্পনায় যে কোন ধরনের গর্ভপাত বা ভ্রূণ হত্যার স্থান থাকতে পারে না।

এখানে নির্লজ্জতা হারাম করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির উৎপাদন ব্যবস্থায় এর বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। অশ্লীল দ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রি, আমদানী, রফতানী সবই ইসলামী রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে এ সব উৎপাদন করা যাবে না। এ সব উৎপাদনে ব্যাংকসমূহও বিনিয়োগ করতে পারে না।

www.pathagar.com

ইয়াতীমদের ধন সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্র বিশেষ খেয়াল রাখবে। তা সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজনে আইন রচনা করবে। ইয়াতীমদের সম্পর্কে ও অন্যান্য বঞ্চিতদের সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ্র যে শিক্ষা রয়েছে তাতে প্রমাণ হয় যে ইসলামী রাষ্ট্র সর্বাবস্থায় অক্ষম দরিদ্র ও বঞ্চিতদের ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখবে। এটি ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এখানে সঠিক মাপ ও পরিমাণ দেওয়া ফরয করা হয়েছে। সঠিক মাপ ও পরিমাণের উপর অর্থনীতির অগ্রগতি নির্ভর করে। সঠিক মাপ ও পরিমাণ না থাকলে পরবর্তীতে কোনো আস্থা থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্র তা পুরাপুরি রক্ষা করার চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে যারা ইসলামী আইনকে ভংগ করবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি রক্ষার জন্য তা অপরিহার্য। যদি শ্রমিক কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দেয, তাও মাপে কম দেওয়ার আওতায় আসে। শ্রমিক কর্মচারীদের এ বিষয়ে ইসলামী সমাজে বিভিন্নভাবে শিক্ষিত করতে হবে। তেমনি শ্রমিক কর্মচারীকে উপযুক্ত বেতন না দেওয়াও এর আওতায় আসে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় অবশ্যই শ্রমিক কর্মচারীকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে। অবশ্য সাধ্যের বাইরে না শ্রমিক কর্মচারী করতে বাধ্য, না কর্তৃপক্ষ, কেননা আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত করতে বাধ্য করছেন না।

১৫২ নং আয়াতের অংশ 'আমি কাউকে সাধ্যাতিরিক্ত দায়িত্ব দেই না ; বাক্যাংশের ব্যাপক অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে কর আরোপ, কাজের সময় নির্ধারণ যেমন পারিশ্রমিক নির্ধারণ ও অন্য সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামর্থের দিকে খেয়াল রেখে করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন, পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ সবাইকে এ মূলনীতি সামনে রাখতে হবে। তেমনি সুবিচার করা এবং আল্লাহ্র সংগে কৃত অংগীকার পূর্ণ করাও অর্থনৈতিক তাৎপর্যবহ। সুবিচার করা অর্থনীতিতে আস্থা ও শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। আল্লাহ্র সংগে কৃত অংগীকার পূর্ণ করার মধ্যে গোটা ইসলামী শিক্ষা মেনে চলাই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ অবশ্যই অর্থনীতিতে সততা, বিশ্বস্ততা, উদ্যোগ, ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতা আনবে। তবে তা কেবল কথায় হবে না, আইনের মাধ্যমে সব ইসলামী শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হবে।

আল্লাহ্র অংগীকার বা আল্লাহ্র সংগে মানুষের কৃত অংগীকার অত্যন্ত বড় দায়িত্ব দ্যোতক। "খলীফাতুল্লাহ্' হিসেবেও এ রূপ মানুষের এ বড় দায়িত্ব বোধটা তার ছোট ছোট প্রয়োজনের বা কল্পিত প্রয়োজনের চাপে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কুরআনের শিক্ষা অবলম্বন করে মানুষের এ ভুলটা ভাঙতে পারে।

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াত দু'টিতে যে সব মূলনীতি দেওয়া হয়েছে তার যেমন রয়েছে নৈতিক, সামাজিক ও ব্যাপক সাধারণ তাৎপর্য, তেমনি রয়েছে ব্যাপক অর্থনৈতিক তাৎপর্য। এ সব মূলনীতি অনুসরণ অর্থনীতিকে উন্নত ও দক্ষ রাখতে বাধ্য। এভাবেই এ আয়াত দু'টি মানুষের সঠিক পথনির্দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি আয়াত। এ থেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোত্রগত, জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ও সর্ববিধ দায়িত্ব বিষয়ে হেদায়াত পাওয়া যায়।

– শাহ্ আবদুল হান্নান

প্রমাণপঞ্জি

১. আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা।

২. আবূ দাউদ।

৩. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী ; এবং তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

www.pathagar.com

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

কেউ কোনও সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কোনও অসৎ কার্য করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। সূরা আল-আন'আম ঃ ১৬০

শাব্দিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

حسنة – حسن যাবতীয় লোভনীয় ও আকর্ষণীয় বস্তু حسن নামে অভিহিত। حسنة তিন প্রকার ঃ ১. বিবেকের দিক থেকে ২. প্রবৃত্তির দিক থেকে এবং ৩. অনুভূতির দিক থেকে।

মানুষের প্রাপ্ত যাবতীয় আত্মিক, দৈহিক ও পারিবেশিক নিয়ামত যেগুলো তাকে আনন্দ দান করে, সেগুলোকেই حسنة বলা হয়। এর বিপরীত শব্দ بسيئة পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে বহু অর্থে বিভিন্নভাবে এ দু'টো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

بسيئة শব্দ سوء থেকে আগত। যে সব বস্তু বা বিষয় মানুষের মনে দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে চিন্তা, ভাবনা, অনুতাপ ও অনুশোচনার উদ্বেগ করে এবং মানসিক, দৈহিক ও বাইরের মাল সম্পদের ক্ষতি এবং বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যুর কারণে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটায় তাই سوء নামে অভিহিত। سيئة অর্থ মন্দ কাজ, পাপ কর্ম, খারাপ ব্যবহার ইত্যাদি। এটা حسنة এর বিপরীত শব্দ। আলোচ্য আয়াত এর উদাহরণ।[২]

তাফসীরকারদের আলোচনা ও মন্তব্য

১. প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমলকারীদের পুরস্কার ও প্রতিদানের পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং প্রথমেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। যে কেউ এরূপ একটি কাজ করলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ তাঁকে ১০টি সৎ কাজের সমপরিমাণ পুরস্কারের অধিকারী বলে বিবেচনা করা হবে। এ হচ্ছে অংগীকারকৃত

www.pathagar.com

সর্বনিম্ন পরিমাণ। অবশ্য সৎকাজের প্রতিদানের পরিমাণ স্থান বিশেষে সাতশ' এমনকি অগণিত অসংখ্য এবং পরিসংখ্যানের অতীত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণেই উক্ত সংখ্যা দশগুণ অর্থে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়, বরং আধিক্য ও অসংখ্য অর্থে বোঝানো হয়েছে বলে মতান্তরে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে মন্দ কাজের কথা। যে কেউ একটি মন্দ কাজ করলো তাকে তার বিনিময়ে কেবলমাত্র একটিরই প্রতিদান দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ক্ষণিকের কুফরীর বদলাতে অনন্তকাল দোযখের নানাবিধ শাস্তি ভোগ করার যুক্তি কোথায়? এর উত্তরে বলা যায় যে একজন কাফিরের মধ্যে এমন একটি দৃঢ় সংকল্প থাকে, যার ফলে সে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিনই সে তার কুফরী আকীদা বা মনোভাব নিয়ে বেঁচে থাকে বা থাকবে। সুতরাং মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে ঈমানের এমন ব্যতিক্রম।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে পূণ্যবান ও পাপীদের কারো উপর আমলের বিনিময় দেওয়ার ব্যাপারে পরিমাণের দিক দিয়ে কোনরূপ জুলুম বা অবিচার করা হবে না।[৩]

২. প্রখ্যাত মনীষী সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এর পূর্বের আয়াতে যারা দীনকে বহু অংশে বিভক্ত করেছে এবং নিজেরা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেল তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে কোনরূপ উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করার পর ঐ আয়াতে পাপ ও পুণ্য কর্মের হিসেব-নিকেশ ও প্রতিদানের ব্যাপারে তার নির্ধারিত নীতি নিয়মের উল্লেখ করেছেন। তিনি যেহেতু বান্দার আমলের হিসেবের ব্যাপারে তাঁর স্বকীয় সত্তার মধ্যেই রহ্মত নির্ধারিত করে রেখেছেন, তাই যে কেউ কুফরী অবস্থায় নয়, বরং মু'মিন অবস্থায় একটি সৎকর্ম করবে, তার জন্য একটির বদলে তাকে দশগুণ প্রতিদান দেবেন। উল্লেখ্য যে, কুফরী অবস্থায় যে কোনও সৎকাজ মূল্যহীন, ব্যর্থ এবং নিষ্ফল কর্মমাত্র। আসলে এ যেন কোন সৎ কর্মই নয়। পক্ষান্তরে (মু'মিন অবস্থায়) যে কেউ কোন একটি মন্দ বা পাপের কাজ করে তার জন্য একটি মাত্র প্রতিফল (শাস্তি) দেওয়া হবে। এ হচ্ছে প্রতিদানের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত নীতি। এ নীতির বরখিলাফ করে তিনি কারো উপর জুলুম বা অবিচার করবেন না।[৪]

৩. আল্লামা ফখরুদ্দীন আর-রাযী (র.) তাঁর 'তফসীরে কবীর' গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন, মূলত সাওয়াব বা প্রতিদান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটা অনুগ্রহ বিশেষ। তিনি ত একটি নেক কাজের দশটি প্রতিদানের একটিকে 'সাওয়াব' এবং নয়টিকে অনুগ্রহ বা করুণা বলে উল্লেখ করেছেন। একটি

www.pathagar.com

'সাওয়াব' নয়টি অনুগ্রহের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। তিনি আরো বলেছেন, কারো কারো মতে (নেক কাজের প্রতিদান) দশ সংখ্যা দ্বারা সীমিত করা উদ্দেশ্য নয় বরং এ দ্বারা বহুগুণ বা অসংখ্য বোঝানো হয়েছে। এর দলিল ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ –

এ আয়াতের দ্বিতীয় অংশে মন্দ কাজের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যে কেউ একটি মন্দ কাজ করবে তাকে একটি মাত্র প্রতিদান দেওয়া হবে অর্থাৎ প্রতিদান সমান সমান বা সমকক্ষ হবে কৃত মন্দ কাজটির। এর প্রমাণ হযরত আবূ যর (রা.) থেকে একটি হাদীস পেশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন-আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "একটি সৎকর্মের পুরস্কার দশ অথবা তারও বেশী আর একটি মন্দ কাজের বিনিময় একটি শাস্তি অথবা ক্ষমা।"

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন এই-কি করে ক্ষণিকের কুফরীর বদলে অনন্ত কালের চরম বিপর্যয়ের আযাব অবধারিত হতে পারে। এর উত্তর এই-কাফির তার এরূপ কুফরীর সংকল্পবদ্ধ রূপ থাকে এভাবে যে, সে যদি চিরকাল বেঁচে থাকত তবে সে তার কুফরী ধারণা ও বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকত। যখন এ তার চিরদিনের একটি স্থায়ী বদ্ধমূল সংকল্প, তখন তার আযাবও চিরকালের জন্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে, একজন গোনাহগার মুসলমানের ব্যাপার ভিন্ন রকমের। কেননা সে ত তার সে কৃত গোনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার সাফল্যে শক্ত। সুতরাং এ সংগত কারণেই তার শাস্তি মওকুফ করা হবে।[৫]

৪. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নে আহ্মাদ আল-কুরতুবী (র.)-ও আয়াতের ব্যাখ্যার বিস্তারিত আলোচনার পর এক হাদীসের উল্লেখ করেছেন যাতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হাসানার বিনিময় দশ, যে ব্যক্তি একটি হাসানা কাজে পরিণত করে তার জন্য নির্ধারিত বিনিময় দশ গুণ, কিন্তু যে হাসানা সাতশ' গুণের সংগে সম্পর্কিত তা হচ্ছে 'ইনফাক-ফী-সাবীলিল্লাহ্।'[৬]

মুফাস্সিরদের আলোচনার সার-সংক্ষেপ

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসিরীন যে সব বক্তব্য রেখেছেন, তা থেকে নিম্নোক্ত মূল তত্ত্বগুলো পাওয়া যায় ঃ

১. আল্লাহ্র মু'মিন বান্দাহ্ যদি কোন একটি নেক কাজ করেন তবে আল্লাহ্ তাঁকে কমপক্ষে দশটি প্রতিদান দেবেন। ক্ষেত্র বিশেষে এ প্রতিদান সাতশ' বা আরও বেশী হতে পারে। দশ শব্দ দ্বারা আসলে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝান হয়নি। দশ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধারনা করা যায়।

www.pathagar.com

২. মু'মিন বান্দার একটি মন্দ কাজ-এর জন্য একটি শাস্তিই দেওয়া হতে পারে অথবা তা ক্ষমা করে দেওয়াও হতে পারে।

৩. একথার আলোচনা প্রসংগে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তা হ'ল কুফরীর কথা। কুফরী করার জন্য কাফিরকে অনন্তকালই দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ, কাফির কুফরী সংকল্পে বদ্ধপরিকর থাকে। সে চিরদিন বেঁচে থাকলে চিরদিনই কুফরী করত। পক্ষান্তরে একজন মু'মিন তার গোনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার জন্যই সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। তাই তাঁর গোনাহের জন্য শাস্তি গোনাহর পরিমাণের চেয়ে বেশী হওয়া ন্যায়-বিচারের পরিপন্থী। অথবা তা ক্ষমা করে দেওয়াও যেতে পারে।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিজগতকে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করে তাঁর অসীম কুদরতে তা অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন। প্রাকৃতিক জগতের দিকে তাকালে আল্লাহ্র অপরূপ সৃষ্টি সৌন্দর্যকে দেখে আমরা অভিভূত না হয়ে পারি না। শুধু তাই নয়, রাহ্মানুর রাহীম মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবদের কল্যাণের জন্য এ পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় সব জিনিসই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র এসব মঙ্গলময় সৃষ্টির দু'টি দিক রয়েছে। একটি হল প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক জগত, যা চিরন্তন এবং শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টির আদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও এর উপর হাত বা কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ নেই।

তাছাড়া বায়ুপ্রবাহ, আকাশের মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে মাটিতে সিক্ত করা ইত্যাদি আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়ে থাকে। আর এসব কিছুই মানুষ ও জীব জগতের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। কিন্তু এ নৈসর্গিক জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম বিধানের উপর মানুষকে কিছু করতে হয় না। কিন্তু আল্লাহ্র সৃষ্টি বিধানের আরেকটি দিক আছে, সে দিকটি হল আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামতসমূহ আল্লাহ্র দেয়া মৌল বিধি-বিধান অনুযায়ী মানুষ ও জীব জগতের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করা। আর এ কাজটি করতে হবে মানুষকেই এবং এ কাজ করার জন্যই মানুষকে এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফা হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

তাই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ঈমান আনার সাথে সাথে ভাল বা সৎকাজের জন্য উৎসাহ এবং তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা আসরে আল্লাহ্ তা'আলা মহাকালের শপথ করে বলেছেন, "মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে ... ...। অর্থাৎ ঈমান আনার সাথে সাথে সৎকাজ না করলে মানুষ ধ্বংস বা

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও জীব জন্তুর জীবন ধারনের জন্য যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন, তা মানুষ তার সৎ পরিশ্রম দ্বারাই ভোগ-ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে পারে। শুধুমাত্র বৃষ্টি বা নদী-নালার পানি দ্বারাই জমিতে ফসল ফলে না। জমি চাষ করে বীজ বপন করতে হয়। খনি থেকে খনিজ সম্পদ আহরণ করে ব্যবহারোপযোগী করে নিতে হয়। এ ধরনের আরো বহু কিছুতে মানুষকে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও পরিশ্রম কাজে লাগিয়েই এ দুনিয়ায় সুখ-শান্তিতে জীবন ধারনের পথ প্রশস্ত করে নিতে হয়। তাই এজন্য আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে যে কাজ করা হয় তাকেই উত্তম কাজ বলা হয়েছে এবং সে উত্তম কাজের জন্য বিপুল উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে একটি উত্তম কাজের জন্য দশটি বা বহু গুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। এ প্রতিদান আখিরাতে তো দেওয়া হবেই, এ দুনিয়ায়ও একটি উত্তম কাজের ফল বহু দিক থেকে প্রসারিত হয়ে বহু গুণ বেশী হয়ে থাকে। Economic benefit এর Spread effect হয় যদি শুধু অর্থনৈতিক কল্যাণের কথাও ধরা হয়। বিভিন্ন কাজের ফল বহু দিক থেকে প্রসারিত হয়ে বহু গুণ বেশী হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সৎ ও ভাল কাজ পর্যালোচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে এক একটি সৎ কাজ দ্বারা এ দুনিয়ায় মানুষ ও জীবকুলের বিপুল কল্যাণ সাধন করা যায়। পক্ষান্তরে সৎ বা ভাল কাজ না করে যদি মন্দ কাজ করা হয় তবে তার ফল হবে বিপরীত। মন্দ কাজ দ্বারা মনুষ্য সমাজ ও জীবজগতের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন হয়। অবশ্য কোনও সৎ বা মু'মিন ব্যক্তি ভুলে বা না বুঝে যদি কোনও খারাপ কাজ করে, তাহলে তাওবা করে সে খারাপ কাজের সংশোধনের চেষ্টা করে। তাতে ঐ খারাপ কাজের অনিষ্টকারিতা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু একজন কাফির কখনও তার অসৎ বা খারাপ কাজকে সংশোধন করার চেষ্টা করে না। তাই তার একটা খারাপ কাজ দুনিয়ায় যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে তা দীর্ঘদিন ধরেই চলতে থাকে। তাই কাফির কুফরীর ক্ষতি বা ধ্বংসকারিতা মু'মিন মুসলমানের মন্দ কাজের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে থাকে।

মোট কথা, সৎ কাজে উৎসাহ দানই এ আয়াতের লক্ষ্য। সে সৎকাজ সামাজিক বা অর্থনৈতিক যে কোনও ধরনের হতে পারে। একটি নেক কাজের দশটি করে অনুরূপ সাওয়াব হওয়ার কথা বোঝানোর জন্য এ দৃষ্টান্ত সামনে রাখা যেতে পারে। যেমন এক সংখ্যা লেখার পর যত শূন্য যোগ হবে ততই এর মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এ এককে বাদ দিয়ে এ শূন্যগুলোর তা যতই হোক-কোন মূল্য হয় না। অনুরূপভাবে যে

www.pathagar.com

কোনও ধরনের নেক কাজ ঈমান সহকারে করলে ঈমানেরই মূল্য বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, ঈমানহীন সৎকাজ একহীন হাজারটি শূন্যের মতই মূল্যহীন।

– নূর মোহাম্মদ আকন

প্রমাণ পঞ্জি

১. আল-মুফরাদাত-রাগেব, পৃঃ ১১৮-১১৯।

২. ঐ

৩. তাফসীরে রূহুল মা'আনী আলূসী ৭/৮ পারা, পৃঃ ৬৮ ও ৬৯।

৪. ফী-যীলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) ঃ পৃঃ ১২৪ ৮ম পারা, ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৯, প্রকাশনায় দারুশ শুরুফ, বৈরুত, কায়রো।

৫. তফসীরে কবীর ঃ ফখরুদ্দীন আর রাজী, ১৪শ খণ্ড, ৮ম-৯ম পৃষ্ঠা, ৮ম সংস্করণ, প্রকাশনায় দারু কিতাবিল ইলমিয়াছ, তেহরান।

৬. আল-জামি লি আহ্কামিল কুরআন, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫০-১৫১, প্রকাশনায় দারুল ইরযাইত তুরামিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৬৫।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-আ'রাফ

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ.

আর আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং উহাতে তোমাদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

- সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১০

কয়েকটি শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

'مكنكم' 'প্রতিষ্ঠিত করেছি; ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ারসহ প্রতিষ্ঠিত করেছি। মূল শব্দ হল 'مكن' বসবাসের জায়গা। ইহার 'فعل' এর একটি রূপ হলো مكن যার অর্থ হল বসতি স্থাপন করা বা করার ব্যবস্থা করা। আয়াতের বর্ণনাভংগী থেকে মনে হয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তি, কারিগরী দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও প্রদান করা হয়েছে। মারমাডিউক পিকথল এস্থলে 'power' এবং আল্লামা ইউসুফ আলী 'Authority' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কুরআনুল করীমের অন্যত্র এ শব্দটির ব্যবহার আছে। তাতে 'Authority' অর্থে 'political Authority' বোঝানো হয়ে থাকে। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ পাক مكن' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। আর এটি সুস্পষ্ট যে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আল্লাহ পাক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এ দু'টি দিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

'معايش' কুরআনুল করীম ও উহার বিভিন্ন তাফসীর থেকে উদ্ধারকৃত অর্থ হল জীবিকা, জীবনের সামগ্রী, জীবন ধারনের উপকরণ ইত্যাদি। আয়াতের মর্মানুসারে

www.pathagar.com

উহা একটি 'stock concept' অর্থাৎ শব্দটির মধ্যে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক উপকরণই মুখ্যরূপে মনে হয়। কেউ কেউ অবশ্য 'means of exploiting the resources' এবং 'profession' ও vocation'-কেও এ শব্দটির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। কিন্তু Profession ও vocation, skill ইত্যাদি ব্যাপক অর্থে 'رزق' এর অন্তর্ভুক্ত। এ শব্দটির মূল হচ্ছে 'عايش' যার অর্থ হচ্ছে জীবন। এ থেকে 'معايش' হচ্ছে জীবনের সামগ্রী। এর বহু বচন হচ্ছে 'معايش' যার অর্থ হচ্ছে জীবন ধারণের সামগ্রী সকল। 'رزق' শব্দটিও জীবন-সামগ্রীর চূড়ান্ত রূপ বোঝায়। তবে এ শব্দটিও অত্যন্ত ব্যাপক। জীবনোপকরণ ছাড়াও মানবীয় গুণাগুণ, বৃত্তিমূলক জ্ঞান, কারিগরী ও শিল্পগত দক্ষতাও 'رزق' -এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

'تشكرون ، شكر' থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংগে তার যোগ্য আচরণ করা ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শামিল। কোন ব্যক্তি থেকে কোন উপকার লাভ করলে তার স্বীকৃতি দানই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা বা শোক্র। এ স্থলে আল্লাহ্ পাকের বহুবিধ দানে ধন্য মানুষের উচিত আল্লাহ্র এ দানসমূহের অশেষ কল্যাণকারিতা অস্বীকার করা অর্থাৎ এ ভাবেই আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। তাই কৃতজ্ঞতা হচ্ছে একক সাধনা, মানবিক অবস্থা প্রসূত আচরণ।

শোক্র দু'ভাবে প্রকাশ করা যায়। মুখের দ্বারা ও কাজের দ্বারা। আলোচ্য ক্ষেত্রে এ অর্থেই শোকর শব্দের ব্যবহার হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সার্বজনীন ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম-নীতির মৌল বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল-কুরআনের শিক্ষা মেনে চলা আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতীতে এ উপদেশ কর্ণপাত না করার পরিণতিতে বহু জাতির ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমান আয়াত থেকে মানুষের মৌল-প্রকৃতি, প্রয়োজন ও তা পূরণের খোদায়ী ব্যবস্থাবলীর বর্ণনাসহ নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে তাঁর সকল সৃষ্টির জন্য আদি থেকেই তাদের আহার-বিহার এবং সামগ্রিক জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বন্দোবস্ত করে রেখেছেন তা কুরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বিশেষ করে মানুষকে সম্বোধন করে তাঁর এ দানসমূহের উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

মুফাস্সিরীনদের মতামত

ক. আল্লামা ইবন কাসীর (র)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া ও আনুকূল্যের বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন যে তিনি মানুষকে ক্ষমতা দিয়েছেন। এর ফলে মানুষ রাজত্ব করছে নদী, সমুদ্র, বাতাস (এমন কি আধুনিক যুগে মহাকাশ) নিয়ন্ত্রিত করে ব্যবহার করছে। স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা নির্মাণ করছে এবং যাবতীয় কল্যাণকর বস্তু নিজের আরাম-আয়েশের জন্য নিয়োজিত করেছে। আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য মেঘমালার বর্ষণ, নদীর পানি প্রবাহ, খনিজ সম্পদ এগুলোর ব্যবহার ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে তাদের বসবাসের আরামদায়ক পরিবেশ গড়ে তোলেন। এতসব সত্ত্বেও তারা এসব নিয়ামতের শোক্র আদায় করে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে-আল্লাহ্র নিয়ামতের পরিমাণ ও সংখ্যা এতই অধিক যে, মানুষ তার পরিমাপ করতে পারে না কখনও।[১]

খ. আল্লামা ফখরুদ্দীন আর-রাযী (র.)

তিনি বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অসংখ্য নিয়ামত দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর সে সব নিয়ামতই তাঁর আনুগত্য করা তাদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছে। আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাবতীয় ভোগ্যবস্তু ভোগ করার ব্যবস্থা করেছেন! বিভিন্নভাবে রুজী রোজগারেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ্র সৃষ্ট কতকগুলো হচ্ছে প্রাথমিক দ্রব্য (Primary products) যেমন তুলা, গম, ইক্ষু, ধান ফল-ফলাদি ইত্যাদি, যেগুলো কাঁচামাল হিসেবে অথবা সোজাসুজি মানুষের অভাব পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

আবার অনেকগুলো সামগ্রী ভোগের জন্য মানুষকে পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবর্তিত বস্তুতে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করতে হয়। আর উভয়বিধ সামগ্রীই হচ্ছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ। আল্লাহ্র কুদরতে মানুষ ক্ষমতাবান। নিঃসন্দেহে এ সবই হচ্ছে আল্লাহ্র দান। সুতরাং মানুষের উচিত তাঁর যথার্থ শোক্রিয়া আদায় করা! কিন্তু পরিতাপের বিষয়! মানুষ খুব কমই শোক্র করে। কম শোক্র করার অর্থ এও হতে পারে যে কোন কোন সময় তারা শোক্র করে বটে তবে তা নিয়ামতের তুলনায় অতি সামান্য ও নগণ্য।[২]

গ. মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.)

মুফ্তী শফী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ পাক যেন পৃথিবীকে মানুষের প্রয়োজনীয় আসবার দিয়ে চিত্ত-বিনোদনের সবকিছুর একটা বিরাট ভাণ্ডারে পরিণত করে দিয়েছেন

www.pathagar.com

এবং সাজ-সরঞ্জাম এর ভেতর স্থাপন করে দিয়েছেন। এখন মানুষের কাজ শুধু এতটুকু যে ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করে নিয়ে তা ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা করে নেওয়া। সত্য বলতে কি, ভূ-পৃষ্ঠের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত দ্রব্য-সামগ্রী সুষ্ঠুরূপে বের করা এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় তা ব্যবহার করাই মানুষের যাবতীয় জ্ঞান-চর্চা এবং বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য।[৩]

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

জীবন ধারণের জন্য প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে কতিপয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা। এগুলো হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান। এগুলো অর্জন করার অধিকার এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করার সুযোগ মানুষের মৌলিক অধিকার। এ জন্য মানুষের চেষ্টা ও সাধনার নামই হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ প্রচেষ্টায় যে যত বেশী পরিশ্রম করবে সে তত বেশী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং তার জীবন ধারণের মানও তত বেশী উত্তম হবে। ইসলামের বিধান অনুসারে সাধারণভাবে মানুষ স্বাধীনভাবে বৈধ ক্ষেত্রসমূহে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। এ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সম্পদ (Economic Resources) আল্লাহ্ পাক বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ সামগ্রী বিভিন্ন রূপে বিরাজমান। যে ভূমিকে বিছানা স্বরূপ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা-ই হচ্ছে উৎপাদনের আদি উপকরণ। ভূমি ছাড়াও রয়েছে পানি, বনজ ও খনিজ সম্পদ। এগুলো ব্যবহার করে মানুষ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করে। অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও প্রয়োজন হচ্ছে শ্রম ও পুঁজি। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী উপকরণ হচ্ছে শ্রম। উৎপাদন ও উন্নয়নের উপকরণগুলোকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদনের কাজে লাগাতে হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি বণ্টন করতে হয়। এ বণ্টন প্রক্রিয়াও আল্লাহ্ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর এ সবই তিনি মানুষকে দান করেছেন তাদের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য অর্থাৎ সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদ উৎপাদনের প্রক্রিয়া এবং তা বণ্টন পদ্ধতি আল্লাহ্রই দান। মানুষের উচিত হচ্ছে এ দানের শোক্র করা মুখে এবং কাজের মাধ্যমে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল মানুষ সে সম্পর্কে খুব কমই চিন্তা করে এবং শোক্র গুজারী করে।

আরো একটি বিষয় খুবই প্রণিধানযোগ্য। আয়াতে 'يايها الناس' বলে সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল সম্পদে সকল মানুষ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তা থেকে অর্জন করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এখানে

www.pathagar.com

শোকরের উল্লেখও বিশেষ গুরুত্বের দাবী করে। আল্লাহ পাকের বিধানাবলীর দাবী অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা আসলে কার্যের মাধ্যমে শোকর প্রকাশের নাম। এ ধরনের শোক্‌র মানুষের কার্যক্রমে যে পবিত্রতা দান করে এবং লোকদের যে মানসিক উন্নয়ন ঘটায় তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফসল সবার মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বন্টন ও ভোগ করতে সহায়তা করে। আর আসলে এভাবেই প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে শোকর প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

– মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম

প্রমাণপঞ্জি

১. তফসীরে ইব্‌ন কাসীর, উর্দু অনুবাদ ঃ আবদুর রশীদ নোমানী পৃঃ ৪৯ ও ৫০।

২. তফসীরে কবীর, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৮, ২য় সংস্করণ।

৩. মা'আরেফুল কোরআন, ১৬০ আয়াতের তাফসীর।

www.pathagar.com

يٰبَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ.

হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদতের সময় ও ক্ষেত্রে তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। খাও ও পান কর কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ্ অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না। বল, কে আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সব সুন্দর বস্তু (উপহার) ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা নিষিদ্ধ করেছে ? বল, পার্থিব জীবন বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সব তাদের জন্য যারা ঈমান আনে। এরূপে যারা বুঝে সে সকল লোকদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। বল, আমার প্রতিপালক যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন তা হল প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি (সীমালঙ্ঘন) এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্র শরীক করা যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

-সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৩১-৩৩

শাব্দিক ব্যাখ্যা

'যীনাত' (زينة) শব্দের অর্থ সৌন্দর্য, পোশাক, অলংকার। মুফাসসিরদের মতে এ আয়াতসমূহে 'যীনাত' অর্থ পোশাক-পরিচ্ছদ। 'তাইয়েব' (طيب) শব্দের অর্থ পাক-পবিত্র, উৎকৃষ্ট, কল্যাণকর, যা ক্ষতিকর নয়।

www.pathagar.com

'ইসরাফ' (اسرف) শব্দের অর্থ-অপব্যয়, অমিতাচার, সীমালঙ্ঘন, বাস্তবিকই যার প্রয়োজন নেই। মুফাস্‌সিরদের মতে ৩১ নং আয়াতে উল্লেখিত 'ইস্‌রাফ' শব্দের অর্থ হারাম খাওয়া, অমিতাচার (অপব্যয়) করা ও সীমালঙ্ঘন করা।

নাযিলের প্রেক্ষিত

তদানীন্তন জাহিলী যুগে আরবের পুরুষেরা দিনে ও নারীরা রাতের বেলায় উলঙ্গ হয়ে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতো। তারা বলতো- যে পোশাকে আমরা গুনাহ্ করেছি, সে পোশাকে আমরা তাওয়াফ করবো না। আবার কেউ কেউ বলতো-এ কাজ আমরা শুভ বিবেচনা করে থাকি অর্থাৎ যেমন আমরা কাপড় শূন্য তেমনি আমরা পাপ শূন্য হয়ে যাবো। হজ্জের সময় তারা হজ্জের সম্মানার্থে শুধু প্রাণে বাঁচার জন্য সামান্য আহার করতো, চর্বি আদৌ খেতো না। এসব দেখে মুসলমানরা বলল- ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.) আমরা মুসলমান, আমরাই ত এ ধরনের পদ্ধতি পালনের বেশী হক্‌দার। এ প্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

তাফসীরকারদের মতামত

ক. 'كلوا واشربوا ولاتسرفوا' আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, যা ইচ্ছা খাও ও যা ইচ্ছা পরিধান কর, তোমার উপর দোষারোপ নেই; কিন্তু দু'টি অভ্যাস বড় খারাপ, এক. অমিতাচার বা সীমালঙ্ঘন, দু. অহংকার বা অহমিকা।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ বলেন ঃ 'ولاتسرفوا' শব্দের অর্থ তোমরা খাও কিন্তু হারাম খেয়ো না, কেননা, এটা বাড়াবাড়ি বা সীমালঘন।[২]

খ. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) লিখেছেন, এখানে 'যীনাত' শব্দের অর্থ কাপড় পরিধান করা বোঝানো হয়েছে 'خذوا زينتكم عند كل' আয়াতের দাবী হচ্ছে প্রতিটি নামাযে পরিপূর্ণ লেবাস পরিধান করা ওয়াজিব। কেননা পরিপূর্ণ লেবাসকেই 'যীনাত' বলা হয়। كلوا واشربوا ولاتسرفوا আয়াত পরিভাষাগত দিক দিয়ে মুতলাক অর্থাৎ সব সময় ও সব অবস্থাকেই করে এবং সব রকম খাদ্য খাবার ও পানীয় বস্তুকেই অন্তর্ভুক্ত করে যতক্ষণ না এর ব্যতিক্রমে কোন স্বতন্ত্র দলীল পাওয়া যায়। 'যীনাত' শব্দটি সবরকমের সাজ-সজ্জাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব সব দিক দিয়ে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বিধান করা, যানবাহন ব্যবহার নানাবিধ অলংকার ব্যবহারও এর অন্তর্ভুক্ত।[৩]

www.pathagar.com

গ. তাফসীরে মায্হারীতে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তী লিখেছেন, 'যীনাত' অর্থ এখানে পোশাক-পরিচ্ছদ। তাফসীরকারদের ঐকমত্যে তাই বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ, কালবী ও ইব্ন আব্বাসেরও তাই মত।

'মসজিদ' অর্থ এখানে সিজ্দার স্থান বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটির অর্থ করা হয়েছে তোমরা প্রত্যেক মসজিদেই কাপড় পরিধান কর তা তাওয়াফের জন্যই হোক বা নামাযের জন্য। গোটা নামাযকেই বোঝানো হয়েছে ....।[৪]

এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে পানাহার ও আচ্ছাদনের পর্যায়ে অনুসৃত নীতি (উসুল) হচ্ছে সব বস্তুই হালাল যে পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হয়।

ঘ. ফী-যিলালিল কুরআন প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) লিখছেন, আয়াতটির তাৎপর্য কেবল সালাতের সময় বেশভূষা এবং পবিত্র বস্তু পানাহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ঐ সব যীনাতের সামগ্রী যা বান্দার জন্য আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তা হারাম করাকে নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ্র দেয়া পোশাক ও পবিত্র খাবার কেউ স্বাধীন ইচ্ছামত হারাম করে নিক-এটা নিন্দনীয় ব্যাপার। কেননা আল্লাহ্র দেয়া শরীয়াত ব্যতীত কারো এ ব্যাপারে কোন অধিকার নেই।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামী অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু নীতি ও শিক্ষা এ আয়াত কয়টিতে বলা হয়েছে। ৩১ নং আয়াতে ইসলামে ভোগ (Consumption)-এর নীতি ও সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতে পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, খাওয়া ও পানকে কেবল হালালই করা হয়নি বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ইসলামে বৈরাগ্যবাদ বা জীবনবিমুখতার কোন স্থান নেই। এ নীতির ফলে ইসলামী সমাজে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর সীমার মধ্যে থেকে আনন্দময় ভোগ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অবশ্য ভোগ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসরাফকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'ইসরাফ' বলতে মুফাস্সিরগণ বুঝেছেন 'হারাম খাওয়া' ও 'অতিরিক্ত পানাহার করা'। 'ইসরাফ' না করার নীতির ব্যাপক ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের তাৎপর্য রয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি একটি নৈতিক নীতি হিসেবে কাজ করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পর্যায়ে ঠিক করবে যে তার কি ভোগ ও ব্যবহার করা উচিৎ ও কি করা উচিত নয়। অবশ্য এ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইনের সীমার মধ্যেই সে প্রয়োগ করতে পারবে। এ কথাও সত্য যে ব্যক্তি পর্যায়ে ইস্রাফ কাল ও স্থানের পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল হবে। এ

www.pathagar.com

জন্যই এর কোনো সর্বকালীন সীমা কোনো আইনে বা বিধিতে ঠিক করে দেওয়া সম্ভব হবে না।

সামাজিক পর্যায়ে 'ইসরাফ' সংক্রান্ত নীতি আরো ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে। সরকারের পরিকল্পনা, আমদানী-রফতানী, উৎপাদন, বণ্টননীতি এমনভাবে তৈরী হতে হবে, যাতে সে সময়ের প্রেক্ষিতে সে দেশে 'ইসরাফ' উৎসাহিত না হয় এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ইস্‌রাফ করার সুযোগ কমে যায়। সরকার নিজেও 'ইসরাফ' পরিহার করবেন। ইসলামী নীতিতে তাই আদর্শ ও কাম্য। এ আয়াতে এ কথাও স্পষ্ট যে Consumerism ইসলামের নীতি নয়। সম্পদ থাকলেও না। কেননা তাতে মানুষ বস্তুবাদী ভোগবাদী হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যাবার বেশী আশংকা থাকে। এ ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতিতে মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে হবে। সরকারী পর্যায়ে 'ইসরাফ' বর্জনের নীতিতে একদিকে তথাকথিত Prestige প্রকল্পের পরিবর্তে এমন সব প্রকল্প হাতে নিতে হবে, যাতে দরিদ্র ও অপেক্ষাকৃত ভাগ্যাহত লোকদের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয় এবং অপর দিকে জনসাধারণের উপর আরোপিত কল্যাণভিত্তিক কার্যক্রমহীন করের বোঝা অপেক্ষাকৃত হালকা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যারা অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ করতে অক্ষম এবং নগ্ন কিংবা অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে (বা নামায পড়তে) বাধ্য হচ্ছে কিংবা অনাহার, অর্ধাহারে, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে জীবন যাদের সমস্যা সমাধানেও সমাজ তথা রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামী সমাজ যতদিন পর্যন্ত একজন লোকও এ জাতীয় সমস্যার আবর্তে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কোন মুসলমানের পক্ষে তার নিজের ও পরিবারবর্গের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত কোন খরচ 'ইসরাফ' বলে গণ্য হতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন মান উন্নত হবে ইহাই কাম্য।

'আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর স্বীয় নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন।

৩২ নং আয়াতে 'পবিত্র' কথাটির উল্লেখ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী অর্থনীতিতে অপবিত্র, মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিকতার জন্য ক্ষতিকর কোন বস্তুর স্থান নেই এ শব্দটির সে দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ নীতিও কার্যকর করতে হবে। এ আয়াত ও পরবর্তী ৩৩ নং আয়াত প্রমাণ করে যে মূলত কোন জিনিসকে হারাম করার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌র। রাসূল (স.) যা কিছু হারাম করেন তাও আল্লাহ্‌র দেয়া ক্ষমতা

বলেই।* সূরা আ'রাফের ৩৩ নং আয়াত ও কুরআনের অন্যান্য জায়গায়ও রাসূল (স.) কর্তৃক খুব কম দ্রব্যই হারাম করা হয়েছে। এ ছাড়া বাকী সবই হালাল। এ নীতি মানুষ ও অর্থনীতির জন্য খুবই কল্যাণকর হয়েছে। বস্তুত মানব জীবন ও সমাজের জন্যে অকল্যাণকর দ্রব্যাদি ও কার্যাবলী হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন। অন্যদিকে নির্দিষ্ট কতিপয় হারাম ছাড়া বাকী সবই হালালের পর্যায়ে রেখেও আল্লাহ আমাদের অর্থনৈতিক জীবন তথা উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন নির্বাচনের এক বিশাল ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নে অতীব সহায়ক।

– শাহ্ আবদুল হান্নান

প্রমাণপঞ্জি

১. তাফসীরে কবীর, সূরা আ'রাফের ৩১-৩৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২. তাফসীর ইব্ন কাসীর, সূরা আ'রাফের ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. তাফসীরে কবীর, সূরা আ'রাফের ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।

৪. তাফসীরে মাযহারী।

* যেমন সূরা আ'রাফেরই ১৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে- উম্মী নবী তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে।

www.pathagar.com

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ
سَحَابًاثِقَالاً سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ
كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. وَالْبَلَدُ
الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَالَّذِىْ خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ اِلاَّ نَكِدًا
كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ.

তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী অগ্রদূতরূপে প্রেরণ করেন। পরে যখন সে পানি ভারাক্রান্ত মেঘমালা উঠিয়ে আনে তখন আমরা তাকে কোন মৃত (বা নির্জীব) ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি এবং সেখানে বৃষ্টি বর্ষণের সাহায্যে সকল ধরনের ফসল উৎপাদন করি। লক্ষ্য কর, এ ভাবেই আমরা মৃতকে জীবিত করব, যাতে করে তোমরা এর থেকে শিক্ষা লাভ (স্মরণ) করতে পার। এবং যে মাটি ভাল, সে মাটি স্রষ্টার আদেশে উত্তম ফসল উৎপাদন করে আর যে মাটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর অতি সামান্য ছাড়া কিছুই উৎপাদন করে না। এভাবে আমরা বিভিন্ন ভাবে আমাদের নিদর্শনকে বুঝিয়ে থাকি যারা কৃতজ্ঞ তাদের উদ্দেশ্যে। - আল-আ'রাফ ঃ ৫৭-৫৮

প্রেক্ষিত

তাফসীরকারদের মতে সূরা আন'আম এবং সূরা আ'রাফ দু'টির অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল এক। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর মক্কাবাসী কাফিরদের চরম নির্যাতন চালাবার সময়ে এ দু'টি সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। সে অবস্থায় বিশেষ করে শেষ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং তাঁর সাহাবাদের জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে তবুও ঈমানের প্রতি অর্থাৎ ইসলামের প্রতি আহবান এবং তার মৌল বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণই তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল। দু'টি সূরার বাণী সে কর্তব্য ও দায়িত্বকে শক্তি এবং সমর্থন দান করেছে। মদীনায় হিজরতের পরবর্তীকালে নতুন পরিস্থিতিতে সাফল্য অর্জিত হওয়ার ইঙ্গিতও রাসূলুল্লাহ্ (স.) লাভ করেন সূরা আন'আমের ৫ নং আয়াতে ঃ

www.pathagar.com

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيْهِمْ اَنْبَؤُا مَاكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ.

(অর্থাৎ এভাবে এখন যে সত্য তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে তাকেও তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। যাই হোক, তারা আজ পর্যন্ত যে সবকে বিদ্রূপ করে এসেছে অতিশীঘ্র সে সম্পর্কে তাদের কাছে সংবাদ পৌছবে)। সূরা আ'রাফের ৫২ নং আয়াতে আল্লাহ তেমনি আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে তিনি আল-কুরআনকে জ্ঞান তথ্যে সুবিন্যস্ত করে এদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য সে কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত। আবার ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ (আল্লাহ্‌র সৃষ্ট) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, যখন এ পৃথিবীকে সুসমন্বিত করা হয়েছে, আল্লাহকেই ডাক-- অন্তরে ভয় আর আশা নিয়ে। কারণ আল্লাহ্‌র রহমত ঈমানদার চরিত্রবানদের অতি নিকটে।

আলোচ্য আয়াত দু'টিতেও মানুষের ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের পটভূমিকে সম্মুখে রেখে অতীতের নূহ (আ.) থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রেরিত নবীদের প্রতি মানুষের আনুগত্যহীনতার পরিণতিকে প্রেক্ষিত ধরে প্রত্যক্ষভাবে শেষবারের মত মক্কাবাসীদেরকে সত্যের পথে আহ্বান জানানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবতার উদ্দেশ্যেও সে পথ নির্দেশকে তুলে ধরা হয়েছে। আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্‌র কৌশলের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উল্লেখ এবং বিজ্ঞানের তথ্যকে সম্মিলিত করে ইসলামী জীবন দর্শনকে সহজ সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে। সে অন্তর্নিহিত জীবন দর্শনে অর্থনৈতিক আর আধ্যাত্মিক দিকও সম্মিলিত রয়েছে।

কতিপয় তাফসীরকারের সংক্ষিপ্ত অভিমত

ক. আল্লামা ইব্ন কাসীর

আল্লামা ইব্ন কাসীর আয়াত দু'টির তাৎপর্যকে এর পূর্ববর্তী আয়াতের ভাবধারার কাঠামোতে বিশ্লেষণ করেছেন। সে কাঠামোতে রয়েছে স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্ট বর্ণনা। বিশেষ করে তাঁর মানুষ ও সৃষ্ট জীবের জন্যে রিয্ক দানের বর্ণনা। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই বর্তমান আয়াত দু'টিতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তাঁর বর্ষণের রহমতকে প্রেরণ করার আগে পাঠালো অগ্রদূত মৃদু বাতাস। সে অগ্রদূত আল্লাহ্‌র রহমতের সুসংবাদ বহন করে। পরিণতি দেখা যায় পরে যখন রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ মৃত

মাটিকে উজ্জীবিত করে এবং সেখান থেকেই ফসল ফল মূলের রিয্ক উৎপন্ন হয়। এখানেই রূপক সাহায্যে আবার বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহ্ নিজ ক্ষমতা ও রহমত গুণেই মৃত মানুষকে কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করবেন। ইবন কাসীর উল্লেখ করেছেন যে একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের আগে ৪০ দিন অবিরাম বৃষ্টি বর্ষিত হবে যার ফলে সকল মৃতদেহ কবর থেকে এমনভাবে সজীব হয়ে ওঠতে থাকবে যেমন বীজ থেকে উদ্ভিদ বা শস্যের চারা ওঠতে থাকে। এই উদাহরণটিকে আরো সুন্দর ও বাস্তবভাবে উপস্থাপিত করার জন্যেই পরবর্তী ৫৮ নং আয়াতে মাটির গুণাগুণের উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের মন ও মানসকে মাটির সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোন কোন মাটি উর্বরা এবং বৃষ্টি বর্ষণের ফলে বীজ থেকে উত্তম ফসল উৎপন্ন করে। আবার কোন কোন জায়গায় মাটি অনুর্বর পাথুরে মাটি, সেখানে একই রকম বৃষ্টি বর্ষণেও তেমন কিছু ফসল উৎপন্ন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে যেমন মরুভূমিতে অথবা পর্বতগাত্রে একেবারেই কিছু জন্মায় না। ঈমানের প্রতিষ্ঠা তেমনি মানুষের মন ও মানসের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। জ্ঞান ও সাধনার সাহায্যে যেখানে মানুষের মন ও মানস উর্বর হয়েছে সেখানেই উৎপন্ন হবে ঈমানের ফসল অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের পূর্ণ আস্থা এবং তার অনুসরণে সত্য ও ন্যায়ের পথে ইসলামী আদর্শে মানুষের হবে জীবন যাপন। যে ক্ষেত্রে মন ও মানস শুষ্ক অনুর্বর, সেক্ষেত্রে ফল হবে বিপরীতধর্মী। বিপথগামী ও বিভ্রান্ত হবে সে রকম মন-মানসের অধিকারী মানুষেরা। আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশনা থেকে তারা নিজেরা নিজদের বঞ্চিত করলো।

খ. আল্লামা কুরতুবী

আল্লামা কুরতুবী ।بشر শব্দটিকে দু'টি অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি হলো সুসংবাদবাহক অথবা সুসংবাদ দানকারী। দ্বিতীয় অর্থ ধরা যায় ।نشر থেকে। বায়ু প্রবাহের এদিক সেদিক চলাচল বা বিস্তৃত হওয়া বোঝায় এক্ষেত্রে। বৃষ্টির পূর্বক্ষণে বাতাস একটু এদিক-সেদিক বা নানামুখী হওয়াও অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়। এ দু'টি অর্থকেই আয়াতটিতে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা যায়। অন্য দিকে قل। শব্দ থেকে স্বল্প, অল্প বা মৃদু-মন্থর অর্থ ধরা যায়। الطيب। بلد কে সরস উর্বরা ভূমি এবং بلد الخبيث। কে অনুর্বর, শুষ্ক পাথুরে জমি অর্থে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং আল-কুরতুবীর বিশ্লেষণও পূর্বোক্ত ইব্ন কাসীরের বিশ্লেষণের অনুরূপ। তবে আল-কুরতুবীর ব্যাখ্যাতে সংশ্লিষ্ট হাদীসটির সূত্রসহ পূর্ণতর বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে এ

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য ইমাম আবূ রাযীলের সূত্রে এক হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ প্রশ্ন করা হলো, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলের পুনরুত্থান ঘটাবেন আর তার উদাহরণই বা কেমন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন ঃ তুমি কি এমন কোন শুষ্ক মৃতপ্রায় শস্যহীন অঞ্চলে যাওনি, যেখানে পুনরায় গমন করে সে ভূমিকে শস্য শ্যামল পরিবর্তিত রূপে দেখেছ ? উত্তরে প্রশ্নকর্তা বললো ঃ হাঁ দেখেছি তো! তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন ঃ এটাই তো পুনর্জীবন দানের উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে এ হলো মানুষের অন্তঃকরণের উদাহরণ। কোন কোন অন্তঃকরণ উত্তম কথা ও উপদেশ গ্রহণ করে আর ফাসিক অন্তঃকরণ সে সব গ্রহণ করে না। মুজাহিদ (র.) বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে যারা 'তাইয়েব' (উত্তম, পবিত্র, উর্বর) তারা উত্তম উপদেশ গ্রহণ করে নিজেরা উপকৃত হয় আবার অন্যদেরও উপকার করে। অন্যদিকে যারা 'খবীস' (ভ্রষ্ট, শুষ্ক, অনুর্বর) তারা সত্য ও ন্যায় পথে চলার উপদেশ গ্রহণ করে না, সুতরাং নিজেরা উপকৃত হয় না, অন্যদের উপকারও করে না।

গ. আল্লামা সাইয়েদ কুতুব

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব উপরোক্ত বর্ণনাকে আরো সুন্দরভাবে প্রকৃতির নিয়ম এবং স্রষ্টার বিধানের প্রেক্ষিতে পরিবেশন করেছেন। প্রকৃতির উদাহরণের পশ্চাতে পরম স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বজ্ঞ সত্তা দিনরাত সর্বদা সক্রিয় আছে। জ্ঞান ও সঠিক শিক্ষালাভ থেকেই মানুষ প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করে আর সত্য পথ অবলম্বন করতে পারে। ভ্রান্ত চেতনার মানুষ তা পারে না। সেজন্যেই পূণ্য পবিত্র আত্মার মানুষ এবং দুষ্ট 'খবীস' আত্মার মানুষের মধ্যে ঈমান বা বিশ্বাস প্রশ্নে অনেক পার্থক্য ঘটে। হেদায়েত, নিদর্শন নীতিবাক্য ও উপদেশ মানুষের আত্মার উপরে প্রভাব সৃষ্টি করে বৃষ্টির পানি যেমন মাটির উপরে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। আত্মা যদি পবিত্র উর্বরা হয়, তাহলে হেদায়েত ও উপদেশ তাকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করে এবং বিপুল কল্যাণ লাভের উপযোগী করে। অন্যদিকে আত্মা দুষ্ট 'খবীস' প্রকৃতির হলে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়; সত্য ও ন্যায়ের উপদেশও সেই আত্মার মধ্যে তখন ঘৃণা, নিন্দা, বিপর্যয় সৃষ্টির আসক্তি সৃষ্টি করে।

ঘ. আল্লামা ইউসুফ আলী

আল্লামা ইউসুফ আলী উপরোক্ত ধরনের বিশ্লেষণকে তিনটি দিক থেকে সুস্পষ্ট সংগঠন করতে চেষ্টা করেছেন ঃ (১) প্রাকৃতিক ও বাহ্যিক দিক; (২) আধ্যাত্মিক দিক;

www.pathagar.com

এবং (৩) পারলৌকিক দিক। তা ছাড়া নতুন একটি দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সে হলো আধ্যাত্মিক দিকটিরই সূক্ষ্ম তাৎপর্য অবলম্বন করে আত্মার কৃতজ্ঞতা উপলব্ধির রূপ شكر। বারবার আল্লাহ্ নিদর্শন প্রেরণ করেন এবং তাঁর লক্ষ্য হলো যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তারা। উপকৃত বোধ করেই মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের দিকে অনুপ্রাণিত হয়। সে জন্যই لقوم يشكرون কথাটির তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। নিদর্শন থেকে তারাই উপকৃত হয় যারা স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে আল্লাহ্র বাণী ও নির্দেশকে গ্রহণ করে এবং পবিত্রতা ও নিষ্ঠার কর্মসাধনা নিয়ে সক্রিয় সাড়া দেয়। (তিনি বলেছেন ঃ Those who are grateful are those who joyfully receive God's Message and respond to it by deeds of holiness and righteousness)।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আয়াত দু'টির প্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখেই সংশ্লিষ্ট এবং বিশিষ্ট আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ এ ক্ষেত্রে উপযোগী। বিশেষ করে এ কারণে যে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সৃষ্টি মহিমা ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তি ও সৌন্দর্যের তাৎপর্য এবং সামাজিক অর্থনৈতিক তাৎপর্যের সঙ্গে মিলিত রাখা হয়েছে। অপূর্ব নিদর্শন ও প্রমাণ সাহায্যে অবিশ্বাসী মানুষের মনকে আকর্ষণ করাই আল্লাহ্র উদ্দেশ্য। ইহকালের জীবন ও পরকালের জীবন-দুই জীবনেই মানুষের কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করেই মন ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে ঈমানে প্রতিষ্ঠিত করা হলো প্রাথমিক মৌল উদ্দেশ্য। শুধু ইহকালের সুখ সমৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য লাভই যে জীবনের লক্ষ্য নয়, সে কথা আয়াতে বোঝানো হয়েছে জীবন্ত নিদর্শন সাহায্যে। পরকালে ইহকালের জীবন শেষে মৃত অবস্থা থেকে কিয়ামত মাধ্যমে পুনর্জীবিত হওয়াকে বিশ্বাস না করলে ঈমান বা সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ হয় না।* তেমনি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের ভিত্তিতে মু'মিন মুসলিমদের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত

* মৃত মাটিতে বৃষ্টি বর্ষণের সাহায্যে যেমন মাটিকে উর্বর করা যায় এবং তার উৎপাদিকা শক্তির সাহায্যে ফসল উৎপাদন করা যায়, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার 'হেদায়েত' ও রহমতের সাহায্যে মানুষের মনকে ঈমানের বীজ গ্রহণ ও ঈমানদার মুসলিম সৃষ্টির ব্যবস্থা করা সম্ভব। আবার মৃত মাটিকে আল্লাহ্ যেমন পুনর্জীবিত করে গাছপালা ফসল, ফলমূল সৃষ্টি করেন, তেমনি মৃত মানুষকেও তিনি নির্ধারিত মেয়াদ শেষে পুনর্জীবিত করবেন। পরকালে ইহকালের দায়িত্ব পালন ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে মানুষকে। সে বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ।

www.pathagar.com

হতে পারে ইসলামী সমাজ ও ইসলামী অর্থনীতি যা পরবর্তী পর্যায়ে মদীনাতে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাঁরই সঙ্গে সম্পর্কিত রেখে ব্যাপক পরিধির অন্তর্গতভাবেই আবার অর্থনৈতিক দিক থেকে আয়াত দু'টির বিশ্লেষণে কতকগুলো প্রধান বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়।

প্রথমত, আয়াত দুটির প্রেক্ষিত, পটভূমি ও সাধারণ তাৎপর্য থেকে স্পষ্ট ধারনা হয় যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে বুঝতে হলে বর্তমানকালের আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতির তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নিয়ম-কানুন বা মনোভাব যথেষ্ট নয়। প্রধান কথাই হলো, পার্থিব জীবন ও পৃথিবী এবং আকাশ-বাতাস থেকে শুরু করে সকল সৃষ্ট সম্পদ, শক্তি ও উপাদান সৃষ্টিকর্তার বিধানের অনুসারী। সে বিশ্বাস নিয়েই মৌল কাঠামো অনুশীলন বিশ্লেষণের কাঠামো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা যেমন উক্ত মৌল ঈমান কাঠামোর অধীন, সমাজ সংগঠন ও অর্থনীতি গঠনেও তারই অধীন। অন্য দিকে মানুষের জীবনকে সে কাঠামোর অধীনে সুদূরপ্রসারী ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের কল্যাণের লক্ষ্যেই পরিচালিত করবেন উক্ত মৌল কাঠামো। আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা ভিত্তিগতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী সমাজের ঈমানদার মানুষকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির জড়বাদী অর্থনীতি ও জড়বাদী মূল্যবোধ থেকে ভিন্ন ও সামগ্রিকরূপে গড়ে তুলবে তারই সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। সেজন্যেই গোড়াতেই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, যে বাতাস বৃষ্টি বর্ষণের সুসংবাদ বহন করে আনে এবং বর্ষণ সম্ভাবনাময় মেঘকে আকাশে পরিচালিত করে কোন ভূখণ্ডের বা অঞ্চলের দিকে নিয়ে যায়, তার উৎস সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা। আর তাঁর প্রদত্ত বৃষ্টি বর্ষণ রহমত বা কল্যাণ রূপেই শুষ্ক মৃত মাটিতে ফসল বা ফলের উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টি করছে।

দ্বিতীয়ত, উপরোক্ত স্বীকৃতিই ইসলামী অর্থনীতির প্রাথমিক ধর্তব্য কথা। ধর্তব্য কথা (Hypothesis) সঠিক হলে উপলব্ধি এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অনুশীলন সঠিক হবে। যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার অবদান রয়েছে সেক্ষেত্রে সে অবদানকে উৎসের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অনুশীলন সঠিক হবে। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার অবদান রয়েছে সে ক্ষেত্রে সে অবদানকে উৎসের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে বিশ্লেষণ অনুশীলন করলেই বিভ্রান্তি আসবে। বিভ্রান্তির যুক্তিতে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার অবদানকে নিজস্ব অবদান হিসেবে ধরে নিতে পারে। তার ফলে সৃষ্ট হবে মানুষের যুক্তিহীন

www.pathagar.com

অহমিকা আর অন্তহীন জড় সম্পদের প্রতি লোভ ও লালসা। মানুষের প্রকৃত সার্বিক কল্যাণের প্রয়াস হবে ব্যাহত ও বিপথগামী। সেজন্যেই আবার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে প্রথম আয়াতটির শেষাংশে এই মর্মে আল্লাহ্ প্রদত্ত অবদানের নিদর্শনকে (ফসল ও ফলের উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টিকে) সঠিকভাবে দেখলে মানুষ সত্যিকারের শিক্ষালাভ করতে পারবে। সুতরাং সঠিক ধর্তব্য থেকেই মানুষ অর্থনীতিবিদ বা জ্ঞানের অনুসারী যে কোন সমাজেই বুঝতে পারবে অর্থনৈতিক প্রয়াসের ভিত্তিই হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত উপাদান ও শক্তি (এ উপলব্ধিকে অবলম্বন করে বিশদ বিশ্লেষণ ইসলামী অর্থনীতি সংক্রান্ত গবেষণার অধীনে করা হয়ে থাকে)।

তৃতীয়ত, জমি ও কৃষি উৎপাদনকে উদাহরণ হিসেবে ধরে দিয়ে দু'রকম দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ অর্থনৈতিক প্রয়াসে লিপ্ত হতে পারেঃ

ক. একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাবে সে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ (জমি ও জমির উৎপাদিকা শক্তি) যে সম্পদ প্রকৃতি থেকেই আসে, তার ব্যবহার করে মানুষ। মানুষই উদ্যোক্তা এবং মালিক। প্রকৃতির সর্বত্র অভিযান চালিয়ে তার শক্তি ও উপাদান সংগ্রহ করে যা উৎপাদন করা যায়, মানুষ কর্মকুশলতার সঙ্গে তা করে যাবে। অন্যের প্রাপ্য মিটিয়ে যা থাকবে তাই তার নিজস্ব সম্পদ। এ হলো পুঁজিবাদী পদ্ধতির উদাহরণে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ। আবার একই দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাজই করা যায় ব্যক্তি মানুষকে দিয়ে নয়, বরং রাষ্ট্রের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই সবকিছু নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের অহমিকা ও সম্পদ লোভ-লালসার স্থলে আসে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অহমিকা ও সম্পদের লোভ-লালসা।

খ. দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণটি হলো ইসলামী অর্থনীতির অন্তর্গত। এক্ষেত্রে প্রকৃতির পরিবর্তে ধর্তব্য হলো সৃষ্টিকর্তা। কারণ বিশ্বের সৃষ্টিজগতে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো মৌলিক আধিপত্য বা সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত। সে ধর্তব্যেরই অনুসারী হলো অন্যান্য ধর্তব্য। সৃষ্টিকর্তার প্রাথমিক ও পরবর্তী অবদান সম্পর্কে। দ্বিতীয় আয়াতটির বিশ্লেষণে সে কথা বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করা যায়। যেমন, জমির মধ্যে গুণমাত্রার শ্রেণীভেদ আছে। বৃষ্টি বর্ষণে উৎপাদিকা শক্তি সক্রিয় হয় এবং বীজ থেকে ফসলের উৎপাদন হয়। কিন্তু জমির শ্রেণীভেদের জন্য সে বৃষ্টি বর্ষণের পানি সরবরাহ সম্পদ ও মরুভূমি অঞ্চলে অথবা পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় নিষ্ফল মু'মিন মানুষকে

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করতে হয় এবং বুঝতে হয় আল্লাহ্‌র বিধানেই প্রাকৃতিক সম্পদের ও শক্তির শ্রেণীভেদ হয়েছে। তা সত্ত্বেও মু'মিন মানুষকে যথাসাধ্য পরিশ্রম এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করে যেতে হয়। আল্লাহ্‌র ইবাদত হিসেবেই তাকে এ কাজ করে যেতে হয় এবং তাঁরই বিধান অনুসারে বিনিময় ও বন্টনের ন্যায় বিচার নীতি অবলম্বন করতে হয়। সমাজ ও অর্থনীতিকে ন্যায়বিচারের এবং যুক্তিসম্মত সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হয়। মানুষেরই সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে, সে কল্যাণ ইহকালের এবং পরকালের সমন্বিত যুক্তিবাদের ভিত্তিতে। সে জন্যেই মু'মিন মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত অবদানকে (বৃষ্টি বর্ষণ, শস্য উৎপাদন, শস্যের বন্টন, আয়ের বন্টন ও ব্যবহারকে) কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতার মনোভাব এবং অবদান প্রাপ্তির জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোভাব মু'মিনের ঈমানেরই একটি লক্ষণ। সুতরাং এ ধরনের সমাজ ও অর্থনীতিতে মানুষ মানবিক মর্যাদা ও নৈতিক মূল্যবোধ নিয়েই জীবন যাত্রা নির্বাহ করে থাকে। বিশ্বের বর্তমানকালের পরিস্থিতি এমনি সমাজ ও অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পাশ্চাত্য ভাব-ধারার পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতি মানুষের জড় কল্যাণকে মানদণ্ড করে বিভ্রান্ত হয়েছে। আংশিক কল্যাণের আংশিক মূল্যবোধ দিয়ে বিভ্রান্ত সমাজ ও অর্থনীতি সংগঠন করে যাচ্ছে এবং তার অধীন মানুষকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর থেকে বহুদূর সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণের দিকে মানবতাকে ফিরিয়ে আনাই ইসলামী অর্থনীতির প্রয়াস। কারণ উক্ত দৃষ্টিকোণই সমাজ ও মানুষকে দর্শন, যুক্তিবাদ ও ক্ষমতা দান করে ইহকাল ও পরকালের সামগ্রিক সাফল্য ও কল্যাণের সমন্বয় সাধন করতে এবং তারই কাঠামোতে পার্থিব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে।

চতুর্থত, আয়াত দু'টির তাৎপর্য থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। যেমন-(১) জমির শ্রেণীভেদ রয়েছে, গুণমাত্রার পার্থক্য রয়েছে। আবার মানুষের মানসিক গুণের সম্পদেরও পার্থক্য রয়েছে তার ভিত্তিতে অঞ্চলে অঞ্চলে জমিতে জমিতে উৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্য নির্ধারণ করা যায়। এমনি পার্থক্যকে ভিত্তি করেই জমির খাজনা নির্ধারণের রিকার্ডিয়ান তত্ত্ব (Ricardian theory of rent) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তেমনি আবার মানুষের গুণগত পার্থক্য এবং

www.pathagar.com

তার উপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে মানব সম্পদ প্রাপ্তি (Human resources) ব্যাপারেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে দেশে দেশে। (২) মু'মিন মুসলিমের জন্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দায়িত্ব পালন যে ভিন্ন ধর্মী, তার স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে ঈমানের ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। একদিকে পার্থিব জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ইসলামী নীতি অনুসরণ করেই মানুষেরা করবে এবং সততা ও কর্মকুশলতা রক্ষা করবে। দুর্নীতি ও অবৈধ ব্যবসা তারা স্বভাবতই পরিহার করবে। এমনি নীতি ও সদাচরণের অনুসরণ হবে তাই সামাজিক সাধারণ রীতি। কারণ পরকালের হিসেব-নিকেশে ন্যায় আচরণ ও অন্যায় আচরণের বিচার হবে বলে মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হয়। এই বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে হিসেব দেওয়ার দায়িত্ব একটি অসাধারণ ধরনের মানসিক গুণ, যাকে বলা হয় (Accountability)। এমনি (Accountability) প্রাথমিক ও ভিত্তিগতভাবে মানুষের মনেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ তখন শুধু প্রাসঙ্গিক সাহায্য দান করবে, যার ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা হবে সর্বোচ্চ মানের। সে জন্যই প্রকৃত ইসলামী অর্থনীতি হবে নানা দিক থেকে সর্বোচ্চ মানব কল্যাণোপযোগী। পরিশেষে উল্লেখ্য যে, কোন মুসলিম দেশ এবং যে কোন দেশে মানুষের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিশিষ্ট ধরনের তত্ত্বের প্রেক্ষিতে কর্মপন্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। কর্মপন্থা প্রথমে হবে জরীপের মাধ্যমে তথ্য আহরণ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, যেমন মাটি ও পানির পরিস্থিতি, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত পরিস্থিতি, আবহাওয়ার প্রভাব, মাটির উর্বরতার প্রকৃতি ও উৎপাদিকা শক্তির মাত্রাভেদ ইত্যাদি। অতঃপর কর্মপন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে নানা উপায়ে বিশেষ করে নতুন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিকৃষ্ট জমিতে ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে। তেমনি আবার শিক্ষা প্রসার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অবলম্বন করা যেতে পারে উন্নততর কর্মপন্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্য। বর্তমানকালে অনুন্নত দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনাতে এ সব কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়। ইসলামী নীতির কাঠামোতে এসব কর্মপন্থার ফলপ্রসূতা হবে উন্নত মানের। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ব্যাপারে (Accountability) সম্পর্কে মানসিক ভিত্তিক সচেতনতার জন্য।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

www.pathagar.com

প্রমাণপঞ্জি

১. মাওলানা মওদূদী, তরজমায়ে কুরআন মজীদ অবলম্বনে বাংলা অনুবাদ এবং প্রেক্ষিত আলোচনা (পৃষ্ঠা ২২৬-২৩৬)

২. তফসীরে ইব্‌ন কাসীর, উর্দূ অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নোমানী, করাচী, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

৩. আল্লামা আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আল-কুরতুবী, তফসীরে আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৮-২৩১।

৪. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ফী-যিলালিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ৮ম সংস্করণ, বৈরূত ও কায়রো, পৃষ্ঠা ১২৯৮-১৩০০।

৫. আল্লামা ইউসূফ আলী, The Glorious Quran, বৈরূত ও কায়রো, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৫৭।

www.pathagar.com

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ

تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا

فَاذْكُرُوْا اٰلاَءَ اللّٰهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

স্মরণ কর, 'আদ' জাতির পর তিনি তোমাদের উত্তরাধিকারকে পৃথিবীতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে বাসগৃহ নির্মাণ কর আর পাহাড় কেটে প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ কর। সূতরাং আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ও দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাক। - সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৭৪

গুরুত্বপূর্ণ দু'টি শব্দ

بـوأ মূল শব্দ بـواء এর অর্থ গৃহাদির অংশসমূহ সমান ও সঠিক ভাবে পরস্পর যথাস্থানে স্থাপিত হয়ে যাওয়া।

سـهول একবচন سـهل এর অর্থ অতি সহজ বা নরম, যা কঠিন বা শক্ত নয়। এখানে سـهل الارض মানে নরম মাটি বা সমতল ভূমি।

(রাগেব ইসফাহানী ঃ আল-মুফরাদাত, পৃষ্ঠা ২৪৫)

কতিপয় তাফসীর থেকে উৎকলন

১. আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপতী ঃ'আদ' জাতির পতনের পরে সামুদ জাতির কাছে আল্লাহ্ হযরত সালিহ (আ.)-কে পাঠালেন হেদায়েতের জন্য। তারা (অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ) ঈমান না এনে চাইল আল্লাহ্র ওহী পরখ করার জন্য মু'জিযা। এক উষ্ট্রী পাঠানো হলো তাদের কাছে মু'জিযা হিসেবে। কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশকে তাচ্ছিল্য করে তারা উষ্ট্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করলো; আর শেষে ওটিকে হত্যা করল। এরপর চরম ঔদ্ধত্য দেখিয়ে হযরত সালিহ (আ.)-কে তারা চ্যালেঞ্জ করল তাঁর উল্লিখিত আল্লাহ্র গযব আনতে। পরিণামে তারা ধ্বংস হলো ভূমিকম্পে। আল্লাহ্র

www.pathagar.com

দেয়া নিয়ামতের জন্য ... তাদেরকে বিশেষ করে স্থাপত্য সুবিধা ও প্রযুক্তি নিয়ামত দু'টি আল্লাহ্ দিয়েছিলেন ... শোকর গোযারী না হয়ে তারা হলো আল্লাহ্দ্রোহী। তাই তাদেরও দুনিয়াতে আল্লাহ্র গযবে পড়তে হলো। আখিরাতের শাস্তি তো আছেই।

২. ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ 'আদ' ও 'সামুদ' জাতিদ্বয় একই বংশোদ্ভুত। 'আদ' জাতির পতন হলো নবী হুদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহ্র হেদায়েত না মানার ফলে। এর পর 'সামুদ' জাতিকে আল্লাহ সমৃদ্ধি ও স্থাপত্য কৌশল দান করেন, আর দান করেন সুস্থাস্থ্য দৈহিক শক্তি ও দীর্ঘ জীবন। নবী সালিহ (আ.) তাদেরকে হেদায়েত করেন একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করতে, আর সৎ জীবন যাপন করতে। তাদেরকে আল্লাহ্ যে সব নিয়ামত দান করেছেন, সে সবের জন্য আল্লাহ্র শোকর করতেও তিনি তাদেরকে বললেন। কিন্তু তারা ঔদ্ধত্য দেখালো; আল্লাহ্র প্রেরিত নবীর হেদায়েত না মেনে মু'জিযা দেখাবার দাবী জানাল। সে মু'জিযার প্রতিও তারা কোন মনোযোগ ও বিবেচনা দেখালো না। আল্লাহ্র পাঠানো উষ্ট্রীকে হত্যা করল, নবীকে চ্যালেঞ্জ করল আল্লাহ্র গযব আনতে। পরিণামে আল্লাহ্র শাস্তি এলো। ধ্বংস হলো তারা।

৩. ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে অত্যুচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের প্রয়োজন থাকলে তা জায়েয। তবে এ মতের বিপরীত হাদীসও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে হযরত হাসান বসরী ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর এই হাদীসটির উল্লেখ করেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন বান্দার অকল্যাণ কামনা করেন, তখন সে তার সম্পদকে মাটি ও ইটে ধ্বংস করে দেয়।" বিভিন্ন মতের এ বিষয়ক হাদীস বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কিত।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতটি পূর্ববর্তী বহুসংখ্যক আয়াতের অনুবর্তন। ঐসব আয়াতে বিভিন্ন নবীর নযীর উল্লেখ করা হয়েছে। এরা আল্লাহ্র বাণী পৌছিয়ে দিয়েছেন নিজেদের জাতির কাছে। জাতি তা গ্রহণ করেনি, পরিণামে আল্লাহ্র গযব তাদের উপর পতিত হয়েছে। এ আয়াতেও ঐ রকম একটি নযীর উল্লেখ করা হয়েছে। এটি 'সামুদ' জাতির নযীর। নবী সালিহ (আ.)-এর হেদায়েত না মেনে তারা আল্লাহ্র নাফরমানী করল। ফলে ভূমিকম্পে ধ্বংস হলো তারা। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যক্ষত অর্থনৈতিক যে কটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) 'সামুদ' জাতিকে আল্লাহ্ আদ জাতির স্থলাভিষিক্ত করে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; (২) 'সামুদ' জাতি আল্লাহ্র দেয়া

www.pathagar.com

প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহার করে সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও দূর্গ নির্মাণ করেছিল। আর পাহাড় কেটে আরামপ্রদ আবাস তৈরী করেছিল, (৩) এতসব নিয়ামত দেওয়ার পর তাদেরকে নবী (আ.)-র মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঃ (ক) আল্লাহ্‌র নিয়ামত সমূহের কথা কৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করতে আর (খ) পৃথিবীতে অনাচার না করতে ও বিপর্যয় না ঘটাতে। (আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ অমান্য করে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল তারা। ফলে ধ্বংস নেমে এল তাদের উপর, এসব কথা পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে)।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে কোন জাতি পৃথিবীতে বা পৃথিবীর কোন অংশে প্রাধান্য লাভ করবে আর পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত উপভোগ করবে সে বিষয়ে যে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত কার্যকর হ'তে দেখা যায়, তার প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত শোকর গোযারীর সঙ্গে ভোগ করা হোক-এটা আল্লাহ্‌র বাঞ্ছিত। এটাও কুরআনে দেখা যায়। তা ছাড়া আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের ভিত্তিতে সমৃদ্ধি লাভ করে কোন জাতি পৃথিবীতে অনাচার বিপর্যয় সৃষ্টি করুক, এটা আল্লাহ্ কখনো চান না। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ তাঁরই সৃষ্ট নিয়ামত ব্যবহার করবে তাঁরই নির্দেশিত পদ্ধতিতে আর তা করে তাঁর ইবাদত করবে, এটাও আল্লাহ্ চান। এসব আল্লাহ্‌র বাঞ্ছিত বিষয়াবলীর ব্যতিক্রম হলে আল্লাহ্‌র সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় তাঁর অসন্তোষভাজন জাতি বা মানব গোষ্ঠির ধ্বংসের মাধ্যমে (বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলেও তুলনীয় অবস্থা সহজেই নজরে পড়ে)।

- ডঃ কে.টি. হোসাইন

প্রমাণপঞ্জি

১. রাগেব ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃষ্ঠা ২৪৫।

২. সানাউল্লাহ পানিপতী, তাফসীর মাযহারী, পারা ৮, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৭৬, ২য় সং, ১৯৬৭, দিল্লী।

৩. শাওকানী, তাফসীর ফাতহুল কাদীর, বৈরূত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৯-২০।

৪. কুরতুবী, তাফসীর আল জামি' লি-আহকামিল কুরআন, বৈরূত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯-৪০।

www.pathagar.com

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُه قَدْ جَائَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই; তোমাদের রব-এর নিকট হতে তোমার কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু থেকে কম দেবে না; এবং দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না। তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা মু'মিন হও। -সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৮৫

আয়াতে উল্লিখিত কয়েকটি শব্দের অর্থ

كيل শব্দটির অর্থ পরিমাপ করা যেমন كلة الطعام। আমি তাকে খাদ্য পরিমাপ করে দিলাম'। শব্দটি যখন কোন নির্দিষ্ট প্রচলিত মাপের ভাণ্ড বা পাত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়,তখন তাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থাকে, আর যে কোন লেনদেনের ব্যাপারেই এর প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়ে থাকে, যাতে কোন প্রকার কম-বেশী করা চলে না।

وزن কোন কিছুর পরিমাণ নির্দেশ করে। ব্যবহারিক অর্থে, ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দাড়িপাল্লার সাহায্যে ওজন করা। এ থেকেই ميزان শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ ওজনের যন্ত্র বা দাড়িপাল্লা, ওজন করার পাথর ইত্যাদি।

সাধারণ ব্যবহারে কোন ভাণ্ড দ্বারা পরিমাপ করাকে كيل এবং দাড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করাকে وزن বলা হয়।

www.pathagar.com

' بخس ' রাগেব ইসফাহানীর মতে এর অর্থ হলো জুলুম-অবিচার ও অন্যায়ভাবে জিনিস কম দেওয়া। আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপতীর মতে وزن এবং كيل এর পর بخس শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। লঘু-গুরু কম-বেশী ভাল-মন্দ, তুচ্ছ-অতুচ্ছ সকল প্রকার দ্রব্যের প্রাপ্য প্রদানে কম করা এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সামান্য কিছু প্রদানের সময় কিঞ্চিৎ কম দেওয়াও নিষিদ্ধ। আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ

بخس অর্থ প্রাপ্যে কম দেওয়া, যা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন বিক্রেতা পুরো দাম নিয়ে দূষিত দ্রব্য সরবরাহ করলো, ক্রেতা কম দাম দিয়ে উন্নততর দ্রব্য নিয়ে নিল কিংবা দামের মধ্যে একে অপরকে প্রতারিত করলো অথবা অপকৌশল অবলম্বন করে মাপে বা ওজনে কম-বেশী করলো ইত্যাদি। আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযীর মতে সকল ব্যাপারেই প্রাপ্যে কম দেওয়ার ব্যাপক অর্থে بخس শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

فساد অর্থ ফাসাদ, বিপর্যয়, গণ্ডগোল, অকল্যাণ ইত্যাদি। আল্লামা কুরতুবীর মতে فساد হলো এমন একটি ব্যাপকার্থক শব্দ, যা ছোট-বড় তুচ্ছ-অতুচ্ছ সব রকম বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী বলেন, একে অপরের প্রাপ্য ঠিকমত না দিলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, এখানে তাকে فساد বলা হয়েছে। আল্লামা রাযী আরো বলেন যে, কারো কারো মতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপর্যয়ই এ فساد এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতটির প্রেক্ষিত

আয়াতটির বক্তব্য এবং মুফাস্সিরগণের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আয়াতটি হযরত শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং তাদের প্রতি শু'আইব (আ.)-এর উপদেশ-নির্দেশ সংক্রান্ত বিষয়েই এই আয়াত নাযিল হয়েছে। সম্প্রদায়টি ছিল কাফির; কারো মতে তারা ছিল মুশরিক। তাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বিশেষ দিক এই ছিল যে, তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজনে কম দিত, পরস্পর পরস্পরের প্রাপ্য ঠিকমতো দিত না, একে অপরকে ঠকাতো, পথে-ঘাটে পথিকের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতো, রাস্তায় বসে পথ-চারীদের নিকট থেকে অবৈধভাবে ট্যাক্স ও শুল্কের নামে অর্থ কেড়ে নিতো ইত্যাদি। হযরত শু'আইব (আ.) নবী হিসেবে তাদেরকে প্রথমেই এক আল্লাহ্র ইবাদতের আহবান জানালেন। আর এরপরই তিনি তাদের জাতীয় চরিত্রের মারাত্মক দিকটি সংশোধনের দিকে নযর দিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা ওজনে কম দিও না, এবং প্রাপ্য প্রদানে ঘাটতি করো না।" ব্যাপকভাবে এ নির্দেশ উপরোল্লিখিত

www.pathagar.com

জাতীয় চরিত্রের সকল দিকই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ আচরণের অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের ইঙ্গিতও দিলেন।

শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কথা কুরআনে কিস্‌সা-কাহিনী বলার স্থলে উল্লিখিত হয়নি। বরং এ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে শিক্ষাদানই উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সকল ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে শরীয়ত বিরোধী আচরণ পরিহার করে জাতীয় বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা এ আয়াতে রয়েছে।

মুফাসসিরগণের সংশ্লিষ্ট বক্তব্য

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপতী ঃ আল্লামা পানিপতী বলেন, শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায় কাফির ছিল এবং তারা লেনদেনের ব্যাপারে মাপে ও ওজনে কম দিতে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিল। ... ... তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কর ... . তোমাদের নিকট বাইয়েনা (নবূয়তের মু'জিযাসহ প্রমাণ অথবা হিকমতপূর্ণ উপদেশ) এসে গেছে। ... ... সূতরাং তোমরা মাপ ও ওজনে কম দিও না। প্রাপ্য বস্তু সামগ্রীকে 'আম' (ব্যাপক) হিসেবে উল্লেখ করে বিষয়টির দিকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা বস্তুর লঘু-গুরু, কম-বেশী ভাল-মন্দ, তুচ্ছ-অতুচ্ছ নির্বিচারে ঢালাওভাবে সবকিছুতেই কম দেওয়া তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, আর এমন প্রথা তাদের ছোট বড় সবার মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। ... . মাপ ও ওজনে কম দেওয়া সাংঘাতিক রকম জুলুমের কাজ, জঘন্য অপরাধ। যদি এতে সাময়িকভাবে (ওজনে কম দানকারীর) কিছুটা লাভ অনুমিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় লোকের বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, এতে ক্ষণিকের জন্য কিঞ্চিৎ লাভ দেখা গেলেও ক্রেতা যখন জানতে পারবে যে, বিক্রেতা মাপে কম দিয়েছে বা ভালোর পরিবর্তে মন্দ জিনিস কিংবা খাঁটির পরিবর্তে ভেজাল সামগ্রী বিক্রয় করেছে,. তখন এই ক্রেতা তো নয়ই অপর কোন গ্রাহকই আর তার নিকট ভিড়বে না। এ ভাবে এমন বিক্রেতা ব্যবসার ক্ষেত্রে মার খাবে এবং স্থায়ী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ছাড়া পরলোকের ক্ষতি তো আছেই।.... সুতরাং এহেন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকাটাই কল্যাণকর।[১]

আল্লামা কুরতুবী ঃ আল্লামা কুরতুবী আয়াতটির মূল্যবান ব্যাখ্যা দান করেন (শব্দার্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বেই তার উল্লেখ করা হয়েছে)। এরপর ৮৬ নং আয়াতের প্রসঙ্গ টেনে এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-র বরাতে বলেন, মাদইয়ানবাসীরা রাস্তা-ঘাটে

www.pathagar.com

গোপনে বসে পথিকের মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নিতো এবং তাদের সর্বস্ব লুট করে নিতো। এসব কাজ করা তাদের মজ্জাগত স্বভাব ছিল।

এরপর আল্লামা কুরতুবী সুদ্দীর বরাতে বলেন, উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা রাস্তায় বসে পথচারীদের নিকট অবৈধভাবে কর ও শুল্কের নামে অর্থ কেড়ে নিতো। ওদের মতো আজকেও লুটের দলের পাঁয়তারা বিদ্যমান রয়েছে, যারা শরীয়তের অসমর্থিত পথে বিভিন্ন অজুহাতে জোর জবরদস্তি করে টাকা-কড়ি আদায় করে। এ ধরনের কাজ নিঃসন্দেহে বিরাট পাপ জঘন্য অপরাধ।[২]

সাইয়েদ কুতুব শহীদ ঃ শু'আইব বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই। দীনী দাওয়াতের এটাই নিয়ম যে, সবকিছুর পূর্বে তৌহিদের কথা বলতে হবে। এরপর অন্য কথা। ... . এরপর শু'আইব বললেন, তোমাদের নিকট 'বাইয়েনা' এসে গেছে। .... বাইয়েনার উপস্থিতি তাঁর নবুয়ত প্রমাণ করে এবং তদনুযায়ী তিনি তাদেরকে মাপ ও ওজনে পুরোপুরি দিতে নির্দেশ দেন, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন এবং রাহাজানি করতে নিষেধ করেন, আর মু'মিনদেরকে দীনের পথ থেকে বাধা দিতে নিষেধ করেন।[৩]

আল্লমা ফখরুদ্দিন রাযী ঃ তিনি বলেন, শু'আইব (আ.) নবীদের দাওয়াতের রীতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মানব গোষ্ঠী যে পাপাচারে সবচেয়ে বেশী অভ্যস্ত তারই বারণ প্রথম করলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে মাপ ও ওজনে কম দেওয়ার আচরণ থেকে বারণ করলেন। ... ... এরপর শু'আইব বললেন, মানুষকে কোন প্রাপ্যেই কম দিও না। একথা বলার তাৎপর্য এই যে, যেমন তোমরা মাপ ও ওজনে কম দেবে না, তেমনি অপরাপর সব ব্যাপারেই কম দেবে না। সব ব্যাপারেই এ নীতি মেনে চলবে। প্রাপ্যের কোন কিছুতেই কম করা যাবে না। অতএব ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, রাহাজানি, ভেজাল দেওয়া, বাহানা বা প্রতারণা দ্বারা মালামাল লুণ্ঠণ করা ইত্যাদি সবকিছুই এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

মালিকের সম্মতি ব্যতীত তার মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করার দরুন ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হয়, যার পরিণতিতে স্থায়ীভাবে অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রাপ্য কম দেওয়াতে বারণ করার পর অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণভাবেই বলা হয়েছে যে, "ফাসাদ সৃষ্টি করো না।" মতান্তরে, 'ফাসাদ' শব্দটি 'আম (ব্যাপক) ধরে সব রকম ফাসাদ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপর্যয়কে বোঝানো হয়েছে।[৪]

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনসহ মানব জীবনের অন্যান্য দিকের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। আর তা হলো এই যে, জীবনের চলার পথে একের নিকট অন্যের যা প্রাপ্য তা পুরোপুরি আদায় করতে হবে। এতে কম দেওয়া যাবে না। যদি কম করা হয়, তবেই বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

দৈনন্দিন জীবনের আদান-প্রদানে যদি প্রাপ্য জিনিস ঠিকমত দেওয়া না হয়, তাহলে বিপর্যয় দেখা দেয়। যেমন কেউ যদি অন্যের পাওনা টাকা না দেয় তবে মনোমালিন্য ঝগড়া এমনকি বংশানুক্রমিক মারা-মারি কাটাকাটি সৃষ্টি হয়ে যায়। সামাজিক জীবনে একের নিকট অন্য লোকের যেমন আচরণ প্রাপ্য, সেরূপ আচরণ না করলেই রেষারেষি থেকে দলাদলি এবং এ দলাদলি থেকে নানা ধরনের ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সুতরাং ন্যায়ভিত্তিক এবং শান্তি ও কল্যাণকামী ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাবী হলো এই যে, সকল ব্যাপারেই প্রাপ্য ঠিকমতো আদায় করতে হবে।

বিশেষ করে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রাপকের প্রাপ্য সঠিকভাবে প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আলোচ্য আয়াতটিতে প্রথমেই মাপে ও ওজনে কম না দেওয়ার কথা বলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ মূলনীতি পালনের প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। এরপর সকল প্রাপ্যের বেলায় এ মূলনীতি অনুসরণ করার সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশেষ কয়েকটি দিক প্রসঙ্গে এর তাৎপর্য এখানে আলোচনা করছি।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে দু'টি পক্ষ থাকে-ক্রেতা ও বিক্রেতা। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার উচিত বিক্রেতাকে তার প্রকৃত প্রাপ্য প্রদান করা। আর বিক্রেতার উচিত ক্রেতাকে তার প্রাপ্য সামগ্রী ঠিকমত প্রদান করা। কারো জন্য অপরের প্রাপ্যে কম করা ঠিক হবে না। বিক্রেতা ক্রেতার প্রাপ্যে বিভিন্নভাবে কম করতে পারে; যেমন (১) চালাকী করে বিক্রিত দ্রব্য ওজনে কম দেওয়া; (২) যে মানের দ্রব্য দেওয়ার চুক্তি হয়েছে, তার চেয়ে নিম্নমানের দ্রব্য দেওয়া; (৩) বিক্রিত দ্রব্য যে সময় ও স্থানে সরবরাহ করার কথা, সে সময় বা স্থানে সরবরাহ না করা। দেশের অভ্যন্তরে বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রেই এ মূলনীতি প্রযোজ্য। ইসলামের এ মূলনীতির অনুশীলন যদি না করা হয়, তা হলে কুরআনের হুশিয়ারী অনুযায়ী ফাসাদ সৃষ্টি হবে। অন্যের প্রাপ্য অপহরণের দায়ে

www.pathagar.com

আখিরাতে তো বিপর্যয় আসবেই, দুনিয়াতেও এর কুফল দেখা দেবে মারাত্মকভাবে। দুনিয়ার কুফল বিভিন্ন প্রকার হতে পারে; যেমন ঃ (১) এতে ক্রেতা সাধারণের ভোগান্তি বৃদ্ধি পাবে, (২) গোটা কয়েক ব্যবসায়ী অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ হরণ দ্বারা পুঁজিপতি হয়ে উঠবে এবং এতে করে সম্পদ বন্টনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে, অপরের সম্পদ অপহরণ করে নিজ ভাগ্য অন্যায়ভাবে গড়ে তুলেও যখন জনগণ নিজ প্রাপ্য ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন দেশে যে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তা সর্বজনবিদিত।

অপরদিকে জনগণ যদি সরকারকে তার ন্যায্য প্রাপ্য না দেয়, তা হলেও নানা ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আয়কর ফাঁকি দেওয়া, আমদানী কর ও রপ্তানী কর ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি আচরণ সরকারকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে এবং এতে করে কর অর্পণের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়ে।*

এখানে ঠিকাদারী প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। ঠিকাদাররা নির্দিষ্ট পরিমাণ ও গুণের সেবা বা সামগ্রী নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু অনেক সময় তাঁরা এ চুক্তি পালনে ফাঁকি দেয় এবং চুক্তি অনুযায়ী যা প্রদেয়, তা দেয় না। বিশেষ করে অধিকাংশ সরকারী কাজ, যেমন রাস্তাঘাট, দালান-কোঠা, ইত্যাদি ঠিকাদারীর চুক্তির মাধ্যমে দেওয়া হয়। সরকারের সকল প্রকার উন্নয়ন ব্যয় বা কর্মসূচী সাধারণত ঠিকাদারীর মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে ঠিকাদার যদি চুক্তি অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন না করে, তা হলে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচী বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এ প্রসঙ্গে মুসলিম উম্মার কথাও বলা যায়। মুসলিম উম্মা এক জাতি। এখানে অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ -এতসবের কোন বালাই নেই। আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাকে যে প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন, তা কারো একার পক্ষে কুক্ষিগত করে রাখা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোচ্য নীতির পরিপন্থী। কোন মুসলিম রাষ্ট্র অত্যন্ত সম্পদশালী থাকবে এবং প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র গরীব হওয়ায় তার জনগণ ভুখা-নাঙ্গা আশ্রয়হীন অবস্থায় কষ্ট পাবে -ইসলাম তা সমর্থন করে বলে মনে হয় না। আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল সম্পদে তাদেরও অধিকার আছে, প্রাপ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, এবং (৩) সর্বোপরি স্বয়ং ব্যবসায়ীই দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতি গ্রস্ত হবে, কারণ বিক্রেতার অসদাচরণ সম্পর্কে

* যেমন, বাংলাদেশে ভি.সি.আর এর-ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য উচ্চহারে আমদানী কর বসানো হয়েছে। কিন্তু ঘুষের মাধ্যমে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে প্রচুর ভি.সি.আর. দেশে আসছে। সরকারের এ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু থাকায় উক্ত মারাত্মক দ্রব্যটির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ফলে ইসলামী সংস্কৃতির অবক্ষয় হচ্ছে।

www.pathagar.com

ক্রেতাগণ যখন অবহিত হবে, তখন ব্যবসায়ের সুনাম (good will) নষ্ট হবে, যা পুরো ব্যবসাতেই বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। এ সুনাম (good will) ব্যবসায়ের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (asset) ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট হওয়ার দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর চাহিদা রেখা বাঁদিকে স্থানান্তরিত (shift) হবে, ফলে ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শিল্পক্ষেত্রেও (Industries) প্রাপ্য সঠিকভাবে প্রদানের ইসলামী নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। শিল্পের বিভিন্ন দিকের মধ্যে শুধু শ্রমের প্রাপ্য সম্পর্কেই এখানে আলোচনা করা যাক। একথা প্রায় সর্বজনবিদিত যে, শ্রমিককে তার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়ার জন্য মহানবী (স.) অত্যন্ত তাকীদ করেছেন। কুরআনের আলোচ্য আয়াত মতেও শ্রমিককে তার প্রাপ্য ঠিকভাবে দিতে হবে। শ্রমিককে কম দিয়ে অর্থাৎ শ্রমিক শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা যাবে না। এতে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত কুফল এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, ধর্মঘট, লে আউট ইত্যাকার বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। ইসলামের মূলনীতিটি চালু না থাকায় পুঁজিবাদী শিল্পজগতে এসব বিপর্যয় আজ নিত্য দিনের ঘটনা।

'মুশারাকা' ও 'মুদারাবা' ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য আলোচ্য ইসলামী মূলনীতি অবশ্য কর্তব্য। শিল্প বা ব্যবসায়ে যে মুনাফা হয়, উদ্যোক্তা যদি তা গোপন করে এবং ইসলামী ব্যাংককে তার যথার্থ প্রাপ্য না দেয়, তাহলে 'মুশারাকা' ও মুদারাবা'র ভিত্তিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হওয়া সুকঠিন ব্যাপার। আর সে ব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা হলে সুদভিত্তিক অর্থনীতির সকল ফাসাদ ও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

সরকার ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং আদান- প্রদানেও এ মূলনীতির তাৎপর্য অপরিসীম। সরকার যদি জনগণের উপর তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ট্যাক্স বসায় এবং জনগণের যা প্রাপ্য তাতে কম দেয়, তখনই দেশে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও আন্দোলন। প্রাপকের প্রাপ্য যদি প্রাপককে না দেওয়া হয় বা কম দেওয়া হয়, তবে মুসলিম উম্মাহ্ সার্বিকভাবে বিপর্যয়গ্রস্ত হবে। গরীব মুসলিম দেশগুলো শতধা সমস্যার সম্মুখীন হবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অমুসলিম শক্তির পদানত হবে। ফলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে। মুসলিম উম্মাহ্ একটি দেহের মতো; দেহের অধিকাংশ এমনকি একটি অঙ্গে ব্যথা থাকলেও গোটা দেহে শান্তি বিরাজ করতে পারে না।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনে ন্যায়নীতি মোতাবেক প্রাপককে তার প্রাপ্য যথাযথভাবে প্রদান করা ঈমানের দাবী। ঈমানের এ দাবী যদি পূরণ করা হয়, তবেই ইসলামের প্রতিশ্রুত শান্তি আসতে পারে। এ মূলনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে শান্তির আশা সুদূরপরাহত ও মানব কল্যাণ বিধান করা সুকঠিন। এ জন্যই আলোচ্য আয়াতটির শেষ অংশে বলা হয়েছেঃ "এটাই (অর্থাৎ এ নীতির বাস্তবায়ন) তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা মু'মিন হও।"

- ডঃ এ. এইচ. এম. সাদেক

প্রমাণপঞ্জি

১. সানাউল্লাহ পানিপতী, তফসীরে মাযহারী, নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, দিল্লী।

২. আল্লামা কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, দারুইহইয়া ইতুরামিল, আরবী বৈরূত, লেবানন।

৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী-যিলালিল কুরআন, দারুশ শুরুফ, কায়রো।

৪. ফখরুদ্দিন রাযী, তফসীরে কবীর, দারুল কিতাবিল, ইলমিরাহ, তেহরান।

www.pathagar.com

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ - فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ.

তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং উহা হতে তাঁর অনুরূপ প্রকৃতির সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাতে তাঁর নিকট সে শান্তি পায়। অতঃপর যখন তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় তখন তার অজান্তে সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে অনায়াসে চলাফেরা করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাঁরা উভয়ে তাঁদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে, 'ইয়া আল্লাহ্ আমাদের পূর্ণাঙ্গ (সুন্দর স্বাস্থ্যবান সৎ) সন্তান দাও, যাতে করে আমরা কৃতজ্ঞ থাকি।"– **- সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮৯**

সংক্ষিপ্ত নোট

এই পবিত্র আয়াতে মানবকুলের আদি জননী বিবি হাওয়ার সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মানুষের সাধারণ জন্ম প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধিকাংশ তাফসীরকারের মত হচ্ছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আ.)-এর জন্য তাঁর পত্নী হাওয়াকে তদীয় বাম পঞ্জরাস্থি হতে সৃষ্টি করেছেন। তাওরাত এবং একাধিক হাদীসেও এ মত সমর্থিত হয়। মিশকাত শরীফের একটি হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, পুরুষের বক্র পঞ্জরাস্থি হতে সৃষ্টি বলে নারীর প্রকৃতি স্বভাবতই একটু বক্র। বক্র অস্থিকে বেশী সোজা করতে গেলে তা যেমন ভেঙ্গে যায়, নারী জাতিকেও তেমনি অতিরিক্ত সোজা করতে গেলে তার পক্ষে ভেঙ্গে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

কিন্তু কোন কোন তাফসীরকার উপরোক্ত হাদীসসমূহের মর্মার্থ অন্যরূপ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আলোচ্য আয়াত এবং হাদীসসমূহের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলা আদি মাতা হাওয়াকে হযরত আদম (আ.)-এর 'অনুগত পার্শ্বচারিকা সহধর্মিনী' বা 'নিকটতম সমজাতীয় সঙ্গিনী' রূপে সৃষ্টি করেছেন। পঞ্জর বা পঞ্জরাস্থি হতে সৃষ্টি করার প্রকৃত তৎপর্য তাই। 'বাম পঞ্জর' নির্দেশ করায় স্ত্রী-জাতির পক্ষে পুরুষের নিকটবর্তিতার সাথে তাঁদের অনুগত বা অধীনতার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে (তফসীরে কবীর এবং মাওলানা আযাদ)। 'ইয়াসকুনা ইলাইহা'......'ইয়াসকুনা ' 'সকন' হতে নিষ্পন্ন। 'সকন' অর্থ অবস্থান লেখা হয়েছে। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ স্থৈর্য, ধীরতা অথবা অচলতা। মানসিক শান্তি, আকাঙ্খা, অনুরাগ বা আকর্ষণীয় ভাবটি এর দ্বারা পরিব্যক্ত হয়। এ জন্য ইয়াসকুনা ইলাইহা অর্থে কেউ 'তাহাতে অনুরক্ত' কেউ, 'তার দিকে আকৃষ্ট' আবার কেউবা 'তার প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া' নির্দেশ করেছেন অর্থাৎ পুরুষের স্ত্রীর সাথে অবস্থান করা অথবা স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও আকর্ষণ সঞ্চার হওয়াই উক্ত বাক্যাংশের প্রকৃত মর্মার্থ। সুতরাং স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার ভাবটিও এ দ্বারা অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হয়েছে।

নারী-পুরুষের এ স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি ও মিলন মানব সমাজকে একটা সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রেখেছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা অতি সুরুচিসম্পন্ন ভাষায় স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলন ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ গর্ভ সঞ্চারের ও নরনারীর স্বাভাবিক সন্তান কামনার কথা বর্ণনা করেছেন। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক মিলনের ফসল হচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং নারী পুরুষ অন্তর থেকে কামনা করে তাদের সে সন্তান হোক দেহ মান মেধার দিক থেকে সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং নিখুঁত, যেন জীবন সংগ্রামে সে বিজয়ী হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্র দেয়া সব নিয়ামতের অধিকারী হতে পারে। সন্তানের জন্ম না হোক-এটা নর-নারীর স্বাভাবিক কামনা নয়। এজন্য নারী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র কাছে মনোবাসনা নিবেদন করে যে, যদি আল্লাহ্ তাদেরকে দয়া করে সুসন্তান দান করেন, তাহলে তারা আল্লাহ্র কাছে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ীই শুধু তারই ইবাদত করবে।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের বিষয়ে যে মৌলিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তাই মানব-সমাজের সঠিক ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। এক জোড়া নারী-পুরুষ যখন আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের জীবন সাথীরূপে একই 'সংসারে' বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তাদের পরস্পরের উপর

www.pathagar.com

কতগুলি বুনিয়াদী দায়িত্ব এসে পড়ে। মানব জাতির আবহমানকালের সামাজিক ধারায় সাধারণভাবে পুরুষই ঘরের বাইরের সব কাজকর্ম সমাধা করে, রুটি রুজি উপার্জন করে। স্রষ্টা তার দেহের গঠন আকৃতি-প্রকৃতি এমনভাবে করেছেন, যাতে সে কঠোর পরিশ্রম ও কঠিন কাজের যোগ্য হতে পারে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ঘর সংসারের কর্তৃত্ব নেতৃত্ব তার উপরই বর্তায়।

অপরদিকে নারীদেহের আকৃতি-প্রকৃতি করা হয়েছে এমনভাবে কোমল ও কমনীয় যে, সাধারণভাবে ঘরের বাইরের রোদ বৃষ্টি ঝরা কঠিন কাজ তার প্রকৃতির সাথে খাপ খায় না। তাই বলে তার কাজও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঘরকে রক্ষা করা, ঘরের শান্তি-শৃঙ্খলার বিধান করা, পুরুষের অর্জিত রুজি ঘরের সবার মধ্যে সুচারুরূপে বন্টন করা এবং সর্বোপরি দিবসের কর্মক্লান্ত স্বামীকে আদর-যত্ন-ভালবাসা দিয়ে তার ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর করে দেওয়া তার প্রধান কর্তব্য। স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক কর্ম বন্টনে পরস্পরের মধ্যে আসে এক গভীর প্রশান্তির উপলব্ধি। কারণ, নারীই শুধু এক তরফা-ভাবেই পুরুষের সেবা-শুশ্রুষা করে যায় না। প্রতিদানে সেও স্বামীর কাছ থেকে পায় প্রেম-প্রীতি ও প্রশংসা। তাই একদিকে স্বামী যেমন স্ত্রীর মিলন মাধুর্যে তার ক্লান্তি শ্রান্তি দূর করে কর্মক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, স্ত্রীও তেমনি স্বামী সাহচর্যে আনন্দিত হয়ে ঘরের কাজে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করে। ফলে এরূপ একটি পরিবারের সার্বিক কর্মদক্ষতা বেড়ে যায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তির উপর তার কর্মদক্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই শান্তিপূর্ণ একটি পরিবারের পুরুষ ও নারীর উভয়েরই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কর্মদক্ষতাবৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে, ঐ পরিবারের কাজের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। আর শান্তিপূর্ণ পরিবারের সমষ্টি নিয়ে যে সমাজ গড়ে উঠবে সে সমাজেও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিকভাবে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে ঐ সমাজের অভাব-অনটন দূর হবে। আর শান্তিপূর্ণ পরিবারের সমষ্টি নিয়ে যে সমাজ গড়ে উঠবে, সে সমাজ হবে শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ সামাজিক শৃঙ্খলা ও মানুষের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির আর একটি প্রধান শর্ত। অশান্তিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল সমাজে মানুষের কর্মদক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমান পারিবারিক বন্ধনবিহীন পশ্চিমী সভ্যতায় এ সত্যের উপলব্ধির দিক প্রকট হয়ে উঠছে। সে সমাজের লোকদের কর্মদক্ষতা এখন বাড়ছে না বরং ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। তাই তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে এক মন্দাভাব দেখা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

এ আয়াতের আর একটি কথা হল নর-নারীর পূর্ণাঙ্গ সু-সন্তান কামনা। পূর্ণাঙ্গ সু-সন্তানই কর্মক্ষম এবং দুনিয়ার এবং দুনিয়ায় আর্থ-সামাজিক কাজকর্মের জন্য যোগ্য হয়। তারাই তাদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা দ্বারা জমিনের বুকে, জলে-স্থলে, পাহাড়ে-জংগলে, সাগরে-মহাসাগরে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সম্পদ আহরণ করে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবদের জীবন ধারণের কাজে লাগাতে পারে। দেখা যায় এ পৃথিবীতে যতই মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে নতুন নতুন দ্রব্য-সম্ভার মূল্যবান ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী ও কলাকৌশল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। তাই আর্থসামাজিক দৃষ্টিতে মানুষের স্বাভাবিক বংশ বৃদ্ধি মানুষের স্থায়িত্ব ও সার্বিক উন্নতির জন্যই কাম্য হওয়া উচিত এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- নূর মোহাম্মদ আকন

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-আনফাল

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

হে নবী ! তোমার নিকট গনীমতের মাল সম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে। বল ঃ এই গনীমতের মাল তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিক ও সংশোধিত কর। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। -সূরা আন্ফাল ঃ ১

একটি শব্দের ব্যাখ্যা

(ক) আন্ফাল (انفال) বহু বচনের শব্দ, এক বচনে 'নাফলুন' (نفل) বা নাফালুন (نفل) ইমাম রাগেব লিখেছেন ঃ মূলত এই শব্দটির সুনির্দিষ্ট অর্থ 'গনীমত'। কিন্তু শব্দটির প্রয়োগ ক্ষেত্রের পার্থক্যের কারণে অর্থের তারতম্য হয়ে যায়। যখন বিজয় লাভের ফলশ্রুতি প্রসঙ্গে এই শব্দটির ব্যবহার হবে তখন তার অর্থে যুদ্ধ জয়ের পরে শত্রুর নিকট থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় সম্পদ সামগ্রী বোঝাবে। আর যখন আল্লাহ্র নিকট থেকে বাধ্যতামূলক হিসেবে নয়, অবাধ্যতামূলকভাবে দান বোঝাবে, তখন তাকে বলা হয় 'নাফাল' (نفل)। অনেকে এ দু'টির ব্যবহারের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে পার্থক্য করেছেন। বলেছেন, গনীমত হচ্ছে তা, যা কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করার পর পাওয়া যায় কিংবা তার ব্যতিরেকেই, অধিকার হিসেবে পাওয়া যায়। কিংবা বিনা অধিকারে বিজয়ের পূর্বে পাওয়া যায়, অথবা বিজয়ের পর।

www.pathagar.com

মোট গনীমতের মাল থেকে বন্টন করার পূর্বে মানুষ যা পায় তা 'নাফাল'। যুদ্ধ ছাড়াই শত্রু পক্ষের নিকট থেকে মুসলমানেরা যা পায়, তাকে বলা হয় 'ফাই' (فيء)। অপর মত হচ্ছে গনীমত বন্টনের পর যে সব সামগ্রী আলাদা করে রাখা হয়, তা-ই 'নাফাল'। আলোচ্য আয়াতে তারই বহু বচন (انفال) ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার অর্থ তা-ই।

মূলত 'নাফাল' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত, বাড়তি-মূল কর্তব্যের উপর। কুরআনের ভাষায় অন্যত্র এই পর্যায়ের ইবাদতকে বলা হয়েছে 'নাফিলাতুন' (نافلة)। যুদ্ধে কোন শত্রুর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির মাল-সামান দিয়ে দেওয়াকেও 'নাফাল' বলে।[১]

(খ) আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন ঃ 'নাফাল' অর্থ মূল কর্তব্যের উপর ইচ্ছাকৃত যা অতিরিক্ত তাই। সন্তানের সন্তানকেও নাফাল বলা হয়, কেননা সে সন্তানের উপর বাড়তি অতিরিক্ত। গনীমত-ও বাড়তি ধনমাল, যা আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাতের জন্য হালাল করেছেন (যা অন্যদের জন্য হারাম ছিল), তার উপর বাড়তিভাবে যা হালাল করা হয়েছে সেটা।[২]

আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত

আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী লিখেছেন ঃ বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত 'গনীমতের' মাল সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। যুদ্ধশেষে প্রাপ্ত গনীমত পাওয়ার অধিকার নিয়ে যুদ্ধকারীদের মধ্যে মতপার্থক্য ও কিছু বাগ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আবূ দাউদ, নাসায়ী, গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী করীম (স.) যুদ্ধের পূর্বে বলেছিলেন ঃ যে যোদ্ধা শত্রু পক্ষের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে এই পাবে, যে কাউকে বন্দী করবে, সে এই এই পাবে। আর বৃদ্ধ বয়সের লোকদেরকে বলেছিলেন, তাঁরা যেন ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হয়ে থাকেন। আর যুবকদের বলেছিলেন ঃ তোমরা শত্রু নিধনে ঝাপিয়ে পড়। গণীমতের মাল সংগ্রহেও মনোযোগ দিও।

যুদ্ধশেষে বৃদ্ধরা যুবকদের বললেন ঃ আমরা তো তোমাদের ঢাল ছিলাম। তোমাদের কারো কিছু হলে তোমরা আমাদের নিকট এসে অবশ্যই আশ্রয় নিতে। এ ভাবে 'গনীমতের' মাল নিয়ে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হন মুজাহিদগণ। পরে নবী করীম (স.)-এর নিকট এ বিষয়ে মীমাংসা চাওয়া হয়। আর তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ হে নবী! তোমার নিকট লোকেরা 'গনীমতের' মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। তুমি বলে দাও, 'গনীমতের' মাল আল্লাহ্ এবং রাসূলের জন্য। ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ঃ হযরত সায়াদ ইব্ন আবু

আক্কাস (রা.) সায়ীদ ইবনুল আস নামের কাফিরদের পক্ষের এক ব্যক্তিকে তার তরবারিখানি নিয়েছিলেন এবং নবী করীম (স.)-এর নিকট সেটি দান হিসেবে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। উদ্ধৃত আয়াত সেই বিষয়ে মীমাংসার জন্য নাযিল হয়। তখন তিনি তরবারিটি তাঁকে দিয়ে দিলেন। কেননা আয়াতটিতে তা করার পূর্ণ অধিকার তাঁকেই দেওয়া হয়েছে।[৩]

তাফসীর লেখকগণের আলোচনা

১. আল্লামা কুরতুবী উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ হযরত উবাদাত ইবনুস্ সামেত (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স.) বদর যুদ্ধের জন্য সাহাবা পরিবেষ্টিত হয়ে বের হয়ে গেলেন। শত্রুদের বাহিনীর সহিত মুকাবিলা করলেন। তাতে শত্রু বাহিনী পরাজিত হল। তখন মুসলমানদের একটি বাহিনী তাদের পিছনে ধাওয়া করল, তাদের হত্যা করল। অপর লোকেরা রাসূলে করীম (স.)-কে পরিবেষ্টিত করে রাখলো। শেষ পর্যন্ত তারা শত্রু বাহিনীর উপর বিজয়ী হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহে লিপ্ত হয়। শত্রু-নিধন পরিসমাপ্ত হলে এবং আল্লাহ্ তাদের নির্মূল করে দিলে সেই লোকেরা দাবী করল ঃ নফল গনীমত কেবল আমরাই পাব। কেননা আমরাই শত্রু নিধনে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছি। আল্লাহ্ আমাদের দ্বারাই শত্রুকে পরাজিত করেছেন। শত্রু পক্ষের সহিত আমরাই মুকাবিলা করেছি, যুদ্ধ আমরাই করেছি। আমরাই তাদেরকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছি। যাঁরা রাসূলে করীম (স.)-কে বেষ্টন করে ছিলেন, তাঁরা বললেন' গনীমত' পাওয়ার ব্যাপারে আমরাই বেশী অধিকারী, তোমরা নও। বরং 'গনীমত' কেবল আমরাই পাব। এই সময় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। পরে নবী করীম (স.) অনতিবিলম্বে প্রাপ্ত 'গনীমতের' মাল সকলের মধ্যে বন্টন করে দেন।

এ আয়াতটি প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়। এ সম্পর্কে পরে নাযিল হয় ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَالِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ –

তোমরা জেনে রাখবে, তোমরা যে, 'গনীমতের' মাল লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট।[৪] - সূরা আন্‌ফালঃ ৪১

আলিমগণের মত হ'ল 'গনীমতের' মাল আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য অর্থ, সে বিষয়ে ফয়সালা করারও হুকুম দেওয়ার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রয়েছে, আর তাঁর পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে এই অধিকার তাঁর রাসূলের। সে পর্যায়ে আমল করতে হবে এমন ভাবে, যেন তা মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়।

হযরত উবাদাতা ইবনুস্ সামেত বলেছেন ঃ আয়াতটি আমাদের বদর যুদ্ধের সঙ্গে-সাথীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে যখন আমরা 'গনীমত' সম্পর্কে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলাম এবং তখন সে ক্ষেত্রে আমাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ্ সে জিনিস আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এর সম্পূর্ণ ইখ্‌তিয়ার রাসূল (স.)-কে দিলেন। তখন তিনি তা সকলের মধ্যে সমান সমান বন্টন করেন। ফলে এ কাজে আল্লাহ্‌র ভয় ও রাসূলের আনুগত্য কার্যকর হল এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধিত ও প্রীতিপূর্ণ হয়ে গেল।[৪]

২. আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী লিখেছেন ঃ উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ হে নবী! লোকদের বল যে, 'গনীমত' কেবল আল্লাহ্‌র জন্য, তিনিই সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দেওয়ার অধিকারী আর রাসূলের করণীয়, আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী তা বন্টন করা। তিনি তাই করেছেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র কথা হ'ল গনীমতের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ন্যস্ত। পরে ৪১ নং আয়াতে 'গনীমতের' বন্টন খাত ও বন্টন পদ্ধতি বলা হয়েছে। ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার রয়েছে, তা থেকে 'খুমুস' এক-পঞ্চমাংশ বের করার পূর্বে যাকে যা বা যত পরিমাণ ইচ্ছা দিয়ে দিতে পারে। হযরত সায়ীদ ইবনুল আ'স (রা.) তাঁর নিহত ব্যক্তির তরবারি চাইলে রাসূলে করীম (স.) বলেছিলেন ঃ ليس هذا لى ولك না, এটা আমার নয়, নয় তোমারও। বললেন-এই সময় আমার মনের অবস্থা যে কি ছিল, তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর রাসূলে করীম (স.) বললেন ঃ হে সায়াদ! তুমি যে তরবারিটি নিতে চেয়েছিলে, তখন সেটি আমার ছিল না, তোমাকে দিয়ে দেওয়ার অধিকারও আমার ছিল না। অত্র আয়াতে আমাকে তা বন্টনের ভার দেওয়া হয়েছে। এখন আমি সেটি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি। অতএব, আমি তোমাকে সেটি দিচ্ছি, তুমি সেটি গ্রহণ কর।[৫]

৩. মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ আলোচ্য ভাষণের শুরুতে 'গনীমত'কে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র পুরস্কার এবং এই বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণের ইখতিয়ার আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পর ৪১ নম্বর আয়াতে সেই ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। সে ফয়সালা এই যে, যুদ্ধের পর সব সৈন্যই ভিন্ন রকমের 'গনীমতে'র সকল মাল-সামান ইমাম বা সেনাধ্যক্ষের সামনে উপস্থিত করবে, কোন একটি জিনিসও কেউ লুকাবে না, গোপন

www.pathagar.com

করবে না। তারপর এই মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ বর্ণিত খাতসমূহ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম মিস্‌কীন ও নিঃস্ব পথিক-এর জন্য আলাদা করে নেবে। অবশিষ্টের চার-পঞ্চমাংশ শরীফ সকল লোকের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। এই কারণে সব যুদ্ধের পরই রাসূল (স.) ঘোষণা করতেন, এই গনীমতের মাল তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট। এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত তাতে আমার ব্যক্তিগত কোন অংশ নেই। আর সেই এক-পঞ্চমাংশও তোমাদেরই সামাজিক ও সামগ্রীক কল্যাণের কাজে ব্যয় করা হবে। কাজেই এক-একটি সূচ এক-একটি সূতাও এনে জমা করে দেবে। কোন ক্ষুদ্র কিংবা বড় জিনিসও লুকিয়ে রাখবে না। তা লুকানো বড়ই লজ্জাকর এবং তার পরিণাম জাহান্নাম।

এই বন্টনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অংশ মাত্র একটি। সে অংশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'গনীমতে'র মাল থেকে একটি অংশ আল্লাহ্‌র দীন ও কালেমা প্রচার ও তার প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করা।

আয়াতে 'যিলকুরবা' 'আত্মীয়-স্বজন' বলতে বোঝায়, যারা রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁর আত্মীয় ছিলেন তাঁদেরকে। কেননা রাসূলে করীম (স.) সব সময় দীনের কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতেন। নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থোপার্জনের কোন কাজ করার সময় পেতেন না। অথচ সকলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হত। এই কারণে 'গনীমতে'র এক-পঞ্চমাংশ তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়েছিল। তবে তাঁর ইন্তেকালের পর এই এক-পঞ্চমাংশ কাকে দেওয়া হবে, তা নিয়ে ফিকহ্‌বিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। অনেক ফিকহবিদের মতে রাসূলের ইন্তেকালের পর সে অংশটি ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের খলীফাতুল মুসলিমীন-এর নিকটাত্মীয়রা পাবে। তৃতীয় একদলের মত হচ্ছে, তা চিরদিন নবী-পরিবারের বংশধরদের মধ্যের গরীব লোকদের মাঝে বন্টন করা হবে। খিলাফতের রাশেদার সময়ে এই তৃতীয় মত অনুযায়ী কাজ হয়েছে।[৬]

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

ইসলামী অর্থ দর্শনের মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ই সমগ্র বিশ্বলোকের একমাত্র স্রষ্টা। অতএব তিনিই সব কিছুর মৌলিক ও নিরংকুশ মালিক। মানুষের হাতে ধন-মালের যে অংশই এবং যখনই যে কোনভাবে আসুক, তারও প্রকৃত মালিক একমাত্র তিনিই। মানুষ শুধু তাঁর খলীফা হিসেবে সে সবের আমানতদার মাত্র।

'আল-কুরআনের অর্থনীতিতে 'গনীমতের' গুরুত্ব রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। অর্থনীতির দৃষ্টিতে 'গনীমতে'র সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

الغنيمة شرعا كل مال متقول وصل الى المسلمين من المشركين والكفار بطريق اقهر والغلبة

শরীয়তের দৃষ্টিতে গনীমত হচ্ছে সেইসব স্থাবর ধন-মাল, যা হস্তান্তর যোগ্য, যা মুশরিক কাফিরদের হাত থেকে শক্তি প্রয়োগ ও বিজয় লাভের মাধ্যমে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে।

এর শরীয়তী ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্বে মুসলিমগণ 'গনীমতে'র সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাঁরা যখন মদীনায় হিজরত করে গেলেন, তাদের দীনী দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়ে গেল, মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম কেন্দ্র বা রাজধানীরূপে নির্দিষ্ট হ'ল, মুসলিমগণ এক স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন স্বাধীন বিমুক্ত সমাজ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন, তাঁদের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠলো এবং তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট ও প্রতিভাত হল তখন ইসলামী রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠলো। তখন ইহুদী কুরায়শদের সহিত তাঁদের সশস্ত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতে শুরু হল। তাতে মুসলমানদের বিজয় ও কাফিরদের ধন-মাল হস্তগত হতে লাগল। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম 'গনীমত' মুসলমানদের হস্তগত হয় আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ-এর বাহিনীর দ্বারা। পরে বদর যুদ্ধে বিপুল পরিমাণের 'গনীমত' পাওয়া যায়। সূরা আল-আনফাল-এর প্রথম আয়াতটিতে সে দিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, তা একমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূলের কর্তৃত্বাধীন ব্যাপার। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ 'আনফাল' বলতে গনীমত বুঝিয়েছে। তা খালেস ভাবে রাসূলের ব্যাপার। অন্য কারোর তাতে কিছুই নেই। পরে এই সূরা ৪১ আয়াতে (উপরে উদ্ধৃত) তার বন্টন রীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে এক-পশ্চমাংশ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করার পর অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ 'গনীমত' লাভকারীদের মধ্যে বন্টনের কথা বলা হয়েছে। আর এই হচ্ছে 'গনীমতে'র ভিত্তি। অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী 'গনীমত' গ্রহণ ও যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা সম্পূর্ণ জায়েয।

গনীমতের প্রকার বিভক্তি

ফিকহ্‌বিদগণ গনীমতকে চার পর্যায়ে ভাগ করেছেন ঃ কাফিরদের পুরুষ বন্দী, নারী বন্দী, জমি-ক্ষেত ও স্থাবর ধন-মাল! অবশ্য অনেক ফিকহ্‌বিদ দখলকৃত জমি ক্ষেতকে গনীমতের পর্যায়ের বাইরে গণ্য করেছেন এবং জমি ক্ষেতের জন্য ভিন্নতর ও বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছেন সে অধিকৃত জমি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা

www.pathagar.com

ফসলকে পরিভাষায় নাম দেওয়া হয়েছে 'খারাজ'। আর এ স্থাবর সম্পদকেই প্রকৃত 'গনীমত' বলা হয়েছে। তাতে জন্তু-জানোয়ার, অস্ত্র-শস্ত্র ও পোশাক-সরঞ্জাম ইত্যাদি গণ্য হয়েছে।

শুরুতে 'গনীমত' রাসূলে করীম (স.)-এর অভিমতে বন্টন করা হ'ত। যেমন তিনি মনে করতেন তেমনই বন্টিত হত। পরে সাহাবী, আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সে বিষয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করে তা সম্পূর্ণরূপে রাসূলের কর্তৃত্বাধীন করে দেন। আর বদর যুদ্ধের পরে কুরআনেরই ঘোষণানুযায়ী তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীম-মিসকীনদের ও নিঃস্ব পথিকের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। সে ঘোষণা দ্বারা 'গনীমতে'র সমগ্রটারই বন্টন-কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, যেমন 'যাকাত' বন্টনের কর্তৃত্ব তিনি নিজের নিকটেই রেখেছেন। বনূ কায়নুকার কাছ থেকে পাওয়া গনীমতে রাসূল (স.)-এর এক-পঞ্চমাংশ পান। ফলে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আয়াতে উল্লিখিত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এই এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের সম্পদরূপে চিহ্নিত হয়। অপর চার-পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টিত হতে শুরু হয়। তা বায়তুল মালের আয় গণ্য হবে না। তা যোদ্ধাদের মধ্যে তাদের কষ্ট স্বীকার অনুপাত অনুযায়ী বন্টন করাই কুরআনের বিধান। এ দৃষ্টিতে গনীমত একই সাথে micro ও macro উভয় ধরনের অর্থনীতির ক্ষেত্র।

যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত 'গনীমত' বন্টিত না হলে, তা নিয়ে যোদ্ধাদের মশগুল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অন্যথায় তাদের পরাজিত হওয়া অসম্ভব নয়। পরে তা ইসলামী রাষ্ট্রে সীমার বাইরে দারুল হরবে' বন্টন সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। অবশ্য সেনাধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার বন্টন দারুল-ইসলামে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিলম্বিত করা সম্পূর্ণ জায়েয। ইমাম আবূ হানীফার মতে 'দারুলহরব-এ গনীমত বন্টন জায়েয নয়। দারুল-ইসলামে সব সহ ফিরে আসার পরই বন্টন করা আবশ্যক এবং বাঞ্ছনীয়।

নিহতের সঙ্গে পাওয়া দ্রব্যাদি পোশাক, অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জাম, যুদ্ধের যান-বাহন ইত্যাদি সর্বপ্রথম বন্টন করা হবে যোদ্ধাদের মধ্যে সমানভাবে, রাষ্ট্রপ্রধান তার শর্ত করে থাকুন, আর নাই থাকুন। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক-এর মতে প্রথমেই এই শর্তের কথা বলে দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধান বা সেনাধ্যক্ষের কর্তব্য। অন্যথায় এই পর্যায়ের মাল-সমান ও মূল গনীমতের মাল শামিল করে দেওয়া হবে, যাতে সকল যোদ্ধাই সামান ভাগের প্রাপক হয়।

সূরা আল-আনফাল-এর আলোচ্য প্রথম আয়াতটি মানব সভ্যতার বিকাশের যে পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল এবং যুদ্ধে শরীক লোকদের মধ্যে 'গনীমত' বাবদ লব্ধ

www.pathagar.com

জিনিসপত্র বন্টন করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সে সময় বেতনভুক যোদ্ধা রাখার ব্যবস্থা অন্ততঃ তদানীন্তন আরব সমাজে ছিল না। সুসংবদ্ধ সেনা-বাহিনী রক্ষণ ও পালনের কোন পদ্ধতিও তখন চালু করা হয়নি। যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষকে তাতে শরীক হওয়ার আহবান জানানো হলে সে আহবানে যাঁরা সাড়া দিতেন, তাঁরা নিজ নিজ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধে শরীক হতেন প্রধানত আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন ও তাঁর নিকট থেকে বিপুল সওয়াব পাওয়ার লক্ষ্যে। আল্লাহ্ তাদেরকে 'গনীমতে'র মালে শরীক হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। এটা ছিল আল্লাহ্‌র বিশেষ এক অনুগ্রহের ব্যাপার। এটা অনিবার্য ছিল না।

কিন্তু বর্তমানে গোটা প্রেক্ষিতের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এ কালে সাধারণত নির্দিষ্ট বেতন ভাতা গ্রহণকারী সেনাবাহিনী প্রায় প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশেই রয়েছে। তারা সরকারী কর্মচারী এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের সদস্য। এইরূপ একটি সেনাবাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় অতীতের ন্যায় অবেতনভুক সেনাবাহিনীর কল্পনা করাও অনেক দেশের পক্ষে সম্ভব নয়।

তা হলে আলোচ্য আয়াতটির এ কালীন প্রয়োগ কি হতে পারে ? এ কালে তো যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জাম সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটির প্রয়োগ ও ব্যবহারোপযোগিতা শুধু এভাবে হতে পারে যে, নির্দিষ্ট বেতনের যোদ্ধারা যেহেতু রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে নিয়মিত বেতন ভাতা পেয়ে থাকেন, তাই যুদ্ধলব্ধ যাবতীয় জিনিস প্রতিরক্ষা বিভাগেরই সম্পদ হবে, যে বিভাগ থেকে তাদেরকে বেতন দেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত ইসলামী রাষ্টের নাগরিকদের উপর প্রতিরক্ষা কাজে অংশ-গ্রহণ করা' জরুরী বিধায় যুদ্ধকালীন সময়ে তাদেরকে অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে বেতন পেয়ে সেনাবাহিনীর চাকরী করে বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত পাওয়া আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে, যেমন সে কালে 'গনীমতে'র মাল পাওয়ার উৎসাহ ছিল। যুদ্ধে বিজয়ী হলে যোদ্ধাদের বেতন ভাতার হার বৃদ্ধিও করা যেতে পারে। অবশ্য গনীমতের যে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট, তা একান্তভাবে দীনের তাবলীগের কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। আর গনীমতের মাল আল্লাহ্‌র হুকুম ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ الخ

এবং তোমরা শক্তি ও যুদ্ধের যানবাহন প্রস্তুত রাখ যতোটা তোমাদের সাধ্যে কুলায়....।

অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় ও সৈন্যবাহিনীর উচ্চতর ট্রেনিং দেওয়ার কাজেও এ অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে এবং কোন কঠিন দুঃসাধ্য প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার কাজেও ব্যয় করা যেতে পারে। তাদেরকে আরও উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারও দেওয়া যেতে পারে।

এ ভাবে বলা যায়, প্রেক্ষিত বদলে যাওয়ার কারণে আয়াতটির প্রয়োগ খতম হয়ে যায়নি।

- মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

গ্রন্থপঞ্জি

১. মুফরাদাতে রাগেব ইস্ফাহানী, পৃষ্ঠা ৫২২।

২. 'আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১-৬২।

৩. তাফসীর আল-মারাগী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬২-৬৩ ও আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৪

৪. আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১।

৫. তাফসীর আল-মারাগী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬২।

৬. তাফহীমুল কোরআন, পারা ১০, পৃষ্ঠা ১৫৪।

www.pathagar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসনঘাতকতা করো না। আর জেনে রাখ তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী। আল্লাহ্র নিকটই রয়েছে মহাপুরস্কার।

-সূরা আনফাল ঃ ২৭ ও ২৮

আয়াতের সাধারণ ব্যাখ্যা

২৭ নং আয়াতে হুক্কুল্লাহ ও হুক্কুল ইবাদত-উভয়ই উল্লিখিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে এ বিষয়ে চেতনা এত কম যে তা শূন্যের কোঠায়; তাই আয়াতটির প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্ট। হুকুক সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অনীহা উভয়ই এজন্য দায়ী। তবে এ আয়াতে জ্ঞাতসারে অনীহার কথা উল্লিখিত হয়েছে। স্পষ্টতই এটা অপরাধের পর্য্যায়ে পড়ে। ২৮ নং আয়াতে ২৭ নং আয়াতের বক্তব্যের জের টেনেই বলা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ লাভ ও সন্তান সন্ততির কল্যাণ কামনাহেতু লোকে হুকুক ভুলে যায়। এতে করে তারা আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই ভুল করে বসে। পার্থিব জীবনে যা লাভ বলে মনে হয় তা প্রকৃত লাভ না হতে পারে। প্রকৃত পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্রই কাছে, আর তার গুণগত মান অত্যন্ত উচ্চ, পরিমাণও অতি বিপুল।

এই যে আল্লাহ্র কালামে উল্লিখিত সত্য, ঈমানদার ব্যক্তির উত্তম আচরণ নিশ্চিতকরণের জন্য এটা যথেষ্ট হবার কথা। মুমিনদের আর্থসামাজিক জীবন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এটাই পথ নির্দেশ। এখানেই আয়াত দু'টির বিশেষ গুরুত্ব।

www.pathagar.com

তাফসীরকারদের আলোচনা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেন ঃ "নিজেদের আমানত বলতে সেই সব দায়িত্ব বোঝানো হয়েছে, যা সবের প্রতি আস্থা স্থাপন করে তার উপর ন্যস্ত করা হয়। তা ওয়াদা পুরণের দায়িত্ব হতে পারে। কিংবা কোন সংস্থার অভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য হতে পারে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদ হতে পারে। কারো প্রতি ভরসা করে জনসমাজ যদি তাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে তবে তাও এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে।

মানুষের ঈমানের প্রতি নিষ্ঠা ও সততায় সাধারণত যে জিনিস দোষ-ত্রুটির উদ্ভব করে আর যে কারণে প্রায়ই মানুষ মুনাফিকী, বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানতে লিপ্ত হয় তা অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান-সন্তুতির স্বার্থের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ ও উৎসাহ। এ কারণে এখানে বলা হয়েছে যে এ মাল-সম্পদ যার ভালবাসায় নিমজ্জিত হয়ে তোমরা সাধারণত সত্য ও সততার পথ হতে গোমরাহ হয়ে যাও, তা আসলে এ দুনিয়ার পরীক্ষাগারে তোমাদের পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। তোমরা যাকে পুত্র বা কন্যা বল তা আসলে পরীক্ষার একটি কাগজ মাত্র। আর যাকে তোমরা জমি জায়গা ব্যবসার সম্পত্তি মনে কর, তা আসলে পরীক্ষার আর একটি কাগজ বিশেষ। এসব জিনিস তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, এ সবের দ্বারা তোমাদেরকে যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে।"[১]

মুফতী শফি লিখেছেন ঃ "২৭ নং আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হকসমূহ কিংবা পারস্পরিকভাবে বান্দার হকসমূহের খেয়ানত করো না। হক আদায়ই করবে না কিংবা আদায় করলেও কোন রকমে শৈথিল্যের সাথে আদায় করবে- এমন যেন না হয়। আয়াতের শেষভাগে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তো খেয়ানতের অপকারিতা ও বিপদ সম্পর্কে জানই। তারপরেও সেদিকে পদক্ষেপ না নেওয়া মোটেও বুদ্ধিমত্তার কথা নয়। আর যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফলতি ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণত মানুষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে "এ কথা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিত্না।"

www.pathagar.com

'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়, আযাবও হয়। তা ছাড়া এমন সব বিষয়কেও 'ফিতনা' বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ তিন অর্থেই 'ফিতনা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে।"[২]

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ দু'টি আয়াতে ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। আল্লাহ্ ও রাসূল (স.)-এর সঙ্গে খেয়ানত না করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের শিক্ষা মানতে বাধ্য। কোন অবস্থাতেই আমরা তা ভঙ্গ করতে পারি না বা পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম দেশের পার্লামেন্টকে তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

২৭ নং আয়াতে আমানতে পারস্পরিক বিশ্বাসভঙ্গ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমানতের ব্যাপক অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আমানতের এ গুরুত্ব ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বিষয়। অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস বা আমানতদারীর উপর নির্ভর করে। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলা হয় credit worthiness, এটা আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ভিত্তি। ইসলাম সমাজ ও অর্থনীতিতে এরই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যদি আমানতদারী অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ঋণ দান, ঋণ গ্রহণ, বিনিয়োগ সবই নিরাপদ ও সহজ হয়ে যাবে। সে অবস্থায় উৎপাদন ও সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।* অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্রকে শিক্ষা, তথ্য-মাধ্যমের মাধ্যমে ও সামাজিক পত্রিকায় প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আমানতদারী সৃষ্টি করতে হবে। তবে তার ফল পাওয়া যাবে।

২৮ নং আয়াতে লোভ-লালসা ও স্বজনের অতিরিক্ত প্রীতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। ধন-সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী। এর তাৎপর্য এই যে ধন-সম্পদকে সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক নিজের জন্য অন্যের জন্য ব্যবহার

* আমানত সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য এ গ্রন্থে সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াত ও সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াতের আলোচনা দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

করতে হবে। ধন-সম্পদকে অবৈধভাবে ও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা যাবে না। ধন-সম্পদ অপব্যয় ও নষ্ট করা যাবে না। মানবকল্যাণে তার প্রয়োগ হতে হবে। এখানে ভোগ্য ব্যবহারের (consumption) কি নীতি হবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে। এ নীতিকে ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশনও জাতির জন্য ভোগ্য ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ করতে পারেন।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

প্রমাণপুঞ্জি

১. তাফহীমুল কোরআন, সূরা আনফালের ২২ ও ২৩ নং টীকা।

২. মা'আরেফুল কোরআন, সূরা আনফালের ২৭-২৮ আয়াতের তফসীর থেকে।

www.pathagar.com

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ.

আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার জন্য কাফিরগণ তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে ; তারা এরূপ ব্যয় করতেই থাকবে। অতঃপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। অতঃপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। -সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৬

কতিপয় মুফাস্‌সিরের ব্যাখ্যা

১. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এসব কাফিরের দৈহিক উপাসনার বর্ণনার পর তাদের আর্থিক উপাসনার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুকাতিল ও কাল্‌বীর মতে বদরের যুদ্ধে উৎসাহ প্রদানকারী ১২ জন বড় বড় কুরায়শ নেতা সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। মতান্তরে আয়াতটি উহূদ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান এবং সে যুদ্ধে তার সম্পদ ব্যয় করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান মহানবী (স.)-র বিরুদ্ধে নিয়মিত আরব সৈন্যের অতিরিক্ত দু'হাজার হাবশী সৈন্য নিয়োগ করে। এতে তার ৪০ আওকিয়া ব্যয় হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে বাঁধা দান করাই এ সম্পদ ব্যয়ের উদ্দেশ্য ছিল। এ ধরনের খরচ তারা করতেই থাকবে। কিন্তু পরিণামে তারা অনুতপ্ত হবে।

২. আল্লামা শাওকানী বলেন, এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের মাল-সম্পদ ব্যয় করার বিবরণ তুলে ধরেছেন। তাদের এই খরচের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাসূলের (স.) সঙ্গে যুদ্ধ করে সত্য পথ গ্রহণ থেকে মানুষকে বাধা দান করা। এ উদ্দেশ্যে কুরায়শ বংশীয় কাফিররা বদরের যুদ্ধে যেমন ভূমিকা পালন করেছিল, উহূদ

www.pathagar.com

এবং আহ্‌যাব যুদ্ধেও তার পুনরাবৃত্তি করেছিল। প্রতিটি যুদ্ধেই বিত্তশালীরা সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তারা এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করতেই থাকবে; কিন্তু পরিণামে এ ব্যয় তাদের জন্য শুধু আফসোস্, অনুতাপ আর লজ্জাই বয়ে আনবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্যান্য মুফাস্‌সিরও প্রায় একই রকম আলোচনা পেশ করেছেন। তবে ইব্‌ন কাসীর এও বলেছেন যে, আয়াতের প্রেক্ষিত নির্দিষ্ট হলেও আয়াতটির বক্তব্য 'আম' বা ব্যাপক অর্থাৎ কাফিরগণ ইসলামের বিরোধিতা এবং সত্য পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য যত প্রকার খরচই করে তার উপরও এ আয়াত প্রযোজ্য। পরিণামে এ ধরনের ব্যয়কারীরা লাঞ্ছিতও লজ্জিত হবে।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরদের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির একটা সাধারণ নীতি আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। ইসলামী আদর্শের সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠাকে ব্যক্তিগত বা জাতিগত কোনভাবেই তারা সহ্য করতে পারে না। কাজেই ইসলামের সম্প্রসারণ রোধ করার জন্য তারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অর্থ ব্যয় করে।

ইসলামী ইতিহাসের সব যুগেই কাফিরদের মধ্যে এ নীতির অনুশীলন দেখতে পাওয়া যায়। সকল নবীদের আবির্ভাবের সময়ই ইসলামের শত্রুরা সত্যের বিরুদ্ধে ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে, জান-প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পরও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বদরও উহুদ যুদ্ধের সময় কাফিরদের অর্থনৈতিক সমর প্রস্তুতির কথা ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে।

কাফিরদের এ চিরাচরিত অভ্যাস আজও রহিত হয়নি। তাদের অর্থনৈতিক আচরণ আজ আরও বেশী সুবিন্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে তারা তিনটি পর্যায়ে এ কাজ করে থাকে ঃ

১. ব্যক্তিগত ; ২. সরকারী ও বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ; এবং ৩. সরাসরি সরকারী খাত থেকে অর্থ ব্যয়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করছি।

প্রথমত, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য। পৃথিবীর ইসলাম বিরোধী জাতিগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে নানা ধরনের মিশনারী কাজ করছে এবং কর্মতৎপরতার উদ্দেশ্য হলো বাতিল

www.pathagar.com

ধর্মের সম্প্রসারণ এবং ইসলামের ব্যাপ্তিতে সংকোচন সৃষ্টি করা। ব্যক্তিগত অনুদানে এসব মিশনারীগুলো কাজ করছে। এ কাজে তারা এক বিরাট অংক সংগ্রহ ও ব্যয় করছে। আর এতে ইসলামের ক্ষতিও হচ্ছে ব্যাপক।

দ্বিতীয়ত, সরকারী ও বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। বর্তমান বিশ্বের বেশ কয়টি সরকারী ও বেসরকারী আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা এক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের কাজ হলো গবেষণামূলক কাজে সহযোগিতা করা। গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তারা মুসলিম উম্মার মেধাগুলোকে কিনে নেয়। বিপুল-অর্থের বিনিময়ে গবেষকদেরকে ইসলাম বিরোধী আদর্শের পক্ষে নিয়ে যায়; অথবা তাদের দ্বারা মূল্যবোধ নিরপেক্ষ আদর্শের গবেষণা করিয়ে নেয়, এবং এসব কাজে তাদেরকে এমনভাবে ব্যস্ত করে রাখে যে, ইসলামের পক্ষে কাজ করার সুযোগই তাদের হয়ে উঠে না। বরং এ ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলে এক পর্যায়ে তাদের ইসলামের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। এভাবে আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলো অজস্র অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতিসাধন করছে।

তৃতীয়ত, সরকারী অর্থ ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক পর্যায়। বিশ্বের সচ্ছল দেশগুলো গরীব দেশগুলোকে তথাকথিত সাহায্যের নামে তাদের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শগত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।* শর্তাধীন ঋণ ও অনুদানের ফলে এদের উপর আদর্শগত প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো এ ভাবে বিভিন্ন মুসলিম দেশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শিক ও মানসিক গোলামীতে শৃঙ্খলিত করে ফেলেছে। এতে ইসলামী আদর্শের প্রসারে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে। এমন কি দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট মুসলিম দেশে ইসলামী কর্মতৎপরতা সমূলে বিনষ্ট করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। মিসরে ইখওয়ানূল মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যে হত্যালীলা চালানো হয়, তা অনেকটা এমনি কোন এক চাপেরই ফলশ্রুতি।

এসব মাধ্যম ছাড়াও দেখা যায় সংস্কৃতির নামেও অপসংস্কৃতি ও ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ মুসলিম দেশগুলোতে অহরহ হচ্ছে। এ খাতেও ইসলাম-বৈরী দেশগুলো প্রচুর ব্যয় করছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থ ব্যয় এ যুগেও প্রচলিত রয়েছে। শুধু এর রূপ বদলেছে। প্রকৃতপক্ষে তা আরো সুবিন্যস্ত ও সংগঠিত উপায়ে

* উল্লেখ্য যে, মুসলিম দেশগুলো গরীব ও উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

করা হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানের ধনী দেশগুলো সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের আনবিকীকরণ করছে বিপুল অর্থব্যয়ে। আর এসব অস্ত্র তারা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধেই নানাভাবে ব্যবহার করছে।

এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাকে হুশিয়ার থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র দীনের জন্য যথাযোগ্য কর্মতৎপরতার মাধ্যমে চেষ্টা তথা জিহাদ চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَجَاهِدُوْا فِىْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ

আল্লাহ্‌র পথে যথাযোগ্য জিহাদে অবতীর্ণ হও।

এ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী জিহাদের সকল প্রকার কৌশলগত উপায় অবলম্বন করতে হবে। অন্য আরেক আয়াতের মর্ম অনুযায়ী মুসলমানদেরকে যথাযোগ্য হিকমত বা কৌশল অবলম্বন করতে হবে।*

বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র দীনের খেদমতের একটি কৌশল-গত উপায় হলো যে সব কৌশলে ইসলামের ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আর এতে ইসলামী অর্থনীতির ব্যষ্টিক, সামষ্টিক ও সরকারী অর্থব্যবস্থার প্রসঙ্গ এসে যায়।

প্রথমেই ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী অর্থব্যবস্থার কথা বলা যাক। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অধিকাংশ মুসলিম দেশের সরকারী আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আসে বৈদেশিক ঋণ, প্রকল্প ঋণ, অনুদান ইত্যাদি থেকে। মুসলিম উম্মা বা ইসলামী রাষ্ট্রকে এসব গ্রহণ করার বেলায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক চুক্তি, সম্পর্ক, সহযোগিতার বেলায় তাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, এগুলো ইসলামী আদর্শের উপর কোন প্রকার তাৎক্ষণিক বা সুদূরপ্রসারী ক্ষতির কারণ নয়। যদি ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয় তবে তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Social security system) অত্যন্ত জোরদার করতে হবে। এ ব্যপারে সরকারী পর্যায়ে যাকাত ফান্ডকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রয়োজন হলে ধনী মুসলিম দেশগুলোর সহযোগিতায় এ ফান্ডকে মজবুত করতে হাবে। এ অর্থ দ্বারা গরীব মুসলমানদেরকে বিধর্মী মিশনারীদের

---

* اُدْعُوْا اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

www.pathagar.com

কবল থেকে রক্ষা করা সহজ হবে। মুসলিমকে বিধর্মী করার জন্য মিশনারীরা যেরূপ অর্থ ব্যয় করে, তার বিকল্প অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা না করে ওদের প্রভাব দূর করা কঠিন।

অজস্র অর্থ ব্যয় করে সম্ভাবনাময় মুসলিম মেধাকে ইসলামের চর্চা থেকে দূরে রাখার যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলছে, তারও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (I D B), ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) -র মতো সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিটি মুসলিম দেশে ইসলামী গবেষণার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এতে মুসলিম গবেষকগণকে ভিন্ন পথ থেকে ফিরিয়ে এনে ইসলামী ধারায় গতিশীল করা যাবে।

মুসলিম বিশ্বের যে সম্পদ আছে, তা পরিকল্পিত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত পন্থায় ব্যবহার করলে মুসলিম বিশ্বের কউকেই অমুসলিম দেশের উপর বৈদেশিক সাহায্যের বা ঋণের জন্য নির্ভর করতে হবে না।

এ ছাড়া কুরআনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম বৈরীর জন্য অমুসলিমদের এ জাতীয় ব্যয় তাদের জন্য মনস্তাবের কারণ হবে। আখিরাতে তাদের আযাব ও শাস্তির কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। দুনিয়াতে ও এ মনস্তাপ হতে পারে। বর্তমান বিশ্বের অমুসলিম বৃহৎ শক্তিগুলোর সমরসজ্জা, তারকাযুদ্ধ ইত্যাদি পরোক্ষভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং এর কুফল ও অনিষ্ট তারা নিজেরাও ভোগ করছে। এতে জাতীয় সম্পদ মানব কল্যাণে ব্যবহারের পরিবর্তে মানব বিধ্বংসী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য বাতিলের অনুসারীরা ব্যষ্টিক, সামষ্টিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করবে। এগুলোর প্রতিরোধও সমভাবে বা তদপেক্ষা অধিক কার্যকরভাবে করতে হবে। সুতরাং ব্যক্তিগত, সামষ্টিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়েই মুসলিম উম্মাকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহারে বলা যায় সর্বকালেই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা ইসলামকে দুর্বল বা পর্যুদস্ত করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করছে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময়ও এরূপ করা হয়েছে। মহানবীর নেতৃত্বে মুসলিম উম্মা কাফিরদের এ আচরণের প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছেন। কাফিরদের এ আচরণ আজ পূর্বাপেক্ষা

www.pathagar.com

সুবিন্যাস্ত ও সুসংগঠিত পন্থায় চালু আছে। সুতরাং মুসলিম উম্মাকেও যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এর প্রতিকার করতে হবে। ইসলামী অর্থবিষয়টির নীতির ব্যষ্টিক, সামষ্টিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়েই এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

- ডঃ এ. এইচ. এম. সাদেক

প্রমাণপঞ্জি

১. ফখরুদ্দীন রাযী, তফসীরে কবীর, ১৫শ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, দারুল কিতাবিল-ইলমিয়্যাহ, তেহরান, পৃষ্ঠা ১৬০।

২. শওকানী, তাফসীর ফতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬।

৩. তফসীরে ইবনে কাসীর।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আত-তাওবা

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ قْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, সন্তান, ভ্রাতা, পত্নী, আত্মীয়-স্বজন তোমাদের অর্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার মাঝে মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত। আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধাচারীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না। **সূরা আত-তাওবা ঃ ২৪**

প্রেক্ষিত

২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে জনসম্পদ ও অর্থসম্পদ যদি আল্লাহ্র ভালবাসা, রাসূলের ভালবাসা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তবে অপরাধ গণ্য হবে।

www.pathagar.com

আয়াতের সাধারণ তাৎপর্য

আয়াতে মু'মিনের নিকট ও তার জীবনে আল্লাহ্‌র রাসূল ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের গুরুত্বের আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক মু'মিনের নিকট অবশ্যই আল্লাহ্‌ রাসূল ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ সব ধরনের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা ও ধন-সম্পদ, দেশ, বাসস্থান, ব্যবসা বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাধান্য পেতে হবে। আত্মীয় ও ধন-সম্পদ কখনো মু'মিনের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। যদি কখনো আত্মীয়তা, ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা হলে আল্লাহ্‌, রাসূল ও জিহাদকেই গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ বলতে বোঝায় নিজেকে ইসলামের উপর কায়েম রেখে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে ব্যস্ত রাখা ও জুলুম, নিপীড়নের উৎখাত ও মজলুমদের সাহায্য করার জন্য সংগ্রাম করা। কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূল তার হাদীসে এসবের জন্য জিহাদ করার তাকীদ দিয়েছেন।

তাফসীরকারদের আলোচনা

এ আয়াতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বিখ্যাত তাফসীরকার সাইয়েদ কুতুব লিখেছেন "এটা কখনো জীবনের উদ্দেশ্য নয় যে একজন মুসলিম পরিবার-পরিজন, আত্মীয়তার সম্পর্ক, ধন-সম্পদ পার্থিব ভোগ বর্জন করবে এবং জীবনে বৈরাগ্য অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা প্রাধান্য পাবে। যখন তা সম্পন্ন হবে তখন তার জন্য জীবনের সর্ববিধ পবিত্র বস্তু থেকে উপকৃত ও লাভবান হওয়াতে কোন দোষ নেই। মূল প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি তোমার ঈমানী আকীদা দ্বারা পরিচালিত হবে না দুনিয়ার ভোগ ব্যবহার তোমাকে পরিচালিত করবে? যখন মুসলমান এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে তার আকীদা ও ধ্যান-ধারণা পরিশোধিত হয়ে গেছে তখন তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র থেকে লাভবান হওয়া দূষণীয় নয়। অনুরূপভাবে দূষণীয় নয় ধন-সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহাদি থেকে লাভবান হওয়া এবং যার জন্য নেই কোন বাধা যদি এ সবের ভোগ ব্যবহারে ইনসাফ ও অহংকার না থাকে। বরং এ সব থেকে উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ বৈধ ও মুস্তাহাব। কারণ এ নিয়ামত পাওয়ার পর উহা শোকরগুজারীর রূপ নেয়। এভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রক্ত ও বংশের সম্পর্ক, ছিন্ন হয়ে যায় অধিকার সম্পর্ক। অতএব আল্লাহ্‌র জন্যই প্রাথমিক নৈকট্য আর এর উপরই রচিত হয় মানবীয় সকল সম্পর্ক।[১]

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ আয়াত থেকে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড পাওয়া যায়। ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ, সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নিশ্চয়ই গুরুত্ব রয়েছে, যা

www.pathagar.com

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ও হাদীসে বর্ণিত আছে। কিন্তু এ সব কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্ ও রাসূল অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যাবে না। অন্য কথায় অর্থ-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্বাচিত আইন, বিধান, সীমা ও নির্দেশনার অধীনে হবে। সম্পদের ভোগ ব্যবহার উন্নয়ন, বিনিময়, ব্যয় সবকিছুই আল্লাহ্ রাসূলের শিক্ষার অধীন হবে।

আমাদের অর্থনীতিবিদ আমাদের পরিকল্পনা কমিশন ও সরকারকে তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী ও কার্যকরী করার সময় এই নীতিটি মনে রাখতে হবে। তা করা তাদের উপর ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক। তা না করা হলে এ আয়াতে যেমন বলা হয়ছে 'তারা আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের উপযুক্ত গণ্য হবে'।

এ আয়াতে অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে জিহাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থ কিভাবে সমন্বিত হবে। অথবা জিহাদের সময় অর্থনীতিকে কিভাবে বিন্যাস করা হবে। এখানে অবশ্য শরীয়ত সমর্থিত জিহাদের কথা বলা হচ্ছে, অবৈধ যুদ্ধের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এ আয়াতের আলোকে বলা যায় যে জিহাদের প্রয়োজনে প্রত্যেক মু'মিনকে তার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বা সম্পদের ক্ষতি কোন মু'মিনকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয় না। নীতিগতভাবে রাষ্ট্র ও গোটা মুসলিম সমাজের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। আয়াতে গোটা মু'মিন সমাজকেই সম্বোধন করা হয়েছে, এ কথাও লক্ষণীয়। জিহাদের প্রয়োজনে অথবা জিহাদ করা যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তখন ইসলামী রাষ্ট্রকে তার জিহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য সব অর্থনৈতিক ক্ষতি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আরো বলা যায় যে, জিহাদের সময়ে জিহাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে সফল ভাবে জিহাদ পরিচালনা করা যায়। কাজেই সূরা তাওবার আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে-একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

প্রমাণপঞ্জি

১. ফি-যীলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, মিসর।
২. ফি-যীলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, মিসর।

www.pathagar.com

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ.

হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বছরের পরে তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটেও না আসতে পারে। তোমাদের যদি অভাব-অনটনের ভয় হয়, তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ চাইলে তোমাদেরকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দেবেন। আল্লাহ বস্তুতই সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী। যুদ্ধ কর আহলি-কিতাবের সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্‌র এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হারাম করে না এবং সত্য দীন ইসলামকে নিজেদের দীন রূপে গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়।

-সূরা আত-তাওবা ঃ ২৮-২৯

কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা

১. نجس 'ময়লা-আবর্জনা'। যখন কোন জিনিস ময়লাযুক্ত হয়, অপরিচ্ছন্ন হয়, তখন সেই জিনিসকে 'নাজাস' বলা হয়। 'নাজাস' দুই প্রকারের। এক প্রকারের 'নাজাস' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর এক প্রকারের 'নাজাস' জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে অনুভবযোগ্য।

www.pathagar.com

২. عيلة 'দারিদ্র অভাব-অনটন, অধিক সংখ্যক সন্তানাদির কারণে-মানুষ সাধারণত দারিদ্র ভারাক্রান্ত হয়। তাকে আরবীতে বলা হয় وكثير العمال এ থেকে عيلة এর অর্থ করা হয়েছে দারিদ্র, অভাবগ্রস্থতা।

৩. بدين - دين 'কোন আকীদা ভিত্তিক জীবন বিধান গ্রহণ করাকে دين গ্রহণ বলা হয় অর্থাৎ জীবন-যাপন পদ্ধতি। دين الحق অর্থ সত্য দীন। সত্য দীন তা-ই যা আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি নাযিল করেছেন।

৪. الجزية এক প্রকারের খারাজ বা কর, যা ব্যক্তিগণের উপর ধার্য করা হয়, জমির উপর নয়।

৫. يد হাত, প্রশস্ততা, সামর্থ।

৬. صغرون থেকে। অর্থাৎ ছোটত্ব, তা বড়ত্বের বিপরীত। তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে, অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বুদ্ধি-বিবেক গম্য। এখানে অর্থ বিনয়, অধীনতা, ইসলামী বিধানের বা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত্য।

প্রেক্ষিত

সূরা তাওবা তিনটি ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে। শুরু থেকে পঞ্চম রুকূ পর্যন্ত এর প্রথম ভাষণ। তা নাযিল হওয়ার সময়-কাল হচ্ছে নবম হিজরীর যিলকদ মাস কিংবা তার কাছাকাছি সময়। এই সময় ইসলাম রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম সর্বতোভাবে বিজয়ী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিরক পরাজয় বরণ ও পশ্চাদপসরণ মেনে নিয়েছিল।

এই বছরই নবী করীম (স.) হযরত আবূ বকর (রা.)-কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে হজ্জের সময় মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ই ভাষণটি নাযিল হয়। আর তখনই নবী করীম (স.) হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর পেছনে পেছনে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন, যেন হজ্জের সময় তা সকলের সামনে পাঠ করে শুনানো হয়। আয়াত অনুযায়ী যে কর্মনীতি অবলম্বিত হয়েছিল তা যেন সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়--এই উদ্দেশ্যে।

আয়াত দু'টির মোটামুটি বক্তব্য

প্রথম আয়াতটিতে আরবের মুশরিক জনগোষ্ঠী এবং দ্বিতীয় আয়াতে আহলি-কিতাব ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলা হয়েছে। মুশরিকদের সম্পর্কে প্রথমত বলা হয়েছে যে, তারা 'নাজাস'। নাজাস দৈহিক নাপাকিকে বলা যায়,

www.pathagar.com

'বলা যায় আকীদা বিশ্বাসের পংকিলতার কারণে মনমানসিকতার দিক দিয়ে 'নাজাস'। এখানে অবশ্য এই শেষের কথাটিই প্রযোজ্য। কেননা শিরকি আকীদাই জঘন্য ধরনের কলুষতা। এই আকীদার কারণেই তারা নিজেদের হাতে নির্মিত মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করে, সিজদা করে, পূজা অনুষ্ঠান করে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম পালন করে, যা তাদের কোন কল্যাণ দেয় না, না ইহকালীন, না পরকালীন। মৃত ও রক্ত খায়, জুয়া ও জেনা বৈধ মনে করে, হারাম মাসে রক্তপাত ঘটাতেও কুণ্ঠিত হয় না। অতএব তারা হারাম ভূমিতে থাকতে ও মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না-এ বছরের পর। কেননা এ বছর পর্যন্ত হজ্জের সময় তারাও মক্কায় আসতো। তারা এই সময় বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে আসতো মক্কার লোকদের নিকট বিক্রয় করার জন্য। এটা ছিল তখন মুশরিকদের ব্যবসায় এবং মক্কাবাসীদের জন্য খাদ্য পাওয়ার প্রধান উপায়।

এই সময়ই কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয় মদীনায়। হযরত আলী (রা.) মক্কায় বসে এই আয়াতটি পাঠ করে ঘোষণা করে দিলেন যে, অতঃপর মুশরিকরা 'হারাম' এলাকায় তথা মক্কায় আসতে পারবে না। মক্কায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করা ও কা'বার তওয়াফ করা তো দূরের কথা, সমগ্র হারাম এলাকায় প্রবেশও চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা হ'ল। এই কথা শুনে মুসলমানদের কিছু লোক বলে উঠলো ঃ ওরা মক্কায় আসতে না পারলে আমরা খাদ্য পাব কোত্থেকে ? আমাদের তো মহা অভাব-অনটন দেখা দেবে। খাদ্যাভাবে অভুক্ত থাকতে হবে। এর জওয়াব উক্ত খোদায়ী ফয়সালার সঙ্গেই দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা যদি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে কোন অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়, তা হলে তোমাদের তো এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে সে সংকট দূর করে দেবেন এবং মুশরিকদের খাদ্য পরিবেশনের উপর নির্ভরশীলতা শেষ করে দিয়ে তোমাদের অভাব মিটিয়ে দেবেন।

প্রথমোক্ত আয়াতে মুশরিকদের সহিত 'বায়'আত' চূড়ান্ত সম্পর্কহীনতা ও তাদের মক্কায় না আসার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালার পর দ্বিতীয় আয়াতে আহলি-কিতাব-ইহুদী খৃস্টানদের সহিত যুদ্ধ করার ও তার লক্ষ্য সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। এ কথায় ইঙ্গিত রয়েছে রোমানদের সহিত যুদ্ধ করার প্রতি। নবী করীম (স.) এই যুদ্ধের জন্য তাবুকে গমন করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় নি রোমানদের পালিয়ে যাওয়ার কারণে। কিন্তু রোমানদের যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া আধুনিক ভাষায় পশ্চাদপসরণের ফলে সমগ্র আরবে ইসলামের বিজয় গৌরব ছড়িয়ে পড়ে।

মুহাদ্দিস ইবনুল মুনযির বলেছেন, কুরায়শ ও আরব কাফিরদের প্রতি কর্মনীতি নির্দেশ হিসেবে নাযিল হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফেতনা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আহলি-কিতাব সম্পর্কে আলোচ্য ২৯ নং আয়াত নাযিল হয়েছে। অতঃপর 'জিযিয়া' কর ধার্য হয়। রাসূলে করীম (স.)-এর জীবনে নাজরানবাসীরা 'জিযিয়া' দিতে রাযী হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে। রোমান শাসিত তাবুক ও আয়শাও জিযিয়া দেওয়ার চুক্তি করে।

মোট কথা, আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতের ফরমান অনুযায়ী আহলি-কিতাবের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলমানদের উপর ফরয হয়ে যায়।

কয়েকজন তাফসীর লেখকের আলোচনা

১. ইমাম কুরতুবী প্রথমোক্ত আয়াতটির বিস্তারিত তাফসীরে এক পর্যায়ে লিখেছেন ঃ মুশরিক লোকেরা মক্কায় খাদ্য নিয়ে আসতো। তাদের হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দরুন শয়তান কতিপয় মুসলমানের মনে দারিদ্র ও খাদ্যাভাবের আশংকা জাগিয়ে দেয়। তারা বলে ঃ আমরা বাঁচব কি করে ? তখন আল্লাহ্ তাদেরকে সচ্ছল ও মুখাপেক্ষীহীন বানিয়ে দেওয়ার ওয়াদা করলেন। দহাক বলেছেন, অতঃপর আল্লাহ যিম্মীদের নিকট থেকে 'জিযিয়া' আদায় করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। ইকরামা বলেছেন ঃ আল্লাহ মক্কার মুসলমানদের সচ্ছল বানিয়ে দিলেন বিপুল বৃষ্টিপাতের ফলে উদ্ভিদ, গাছপালা ও জমির উর্বরতা সৃষ্টি করে। আর মক্কায় খাদ্য চর্বিতুল পদার্থ (الودت) ও বিপুল কল্যাণ আমদানীর ব্যবস্থা করে দিলেন। এ ছাড়া সমগ্র আরব ইসলাম কবূল করলো, নাজদ, সানয়া প্রভৃতি এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। ফলে তাদের আয়তন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে দাঁড়াল। জিহাদ ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহ্ তাদেরকে অধিকতর সচ্ছল বানিয়ে দিলেন।[১]

২. আর দ্বিতীয় আয়াত পর্যায়ে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ আয়াতেই আল্লাহ সমস্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন। আহলি-কিতাব-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, তারা আসমানী কিতাব এবং তওহীদ ও রিসালত

www.pathagar.com

জানে ও বিশ্বাস করে। তা সত্ত্বেও তারা যখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়ত ও দাওয়াতকে অমান্য করলো তখন তাদের অপরাধ অন্যান্যদের তুলনায় অধিক ও সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে তাদের ও অন্যান্য সকলের জন্য যুদ্ধের মারাত্মক আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায় আছে। তা হ'ল, যুদ্ধে নিহত হওয়ার পরিবর্তে 'জিযিয়া' দিয়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ। এটা তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি।[২]

৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ লিখেছেন ঃ মুশরিকরা 'নাজাস' অর্থাৎ তাদের রূহ্ নাপাক, রূহের এই নাপাকিই তাদের সারকথা, তাদের গোটা সত্তারই নাপাক হওয়ার কারণ। ফলে তাদের সামগ্রিকতা ও অন্তর্নিহিত সত্তাই হচ্ছে নাপাক। মানুষের ইন্দ্রিয়ই তাদের ঘৃণা করে, পবিত্রতা প্রবণ ব্যক্তিরা তাদের থেকে আলাদা থাকতে সচেষ্ট। মূলত তাদের নাপাক হওয়ার ব্যাপারটি ভাবগত, তাৎপর্যগত। বস্তুগত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নয়। তাই বলতে হবে, তাদের দেহ স্বতঃই নাপাক নয়। নাপাকীর কারণ হলে তো নাপাক হবেই। অতএব তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত হুকুম হয়েছে যে, এই বছরের পর তারা আর মসজিদে হারাম-এ আসতে পারবে না। .....কিন্তু অর্থনৈতিক মওসুমে মক্কাবাসীরা তো তাদের আগমনের অপেক্ষা করবে। গোটা উপদ্বীপে ব্যবসায়ই ছিল জীবন যাত্রার প্রধান উপায়। শীত ও গ্রীষ্মের মওসুমে আরবরা দক্ষিণে ও উত্তরে যে ব্যবসা করত, তাই ছিল বড় অবলম্বন। এমতাবস্থায় মুশরিকদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে দেওয়া হলে এবং সমস্ত মুশরিকের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষিত হলে মক্কাবাসীদের জন্য তো কঠিন অবস্থা ডেকে আনা হবে। হ্যাঁ, কঠিন অবস্থাই হবে; তবে এ ব্যাপারটি আকীদা বিশ্বাসের সহিত সম্পর্কিত! আল্লাহ চান ; দিলে খালেস আকীদা স্থান লাভ করুক। এই কারণে আল্লাহ্ উক্ত মনোভাবের জওয়াবে বলেছেন, রিযকের ব্যাপার সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল স্বয়ং আল্লাহ্ প্রচলিত ও পরিচিত উপায়- উপকরণের মাধ্যমে। আর আল্লাহ্ই যখন ইচ্ছা করেন তখন উপায় পন্থাও বদলে দেন, যখন ইচ্ছা একটি দুয়ার বন্ধ করে অন্য দুয়ার খুলে দেন।

দ্বিতীয় আয়াত পর্যায়ে লিখেছেন ঃ আল্লাহ্র দীন থেকে বিভ্রান্ত আহলি-কিতাবের লোকদের সম্পর্কে এখানে নতুন বিধান দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশের মাধ্যমে। আর শেষ পর্যন্ত ছোটত্ব স্বীকার করে জিযিয়া দিতে রাযী হয়ে যুদ্ধে নিহত হওয়ার অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পন্থা উদঘাটন করে। অতঃপর তাদের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি যা-ই গ্রহণ করা হবে, তা এই ভিত্তিতেই হবে অর্থাৎ জিযিয়া দেওয়ার ভিত্তিতে। এইরূপ অবস্থায় তাদের 'চুক্তিবদ্ধ যিম্মী' হওয়ার অধিকার থাকবে। এর ফলে

www.pathagar.com

মুসলিম ও তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হবে। তবে তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে রাযী হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই, মুসলিম হিসেবে সম্পূর্ণ অভিন্ন ও সমান মর্যাদার অধিকারী হবে।[৩]

৪. মুস্তফা আল-মারাগী আলোচ্য প্রথম আয়াতটির তাফসীরে লিখেছেন ঃ মুশরিকরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষিজমি, বাগান ইত্যাদি থেকে মক্কায় যে খাদ্য বহন করে নিয়ে আসতো এবং খাদ্যের যে ব্যবসায় চালু ছিল, মুশরিকদের মক্কায় আগমন নিষিদ্ধ হলে সে সব বন্ধ হয়ে যাবে, তখন খাদ্যের অভাব পড়বে বলে তোমরা যে আশংকা বোধ করছ, জেনে রাখবে, আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে মুখাপেক্ষীহীন বানিয়ে দেবেন। তাঁর অনুগ্রহ ত বিপুল, অফুরন্ত। ইতিহাস থেকে এই কথার সত্যতা এভাবে প্রমানিত হয় যে, উত্তরকালে মুশরিকদের মক্কায় আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পূর্বের মুখাপেক্ষিতা ও মুশরিকদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মক্কাবাসীরা মুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ স্বাচ্ছন্দ্যের বহু উপায় ও অবলম্বন তৈরী করে দেন, যা পূর্বে ছিলনা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। অতঃপর ইয়ামনবাসীরা ইসলাম কবূল করে। তারাই মক্কায় খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতে লাগলো। আশপাশের সব মুশরিকই ইসলাম কবূল করে। ফলে হারাম শরীফে প্রবেশ করতে পারে না-এমন কেউই অবশিষ্ট থাকলো না। আরও পরে আল্লাহ্র মেহেরবানীতে দেশের পর দেশ বিজিত হয়, গনীমতের মালের বিপুল সম্ভার এসে যায়। সর্বাদিক দিয়ে লোকদের লক্ষ্য ও আদর্শ হয়ে উঠে মুসলমানরা। ফলে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প খাতে তাদের বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়। মক্কায় এর সুফল সর্বাধিক আসতে থাকে। হাজীদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়, ব্যবসায়ের কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধ হয় এবং বহির্বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়।

আয়াতে আল্লাহ্ মক্কাবাসীদের উক্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা লাভের ব্যাপারটিকে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও চাওয়ার সহিত সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আর তাদের রব্ব-এর উপর তাদের দৃঢ় ঈমান ও আস্থা রয়েছে বলে কোন ঈমানদারই আল্লাহ্র চাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে না।

দ্বিতীয় আয়াত পর্যায়ে লিখেছেন ঃ আহলি-কিতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'আহলি-কিতাব' যদিও সাধারণ অর্থবোধক, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে খৃস্টান ও ইহুদীদের মনে করা হয়েছে। কেননা তদানীন্তন আরব মুসলিমদের প্রতিবেশী তারাই ছিল। তাদের সাথেই মুসলমানদের মেলামেশা ও লেন-দেন বেশী হ'ত।

www.pathagar.com

তারাই ছিল মুসলমানদের নিকট অধিক পরিচিত। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে তখন, যখন সে যুদ্ধের বাস্তব কারণ ঘটবে। সে কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, তারা যদি তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করে সীমালংঘনমূলক কাজ করে। তারা যদি তোমাদেরকে তোমাদের দীন পালনে বাঁধা দেয়, তোমাদের দীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা বা তার অনুসারী হওয়া থেকে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে, তোমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, যেমন রোমানরা করেছিল। আর তাই ছিল তাবুক যুদ্ধে গমনের মূল কারণ। এরূপ অবস্থায় তাদের উৎপাত থেকে নিরাপত্তা রক্ষার শেষ ব্যবস্থা হচ্ছে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে 'জিযিয়া, দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।[৪]

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে দু'টি আয়াতই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম আয়াতটি থেকে জাতীয় সামষ্টিক ক্ষেত্রে একটি জরুরী পথ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। কোন জনসমষ্টির পক্ষেই সাধারণভাবে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। সামাজিকতার দৃষ্টিতে ব্যক্তি মানুষ যেমন অন্যান্য মানুষের উপর নির্ভরশীল , প্রত্যেকটি মানব সমষ্টিও অন্যান্য মানব সমষ্টির উপর নির্ভরশীল হবে, তা কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একটি মানব সমষ্টি যখন কোন আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীন, সার্বভৌম ও শক্তিশালী হয়ে উঠে, তখন তাদের উপর দ্বিবিধ কর্মধারা বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়। একটি হ'ল তাদের নিজেদের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া এবং সে জন্য বিরোধী মতাদর্শের ধারক-বাহকদের উপর নির্ভরশীলতা ও মুখাপেক্ষিতা পরিহার করা। আর অন্যটি হচ্ছে সেই লোকদের দূরতম প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ন মুক্ত রাখা।

হিজরী ৮ম সনে নবী করীম (স.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই সময়ই মক্কা বিজয় হয়, কাফির ও মুশরিকরা সঠিকভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু তখনও আশ-পাশের এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুশরিক মক্কায় আসতো, কা'বার তওয়াফ করত। তারা ব্যবসা করতো মক্কার বাজারে। বিশেষ করে মক্কার অধিবাসীদের জন্য তারা বাইরে থেকে খাদ্যসম্ভার নিয়ে আসতো। তাদের এই খাদ্য সরবরাহ ছিল মক্কার লোকদের খাদ্য প্রাপ্তির একমাত্র উৎস। খাদ্যের জন্য তারা মুশরিক খাদ্য ব্যবসায়ীদের মক্কায় আসা-যাওয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। এই সময়েই কুরআনের উপরোক্ত ফরমান নাযিল হয়। হযরত আলী (রা.) হজ্জের সময় উপস্থিত সব মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, এই বছরের পর মুশরিকরা আর মক্কায় আসতে পারবে না। ফলে তাওহীদ

www.pathagar.com

বিশ্বাসীদের সহিত তাদের মেলামেশা রহিত হয়ে গেল, খাদ্য নিয়ে তাদের মক্কায় আগমন বন্ধ হয়ে গেল। এই কারণে মক্কাবাসীদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগলো, এমতাবস্থায় তারা খাদ্য পাবে কি করে ?

খাদ্য পাবে কি করে, বাঁচবে কেমন করে-এ চিন্তা স্থূলও বস্তুবাদী। কিন্তু আদর্শবাদীদের নিকট বস্তুবাদ ও স্থূল চিন্তার উপর আদর্শবাদ অগ্রাধিকার পাবে, এটাই কাম্য বিশেষত মুসলমানদের নিকট আল্লাহ্‌র ফরমানের বাস্তবায়ন সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তাতে বৈষয়িক দৃষ্টিতে যত কষ্ট ও সংকটের সম্মুখীন হতে হোক-না-কেন। আল্লাহ যখন চূড়ান্তভাবে ঘোষণা জারি করেছেন যে, নবম হিজরী সনের পরে মুশরিকরা মক্কা তথা সমগ্র 'হারাম' এলাকায়ই প্রবেশ করতে পারবে না, তখন সকল মুসলিমকে এমনকি মক্কার অধিবাসী মুসলিমকেও নিঃশর্তে ও কোন প্রতিবাদ ছাড়াই এই ঘোষণার সম্মুখে মাথা নত করতে হবে, এটাই তো বাঞ্ছনীয় ও স্বাভাবিক। এতে খাদ্যের সরবারহ যদি বন্ধও হয়ে যায়, লোকদেরকে না খেয়েও থাকতে হয়, তবুও। এ-ই হচ্ছে ইসলামী সমাজের আদর্শবাদিতার প্রকৃত রূপ।

মক্কার মুসলিম সমাজ শিরক-এর কলুষ পরিবেশ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল সে সময় থেকে মাত্র বছরখানিক পূর্বে। এখনই মুশরিকদের মক্কায় আনাগোনা বন্ধ হওয়া উচিত তাওহীদী আকীদার লালন ও বলিষ্ঠতা বিধানের লক্ষ্যে। তাওহীদী আকীদার কেন্দ্রবিন্দু কা'বা ও মসজিদ-এ হারামে মুশরিকদের কলুষতার আর কোন স্থান থাকতে পারে না। তাদের উপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বহু দিনের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া এবং তাদের উপর তাওহীদবাদীদের নির্ভরশীলতা ও তাদের খাদ্যের মত অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানীর মুখাপেক্ষিতা অনতিবিলম্বে শেষ হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা এই মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরশীলতা মুসলমানদের আদর্শবাদকে দুর্বল করে দিতে পারে। আর তা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। আল্লাহ্‌র এই ফরমান দেড় হাজার বছর পূর্বের এক সমাজের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়ে থাকলেও তা শাশ্বত এবং চিরন্তন। এ থেকে এই ফর্মূলা পাওয়া যাচ্ছে যে, আদর্শগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হওয়ার পর, এর পরিপন্থী কোন আদর্শের অনুসারী জনগোষ্ঠীর উপর কোনরূপ, বিশেষ করে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা থাকতে পারে না। থাকলে সেটা যত শীগগীর সম্ভব খতম করতে হবে। অন্যথায় আদর্শবাদী জীবন বিঘ্নিত হবে, আদর্শের প্রতি ঈমান দুর্বল হয়ে পড়বে। এ হচ্ছে প্রথম আয়াতভিত্তিক বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় আয়াত থেকে আমরা এ শিক্ষা পাচ্ছি যে, ইসলামী আদর্শবাদী লোকদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলাম-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা সর্বশক্তি দিয়ে, ইসলামী

www.pathagar.com

আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও বিপরীত মতাদর্শের অচলতা প্রমাণ করার লক্ষ্যে। এ জিহাদ চালাতে হবে রাসূলে করীম (স.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী। সে সুন্নাত হচ্ছে প্রথমে প্রতিপক্ষকে ইসলামী আকীদা গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিতে হবে। সে দাওয়াত কবূল করলে অতঃপর আর কোন কথাই থাকতে পারে না! মেনে না নিলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নিজেদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য 'জিযিয়া' দিতে রাযী হতে হবে। তা মেনে নিলে তারা হবে ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী সার্বিক সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ও গ্যারান্টি লাভের বিনিময় 'জিযিয়া' দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু তাতেও রাযী না হলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে 'জিযিয়া'

'জিযিয়া' ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আয়ের একটা বড় খাত। আহলি-কিতাবের মধ্যে যারা ইসলামী রাষ্টের সহিত 'জিযিয়া' দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, তাদের প্রত্যেকের উপর মাথাপিছু 'জিযিয়া' ধার্য হবে। এই ধার্য করই 'জিযিয়া' নামে অভিহিত।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নাগরিক মুসলমানগণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব পালনের সাহায্যার্থে নিজেদের একটা 'কর' অবশ্যই দেবে। আর সমাজ-সমষ্টির সাহায্যের জন্য দেবে যাকাত। যাকাত অর্থনৈতিক ইবাদত হওয়ার সাথে সাথে তা একটি কর-ও বটে। অনুরূপভাবে অমুসলমান নাগরিক, ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণও সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করবে। এর বিনিময়ে আহলি-কিতাব নাম ধারণ ও এদিক দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে, এটা স্বাভাবিক, সুবিচার ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায়পরতার একটা লক্ষণ বটে। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্র তাদের নিকট থেকে মাথাপিছু একটা পরিমাণের অর্থ আদায় করে নেবে 'জিযিয়া' রূপে, 'যাকাত' রূপে নয়। কেননা 'যাকাত' শুধু মুসলমানদের উপরই ধার্য হয়।

'জিযিয়া'র একটা সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ

الجزية ضريبة تفرض جبرا على رؤس من دخل فى ذمة المسلمين من اهل الكتاب ومن فى حكمهم

'জিযিয়া' একটি কর, যা মাথাপিছু ও বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য করা হয় আহলি-কিতাব ও তাদের মত সেই লোকদের উপর, যারাই মুসলিম জন-সমষ্টির সংরক্ষণের দায়িত্বে নিজেদেরকে শামিল করবে।

www.pathagar.com

এই সংজ্ঞার আলোকে স্পষ্ট হয় যে, 'জিযিয়া' করের নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি অবশ্যই থাকতে হবে ঃ

১. ইহা ধার্য হয় ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন একজন নাগরিক হিসেবে। ব্যক্তিদের উপর ধার্য কর ব্যক্তিই দিতে বাধ্য ব্যক্তি হিসেবে।

২. ইহা ব্যক্তির উপর ধার্য কর বলে তার পরিমাণ নির্ধারণে ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা পুরোপুরি পরিলক্ষিত হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্যক্তিগণ বিভক্ত হবে ঃ সচ্ছল ধনী, মধ্যম অবস্থা ও দরিদ্র-এই তিনটি পর্যায়ে। মিসকীন, উপায়-উপার্জনহীন অন্ধ অসচ্ছল বেকার প্রভৃতি লোকদের উপর তা ধার্য হবে না।

৩. ইহা বার্ষিক কর হিসেবে ধার্য হবে। বছরে একবার মাত্র গৃহীত হবে। (শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মযহাব এই মত পোষণ করে)

৪. ইহা ধর্মীয় আকীদার ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে। তা কেবল মাত্র আহ্লি-কিতাবের উপর এবং যারা তাদের অনুরূপ তাদের উপর ধার্য হবে।

এই কর ধার্যের শরীয়তী ভিত্তি প্রথমত আলোচ্য আয়াত যাতে।حتى يعطو الجزية عن بد। বলা হয়েছে। আর সুন্নাত হচ্ছে রাসূলে করীম (স.) রোমানদের হেরাকল-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তিনি রওয়ানা হলেন মুজাহিদ সমভিব্যবহারে নবম হিজরীর রজব মাসে। সেখানে রোমানদের পশ্চাদপসরণের কারণে যুদ্ধ হয় নি, কিন্তু সেখানকার লোক রাসূলের (স.) সহিত জিযিয়া দেওয়ার শর্তে সন্ধি করে। খৃষ্টান ইউহান্না ইব্ন রুইয়া-আয়শা-অধিপতিও এই শর্তে সন্ধি করে যে, সেখানকার প্রত্যেক ব্যক্তি বছরে এক দীনার করে দেবে। এরপর রাসূলে করীম (স.) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট যে পত্র দেন, তাতে জিযিয়ার কথা স্পষ্ট উল্লেখ থাকে।

ইব্ন কুদামাহ্ লিখেছেন, আহলি-কিতাব ও মজুসী (অগ্নিপূজক)-দের নিকট থেকে 'জিযিয়া' গ্রহণ-এর উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। সাহাবাগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। খুলাফায়ে রাশেদুন এই কাজ করেছেন কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য ছাড়াই। হিজায, ইরাক, সিরিয়া ও মিসর প্রভৃতি এলাকার মুসলিম মনীষীগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

'জিযিয়া' ধার্যের কারণ হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ যিম্মী হওয়া। ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মীরা কোন সামরিক দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য নয় বলে তার বিনিময়ে ইহা ধার্য হয় ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসে সুযোগের বিনিময়ে। কোন কোন মনীষী মনে করেন, অধীন-নীচ -লাঞ্ছিত হয়ে। তাদের দলীল ঃ

www.pathagar.com

عن يدوهم صغرون

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এই তাফসীরের সহিত একমত নন। তিনি বলেছেন, 'সাগির' হচ্ছে তাদের উপর মিল্লাতের বিধান কার্যকর হওয়া ও তা মেনে নেওয়া। আয়াতে ছোটত্ব বরণ বা লাঞ্ছনা স্বীকার করার কোন কথা নেই এবং উহা আয়াতের তাৎপর্যও নয় বরং তা নাগরিকদের মধ্যে সাম্য ও সমতার প্রতীক বটে।

- মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

গ্রন্থপঞ্জি

১. তাফসীরুল মারাগী, আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী।
২. ফী-যিলালিল কুরআন, সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ।
৩. আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী।
৪. আল মারাদাউল ইকতি ছাদীয়াত ফিল ইসলাম, ডঃ আলী আলী আবদুর রসূল।

www.pathagar.com

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْكَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِيْنَ. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ.

তাদের বল! তোমরা নিজেদের ধন-মাল ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যেভাবেই খরচ কর তা কবূল-ই করা হবে না। কেননা তোমরা হচ্ছ ফাসিক লোক। তাদের ধন-মালের ব্যয় কবূল করার পথে একটি মাত্র বাধাই প্রকট ছিল এবং তা এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সহিত কুফর করেছে এবং তারা সালাতের জন্য আসে বটে, তবে অবসাদগ্রস্থ অবস্থায়। আর (আল্লাহ্‌র পথে) তারা ধন-মাল ব্যয় ও করে বটে, তবে তা করে অনিচ্ছুক ও অনাগ্রহী হয়ে। অতএব তাদের ধন-মাল ও সন্তান সংখ্যার বিপুলতা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। আল্লাহ্ তাদেরকে এসব দিয়ে দুনিয়ার জীবনে আযাবে নিক্ষেপ করতে চান। তাদের জান বের হয়ে যাবে কাফির অবস্থায়।

-সূরা আত-তাওবা ঃ ৫৩-৫৫

তাফসীর লেখকদের ব্যাখ্যা

১. আল্লামা আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী লিখেছেন ঃ হে রাসূল! ওদেরকে বলুন, আল্লাহ্ তো জিহাদ ও অন্যান্য দীনী কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করার জন্য আদেশ করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু তা অবশ্যই দু'টি ভাবধারা সম্পন্ন হতে হবে। তা নিজ ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে হতে হবে, হৃদয় মন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং

www.pathagar.com

তা হতে হবে আল্লাহ্‌র পরকালীন আযাব থেকে বাঁচার লক্ষ্যে। তাই তোমরা, হে মুনাফিকরা, যতক্ষণ পর্যন্ত দীন-ইসলামের প্রতি সংশয়বাদী হবে এবং পরকালে পূর্ণ প্রতিফল পাওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক বিশ্বাসী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহ্ গ্রহণই করবেন না।

হে নবী! ওদের ধন-মাল সন্তান সংখ্যার বিপুলতা তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। ওদেরকে এসব দেওয়া হয়েছে বটে, তবে তা এ দুনিয়ায় ওদেরকে শান্তি ও স্বস্তি দেবে না এক বিন্দুও। ওদের জন্য তা আযাব হয়ে দেখা দেবে। ওরা মরবেও ঠিক কাফির অবস্থায়ই। ঈমানদার হওয়ার ভাগ্য ওদের নেই।[১]

২. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ লিখেছেন ঃ মুনাফিকদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা রাসূল (স.) ও মুসলমানদের সহিত মিলিত হয়ে জিহাদে যেতে রাযী হত না, নানা বাহানা ও ওযর পেশ করত। তার পরিবর্তে তারা নিজেদের ধনমাল পেশ করত। চিরকাল মুনাফিকরা এরূপই করে থাকে। আল্লাহ্ তাদের জিহাদে শরীক না হয়ে ধন-মাল দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার এই প্রবণতাকে অগ্রাহ্য করেছেন। রাসূল (স.)-কে একথা ঘোষণা করতে আদেশ করেছেন যে, তাদের এই অর্থদান আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় নয়। কেননা তারা তা ব্যয়-করে লোক-দেখানো ভাবধারা ও লোক-ভয়ের কারণে। ঈমান ও খোদাভীতির ভিত্তিতে নয়। তারা হয়ত মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই নীতিকে একটি উপায় হিসেবে সাগ্রহেই গ্রহণ করেছে, কিংবা তাদের মুনাফিকী লোকদের নিকট ধরা পড়ে যাবে-এই ভয়েই হয়ত তারা ধন-সম্পদ দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছে। উভয় অবস্থায়ই তাদের ধনমাল দান প্রত্যাখ্যাত হবে। এতে তাদের কোন সওয়াব হবে না, আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ ধন-মাল দানের কোন মূল্যই স্বীকৃত নয়।[২]

৩. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসেমী লিখেছেন ঃ ওরা যেহেতু নেক আমল করে সওয়াব পাওয়ার আশা করে না এবং না করলে আযাব হবে এই ভয়ও ওদের মনে নেই, বরং আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করাকে ওরা জরিমানার ন্যায় জোরপূর্বক গ্রহণ মনে করে, আর অর্থ গ্রহণ না করাকে মনে করে একটা মহা সুযোগ, তাই ওরা সাগ্রহে ব্যয় করুক, কিংবা অনাগ্রহে করুক, ওদের এই ব্যয় আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে না।

মুনাফিকদের কার্যকলাপের পংকিলতা এবং পরকালে তাদের অপমানকর আযাব হওয়ার কথা ও তাদের অর্থ ব্যয় কবূল না করার কথা বলার পর লোকদের ধারনার ভিত্তিহীনতা স্পষ্ট করে তোলারই জন্য বলা হয়েছে যে, ওদের ধন-মাল ও বৈষয়িক

www.pathagar.com

সুখ-শান্তি প্রকৃতপক্ষে তা নয়, যা মনে করা হয়, বরং তা ওদের জন্য আযাব ও বিপদেরই কারণ। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুনাফিকী মূলত ক্ষতি ও ধ্বংসেরই উৎস। কেননা তাতে ইহজীবন ও পরকালীন জীবনে কেবল আযাব বা দুঃখ-কষ্টই ভোগ করতে হয়। এটা ওদের প্রতি আল্লাহ্র ইস্তিদরাজ'-অর্থাৎ ঢিল দেওয়া পর্যায়ের ব্যাপার মাত্র। অতএব হে নবী! ওদের ধন-মাল ও লোকসংখ্যার বিপুলতা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।৩

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

দীন ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। 'জিহাদ' অর্থ যেমন নিজেকে ইসলামের বাস্তব অনুসরণ পরিবেশ যতই বিপরীত বা প্রতিরোধ হোক না-কেন, তেমনি দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সংগ্রাম করা, প্রতিরোধক শক্তি-সমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া। এ এক কঠিন দায়িত্ব, বিশেষ করে মুসলিম জনগণের উপর তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকেই অর্পিত। কুরআন মজীদে বারবার এই 'জিহাদের' নির্দেশ এসেছে। একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা জিহাদ কর তোমাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে। তোমাদের এই জিহাদ তোমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণময় যদি তোমরা জানো।

-সূরা আত-তাওবা ঃ ৪১

বর্তমান প্রসঙ্গে এ আয়াতের দু'টি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে, জিহাদ করতে হবে ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে করা এই জিহাদ অত্যন্ত কল্যাণময়। জিহাদের প্রথম পর্যায় প্রস্তুতি গ্রহণ। আর দ্বিতীয় পর্যায় সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করে কার্যত যুদ্ধ করা, যাতে যেমন শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন, তেমনি জীবনটাও দিয়ে দেওয়ার ঘটনা সংঘটন সম্ভব। প্রস্তুতি পর্যায়ের প্রধান কাজ দু'টি। একটি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং যোদ্ধা সংঘবদ্ধকরণ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকরণ। আর এই কাজে বিপুল অর্থ সম্পদ বিনিয়োগের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র। আল্লাহ্র উপরোদ্ধৃত নির্দেশেও সর্বপ্রথম সেই ধন-মাল নিয়োগের নির্দেশ উচ্চারিত হয়েছে। এ নির্দেশ মু'মিন মুসলমানদের প্রতি। তাদেরকে সামর্থ্যানুযায়ী ধন-সম্পদ দিতে হবে এবং শেষ পর্যায়ে প্রয়োজন হলে জানও দিতে হবে। কেননা

www.pathagar.com

দীন প্রতিষ্ঠা যেমন মু'মিন মুসলিমের কর্তব্য, তেমনি কর্তব্য প্রতিষ্ঠিত দীনকে রক্ষা করা। আলোচ্য আয়াত কয়টির মূল বক্তব্য হচ্ছে, 'জিহাদে'র জন্য ধন-মাল ও জান-প্রাণ মুসলমানদেরকে দিতে হবে একান্তভাবে নিষ্ঠা সহকারে, কেবল আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য। তাতে কোনরূপ উপেক্ষা, অবহেলা বা অনীহা প্রদর্শনের কোন অধিকার আল্লাহ্র নিকট স্বীকৃত নয়। ধনমাল দিয়ে কার্যত যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকা বা থাকতে চেষ্টা করাকে আলোচ্য আয়াত কয়টিতে মুনাফিকী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও আয়াত কয়টি তদানীন্তন মাদীনীয় সমাজ প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ, যেখানে বহু সংখ্যক মুনাফিকও ছিল। তারা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে মু'মিন জাহির করলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও রাসূল ও দীন-ইসলামের প্রতি তাদের ঐকান্তিক ঈমান ছিল না। কিন্তু তা প্রকাশ করার সুসাহস বা দুঃসাহসও তাদের ছিল না। সেই কারণে সমাজের সব মুসলিম যখন 'জিহাদে' ধনমাল দিয়েছে এবং কার্যত তাতে শরীক হওয়ার জন্য প্রস্তুত সেই মুহূর্তে তারা নানা প্রকারের ওজর-অসুবিধা পেশ করে 'জিহাদে' অনুপস্থিত থাকার অনুমতি রাসূলের নিকট থেকে চেয়ে নিতে চেষ্টা করত। আর 'জিহাদে' যাওয়ার পরিবর্তে ধন-মাল দেবার প্রস্তাব করত। হয়ত তারা সে ধন-মাল দিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অনেকটা অংশ গ্রহণও করে বসত।

কিন্তু আয়াত কয়টির বক্তব্য সেই সমাজ-প্রেক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তা কুরআনের মতই শাশ্বত ও চিরন্তন। এ কালেও মুসলিম সমাজে অনুরূপ অবস্থা দেখা দেওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নয়।

মোটকথা, আয়াত কয়টির বক্তব্য হচ্ছে, কেবল অর্থ ব্যয় করেই যুদ্ধে শরীক হওয়ার দায়িত্ব এড়াতে চাওয়া চরম মুনাফিকী সে সময় যেমন ছিল, বর্তমান সময়ও তেমনি। এই মুনাফিকদের দেয়া ধন-মাল 'জিহাদে' গ্রহণযোগ্য নয়, আল্লাহ্র নিকট তা কবূল হবে না। কবূল না হওয়ার কারণ তাদের মুনাফিক হওয়া। মুনাফিক হওয়ার অর্থ মূলত কুফরি, আর বাহ্যত মুসলমানী। এই কুফরির আর এক নাম ফাসিকী। কেননা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও দীনের প্রতি তাদের ঈমান নেই, অথচ অমুসলিমরূপে চিহ্নিত হতেও প্রস্তুত নয়। সেইজন্য ধন-সম্পদ দিয়ে কার্যত জিহাদে যাওয়ার ও জীবন নাশের ঝুঁকি এড়াতে যারা চায়, তারা যে ধন-সম্পদ দেয় তা ঈমানের ঐকান্তিকতা সহকারে দেয় না। এরূপ অবস্থায় তাদের ধন-মাল গ্রহণ করা হলে 'জিহাদ'-ই পবিত্র 'জিহাদ' হতে পারবে না। অথচ দীনের জন্য 'জিহাদ' সর্বতোভাবে পবিত্র ও মালবিমুখ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাই জিহাদের আর্থিক ঝুঁকিও ঈমানদার মুসলমানকেই গ্রহণ করতে হবে এবং সেই প্রেক্ষিতেই যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গড়ে তুলতে

www.pathagar.com

হবে। গোটা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে এমন ছাঁচে ফেলে পুনর্গঠিত করতে হবে, যেন সাধারণ জাতীয় চাহিদা পূরণের সাথে সাথে যুদ্ধের প্রয়োজনও পুরাপুরিভাবে পূরণ হতে পারে।

যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ মুনাফিক দিয়েছে, না মু'মিন দিয়েছে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে তা গুরুত্ববহ নয়। এ হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ-সম্পদের আয়ও ব্যয় পবিত্র হতে হবে, তাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও স্বার্থবাদ মুক্ত থাকা প্রথম পর্যায়ের শর্ত। এখানেই ইসলামী অর্থনীতির বিশেষত্ব যেমন, তেমন ইসলামের যুদ্ধনীতির বৈশিষ্টও অনস্বীকার্য। ইসলামে অর্থ পেয়ে যাওয়াই বড় কথা নয়। সে অর্থ কোত্থেকে এলো, কে দিল, কোন্ মনোভাব নিয়ে দিল, সে দেওয়ায় দাতার আন্তরিকতা আছে কিনা, সাধারণভাবেই এ প্রশ্ন রয়েছে, 'জিহাদের' ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন উঠবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে।

এই দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াত কয়টির গরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। আলোচ্য শেষ আয়াতটিতে মুনাফিকদের অর্থ-সম্পদ ও বিপুল জনসংখ্যার গুরুত্বহীনতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোন জনগোষ্ঠীর বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ও বিরাট জনসংখ্যা থাকাই কোন বিশেষত্ব বহন করে না, তা দেখে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই ঈমানদার লোকদের জন্য। এই অর্থ-সম্পদ ও জনবল তাদের জন্য প্রকৃতই কোন সুখ বয়ে এনেছে এবং তারা মহাসুখে আছে এবং তা খুবই লোভনীয়। তা না পাওয়ার দরুন মু'মিন সমাজ নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করে হতাশাগ্রস্ত হয়ে থাকবে-এমন কোন কথাই নেই। কেননা ওদের অর্থ-সম্পদ ও জনবল ওদের জীবনে কঠিন আযাব হয়ে দেখা দিয়েছে। আল্লাহ্ ওদেরকে তা দিয়েছেনই এই উদ্দেশ্যে যে, এসব দিয়ে ওদের বৈষয়িক জীবন কঠিন আযাবে জর্জরিত করে তুলবেন। মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে সংখ্যা বা পরিমাণ বিপুলতার তুলনায় গুনগত মানের উচ্চতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই নাম-কা-ওয়াস্তের মুসলমানের তুলনায় সংখ্যা তার যত বেশীই হোক প্রকৃত ঈমানদার লোকদের চাহিদা অনেক বেশী।

সাধারণত মনে করা হয় এবং বর্তমান দুনিয়ায় সাধারণ বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, অর্থ-সম্পদ ও জনবল-ই এক-একটি জাতির মহা গৌরবের ও সুখ-শান্তির উৎস। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ও জনবলের বিপুলতা সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিতভাবে কল্যাণময় কাজে বিনিয়োগের দাবী রাখে। তা করতে পারা একটি মহান আদর্শের অনুসারী জনগোষ্ঠীর পক্ষেই সম্ভব যেমন খলীফা-ই-রাশীদীন পর্যন্ত মুসলিম সমাজে। আর আদর্শহীন, নীতিহীন ও আদর্শ ভিত্তিক পরিকল্পনাহীন জনগোষ্ঠীর পক্ষে তা

www.pathagar.com

মারাত্মক ও কঠিন অশান্তির কারণ হওয়া অসম্ভব কিছুই নয় যেমন আজকের বৈষয়িক সমৃদ্ধিসম্পন্ন পাশ্চাত্যে নানা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও বিকৃতির নজীর থেকে লক্ষ্য করা যায়। শেষ আয়াতটিতে মুনাফিকদের এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং রাসূলে করীম (স.)-কে তা দেখে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত না হতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওরা যেহেতু আল্লাহ্ অমান্যকারী, এই অবস্থায়ই ওদের জীবন সাংগ হয়ে যাবে। ওরা প্রকৃতই কোন শান্তি বা সুখ পাচ্ছে না ওদের ধন-সম্পদ ও জনবল দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, বস্তুবাদী দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা কুরআনের এই তত্ত্বের অকাট্য সত্যতাই প্রমাণ করে।

মুনাফিকদের দেয়া অর্থ-সম্পদ জিহাদে গ্রহণ না করতে বলার মূলে প্রকৃত কারণ কি ? প্রকৃত কারণ এই মনে করা যায় যে, যারা মুনাফিক তারা মূলত ঈমান না এনেও বাহ্যিকভাবে মু'মিন মুসলিম হিসেবে পরিচয় দান করতে ব্যতিব্যস্ত থাকত সর্বক্ষণ। 'জিহাদে' তারা শরীক হতে রাযী না হয়ে শুধু অর্থ দিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চাওয়া ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস। তাদের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে 'জিহাদে' যাওয়া থেকে তাদেরকে রেহাই দেওয়া হলে এই মনোভাব গোটা মুসলিম সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব ছিল না। অন্যরাও তাদের মত অর্থ দিয়ে যুদ্ধের ঝুঁকি এড়াতে চাইতে শুরু করতে পারে। আর তা হলে গোটা মুসলিম সমাজের 'জিহাদবিমুখ হয়ে পড়া-'জিহাদ' সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। উপরন্তু মুনাফিকরা 'জিহাদে' অর্থ দিয়ে শরীক হয়ে মুসলিম জনতার সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ হয়ে ভেতরে ঢুকে 'জিহাদের' ও মুসলিম জনতার মারাত্মক ক্ষতি করতে চায় না-তার গ্যারান্টিই বা কি হতে পারে। বস্তুত পঞ্চম বাহিনীকে কোন সমাজেই বরদাশ্ত করে না। মুনাফিকরা ছিল তদানীন্তন ইসলামী সমাজে সেই পঞ্চম বাহিনী। তাদের কাছ থেকে আর্থিক কোন সহযোগিতা গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে অমুসলিম যিম্মীদের নিকট থেকে 'জিহাদে' আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়।

স্মরণীয় যে, রাসূল (স.)-এর জামানায় ইসলামী সমাজে স্থায়ী সামরিক বাহিনী ছিল না, গোটা মুসলিম সমাজই ছিল জিহাদকারী সামরিক বাহিনী। তাই সেখানে কেবল সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ করা ও জনগণের সে যুদ্ধের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকার ধারণা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ছিল। নিয়মিত সামরিক বাহিনী ঔপনিবেশিক শক্তি প্রবর্তিত ব্যবস্থা। ইসলামে এ ধারণা মূলতই নেই। তবে এ কালেও ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী সামরিক বাহিনী থাকতে পারে না-এমন নয়। থাকবে, তবে দুশমনদের বিরুদ্ধে কেবল তারাই যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধ করবে গোটা জনতা-যার পক্ষে যা করা সম্ভব সে

www.pathagar.com

তাই করবে। যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের সংখ্যা বা পরিধি কেউ গণনা বা পরিমাপ করতে পারে না। এ কালেও যে দেশের শুধু সেনাবাহিনীই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে, গোটা জনতা থাকে তা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বা নিঃসম্পর্ক, সে সেনাবাহিনী শত্রুর মুকাবিলায় কার্যত যুদ্ধও করতে পারে না, যুদ্ধ করলেও সে যুদ্ধে জয় লাভের প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। এ কারণে এ কালের কোন কোন অত্যাধুনিক রাষ্ট্রও সমগ্র জনতা সহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়বার প্রয়োজন বোধ করছে। কুরআনের আলোচ্য আয়াত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা অত্যন্ত আধুনিক মনে হবে - তাতে কোন সন্দেহ নেই।

- **মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম**

গ্রন্থপঞ্জি

১. তাফসীর আল-মারাগী।

২. ফী-যিলালিল কুরআন।

৩. তাফসীর মাহাসিনিত্‌তা'বীল।

www.pathagar.com

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

কিন্তু রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে। সকল কল্যাণই তাদের জন্য রয়েছে আর তারাই সফলকাম। - সূরা আত-তাওবা ঃ ৮৮

প্রেক্ষিত ও শানে নযুল

সূরা তাওবার ৭৩ নং আয়াত থেকে বিশেষ করে জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল বলে জানা যায়। এ আয়াতগুলোতে ইসলামী জিহাদ নীতির বিশ্লেষণ রয়েছে। মৌল নীতি ঘোষণাতে প্রথমেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স.)-কে আদেশ করলেন ঃ কাফির আর মুনাফিক -দুয়ের বিরুদ্ধেই পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করো এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করো (আয়াত নং ৭৩)। অতঃপর কাফির ও মুনাফিক শ্রেণীর চরিত্র ও আচরণের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ধন-সম্পদের ব্যবহার ও প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অনেক লোক এমনও ছিল যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে ঈমানের অঙ্গীকার করে ধন-সম্পদের সচ্ছলতা লাভ করেছিল, কিন্তু পরে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কার্পণ্যের আচরণে লিপ্ত হয় এবং তাতে আল্লাহ্‌র প্রতি কোন ভয়ও আসেনি তাদের মনে। তাদের সতর্ক করা হয়েছে যে আল্লাহ্ সে সকল মুনাফিক ও ফাসিক লোককে কষ্টদায়ক শাস্তি দান করবেন এবং কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। এ সকল লোকের ধন-সম্পদ ও সন্তানের প্রাচুর্য দিয়ে পৃথিবীতেই তাদের শাস্তিদান করবেন (আয়াত নং ৮৫)। এ প্রকৃতির মানুষের পরীক্ষা আগেই করা হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা জিহাদের আহবান দেওয়া হলেই সম্পদশালী ও সমর্থ হয়েও জিহাদের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছে (আয়াত নং ৮৬)। যারা মিথ্যা অজুহাতে জিহাদের দায়িত্ব থেকে নিস্কৃতি লাভ করে নারী ও শিশুদের সঙ্গে ঘরে বসে রয়েছে

www.pathagar.com

তাদের থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম চরিত্রকে জিহাদ ঘোষণার প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচনাধীন আয়াত নং ৮৮-এ চিহ্নিত শ্রেণীই রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সঙ্গে একান্তভাবে শারীরিক শক্তি, রণকৌশলজ্ঞান এবং ধন-সম্পদের সাহায্যে জিহাদে আত্মনিয়োগ করেছে, তারাই পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। ইহ্কালের ও পরকালের সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ তাদেরই জন্য।

তাফসীরবিদদের সংক্ষিপ্ত অভিমত

(ক) ইমাম ইব্ন কাসীর উল্লেখ করেছেন ঃ তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ এ সকল আয়াতের অন্তর্গত আগের আয়াতগুলোতে সেসব লোকের নিন্দাবাদ করা হয়েছে, যাদের দৈহিক শক্তি ও আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও তারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। আল্লাহ্র স্পষ্ট জিহাদের আদেশ পাওয়ার পরেও তারা যুদ্ধযাত্রা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। তারা শান্তির সময়ে জিহাদ সম্পর্কে বড় বড় বুলি উচ্চারণ করতো কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পর্দানশীন নারীদের মতো ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম সেক্ষেত্রে আল্লাহ্র আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে আর সে আদেশ পাওয়া মাত্র সর্বশক্তি নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সাফল্য ও কল্যাণ লাভের কথা উপলব্ধি করার ক্ষমতা পর্যন্ত মুনাফিকরা হারিয়ে ফেলেছে। সে জন্যই শেষোক্ত মুনাফিকদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত ভয়ংকর শাস্তি, আর জিহাদ-সংগ্রামী মু'মিন মুসলিমের জন্য রয়েছে অসাধারণ সাফল্য ও বিপুল কল্যাণ জান্নাতুল ফিরদাউস।[১]

(খ) সাইয়েদ কুতুব বলেছেন ঃ আগের আয়াতগুলো এবং আলোচ্য আয়াতটিতে দু'রকম স্বভাবের লোকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ (১) ঈমানী দুর্বলতা ও মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শনের স্বভাব ; এবং (২) ঈমানী দৃঢ় শক্তি ও মুসিবত সহ্য করার স্বভাব। এ দু'টি পরস্পর বিরোধী স্বভাব এবং দুঁটি ভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বনের দিকে পরিচালিত করে এ দুটি স্বভাব। একটি প্ররোচনা সৃষ্টি করে অজুহাত রচনার পশ্চাতে লাঞ্ছনার মধ্যে ডুবে থাকার পথ আর অপরটি প্রেরণা সৃষ্টি করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, ত্যাগ আর মর্যাদার নির্বাচন করতে। প্রথমোক্ত স্বভাবের মানুষেরা যুদ্ধ বর্জন করে অন্তঃপুরের নিষ্ক্রিয় ও অবমাননাকর জীবন পথ বেছে নেয়। তার পরিণতি সম্পর্কে তাদের কোন উপলব্ধি অবশিষ্ট থাকে না। তাদের স্বভাবের জন্যই তাদের অন্তঃকরণে সীলমোহর আঁটা হয়ে যায় এবং সত্যের উপলব্ধি লোপ পায়। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

(স.) এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদার মুসলিমগণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁরা ঈমানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আল্লাহ্‌র আদেশে সর্বপ্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালান করেন, প্রয়োজনীয় ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন এবং জিহাদ ঘোষণা কালে নিজস্ব ধন-সম্পদ ও প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত থাকেন। কারণ, তাতেই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত সর্বোত্তম সাফল্যের পুরস্কার ও মর্যাদা রয়েছে।[২]

(গ) ইমাম কুরতুবী বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটিতে মুজাহিদদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। আর তাঁদের জন্য পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে 'খায়রাত' অর্থাৎ পার্থিব ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার কল্যাণ বা কল্যাণের উপাদান।*

(ঘ) ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী উল্লেখ করেছেন ঃ মুজাহিদগণ জিহাদ ঘোষণার সাথে সাথে অসাধারণ উদ্দীপনার সঙ্গে জান ও মাল নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থাৎ অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের এ ধরনের ঈমানী দৃঢ়তা এবং জান-মালের উৎসর্গ দানের জন্যে পুরস্কার রয়েছে 'খায়রাত', যার তাৎপর্য ব্যাপক ঃ (১) প্রথমত, শব্দটি এক কথায় পার্থিব ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার লাভ ও কল্যাণ প্রাপ্তি বোঝায়; (২) দ্বিতীয়ত, 'খায়রাত' শব্দে সওয়াব বা প্রতিদান এবং 'মুফলিহুন' শব্দে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ বোঝায়; (৩) তৃতীয়ত, পরবর্তী ৮৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'জান্নাত', 'খায়রাত' ও 'ফালাহ' শব্দ তিনটির তাৎপর্য। এখানে 'খায়রাত'কে কল্যাণসমূহ এবং 'ফালাহ'কে মুক্তি বা সফলতা ধরা যেতে পারে। সম্ভবত 'খায়রাত' ও 'ফালাহ্' শব্দ দু'টিকে নানা ধরনের পার্থিব উপকারও ধরে নেওয়া যায়। যেমন ঃ জিহাদের মর্যাদা, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, বিজয় লাভের পুরস্কার এবং 'জান্নাত' শব্দ দিয়ে পরকালের প্রতিদান ধরা যেতে পারে। আর ' 'ফাউযুল আজীম'-এর সাহায্যে ওই সকল অবস্থা, উচ্চমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ সম্মানের প্রতীক মনে করা যেতে পারে।[৩]

(ঙ) আল্লামা শাওকানী বলেছেন ঃ আয়াতটিতে এক কথায় বোঝানো হয়েছে যে, মুনাফিকদের জিহাদে অংশগ্রহণ বা না গ্রহণ অথবা পশ্চাদপদ হওয়াতে কোন ক্ষতি হবে না। কারণ প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমগণ জানমাল দিয়ে জিহাদের আহ্বানে সাড়া দেবেই। তাঁদের অবদানই ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যথেষ্ট। আর তাঁদের জন্যেই রয়েছে 'খায়রাত' বা কল্যাণসমূহ।[৪]

---

* হযরত হাসানের বর্ণনায় 'খায়রাত'-এর অন্তর্গত রয়েছে বেহেশতের হুর।

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

উপরোক্ত প্রেক্ষিত ও তাফসীর আলোচনা থেকেই সুস্পষ্ট বোঝা যায়, সংশ্লিষ্ট আয়াত কয়টিতে এবং আলোচ্য আয়াতটিতে ইসলামী জিহাদ নীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। এ জিহাদ নীতি ইসলামী রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি-চরিত্র সংগঠনে ব্যাপক ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে প্রদর্শন করেছে। এ নীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অনেকগুলো দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যার আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর ধর্মী।

প্রথমত, ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতির গোড়ার কথাই হলো ঈমান ও ঈমান ভিত্তিক মূল্যবোধ। ঈমানদার মুসলিমের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব কখনো কাফির বা মুনাফিকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনীয় নয়। আল্লাহ্‌র বিধানে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্‌র বিধান ও আদেশকে আচরণ ও সংগঠনে প্রয়োগকারী মুসলিম অসত্যের সহিত আপোস করে না। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ বা সংগ্রাম করে। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সঙ্গী ও অনুগামী হয়ে ওহুদ ও বদরের যুদ্ধের ইতিহাসেও তাঁরা ঈমানের নিদর্শন হিসেবে নিজস্ব সম্পদ ও প্রাণকে উৎসর্গ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পরেও সর্বক্ষেত্রেই সে একই বিধানের বাস্তবায়ন প্রদর্শন করেছে। সত্যের প্রতি ও মৌল ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির প্রতি এমনি দৃঢ় সংকল্প ইসলামী জীবন পরিচালনারই ভিত্তি। জিহাদের মতো রাষ্ট্রীয় সংকটকালে হয় তার পরীক্ষা। সে পরীক্ষাতে 'মুনাফিক' সত্য থেকে পশ্চাদপদ হয় এবং পথচ্যুত হয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও নীতির জীবন বিধান ও সমাজ বিধানের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব উক্ত সত্যকে প্রতিরক্ষা করার জন্যেই নিরংকুশ রাষ্ট্রশক্তি। সে শক্তিকে শুধু সমর-কৌশলের শক্তি বলা যায় না। জিহাদের সময়ে মু'মিন-মুসলিমের ঈমান এবং ধন-সম্পদ প্রয়োগ করা হয়। আর সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গিত হয়। এ জন্যেই জিহাদে মু'মিন-মুসলিমের সংগ্রামফল অমুসলিম বা মুনাফিকের সংগ্রামফলের সহিত তুলনীয় বা সমকক্ষ হতে পারে না। ঈমানে অনুপ্রেরণা বিরাট শক্তি। তা ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত 'খায়রাত' অর্থাৎ পার্থিব ও পারলৌকিক পুরস্কার লাভের আশা মুসলিম সংগ্রামী যোদ্ধাকে বিজয়ের পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়। আত্মিক শক্তিই সে কাজে বিপুলভাবে সাহায্য করে। তা ছাড়া ইসলামী সংগ্রাম বহুমুখী। এটা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অসত্যের প্রতীক, শত্রু

www.pathagar.com

শক্তির শুধু মুকাবিলাই নয়। সমাজের মানুষকে এবং ব্যবস্থাকে অসত্যের সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্যে তৈরি করতে হয়। এ জাতীয় সাংগঠনিক প্রয়াসও জিহাদ বা ইসলামী সংগ্রামের অন্তর্গত এবং তার কাঠামোগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। বর্তমান কালে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশবাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করার পরে যে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে, তা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিফলন নয়। বর্তমান কালেও সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের সংঘাতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি জড়িত হতে বাধ্য হচ্ছে। সে পরিস্থিতির মধ্যেই তাদের নিজস্ব সত্তার ও নীতির বিবর্তন আর সমৃদ্ধি চলছে। তার মধ্যে বাস্তবতা হিসেবে প্রধান উপলব্ধি হলো ঃ বর্তমানকালে 'জিহাদকে শুধু মনোবলের দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করলে চলে না; প্রয়োজন আধুনিক সমরাস্ত্রের ও সমরাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণের, আর প্রয়োজন উন্নতমানের সমরাস্ত্র উৎপাদনের এবং সে উৎপাদনকে পূর্ণ সমর্থনদানের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রচনার। তারই দিক-নির্দেশনা রয়েছে সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াতে। সেখানে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ ঃ "শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাধ্যের সর্বোচ্চ মাত্রা পর্যন্ত শক্তিকে প্রস্তুত করো যুদ্ধের অশ্বসহ, যাতে আল্লাহ্র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের এবং অন্যান্য শত্রুদের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করতে পার।" উপরোক্ত ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে একটা দেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের সার্বিক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ও উন্নয়নেরই পরিকল্পনা। সে ব্যাপারে যে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলি আগে থেকেই সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়ে আছে তাদের কাছে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে উদ্দেশ্য লাভ ব্যাহত হবে এবং দুই পরাশক্তির প্রতিযোগিতা তারই পরিবেশে সমরাস্ত্র বাণিজ্যকে করেছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। সে রাজনৈতিক কূটনীতির মুকাবিলা করা ভীষণ দুরূহ বলেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলি পরাশক্তি দু'টির যেকোন একটির মুখাপেক্ষী হয়ে সুযোগ-সুবিধা অর্জনে প্রয়াসী। অবশ্য কেউ কেউ নিরপেক্ষ নীতি পালনের নিরাপত্তারও সন্ধান করতে প্রয়াসী। কিন্তু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাম্প্রতিককালের তৈল সম্পদের ভিত্তিতে কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের কিছুটা লক্ষণীয় হলেও সামরিক অস্ত্রসজ্জায় আধুনিক প্রস্তুতিতে এখনো অনেক দূরে রয়েছে তারা। প্রশিক্ষণ এবং সামরিক বিজ্ঞান গবেষণাতেও অনেক দূরে। সে দূরত্ব হ্রাস করার পরিকল্পনাও কঠিন ব্যাপার।

তৃতীয়ত, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অনুন্নত অবস্থা, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা বর্তমান বিশ্বে জিহাদের নীতি অবলম্বনকে ভীষণ সংকটপূর্ণ করে তুলেছে। কারণ বর্তমান বিশ্বে অমুসলিম ও মুনাফিক রাষ্ট্রগুলোই অর্থনৈতিক শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ এবং সমরাস্ত্র উৎপাদনে ও ব্যবহারে বিশেষ পারদর্শী। কুরআনের

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক শিক্ষাই রয়েছে ঃ "মুনাফিকদের শক্তিই দুর্বল, মু'মিন-মুসলিমের সমরশক্তিই এনেছে বিজয়।" কিন্তু বর্তমান বিশ্বেও মু'মিন-মুসলিমকে মুনাফিকদের সমরশক্তির সমকক্ষ হয়ে ঈমানী মনোবল দিয়ে তাদের পরাভূত করার যোগ্যতা অর্জন করার কথা। সে ব্যাপারেই তো প্রয়োজন দ্রুত প্রস্তুতি, সমন্বিত সমঝোতা, সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়াস, দুর্বলতা হ্রাস ও যোগ্যতা দিয়ে বিজয় সম্ভাবনা বৃদ্ধি। সে দিকেই প্রয়োজন মুসলিম 'উম্মাহ্‌র' নিশ্চিত অগ্রগতি। তাহলেই শুধু মুনাফিকদের শক্তিতেও আসতে পারে দুর্বলতা, আসতে পারে ইসলামী নীতির গৌরবোজ্জ্বল নতুন ঊষা।

চতুর্থত, উপরোক্ত সম্ভাবনার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্যে বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতেও সর্বস্তরে প্রস্তুতি প্রয়োজন। 'উম্মাহ' ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনার সঙ্গে প্রয়োজন প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রস্তুতি। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নিজস্ব মূল্যায়ন ভিত্তিতে সম্ভাব্য সব রকম প্রস্তুতির কার্যক্রম প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। দূরদর্শিতাপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে সে কার্যক্রম নানা দিকেই পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হতে পারে। সাংবিধানিক নীতির অধীনে (ক) সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব; (খ) শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব; (গ) পারিবারিক ও ব্যক্তি-চরিত্রে মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামী ঈমান আর জিহাদ সহ সর্ব প্রকার দায়িত্ব পালনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করাও সম্ভব; এবং (ঘ) জ্ঞান গবেষণা ও চিন্তা-মানসে ইসলামী অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা। বিশেষ করে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে অবদান সৃষ্টির সাহায্যে অর্থনৈতিক ও সমর-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পশ্চাদপদতা হ্রাস করা সম্ভব। আরো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হতে পারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাতে সম্পদ ব্যবহারের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ব্যাপারে। ইসলামী অগ্রাধিকার নীতিতে সম্পদের অপচয়কে রোধ করা প্রয়োজন এবং সাধারণ নিয়মে আল্লাহ্‌র পথে সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপযুক্ত সম্পদ ব্যয়ের বরাদ্দ প্রয়োজন। আর জরুরী পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে সম্পদ ত্যাগের নীতিও বাঞ্ছনীয় হবে (যার নির্দেশ রয়েছে সূরা বাকারার ১৯৫ নং আয়াতে)। ইসলামী সমাজ ও ইসলামী ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দিয়েই বর্তমান পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করে সম্মুখে চলতে হবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও। মুনাফিক রাষ্ট্রগুলো থেকে সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য হলে নিজেদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়েই সে সাহায্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। নিজেদের পশ্চাদপদতা হ্রাস করে আত্মনির্ভরশীলতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে ভবিষ্যতকালে সম্ভব হবে, তখনই আত্মপ্রত্যয়ের শক্তি ও ঈমানী শক্তি একত্রিত হয়ে পূর্ণ প্রস্তুতিতে

www.pathagar.com

পরিণত হবে। তার পূর্ব পর্যন্ত মু'মিন-মুসলিমের যথাসাধ্য সম্পদ ব্যবহার, অর্থনৈতিক, সমৃদ্ধির ব্যবহার এবং ত্যাগ স্বীকার হবে উক্ত পূর্ণ প্রস্তুতি নির্মাণের প্রথম পর্ব। জিহাদ প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামকে বোঝায়। শুধু সম্মুখ-সমরে সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার সংগ্রামও জিহাদ। বর্তমানকালের মোটামুটি শান্তিপূর্ণ কাঠামোতেও সংগ্রাম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের ভূমিকা অবলম্বন করবে। প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার পরিকল্পনাও ব্যাপক। আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টি দিয়ে বিশদভাবে পরিকল্পনা করতে গেলে অনেক নতুন দিক-নির্দেশনা এ আয়াতের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যাবে। যেমন অর্থনীতির উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হবে সম্ভাব্য সমর-প্রস্তুতির অর্থনৈতিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়নের উপর অগ্রাধিকার প্রয়োগ ইত্যাদি।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

প্রমাণপঞ্জি

১. তফসীরে ইবনে কাসীর, ১০ম পারা, পৃঃ ৯১-৯২ (উর্দূঃ মাওঃ আবদুর রশিদ নোমানী, আরামবাগ, করাচী)।

২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যালালিল কুরআন, পৃঃ ১৬৮৪-৮৫, ৩য় খণ্ড, ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৯, বৈরুত।

৩. তফসীরে কবীর, ফখরুউদ্দীন আল রাযী, পৃঃ ১৫৭-৫৮, ১৬ খণ্ড, ৮ম সংস্করণ, তেহরান।

৪. তফসীরে ফাতহুল কাদীর, ইমাম শাওকানী, পৃঃ ৩৯০- ৯১, ২য় খণ্ড, বৈরুত।

www.pathagar.com

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

যারা হাজীদের পানি সরবরাহ্ করে এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাদেরকে ওদের মতই সমজ্ঞান কর, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে ? আল্লাহ্র কাছে তারা সমতুল্য নয়, আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম।

-সূরা আত-তাওবা ঃ ১৯-২০

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দ

عمارة المسجد الحرام মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ। দু'টি অর্থ হতে পারে এ আয়াতাংশের (১) শুধু মসজিদটি নির্মাণ ও তার ভৌত রক্ষণাবেক্ষণ; (২) আল্লাহ্র ইবাদত ও যিক্র-এর কাজে মসজিদটি ব্যবহার করা। এই দ্বিতীয় অর্থটিই মসজিদটির প্রকৃত আবাদকরণ। এ অর্থে জিহাদের চাইতেও মসজিদ ব্যবহার করা শ্রেয়তর। তবে প্রথম অর্থে মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ অপেক্ষা অবশ্য জিহাদ শ্রেয়তর। মা'আরেফু কোরআনে এই মত উদ্ধৃত হয়েছে। امن بالله আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা মনে-প্রাণে এবং সব কাজ-কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে তার স্বাভাবিক প্রকাশ।

www.pathagar.com

جاهد فى سبيل الله। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। তাঁর নির্দেশ অনুসারে সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানব জীবন-যাপনের সংগ্রামে জান-মালসহ আত্মনিবেদন।

هاجروا। হিজরত করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে সফল সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ও কাঙ্ক্ষিত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ।

তাফসীর ভিত্তিক আলোচনা

১. আল্লামা ইব্‌ন কাসীর লিখেছেন, ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত, মুশরিকগণ বলত যে, বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও আবাদ এবং হাজীদের পানি সরবরাহ করা ঈমান ও জিহাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তারা এ ব্যাপারে অহংকার ও গর্ব করে বেড়াতো। আর এ অহংকারে মত্ত হয়ে তারা কুরআন ও নবীকে প্রত্যাখ্যান করতো। তখন তাদের এ অসার গর্ব ও অহংকারের প্রতিবাদে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

- তফসীরে ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ-২৪১

২. মুফতী শফী লিখেছেন, ঈমান ও জিহাদ উভয়ই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি সরবরাহের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের মানে মুশরিকদের অসার দাবির খণ্ডন রয়েছে। আর জিহাদের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা মুসলমানদের সে ধারনার বিলোপ সাধন করা হচ্ছে, যাতে তারা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পনি সরবরাহকে জিহাদের চাইতেও পুণ্য কাজ মনে করত।

তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লা পানিপথী বলেন, মসজিদ আবাদ করার অর্থ যদি মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তবে তার চাইতে জিহাদের ফযীলত স্বতঃসিদ্ধ।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার দাবিদার হিসেবে সেবা ও সংগ্রামের (জিহাদের) মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। সংগ্রামের সঙ্গে অবশ্য অপরিহার্যভাবে আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনয়নের গুরুত্বও উল্লিখিত হয়েছে। ঈমান ছাড়া কুফর অবলম্বন করে সংগ্রাম করলে তা জিহাদ হতে পারে না। বায়তুল্লাহ্ শরীফের হেফাজত ও হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করার মতো সেবাকাজ করতেও ঈমান বাঞ্ছনীয়। ঈমান ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে সৎকর্মশীল হওয়া কোন মূল্য বহন করে না আল্লাহ্‌র নির্দেশের ও ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে। বরং সেবাকর্মের পরিবর্তে জিহাদ ও হিজরত করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মোৎসর্গকারীদের মর্যাদা আল্লাহ্‌র নিকট উচ্চতর।

www.pathagar.com

সেবাকার্যে বৈষয়িক ত্যাগ রয়েছে। আবার জিহাদ ও হিজরতেও বৈষয়িক ত্যাগ রয়েছে। আল্লাহ্‌র নিকট কোন্ ত্যাগটি উচ্চতর মর্যাদাবাহী- এ প্রশ্নের জওয়াবই আয়াত দু'টিতে রয়েছে। আচরণগতভাবে জিহাদ আর সেবা-এর মধ্যে কোন্‌টি মু'মিনের জন্য অধিকতর বাঞ্ছনীয়- যদিও উভয়টিতেই বৈষয়িক ত্যাগ রয়েছে ও আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবাহী এটাই আয়াত দুটি থেকে শিক্ষণীয় বলে মনে হয়। জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ও কুফরের পরাজয় ঘটে। কাজেই কওম হিসেবে মুসলিমদের ঐক্য ও শক্তিমত্তা বর্ধনে জিহাদের গুরুত্ব অধিক বলে এখানে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত।

ড. কে. টি হোসাইন

প্রমাণপঞ্জি

১. তফসীর ইব্‌ন কাসীর।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন আল-কুরআনুল করীম (অনুবাদ)।

৩. Abdullah Yusuf Ali; The Holy Quran (Translation & Commentary).

৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী ঃ মা'আরেফুল কোরআন।

৫. মোহাম্মদ তাহের ঃ আল কোরআন তরজমা ও তফসীর।

৬. তফসীর আশরাফী (বাংলা অনুবাদ)

৭. মুআত্তা ইমাম মালিক (ইংরেজী)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ
اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ
يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ. يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ
فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং উহা দ্বারা তাদের ললাটপার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে সে দিন বলা হবে- ইহাই তাহা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।

-সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৪-৩৫

তাফসীরকারগণের মতামত

উপরোক্ত ৩৪ নং আয়াত ইহুদী খৃস্টান পীর-পুরোহিতদের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলাধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহ্‌র সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখছে। গর্হিত পন্থায় সম্পদ ভোগের অর্থ হল অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তাওরাতের শিক্ষা বিরোধী ফতোয়া দান করতো। আবার কখনো তাওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞান-পাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হত। এদের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধির সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয় অর্থের লোভ-লালসা থেকে। এ জন্যে বর্ধিত অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণিত হয়।

"আর তা খরচ করে না আল্লাহ্‌র পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধান মতে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খরচ করে তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থসম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন ঃ যে মালামালের যাকাত দেওয়া হয় তা জমা রাখা সঞ্চিত ধনরত্নের শামিল নয়।" (আবু দাউদ আহমদ) এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা জমা রাখা গুনাহ্ নয়। অধিকাংশ ফকীহ্ ও ঈমাম এ মতের অনুসারী। ৩৫ নং আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট-পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং কৃত আমলই সে আমলের সাজা। অর্থাৎ যে অর্থ-সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয় কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা হয় না, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের রূপ ধারণ করে।'

- মা'আরেফুল কোরআন

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আধুনিক অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের গুরুত্বের কথা বলা হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। আর বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন। বর্তমানের ভোগকে ত্যাগ করে ভবিষ্যতের ভোগের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নই হল পুঁজিবাদী সমাজের মূল লক্ষ্য। পুঁজিবাদী উন্নয়নের অগ্রগতির সাথে সাথে পুঁজিবাদীর হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী উন্নয়ন পদ্ধতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া। কিন্তু এর ফলে ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক অসাম্য সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ও ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন- উভয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর তাই ইসলামে সঞ্চয়ের কথা বলা হয়েছে এবং সাথে সাথে সঞ্চয়ের বৈধ ও অবৈধ উপায়ের কথা বলা হয়েছে, যার উল্লেখ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অনুপস্থিত। ইসলামের দৃষ্টিতে সঞ্চয়ের ঐসব পদ্ধতি বৈধ, যার উপর যাকাত দেওয়া হয়েছে। যাকাত দেওয়ার উদ্দেশ্য হল সমাজ থেকে অসাম্য দূর করা। এর ফলে একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আয়ের সুষম বণ্টন সম্ভব হয় এবং এর ফলে পরবর্তী সময়ে সঞ্চয়ের পরিমাণেরও বৃদ্ধি হয়। বর্তমান অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, দারিদ্র্য

www.pathagar.com

দূরীকরণের সাথে সাথে অধিকতর লোকের আয় বাড়ার সাথে সাথে অর্থনীতির মোট সঞ্চয় ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ার সম্ভাবনা বাড়ে। বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বে সঞ্চয় বাড়ানোর যে প্রচেষ্টা চলছে তাদের জন্য ইসলামের উপরোক্ত পদ্ধতির প্রবৃদ্ধি ও সুষম বণ্টন আনয়নে সহায়ক হবে।

আয়াত দু'টিতে সুস্পষ্টরূপে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ রয়েছে ঃ

প্রথমত, খৃস্টীয় ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ধর্মকে দুনিয়াবী কাজ-কর্ম থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই করেনি বরং শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করার একটি পৈশাচিক চক্র গড়ে তুলছে। তাদের এহেন কার্যকলাপ শুধু ধর্ম ও নৈতিকতার দিক থেকেই ক্ষতিকর নয় বরং সামাজিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক প্রগতির সকল দিক থেকেই আপত্তিকর। কারণ এ ধরনের অবস্থা বিরাজ করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে কার্যকর চাহিদা (effective demand) তা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। দ্বিতীয়ত, সঞ্চয়ের একটি সৎ, বৈধ এবং কল্যাণকর উদ্দেশ্য থাকা চাই। যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে এবং তা আল্লাহ্র পথে খরচ করে না, তাদের আচরণ সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। আল্লাহ্র পথে খরচ করার অর্থ শুধু দান-সাদকা বা যাকাত প্রদানই নয়- মানব কল্যাণের জন্য উৎপাদনশীল খাতে সম্পদের ব্যবহারও এর অন্তর্ভুক্ত। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ যথার্থভাবেই আল্লাহ্র পথে খরচ করা হবে যদি সে উন্নয়ন বৈধ খাতে এবং মানব সাধারণের যথার্থ প্রয়োজন পূরণে কাজে লাগে।

- ড. সালাহ উদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

(হে নবী)! তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করো। তা দিয়ে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবে। তুমি তাদের জন্য দোয়া করবে, তোমার দোয়া তাদের প্রাণে শান্তিদায়ক হবে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

- সূরা আত-তাওবা ঃ ১০৩

প্রেক্ষিত ও তাফসীরকারগণের কিছু অভিমত

উপরোক্ত আয়াতটির প্রেক্ষিত স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয়েছে পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে। বিশেষ করে ৯৭ নং আয়াত থেকে শুরু করে ১০২ নং আয়াত পর্যন্ত এ সকল আয়াতে বেদুইন মরুবাসীদের কুফর ও মুনাফিকীর কথা সাধারণভাবে এবং মদীনাতে হিজরত এমনকি বদর ওহুদের জিহাদে অংশগ্রহণ করার পরে যারা মুনাফিকী করে তাবুকের জিহাদে যোগদান থেকে বিরত ছিল তাদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। অতঃপর সততা ও ঈমানের দৃঢ়তায় যারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিশ্বস্ত অনুচর ও সহগামী হয়েছিল তাদের বিরাট সাফল্য (فوز العظيم) লাভের তুলনায় মুনাফিক অনুশোচনাকারীদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান প্রধান তাফসীরকারগণ ১০৩ নং আয়াতটির প্রত্যক্ষ উপলক্ষ ও বর্ণনা করেছেন। তাদের কিছু অভিমত পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো ঃ

(ক) ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী উল্লেখ করেছেন ঃ অনুশোচনাকারীদের মধ্যে আবূ লুবাবা আওস ও ওয়াদীয়া প্রমুখ কয়েকজন নিজেদের অপরাধের ক্ষমা লাভ করার জন্য অনুতাপে দগ্ধ চিত্তে নিজেদেরকে মসজিদে নববীর দেয়ালের সঙ্গে বেঁধে রাখে। রাসূলুল্লাহ (স.) তাবুকের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন এবং দু'রাকাত নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বাইরে এসে এদের দেয়ালে বাঁধা অবস্থায় দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) জানতে পারলেন যে তারা অনুশোচনাকারী এবং এভাবে বেঁধে ফেলে শপথ করেছে যে তাদের বাঁধন কেউ

www.pathagar.com

যেন না খোলে, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স.) নিজ হাতে তাদের বন্ধনমুক্ত না করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) নিজ হাতে তাদের বন্ধন না খুলে আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রথমে ১০২ নং আয়াতটি ও অতঃপর ১০৩ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। প্রথম আয়াতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, অপরাধ স্বীকারকারী এ ধরনের কিছু লোকের আমল মিশ্র ধরনের। তাতে ভালোও আছে, মন্দও আছে। তবু আল্লাহ্ তাদের অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন। কারণ, তিনি নিশ্চয়ই গফুরুর রাহীম। তার সঙ্গে পরের আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন তাদেরকে বিশুদ্ধ পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে। এ পদ্ধতি তাদের 'তাওবা' কবূল হওয়ার আশায় গ্রহণীয় হতে পারে।

আয়াতটির তাৎপর্য সম্পর্কে তিনটি মতের কথা ইমাম রাযী উল্লেখ করেছেন ঃ (১) কেউ বলেন, আয়াতে هم সর্বনামটির ব্যবহার সংশ্লিষ্ট অনুশোচনকারী, অপরাধী ও ক্ষমাপ্রার্থী লোকদেরকেই বোঝায়। কারণ তারাই তাদের সমস্ত মাল-সম্পদ সাদকাস্বরূপ পেশ করেছিল এবং সে সাদকাকে গ্রহণ করার জন্যই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি নির্দেশ এসেছিল। এ সাদকাকে তাদের কাফ্‌ফারা বলে গণ্য করা যায়। বিশেষ করে হযরত হাসান (রা.) এই মত প্রকাশ করেছেন। (২) দ্বিতীয় অভিমতে বলা হয়েছে যে, যাকাত তাদের ওপর আগে থেকেই 'ওয়াজিব' করা হয়েছিল, কিন্তু সম্পদ-প্রীতির কারণে তারা তা আদায় করেনি। পরে তারা যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তওবা করল এবং উপরোক্তভাবে নিজেদের ঈমানকে সংশোধিত করার উদ্দেশ্যে যাকাত আদায় করল, তখন আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (স.)-কে তা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। (৩) তৃতীয় অভিমতটি হলো ঃ আয়াতটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র বাক্য, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদশালীদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করা। অধিকাংশ ফকীহ্‌র মত এই তৃতীয় অভিমতকেই সমর্থন করে।

(খ) আল্লামা শাওকানীও 'সাদকা' সম্পর্কে ওলামাদের মতভেদের কথা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর উল্লেখ করেছেন ঃ 'সাদকা' ফরয যাকাতই হোক কি 'নফল'দানই হোক- এটা উল্লেখযোগ্য যে, আয়াতে من শব্দটির সাহায্য সম্পদের কিছু পরিমাণ বোঝায়, সমস্ত সম্পদ নয়। উল্লেখ্য যে صدقة শব্দটি মূল صدق থেকে নেয়া, যার অর্থ হলো সত্যতা বা সত্যায়ন। এক্ষেত্রে সাদকা দানকারী সাদকা আদায়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে নিজস্ব নিয়তের সত্যতা প্রমাণ করলো। রাসূলুল্লাহ (স.)-কে আয়াতটির মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ হে নবী! তুমি তাদের মাল থেকে কিছু অংশ সাদকা

www.pathagar.com

হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করে নাও। আয়াতে تزكيهم بها অংশে بها সর্বনাম ব্যবহার রাসূলুল্লাহ (স.)-কে অথবা সাদকাকে নির্দেশ করে। এর অর্থ দাঁড়াবে এমনি ঃ হে নবী! তাদের কাছ থেকে যাকাত বা সাদকা আদায় করে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে অথবা তুমি তাদের কাছ থেকে যে সাদকা আদায় করবে, সে সাদকাই তাদেরকে পবিত্র করবে। এভাবে সাদকা আদায়ের পরে তুমি তাদের জন্য দোয়া করবে। তোমার এ দোয়া তাদের জন্য মনের সান্ত্বনার কারণ হবে।

(গ) আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ আয়াতটির প্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর হযরত মুহাম্মদ বিন সাদের সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অবলম্বন করে তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) যখন আবূ লুবাবা ও তাঁর দু'জন সঙ্গীকে বন্ধনমুক্ত করলেন তখন তাঁরা তাঁদের সমস্ত মাল-সম্পদ এনে পেশ করে বললেন, এ আমাদের মাল, এসব গ্রহণ করে আমাদের পক্ষ থেকে দান করুন আর আমাদের জন্য দোয়া করুন আর আমাদেরকে পবিত্র ও মার্জিত করুন। তার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন যে, এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্‌র আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত এসব মাল গ্রহণ করবেন না। এ প্রেক্ষিতেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(ঘ) ইমাম ইব্ন কাসীর বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন ঃ যদিও কারো কারো মতে আয়াতে উল্লিখিত هم সর্বনাম তাদেরকেই নির্দেশ করে যারা অপরাধ স্বীকার করেছিল, তার ভাল-মন্দ কাজ মিশ্রিতভাবেই করেছিল, প্রকৃতপক্ষে আয়াতটি সাধারণ ধর্মী এবং সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তাঁর বর্ণনাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে ইঙ্গিত ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক লোক যাকাত আদায়ের অধিকার শুধু রাসূলুল্লাহ (স.)-র বলে মনে করতো। خذ من اموالهم আয়াতের ভিত্তিতে এবং পরবর্তীকালে খলীফা ও ইমামদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। আয়াতের এ ভুল ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ করেন হযরত আবু বকর (রা.)-সহ সকল সাহাবা। সে ভুল ব্যাখ্যাকারীদের সঙ্গে সংগ্রামের ফলে সকলের সঙ্গে তারাও খলীফার নিকট যাকাত আদায় করার বিধি পালন করতে বাধ্য হয়।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

প্রেক্ষিত-তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে দু'টি প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ দিক-নির্দেশনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা হলো ঃ (ক) মুনাফিকদের প্রতি ইসলামী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কি ধরনের হওয়া সঙ্গত, (খ) যাকাত ও সাদকার ভূমিকা ও বিধি-নিয়ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা সঙ্গত। প্রথম দিকটিতে আল্লাহ্ ও রাসূল (স.)-এর বিধান অনুসারেই মুনাফিকদের নিজেদের বিপথগামী হওয়ার অপরাধ থেকে

www.pathagar.com

মুক্তিলাভ করার পন্থা বা পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে। মুনাফিকদের মধ্যে যারা যথাযোগ্য অনুশোচনার অনুভূতি প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনার মনোভাব নিয়ে 'তওবা' করবেন, তাদের তওবা আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হতে পারে ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের 'মুনাফিকী' আখ্যার সামাজিক অবজ্ঞা থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। অতঃপর তারা নিজেদের পরিবর্তিত ও পরিশোধিত আচরণ ও নিয়মানুবর্তিতার সাহায্যে সমাজের মু'মিন-মুসলিমের সমতুল্য স্থান লাভ করতে পারবে এবং কল্যাণের ভূমিকা অবলম্বন করে সার্বিক সামাজিক কল্যাণকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে যথাযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

. উপরোক্ত ধরনের ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন সম্ভব হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং রাজনৈতিক-সামাজিক দিক থেকে সমাজের কল্যাণ, স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে অধিকতর অগ্রগতি অর্জন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় দিকটিতে যাকাত ও সাদকার ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে ঃ (১) প্রথমত, উপরোক্ত বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে যাকাত ও সাদকার রাষ্ট্রীয় তহবিলের এবং ব্যক্তিগত সম্পদ হস্তান্তরের ভূমিকা বৃহত্তর হবে। আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার সৃষ্টির ক্ষেত্র এবং সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। (২) দ্বিতীয়ত, ফিকাহবিদদের নীতি নির্ধারণ-এর সাহায্যে যাকাত ও সাদকাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৃহত্তর লক্ষ্যে ব্যাপকতর ভিত্তিতে সংগঠিত করা সম্ভব হবে। তার আইন বিধিগতভাবে প্রণয়ন করা এবং বাস্তবায়িত করা যেমন এক দিকে সম্ভব হবে, অন্যদিকে ভুল বোঝাবুঝি ও বিতর্কিত বিভ্রান্তির সুযোগ হ্রাস করাও সম্ভব হবে। (৩) তৃতীয়ত, 'মুনাফিকী' থেকে সমাজের যে অংশকে রক্ষা করে সমাজে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা হবে তাদের ভূমিকাও হবে ব্যাপক ধর্মী আর স্থায়ী প্রকৃতির। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গে এ ভূমিকাতে একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। সে আধ্যাত্মিক দিকের জন্য সমাজের এই অংশটিও ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকাকেই জীবনের লক্ষ্য মনে করবে, পুনরায় পথচ্যুত হওয়ার কথা চিন্তা করবে না। তাদের আত্মার শান্তি ও ইসলামের প্রতি আত্মসমর্পণের অনুভূতিকে সবল ও সুসংহত করার জন্যেই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দোয়া ও মুনাজাতের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াতে। বর্তমান কালে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলেও একই ধরনের দোয়া ও মুনাজাত উক্ত দায়িত্বে নিযুক্ত বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় আলিম সম্পন্ন করতে পারেন, যাতে করে এতে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় সে নতুন সমাজের

www.pathagar.com

অংশটিতে। সে অনুপ্রেরণার প্রভাব আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যাকাত ও সাদকার বলিষ্ঠ সামাজিক আর অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং সে ভূমিকার সুস্থ প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামী অর্থনীতির অন্তর্গত সামাজিক ন্যায়বিচার যে পুঁজিবাদী অথবা সমাজতন্ত্রবাদী ন্যায় বিচারের চেয়ে অধিকতর স্থিতিশীল ও উন্নতমানের, সে কথা উক্ত বিশিষ্ট ক্ষেত্রটির বিশ্লেষণ থেকেও এভাবে স্পষ্ট বোঝা যায়। (৪) চতুর্থত, এই আয়াতটির অন্তর্গত বাক্যাংশ থেকে যে ফিকাহ ভিত্তিক বিশ্লেষণ, যাকাত আদায় ও বিতরণ নীতিকে শরীয়ত নির্দিষ্ট হয়েছে তার কোন বিতর্কের অবকাশ নেই।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

প্রমাণপঞ্জি

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রণীত আল-কুরআনুল করীম অবলম্বনে অনুবাদ।

২. ফখরুদ্দিন রাযী, তফসীরে কবীর, ১৫-১৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৪-৭৭।

৩. মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, তফসীরে ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৯-৪০০।

৪. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী- যিলালিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭০৭-১৭০৮।

৫. তফসীরে ইবনে কাসীর, ১১ পারা, পৃষ্ঠা ৭-৯ (উর্দু অনুবাদ মাওলানা আবদুর রশিদ নোমানী, আরামবাগ, করাচী)।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইউনুস

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

তিনি সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং মনযিল (তিথি) নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে বছর গণনা ও সময়ের হিসেব জানতে পার। এ আল্লাহ্ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। – সূরা ইউনুস ঃ ৫

তাফসীরকারদের ব্যাখ্যা

সূরা ইউনুসের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী তাঁর তাফসীর 'ফাতহুল কাদীর'-এ লিখেছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কতকগুলো নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর অস্তিত্ব, একত্ববাদ, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার প্রমাণ দেয় এবং চন্দ্র ও সূর্য- এ দুটোতে তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে। এ বিষয়টি আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং আরশে তাঁর সমাসীন হওয়ার বিষয় বর্ণনার পরে উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন। বলা বাহুল্য, সূর্য উত্তাপ ও আলো দান করে, অন্যদিকে চাঁদ কেবল আলো দান করে। তাফসীর প্রণেতা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন সূর্যকে ضياء কিরণময় আর চন্দ্রকে نور আলোময় করেছেন এবং চাঁদের জন্য গতিপথ منازل বা তিথিসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। চাঁদ সেসব গতিপথ অতিক্রম করে, যার ফলে মানুষ বর্ষ গণনা ও হিসেব-নিকেশ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এ জ্ঞান তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য বিভিন্ন কাজ-কর্মে, কৃষি ও ক্ষেত-খামারে উৎপাদনে সহায়তা করে এবং গ্রীষ্মকালের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তাফসীরকার আরো

www.pathagar.com

বলেছেন, সৃষ্টিজগতের জন্য সূর্যের কিরণ এবং চাঁদের আলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে এবং সূর্যের গতিবিধিতে বিভিন্ন ঋতুর সৃষ্টি হয়। আর এই ঋতু বা মৌসুমের প্রভাবে পৃথিবীতে বহুবিধ কল্যাণকর কাজ সাধিত হয়। আবার চাঁদের গতিবিধিতে মাসগুলো বেরিয়ে আসে আর এরই আলোর কম ও বেশীর ব্যতিক্রমে পৃথিবীর আর্দ্রতায় ব্যবধান ঘটে। প্রতিদিনের এরূপ গতিবিধিতেই দিন-রাতের সৃষ্টি হয়।

-তাফসীরে কবীর, ফখরুদ্দিন রাযী, ১ম খণ্ড, ৩৩ ও ৩৬ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে চন্দ্র-সূর্যের প্রভাব সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল। আয়াতটি মূলত আল্লাহ্ পাকই যে বিশ্বচরাচরের সব কিছুরই স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক তার স্মারক। বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়বস্তু সময় এবং সংখ্যাও আল্লাহ্রই সৃষ্টি। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সময় ও সংখ্যা তথা ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর এবং হিসেব ও অংকশাস্ত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা স্মরণ করিয়ে ধরেছেন এবং মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এসব কিছুই উদ্দেশ্যহীনভাবে তৈরী করা হয়নি। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বিজ্ঞান চর্চা ঔচিত্য বিবর্জিত হতে পারে না। এমন কি জ্ঞানও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি হয়নি। এই পৃথিবী তথা মানুষ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যের কথা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থনৈতিক জগতে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম আল্লাহ্র উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম। আল্লাহ্ সময় সৃষ্টি করেছেন মানুষেরই জন্য বা কল্যাণের সর্বাধিকরণের উদ্দেশ্যে। ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছর তথা সময়ের হিসেব ছাড়া উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, আয় ও ব্যয় তথা যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একেবারেই চিন্তা করা যায় না।

অন্যদিকে পৃথিবীর জলবায়ু ও পরিবেশ সূর্যকিরণ এবং পৃথিবী ও চাঁদের গতিপথ ও অবস্থানের (منازل) উপর নির্ভরশীল। আবার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এই জলবায়ু ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। জমির উর্বরতা, ফসলের পরিমাণ, ফসল পাকার ন্যূনতম সময়, ফসলের হেফাযত-সবকিছুই নির্ভর করে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর। শিল্প ও পরিবহন জগতেও আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব সুস্পষ্ট। মোটকথা আল্লাহ্র দেয়া অসংখ্য নিয়ামতের উপর নির্ভরশীল আমাদের উৎপাদন তথা গোটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। আল্লাহ্ অন্য এক আয়াতে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً.

আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে এসব কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। -সূরা সাদ ঃ ২৭

দেখা যাচ্ছে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌রই দেয়া অগণিত উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে। এমতাবস্থায় অর্থনীতিতে উৎপন্ন সম্পদ বণ্টনের সময় কেবল মাত্র দৃশ্য (visible) উপাদানের অংশ নির্ধারণ করলেই চলবে না। বরং অদৃশ্য উপাদানের (invisible factors) হিস্‌সা ও কর্তব্য যাকাত তথা অন্যান্য সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের হিস্‌সা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আদায় হতে পারে। অনাদায়ী অংশ আল্লাহ্‌র নেয়ামত (উৎপাদনকারী) বান্দা ভোগ করবেন এবং সে জন্য শুকরগুযারী করবে। নিজের চেষ্টায়ই সব করেছে- এ দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কারণ তা অসম্ভব।

আলোচ্য আয়াতে আরেকটি বিশেষ দিক বিবেচ্য। সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনের ফলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সময়, দিন, মাস, বছরের যে বিবর্তন কিংবা ঋতুর যে পরিবর্তন তা আখিরাতের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত ও তুচ্ছ। কাজেই আমাদের প্রাত্যহিক কাজে-কর্মে ও ব্যবহারে তা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সূরা হূদ-এর ৩ নং আয়াতেও يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে সময়ের সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে।

- ডঃ আলী আহমদ রুশদী

www.pathagar.com

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

অতঃপর আমরা তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ কর তা দেখার জন্য। - সূরা ইউনুস ঃ ১৪

'খলীফা' শব্দের ব্যাখ্যা

খলীফা (خليفة) এ আয়াতে 'খালায়েফ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর একবচন হচ্ছে 'খলীফা'। 'খলীফা' শব্দ কুরআন মজীদের ব্যবহৃত একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। 'খলীফা' শব্দের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেন ঃ 'খলীফা' তাকে বলা হয়, যে অন্য কারো মালিকানায় তারই প্রদত্ত ক্ষমতা ইখতিয়ার ব্যবহার করে। খলীফা কখনো মালিক হতে পারে না। প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা, কামনা অনুসরণ করা তার কর্তব্য হয়।

এমতাবস্থায় সে যদি নিজে মালিক হওয়ার দাবী করে বসে এবং মালিক প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ খামখেয়ালীভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে কিংবা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক মনে করে তারই ইচ্ছা-বাসনা অনুসরণ এবং তারই আদর্শ পালন করতে শুরু করে, তবে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতামূলক পদক্ষেপ।

-তাফহীমুল কোরআন, সূরা বাকারার তাফসীর, ৩৮ নং টীকা

খিলাফতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কিত একটি পরিশিষ্ট আলাদা করে এ গ্রন্থে সংযোজন করা হয়েছে।

তাফসীরকারদের মতামত

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা মুফতী শফী লিখেছেন, "পূর্ববর্তী জাতি সম্প্রদায়ের ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি এবং পৃথিবীর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করেছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীতে খিলাফতী কেবল ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের আসল উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

হলো তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া--তোমরা কি বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা সংশোধন কর, না রাষ্ট্র ও ধনদৌলতের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়। এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো অহংকারের বিষয় নয় বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়-দায়িত্ব।

-- মা'আরেফুল কোরআন, সূরা ইউনুসের ১৪ নং আয়াতের তাফসীর

আয়াতের সাধারণ অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা ইউনুসের ১১-১৩ নং আয়াতে আল্লাহ্কে অমান্যকারীদের পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক পূর্ববর্তীদের পরিবর্তে নতুন লোকদের পৃথিবীতে দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে তিনি তাদের আচরণ লক্ষ্য করতে পারেন।

এ আয়াতে মানুষের আচরণের (behaviour) গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের আচরণের ভাল-মন্দের জন্যই আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে এক জাতির পর অন্য জাতির উত্থান করেন অর্থাৎ মানুষের আচরণ ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের বড় কারণ অর্থাৎ কুরআনের অন্যান্য আয়াতে মানুষের ঈমান বা সঠিক বিশ্বাসকেও জাতির কল্যাণ-অকল্যাণের কারণ বলা হয়েছে। সূরা আসরে আল্লাহ্ পাক উল্লেখ করছেন, "সময়ের সাক্ষ্য। মানুষ সব সময় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, ভাল কাজ করেছে, একে অপরকে সত্যের পথে এবং ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে।"

খিলাফতের অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রথম বলা হচ্ছে যে মানুষ রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র খলীফা। রাব্বুল আলামীন-এর অন্যতম অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ সব জীবের প্রতিপালক। তাই রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে অন্য সব মানুষ ও জীবের জীবিকা ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের উল্লেখ করা যায়।

"পৃথিবীর সকল প্রাণীর রিযকের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর।" -- সূরা হূদ ঃ ৬

"আমার ইচ্ছা যে দুনিয়াতে যারা বিস্তৃত তাদের উপর মেহেরবানী করব এবং তাদেরকে দুনিয়াতে ইমাম বানাব, দুনিয়াতে তাদেরকে আমার উত্তরাধিকারী করব এবং পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা দান করব।" -- সূরা কাসাস ঃ ৫

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ থেকে আমার রিয্ক পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব বিশেষ করে মুসলিম সরকারের

www.pathagar.com

আরো বেশি। কেননা তারা গোটা জাতির পক্ষ থেকেও দায়িত্বপ্রাপ্ত। তেমনিভাবে নির্যাতিত জনগণের নির্যাতন দূর করাও খলীফা হিসেবে সবার এবং বিশেষ করে সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, খিলাফতের নীতিটিই প্রধান গুরুত্বের দাবীদার। তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু যখন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বা জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করতে হয়, তখন অবস্থা বিশেষে পরিবর্তন করা যেতে পারে, যদি তাতে শরীয়তের কোন প্রমাণিত নীতির লংঘন না হয়।

এ আয়াতে যে খিলাফতের কথা বলা হয়েছে তাতে অর্থনৈতিক খিলাফতের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক খিলাফতের নীতিও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। খিলাফতের অর্থনৈতিক নীতি হচ্ছে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জনগণের সম্মতিতে গ্রহণ করতে হবে। জাতির অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত হতে জনগণকে বাদ দেওয়া যাবে না। এ যুগে তা করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। স্বাধীন পত্র-পত্রিকাও এ ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ আয়াতের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ্ পাক মানুষের আচরণ লক্ষ করেন। এ আচরণের মধ্যে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক আচরণও অন্তর্ভুক্ত। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের জন্য সে আল্লাহ্র নিকট দায়ী। মানুষকে তার অর্থনৈতিক আচরণের জন্য আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। মুসলিম সরকারও তেমনিভাবে আল্লাহ্র নিকট দায়ী, মুসলিম শাসকগণ সম্পর্কেও একই কথা। তাই মানুষ যদি আল্লাহ্র অনুগত হয়, তাহলে সে অবশ্যই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসরণ করবে। কোন অর্থনৈতিক জুলুম করবে না বরং অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের জন্য জবাবদিহি (accountabilty) ইসলামের বৈশিষ্ট্য, যা এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ
وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا اللّٰهَ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشّٰكِرِيْنَ فَلَمَّا اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ لا مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ
اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا
يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰى اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا لا اَتٰهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا
فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ. وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

তিনি আল্লাহ্-ই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমনকি তোমরা নৌকায় আরোহণ করে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ স্ফূর্তিতে সফর করতে থাক, আর সহসাই বিপরীতমুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারদিক থেকে তরঙ্গের আঘাত এসে ধাক্কাদেয়, মুসাফির মনে করে যে তারা ঝন্‌ঝায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দীনকে আল্লাহ্‌রই জন্য পবিত্র করে তাঁরই নিকট দোয়া করে যে, তুমি যদি আমাদের

www.pathagar.com

এই বিপদ থেকে রক্ষা কর তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ-অনুগত বান্দাদের অন্তর্গত হয়ে থাকব। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন আবার তারা সত্য থেকে বিমুখ হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ শুরু করে। হে মানুষগণ! তোমাদের এই বিদ্রোহ উল্টা তোমাদেরই বিরুদ্ধে পড়ছে। পার্থিব জীবনের কয়েক দিনের আনন্দ সামগ্রী মাত্র (ভোগ করিয়া লও)। শেষ পর্যন্ত আমাদের নিকটই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তোমাদের বলব, তোমরা কি সব এবং কি ধরনের কাজকর্ম করতে। পৃথিবীর এ জীবনের দৃষ্টান্ত হল এমন, যেন আকাশ থেকে আমরা পানি বর্ষণ করলাম, তার ফলে জমির উৎপাদন যা মানুষে ও পশু/জন্তু আহার করে, যথেষ্ট পুঞ্জীভূত হল। পরে ঠিক সময় যখন যমীন ফসল ভারাক্রান্ত আর ক্ষেত-খামারগুলো শস্য-শ্যামল, চাকচিক্যময়, তখন সহসা রাত্রিকালে কিংবা দিনের বেলায় আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছল এবং আমরা তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেললাম মনে হবে গতকাল সেখানে কিছুই ছিল না। এইভাবেই নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে পেশ করি তাদের জন্য, যারা চিন্তাশীল। অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে চিরস্থায়ী শান্তিধামের দিকে আহবান জানাচ্ছেন। যাকে তিনি চান সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। - সূরা ইউনুসঃ ২২-২৫

আয়াত চারটির পটভূমি ও সারকথা

গবেষকগণ মনে করেন, এ সূরা রাসূলে করীম (স.)-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। মাওলানা মওদূদীর (র.) এ সূরার সূচনার অনুবাদে ভাষ্য রয়েছে এ রকম ঃ --এর বাচনভংগী হতে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, এ সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা এবং প্রতিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছে। তারা নবী ও নবীর অনুসারীদের অস্তিত্ব পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বরদাশ্ত করতে প্রস্তুত নয়। কোনরূপ উপদেশ নসীহতের ফলে তারা সত্যের পথে ফিরে আসবে–তাদের সম্পর্কে এমন কোন আশা পোষণ করা যায় না। কাজেই নবী (স.)-কে শেষবারের মতো প্রত্যাখ্যান করার অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার সময় এখন উপস্থিত। এমনি প্রেক্ষিতে উপরোক্ত চারটি আয়াতের বক্তব্যে স্পষ্টই বোঝা যায়। বিরুদ্ধবাদী কুরায়শদের স্পষ্ট কথায় সতর্ক করে দিয়ে তাদের বিপরীতধর্মী কাজের পরিণতি কি হবে তার ধারনাকে নিদর্শন সাহায্যে বিশেষভাবে গভীরধর্মী করা হয়েছে। তার মধ্যেই আবার অন্তর্নিহিত রয়ে গেছে পার্থিব জীবনের বহুমুখী চিত্র সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে। প্রথম আয়াতটিতে দেখা যায়, ঈমান সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষের

www.pathagar.com

মনের যে দুর্বলতা কার্যকর থাকে তারই নির্ভর-যোগ্যহীনতার প্রকৃতি। দ্বিতীয় আয়াতে বোঝা যাচ্ছে–উপরোক্ত ধরনের দুর্বলচিত্ত মানুষের বিপদকালে পরীক্ষা শেষ হলেই সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আচরণ তার স্বভাবসিদ্ধ রূপ হয়ে প্রকাশ পায়। তৃতীয় আয়াতটিতে তারই প্রেক্ষিতে সত্যের পথ বর্জন না করার জন্য শেষবারের মত পথ-নির্দেশনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে–পরিণতি হবে ভয়ংকর এবং অনিবার্য। সে যুক্তিতেও যদি সত্য বর্জনকারী ফিরে আসে সত্য পথে, তা হলে প্রত্যাবর্তনকারী মানুষেরই বিপুল সম্পদ লাভ হবে। চতুর্থ আয়াতে তারই আভাস দেওয়া হয়েছে। সে হলো স্থায়ী সুখ-শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছার পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি। দারুস সালাম জান্নাত। সেখানে অবস্থানের বা অবস্থান দানের জন্য আল্লাহ্ দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি।

"তারাই তখন সত্যের প্রতি বিমুখ হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। অথচ এ বিদ্রোহের পরিণামে মানুষদের নিজেদেরই ক্ষতি।"

গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ সম্পর্কে

২১ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "লোকদের অবস্থা এই যে, বিপদের পরে আমরা যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দান করি, তখন তারা সহসাই আমাদের আয়াত ও নিদর্শনের ব্যাপারে চালবাজি শুরু করে দেয়"। এই চালবাজি হলো প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ ও প্রতারণা। প্রকৃতপক্ষে বিপদের আবির্ভাব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক নিদর্শন, যার সাহায্যে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন মানুষের পার্থিব জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তির মধ্যে হঠাৎ আকস্মিকভাবে বিপন্ন অনুভব করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করে। তারা প্রার্থনা করতে থাকে, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে রক্ষা কর, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।" কিন্তু বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পরেই তারা শুরু করে সত্যের বিরুদ্ধে ও সত্য-নির্ভর জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ আসে দুর্বিনীত অহংকার থেকে।

আল-কুরআনের সূরা আন'আমে আয়াত নং ৬৩ ও ৬৪-তেও এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ঃ মরু প্রান্তরের ও নদী সমুদ্রের পুঞ্জীভুত অন্ধকারে তোমাদের কে রক্ষা করেন ? কার সম্মুখে (বিপদের সময়) কাতর কণ্ঠে ও চুপে চুপে প্রার্থনা ও দোয়া করতে থাক ? কাকে বল যে তিনি তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করলে তোমরা অবশ্যই শোকরগুযার বান্দা হবে ? বল, আল্লাহ্ই তোমাকে তা হতে মুক্তিদান করেন, তাহলে অপরকে তোমরা তার শরীক মনে করছ কেন ? মানুষের মন ও মানসিকতার

www.pathagar.com

সংগঠন যদি আল্লাহ্ও রাসূলুল্লাহ (স.)-র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তিতে হয় তাহলে যার চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা বিপর্যয় ডেকে আনে না, ঈমানের দুর্বলতার অভাবে মানুষকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত পরীক্ষা স্থায়ীভাবে উত্তীর্ণ হতে দেয় না–পরীক্ষা অতিবাহিত হলেই আবার তাকে বিপথগামী অথবা প্রতারকে পরিণত করে।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টি তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয় না, মৃত্যুকালেও তেমনি তার নিজস্ব ক্ষমতা কোন কাজে আসে না, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হয়েই মানুষকে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হতে হয় এবং আরো অসংখ্য সৃষ্ট জীবের সঙ্গে থেকেও পার্থিব জীবনে মানুষকে স্বতন্ত্র ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়। সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুসরণ করেই তাকে এ স্বতন্ত্র ভূমিকার সাফল্য বা কার্য কুশলতা প্রদর্শন করতে হয়। উক্ত বিধান জানতে হলেই তো কুরআন ও সুন্নাহর বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সত্য পথ, সঠিক পথ চিনতে হয় ও অবলম্বন করতে হয়। যে সকল মানুষ তা করতে চায় না অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবেই সত্যকে বর্জন করে, সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অসত্যকেই জীবন দর্শন বলে মেনে নেয় তাকে ব্যক্তি পর্যায়ে, সামাজিক পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পালন করাকেই কর্তব্য ও দায়িত্ব মনে করে; সে সকল মানুষ, তাদের চিন্তাধারা, তাদের আচরণ, তাদের সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি সৃষ্টিকর্তার বিধানের পরিপন্থী। সে কারণেই তা প্রকৃত মানব কল্যাণের বিরোধী। সেজন্যই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ আয়াতের বাণী দিয়ে যথা প্রয়োজনীয় সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল মানুষকে সতর্ক করেছেন। সে সতর্কতার বাণীতে মানবতার ইতিহাস থেকে সাক্ষ্য ও নিদর্শন মানুষের সত্যের চেতনা জাগ্রত করার শক্তিরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের দুর্বল চরিত্র ও নেতৃত্বের মিথ্যা দম্ভ কোন কোন যুগে সত্যকে শুধু প্রত্যাখ্যান নয়, অবমাননা করেছে আর নিজেদের ধ্বংসকে ডেকে এনেছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে সেসব ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের ফলেই আজ মানবতা খণ্ড-বিখণ্ড। এক সত্যে নির্ভরশীল এক আদর্শবাদ আর জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাও গড়ে উঠেনি। তারই মধ্যে চলছে মানবতার মৌল দায়িত্ব ও কর্তব্যের অব্যাহত অগ্নি পরীক্ষার নতুন ধারা। সে ধারার ইতিহাস নতুনরূপে বিবর্তনশীল। ইসলামী আদর্শবাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতাভিত্তিক পূর্ণ প্রতিফলনের পরে জড়বাদী পথে ধর্ম বর্জিত পথে শক্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে দ্বন্দ্বের ও

www.pathagar.com

সংঘাতের প্রতিযোগিতায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমরাস্ত্র ব্যবহারের প্রেক্ষিতে চলছে সত্যবিচ্যুত রূপের ভাঙ্গা-গড়ার প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়ায় ইসলামী আদর্শবাদকে ঔদাসীন্য বর্জন করে নিতে হবে সক্রিয় আত্মপ্রতিষ্ঠার উজ্জীবনী ভূমিকা। তেমনি নতুন পটভূমির দৃষ্টিকোণ থেকে দিক-নির্দেশনা সন্ধান করার প্রয়োজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদেরই সর্বাগ্রে। উপরোক্ত আয়াত চারটিকে নতুন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে গেলে তেমনি দিক-নির্দেশনার রূপরেখা মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যেই আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে বিকশিত হতে থাকবে। সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি প্রধান দিকে আভাস দিতে তাই প্রয়াস করছি যেমন ঃ

১. প্রথমত, ইসলামী আদর্শবাদ সাহায্যে সমাজ ও সভ্যতা গড়ার ইতিহাসকে যারা নিজস্ব ইতিহাস বলে স্বীকার করেন, তারা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য নিয়ে আংশিক প্রতিফলনকে বা সামান্য আনুষ্ঠানিকতাকে সর্বস্ব মনে করলে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হবে। তাদেরকে সামগ্রিক মানব কল্যাণের দিক থেকে কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসেবেই চিরসত্যের জ্ঞানকে প্রকৃত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সমর্থনে অনুসন্ধান, পরিবেশন ও অনুসরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ঈমানকে অটুট রেখে জ্ঞানকে অনুসন্ধান করলে, অনুশীলন, বিশ্লেষণ ও গবেষণার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে সত্য প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার জ্ঞান-গত ও তথ্যগত জ্ঞান। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান প্রয়োগের শিল্পজ্ঞান, পণ্য উৎপাদন জ্ঞান, আত্মরক্ষার সমরাস্ত্র নির্মাণ জ্ঞান ইত্যাদি সর্বমুখী জ্ঞান। সর্বমুখী এমনি জ্ঞানের সন্ধানে বিকাশ ও বিতরণই বুঝিয়ে দেবে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইহকাল পরকালের সামগ্রিক মানবজীবনের সাফল্য কিভাবে অর্জন করা যায়।

২. দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের কাঠামো থেকেই পরিস্ফুট হবে আয়াত চারটিতে উল্লেখ করা ইহকাল ও পরকালের জীবন সত্য। পরকালের জীবন সত্য (শেষ আয়াতটিতে) স্পষ্ট করে দিয়েছে মানুষের জীবন সংগঠন ও জীবন পরিচালনার কি উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত। দারুস সালাম বা শান্তির চিরসুন্দর ধামে জান্নাতে অবস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা, যদি জীবনকে সত্য প্রতিষ্ঠিত ঈমান পরিচালিত নীতি, রীতি, আইন ও পরিকল্পনা দিয়ে নিজের পরিবারের জন্য, প্রতিবেশীর জন্য, সমাজের জন্য এবং বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণসমৃদ্ধ করা যায়।

৩. তৃতীয়ত, উপরোক্ত সার্বিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন-এর শর্তের মধ্যেই রয়েছে মানুষের আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো

www.pathagar.com

সংগঠনকে করতে হবে উপরোক্ত লক্ষ্যের উপযোগী। আর সে কাঠামোতে সমন্বিত ও অঙ্গীভূত থাকবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

তাহলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন দিক (যেমন ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, পণ্য উৎপাদন--কৃষিতে ও শিল্পে বিতরণ ও বণ্টন, বাজারজাতকরণ, পরিবহন, ব্যাংকিং, সরকারি-বেসরকারি অর্থনৈতিক উদ্যম ও দায়িত্ব ইত্যাদি কখনও হবে না লক্ষ্যভ্রষ্ট ও পথচ্যুত। লক্ষ্যভ্রষ্ট ও পথচ্যুত হওয়া মানেই হলো বিশ্বস্রষ্টার নির্দেশিত সত্যের অনুসরণ থেকে ও জীবন-পদ্ধতি থেকে বিপথগামী হওয়া। আর অহংকারের সঙ্গে অসত্যকে বিপরীতধর্মী পদ্ধতি অবলম্বন সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রয়াস হলো সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহকে স্বীকার করে নেওয়া সৃষ্টিকর্তার কল্যাণধর্মী ন্যায়বিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেজন্যেই মানবতার কল্যাণবিরোধী বিদ্রোহকে ঐতিহাসিক বিধানই সত্যচারী নেতৃত্বের অধীনস্থ নানা জাতির নিশ্চিহ্ন হওয়ায় নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়। সে ঐতিহাসিক শিক্ষার ভিত্তিতেই বিভিন্ন সমাজ গোষ্ঠীকে, পৃথিবীতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, সৃষ্টিকর্তা নির্দেশিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে হয় এবং সামাজিক আর অর্থনৈতিক কাঠামোকে ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে ভারসাম্যমূলক করে গড়তে হয়। শুধু গড়লেই হয় না, তেমনি মানদণ্ড বহাল রাখতে হয় এবং ক্রিয়াশীল ও গতিশীল রূপ দিয়ে ইহকাল পরকালেরই দীর্ঘতম জীবনের কল্যাণভিত্তিক লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হয়।

৪. চতুর্থত, ইতিহাসের অব্যর্থ শিক্ষা গ্রহণ না করে এবং যথার্থ সমাজবোধ ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের কল্যাণ উপলব্ধি না করে আধুনিক ইতিহাসের উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভিন্ন পথে কোন কোন জাতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে নতুন নতুন ব্যবস্থার ভাবমূর্তি।

প্রধানত, সেগুলো হলো পুঁজিবাদ, কম্যুনিস্টবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। সাম্প্রতিক মূল্যায়ন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তিনটি জড়বাদী আংশিক জীবনেরও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা সত্যনির্ভর ছিল না বলেই স্থিরতা লাভ করতে পারেনি। স্থায়ী সমাজবোধ, জীবনবোধ ও মূল্যবোধ ভিত্তি করে, বিবর্তনকে জীবনের দীর্ঘতম লক্ষ্যের দিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আচরণ এবং প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করতে পারেনি তিনটি ভাবমূর্তির পূজারী পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ। গণতন্ত্রগর্বিত ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শ্রমিকের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েও জীবনকে আর সমাজকে অপরাধ, অশান্তি ও নৈতিক অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর চীনদেশের মাওবাদ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিস্টদের কম্যুনিস্টবাদ রক্ষণশীল

www.pathagar.com

পন্থায় নিজস্ব কঠোর শৃঙ্খলা বর্জন করে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের দিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যকর করার পন্থা অবলম্বন করে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদেরও ভিত্তি-গড়ার নতুন অভিযান শুরু হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে চীনের ও রাশিয়ার কঠোর কম্যুনিস্টবাদ। সে কারণেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাহায্যে পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণ সাহায্যে ক্ষতিপূরণ করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে তাদের সংস্কারে। কিন্তু সে প্রয়াসের দরজা জানালা উন্মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজে ও অর্থনীতিতে শুরু হয়েছে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী মুনাফাপ্রীতি, অপরাধ প্রবণতা, মাদকাসক্তি, ভিক্ষাবৃদ্ধি এবং যৌন স্বেচ্ছাচারিতা। সমাজবোধ ও মূল্যবোধের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার অক্ষমতা এমনিভাবে তিনটি পথচ্যুত ভিন্নপন্থী ব্যবস্থাতেই ঐতিহাসিকভাবে প্রকটিত হাচ্ছে। অস্থিরতায়, অনৈতিকতায়, মানবিকতার অমর্যাদায় এবং বিপুল অবক্ষয় সম্পদ অপচয়ের নিদর্শনে।

৫. পঞ্চমত, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমৃদ্ধির শক্তি আহরণ প্রয়োজন বলে তারই নির্মাণকৌশল প্রয়োগ নিয়ে তিনটি পথচ্যুত ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযেগিতা। সে প্রতিযোগিতাতে সাফল্যের চাবিকাঠি এনে দেয় বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি। সে চাবিকাঠি হস্তগত করার পন্থা হিসেবেই তিনটি বিপরীতমুখী ব্যবস্থার একই দিকে নতুন সমঝোতা সহযোগিতার গতি। সে হলো আধুনিকীকরণের দিক। নৈতিকতার দিক থেকে মানবতার চরিত্রগত ভাবমূর্তি নির্মাণ এ সকল ব্যবস্থার লক্ষ্য নয়। ইসলামী নৈতিকতা ও অর্থনীতিতে রয়েছে সে লক্ষের সংযোজন। সেজন্যেই ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতি মানুষের ব্যাপক কল্যাণের চাহিদা মেটাতে পারে। বর্তমান বিশ্বের বিগত দুই শতাব্দির ইতিহাসে ভিন্নভিত্তির আংশিক ব্যবস্থা তিনটির আংশিক প্রয়াসের ভারসাম্যহীন ফলাফল হয়েছে কিন্ত কল্যাণের সঙ্গে ব্যাপক অকল্যাণ সৃষ্টি আর প্রতিযোগিতার মুল্যায়ন লাভ ক্ষতির পুনর্বিন্যাস করে সংস্কার সাহায্যে একই পরিণতি সৃষ্টি। সুতরাং আসল কথা হলো স্থায়ী সমাজবোধ ও মূল্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার পন্থাকে গ্রহণ ও সর্বাত্মকভাবে বাস্তবায়ন। সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবোর্চ্চ কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যেকে সমুন্নত রাখার জন্যই আল-কুরআনের উল্লিখিত চারটি আয়াতে মানব জাতিকে আহবান করা হয়েছে। সে ব্রত পালনের পুরস্কারই দারুস সালাম। পরিপূর্ণ শান্তির ধামে বা বেহেশতে পরলোকে অবস্থান ইহকালে কঠিন ভারসাম্য ও কল্যাণের পথকে আকড়ে থাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এ পুরস্কার যার স্থায়িত্ব কালজয়ী ও সীমাহীন।

www.pathagar.com

৬. ষষ্ঠত একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ইসলামী সভ্যতা ও সুসমন্বিত সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা আর অর্থনীতির গৌরবোজ্জল আদর্শবাদের প্রয়োজন ও উত্থান-পতনের ইতিহাস রয়েছে। বর্তমানকালে সে আদর্শবাদ অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ অবস্থানে আছে। সেজন্যই মানবতার সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জনের আদর্শকে সমুজ্জ্বল রেখে বিশ্বের[১] প্রতিযোগিতায় কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সর্বোত্তম জীবনবিধান ও সমাজবিধান-এর নিদর্শন প্রদর্শন করতে পারছেন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি তারা নানা পর্যায়ে ও নানা মাত্রায় বিপর্যয় ও বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে নিজেদের দুর্বলতা, সংগঠনহীনতা এবং আরো অন্যান্য কারণে। তাতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা যায় মসলিম দেশগুলোর সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তাঁর বাস্তবায়নকে। জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও উম্মা পর্যায়েই প্রয়োজন এসবের। মুসলিম দেশগুলোতে তার সুচিন্তিত প্রস্তুতি আনবে নতুন আশার আলো।

- অধ্যাপক রায়হান শরীফ

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বাংলা অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী, তরজমায়ে কুরআন মীজদ, ফালাই-ই আম ট্রাস্ট।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হূদ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, যার রিয্ক দানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর নয়, আর যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছু এক স্পষ্ট গ্রন্থলিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। – সূরা হূদ ঃ ৬

আয়াতের প্রেক্ষিত ও সারমর্ম

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সূরা হূদের প্রেক্ষিতকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা.) নবী করীম (স.)-এর নিকট আরয করলেন ঃ 'আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি ক্রমে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। এর কারণ কি? জওয়াবে নবী করীম (স.) বললেন ঃ 'সূরা হূদ ও তার সমবিষয়ক সূরাগুলিই আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।'

এ হতে ধারণা করা যায়, নবী করীম (স.)-এর পক্ষে কত কঠোর ছিল সেই সময়টি, যখন একদিকে কাফির কুরায়শগণ নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ইসলামের দাওয়াতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খতম করার জন্য ব্যবহার করছিল, আর অপর দিকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে পর পর নানাবিধ কঠোর ভাষার তাকীদ ও তাসবীহ্ আসছিল। এরূপ অবস্থায় রাসূলে করীম (স.) প্রতি মুহূর্তে ভয় পাচ্ছিলেন ... ভয়ে দ্রবীভূত হচ্ছিলেন যে, কোন্ সময় না জানি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া সময়ের অবসর চিরদিনের

www.pathagar.com

জন্যে শেষ হয়ে যায়। আর সেই শেষ মুহূর্তও এসে পড়ে যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতিকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সূরা পাঠ করার সময় অনুভূত হয়, যেন এক মহাপ্লাবনের বাঁধ এখনি ভেঙ্গে যাবে। আর এ বন্যার গ্রাসে যে জনতা পড়বে, তাদের শেষবারের মতো হুঁশিয়ার করে দেওয়া হচ্ছে।

একটি বিপথগামী জাতিকে সতর্ক করার চরম পর্যায়েও আল্লাহ্ তা'আলা কিছু অবকাশ দান করেন, যাতে সে জাতি হূদ সূরায় বর্ণিত আ'দ, সামুদ, মিদিয়ানী ইত্যাদি কঠিন প্রকৃতির, অপরিশোধনযোগ্য এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য জাতির মতো না হয়ে পড়ে। কারণ তাহলে তো আর সত্যের পথে ঈমানের পথে সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের সুযোগও শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ্ চান সে সুযোগ খোলা থাক। রাসূলুল্লাহ (স.)-ও চান, সে জাতি সতর্কবাণী গ্রহণ করুক এবং ধ্বংসের কঠোর শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হোক– শেষ পর্যায়ে হলেও সক্ষম হোক। কুরায়শ জাতির কঠোর বিরোধিতার ভীষণতম পর্যায়েও তিনি তাই চেয়েছেন এবং পরিণতি যাতে শুভ হয় তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন। সে পর্যায়েও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্র করুণা ও সৃষ্ট জীবের রিয্ক ব্যবস্থার দায়িত্ব পালনের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে উপরে উল্লিখিত আয়াতে। এর আগে সূরা আন'আমের ৩৮ নং আয়াতেও বলা হয়েছে ঃ "যমীনের উপরে বিচরণশীল কোন জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোন পাখিই দেখ, ইহারা তোমাদের মতোই বিচিত্র জাতি-প্রজাতি। আমরা ইহাদের নিয়তি নির্ধারণ করার কোন ত্রুটি রাখি নাই। শেষ পর্যন্ত ইহাদের সকলকেই তাহাদের 'রবের' দিকে একত্র করিয়া উপস্থিত করা হইবে।" এখানে ছিল জীবনান্তে ও পাখি এবং মানুষ সবকিছুর বিচিত্র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন হিসেবে দৃষ্টি আকর্ষণ যাতে সব যুগের সব মানুষ বা সব জাতি সৃষ্টিকর্তার অতুলনীয় গুণমর্যাদা, একত্ব ও মহত্তকে উপলব্ধি করে বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু এত প্রত্যক্ষ এবং এত অকাট্যভাবে সত্য ও স্পষ্ট নিদর্শনকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে এর পরবর্তী আয়াতেই চিহ্নিত করা হয়েছে 'কালা ও বধির' হিসেবে এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত' হিসেবে। – সূরা আন'আম ঃ ৩৯

এজন্যই উপরোক্ত আলোচনাধীন আয়াতে আরো স্পষ্ট, আরো প্রত্যক্ষ নিদর্শন হিসেবে আল্লাহ্র পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে, সাগরে-পাতালে যেখানে যতো বিচরণশীল জীব জীবন ধারণ করে থাকে তাদের 'রিয্ক' দানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ নিদর্শনকে অস্বীকার করতে পারে কে ? সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষই শুধু বিচার বুদ্ধিশীল। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেই মানুষ উপলব্ধি করবে এ নিদর্শনের

www.pathagar.com

সত্যতা ও গুরুত্ব। উপলব্ধি ও সত্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থেকেই বিবর্তিত হবে পূর্ণ মানুষ বা মু'মিন।

তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ বা বাক্যাংশের আলোচনা

আয়াতটিতে তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যাংশ ও শব্দের মধ্যে প্রধানত وَمَا مِنْ دَابَّةٍ আর সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন মনে করছি। 'দাব্বাতুন' এমন সব প্রাণীকে বোঝায় যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে। পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ও ভূপৃষ্ঠে অথবা ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন স্থানে হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর অন্তর্গত সাগর মহাসাগরের জীবন ধারণ উপযোগী পরিবেশে বিচরণ করে এবং সেই পরিবেশ থেকে খাদ্য আহার্য গ্রহণ করে। مِنْ শব্দ যোগ করে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ বাক্যাংশে আয়াতের ব্যাপক পরিধির অন্তর্গত বিচরণশীল প্রাণী জগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মানুষ থেকে শুরু করে বন্য জন্তু, উড়ন্ত পাখি, সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড়, সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদি সবকিছুই– সব জাতি প্রজাতিই-এর অন্তর্গত। আর এমনি বিরাট পরিধির প্রাণী জগতের জীবন ধারণ ও পুষ্টি সাধন থেকে শুরু করে সব জাতি-প্রজাতির উৎপত্তি, অবস্থান, জন্ম, মৃত্যু, অন্তর্ধান, স্থানান্তর ইত্যাদি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দায়িত্ব ও পরিচালনা কার হাতে, প্রাণী জগতের অন্তর্গত মনুষ্য জাতির সেসব ক্রিয়া প্রক্রিয়ার দায়িত্ব ও পরিচালনাই বা কার হাতে সে কথা স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যই আবার বলা হয়েছে ... عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا অর্থাৎ ইহাদের রিযকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। আল্লাহ্ নিজেই নিজের হাতে এ বিরাট দায়িত্বকে ন্যস্ত রেখেছেন। তাঁরই প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক বিধানের প্রক্রিয়ায় 'রিয্‌কের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার চলছে সারা বিশ্বের আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, বনে-জঙ্গলে অর্থাৎ প্রাণী রক্ষার পরিবেশে।

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের সংশ্লিষ্ট ভাষ্যে দেখা যায় ঃ رزق রিযকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যা কোন প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যা দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিযকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল জীব-জন্তু রিযক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা উহার মালিক হয় না। কারণ মালিক হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু তাদের রিযক অব্যাহতভাবেই তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। রিযকের এরূপ ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে উলামায়ে কিরাম বলেন– রিযক হালালও হতে পারে হারামও হতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ

www.pathagar.com

করে তখন উক্ত বস্তু তার রিয্ক হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কারণে উহা তার জন্য হারাম হয়েছে।"

মানুষের সৃষ্টি অন্যান্য জীব-জন্তু সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা লক্ষ্যে পরিকল্পিত হয়েছে আল্লাহ্র সামগ্রিক পরিকল্পনার যুক্তিবাদ কাঠামোতে। মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে তাই আলাদা ও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আল-কুরআনে। যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বজ্ঞ তাঁর নিকট থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে আল-কুরআনের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিস্তৃত বর্ণনার এসব ব্যাপারে বাণী ও নিদর্শন। প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো : মানুষ অন্য মানুষের দাসত্ব করবে না, দাসত্ব করবে শুধু আল্লাহ্র– যেমন বলা হয়েছে সূরা হূদেরই ২ নং আয়াতে اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ। সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন মৌলিক ধর্মী এবং সে ব্যাপারে মানুষ উপেক্ষা ও অস্বীকার করলে মানব জাতিরই মৌলিক অকল্যাণ। ভিত্তিগত যুক্তিবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নতার জন্য এবং পরিকল্পিত জীবন বিধানের সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য– যার পরিণতি হলো জাতিগত ধ্বংসের আমন্ত্রণ। সে ধ্বংসের পথ থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যই রাসূল করীম (স.)-কে দৃঢ় কণ্ঠে বলতে বলা হয়েছে দুর্যোগপূর্ণ পর্যায়ে : اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ। (অর্থাৎ আমি তাঁরই পক্ষ থেকে ভয় প্রদর্শনকারীও আর সুসংবাদদাতাও) উক্ত আদেশ অনুসরণ করেই রাসূল করীম (স.) কুরায়শ জাতিকে যা বললেন, তাই ৩ নং আয়াতে লিপিবদ্ধ হয়েছে : "আর তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও ও তাঁরই দিকে ফিরিয়া আস। তাহা হইলে তিনি একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে উত্তম জীবন সামগ্রী দান করিবেন। আর অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার অনুগ্রহ দান করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে আমি তোমাদের জন্য এক বড় ভীষণ দিনের আযাব সম্পর্কে ভয় করিতেছি।" তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আবার জোর দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ্র রিযক দানের দায়িত্ব সম্পর্কে, তাঁর সর্বজ্ঞতা সম্পর্কে, প্রাণীদের ও মানুষদেরকে কোথায় থাকে আর কোথায় সমর্পিত থাকে সে অবগতি সম্পর্কে এবং সবকিছু 'কিতাবিল মুবিনে' লিপিবদ্ধ থাকা সম্পর্কে, যাতে বিভ্রান্ত কুরায়শ জাতির জাতীয় চেতনা সঠিক পথে ফিরে আসে। প্রাণীজীবন ও মানুষের জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে মুসতাকাররাহা' এবং 'মুস্তাউদা 'আহা' দু'টি শব্দের বিন্যাসে। 'মুসতাকার' অর্থ হলো নির্দিষ্ট অবস্থান বা বসতিস্থান যেখানে কোন প্রাণী কিছুকালের জন্য থাকে 'স্থিতি'

www.pathagar.com

নিয়ে। 'মুসতাউদা' বোঝায় সে স্থানকে, যেখানে কোন প্রাণীকে বা কিছুকে স্বল্পক্ষণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। প্রাণী জীবনের প্রেক্ষিতে আল্লামা ইউসুফ আলী শব্দ দু'টির তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে ঃ "... the former denotes its life on this earth; the latter its temporary pre-natal existence in the egg or the womb and its after-death existence in the tomb or whatever state it is in until its resurrection"*

মানুষের বিবর্তিত বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা আল্লাহ্র বিধিবদ্ধ সর্বশক্তি ও সর্বজ্ঞানের কিছু কিছু অংশমাত্রকে আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাষায় বা পরিভাষায় বোধগম্য করতে সক্ষম হয়েছে। কালক্রমে ভবিষ্যৎ গবেষণা আরো নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে আধুনিক ভাণ্ডারে সংযোজন করতে থাকবে। পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্র লিপিবদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থলিপিতে বিদ্যমান রয়েছে।

মানুষ স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যতই সেই কিতাবুন মুবিন' সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের গবেষণা ও অনুসরণ করতে থাকবে ততোই সৃষ্টি রহস্যের উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য ও বিধান সম্পর্কে নতুন জ্ঞানের আলো সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হবে। সেদিকে সাধারণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (সবকিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে স্পষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থলিপিতে)। তেমনি সূরা ইউনুসের ৬১ নং আয়াতের আসমান ও যমীনে একবিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নেই- না ছোট না বড়- যাহা তোমার রবের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রহিয়াছে এবং এক স্পষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থলিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আয়াতটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আয়াতটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। বিশেষ করে রিয্ক কথাটির তত্ত্ববাদ ও তার সামাজিক, জাতিগত, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োগের দিক থেকে। সমাজে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ কি ধরনের হতে পারে এবং কি ধরনের হওয়া সঙ্গত সে সব প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় রিয্ক কথাটির সঠিক তত্ত্ববাদ উপলব্ধি করা এবং নানা পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা থেকে।

ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থার অধীনে প্রযোজ্য রিয্ক কথাটি শুধু সংকীর্ণ অর্থে খাদ্য ও আহার্য দ্রব্যের সংগ্রহ, উৎপাদন, বিতরণ ও ভোগ ব্যবহার বোঝায় না। এমনকি

* Abdullah Yusuf Ali : The Holy Quran, Lahore, Note No. 1499, P. 515.

www.pathagar.com

খাদ্যদ্রব্যের জড়রূপী উপকরণকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক কাঁচামাল থেকে ভোগের বা ব্যবহারের উপযোগী রূপে রূপান্তর করে মানুষের ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ ব্যবস্থাও বোঝায় না। আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবকাঠামোতে ব্যাপক তাৎপর্য প্রদর্শন করার জন্যেই 'রিয্ক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টির সর্বোচ্চ নিদর্শন হিসেবে মানুষকে পার্থিব ও পারলৌকিক সমন্বিত জীবনের এবং তারই সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ কল্যাণের উপযোগী হয়ে রিযক– যা আল্লাহ্ সারা বিশ্বে নানাভাবে নানারূপে নির্ধারিত ও সৃষ্টি রেখেছেন– অর্জন করতে হবে এবং অর্জিত দ্রব্য, কল্যাণ বা আয়কে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, প্রতিবেশীর জন্য, সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য এবং পরকালের জীবনের সাফল্য লাভের জন্য ব্যয় অথবা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনৈতিক নানা প্রক্রিয়া তার মধ্যে জড়িত রয়েছে– প্রাকৃতিক সম্পদ কাঁচামাল, প্রাকৃতিক শক্তি-নির্ভর (উত্তাপ-নির্ভর) জ্বালানি, ইত্যাদি প্রয়োগ থেকে শুরু করে জড় জীবনোপকরণের উৎপাদন, বিতরণ, বাজারজাতকরণ, মুনাফা অর্জন, আয়কে ভোগ, সঞ্চয় বিনিয়োগে রূপান্তরিতকরণ ইত্যাদি। কিন্তু এসব প্রক্রিয়ার যে জড় পণ্যরূপকে অথবা নীতি নিরপেক্ষ সেবা ভোগের রূপকে আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ অর্থনীতির সমৃদ্ধি হিসেবে গণ্য করা হয়। সে শুধু সংকীর্ণ জড় মূল্যবোধের কল্যাণ ভিত্তিক ভাবধারণা। তাকে ইসলামী অর্থনীতির যে নিয়ন্ত্রণ রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি-নৈতিকতা-আধ্যাত্মিকতার বিধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সে সকলকে অঙ্গীভূত করে অর্থনীতিকে

---

২. আল্লামা ইউসুফ আলী সূরা ইউনুসের ৬১ নং আয়াতের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এমনি ভাষায় ঃ `There is nothing that men can do but God is a witness to it. We may be deeply engrossed in some particular thing and for the time being, be quite unconscious of other things. But God's knowledge not only comprehends all things, but has all things actively before it. Nothing is hidden from Him. And His knowledge has another quality which human knowledge has not. Human knowledge is subject to time and is obliterated by time. God's knowledge is like a Record and endures for ever. And His Record has a futher quality which human records have not. The most permanent human record may be quite intelligible to those who make it but may be ambiguous to others and may become uninelligible with the progress of time, as happens almost invariably to the most enduring inscriptions from very ancient times; but in God's Record or knowledge, there is no ambiguity, for it is independent of time or place or circumstances. This is the force of Mubin ("clear") here." (Vide Note No. 1450, p. 500).

www.pathagar.com

পরিশোধিত করে নিতে হয়। আর তখনই 'রিযক' কথাটির তাৎপর্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতি সমর্থিত হবে। তখনই তার তাৎপর্য ব্যাপক ও সার্বিক দিক থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব এবং তখনই এর সংশ্লিষ্ট তত্ত্ববাদকে সমাজ ও অর্থনীতির পরিকল্পনাতে প্রয়োগ করে উন্নয়নে প্রতিফলিত করা যায়। বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় কয়েকটি দিক। যেমন ঃ

১. প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ্ প্রদত্ত অর্থনৈতিক সম্পদ; তার মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবহারের উপযোগিতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের বিপুল সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। সে সম্ভাবনাই মানব কল্যাণের উৎস আর তার মধ্যেই রয়েছে মানুষের জন্য রিয্ক। রিয্ক বৃদ্ধির জন্য সার্বিক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা, উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি তাই যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়া ও প্রয়াস। কিন্তু প্রয়াস ও বিধি নিয়ন্ত্রিত হবে। আর প্রক্রিয়া ও বিধি নিয়ন্ত্রিত হবে। একটি মৌল বিধি হলো ঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানুষ ও অন্যান্য জীবের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ভারসাম্যের পরিমাপে ব্যবহৃত হতে হবে। সে বাঞ্ছনীয় পরিমাপের (due measure) সীমালংঘন পৃথিবীর জন্যই কল্যাণময় নয়। সে সীমা অতিক্রম করেই বর্তমানকালের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও অর্থনীতি পরিবেশের ভারসাম্য (ecological balance) হারিয়ে ফেলেছে।

২. ভোগ্য পণ্যও খাদ্যের মতই মানুষের কল্যাণে আসে। সেই অর্থে ভোগ্য পণ্যকে অর্থনৈতিক রিয্ক ধরা যেতে পারে। কারণ, প্রাকৃতিক সম্পদে মানুষের স্বাভাবিক কর্মনিপুণতা (মানসিক ও শারীরিক শক্তির সমন্বয়) ব্যবহার করেই উৎপন্ন হয় পণ্যদ্রব্য আর সে পণ্যদ্রব্য ভোগের উপর নির্ভর করে মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুখশান্তি। কিন্তু তার উৎপাদন ও ব্যবহারকেও হতে হবে বিধি নিয়ন্ত্রিত। ইসলামী সমাজে ভোগ ও উৎপাদন হবে "যে সকল উত্তম জিনিস আল্লাহ্ সরবরাহ করেছেন" (সূরা বাকারা ঃ ১৭২) সে সকলকে ভিত্তি করে।

৩. প্রকৃতির শক্তিকে যে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ধারণ করতে পারে, সে ক্ষমতাও আল্লাহ্রই দান। এ ক্ষমতার ব্যবহার ঘটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা ও জ্ঞানলাভ এবং উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ মাধ্যমে। পরিণতিতে উৎপত্তিলাভ করে নতুন নতুন উন্নয়ন কৌশল ও উৎপাদন কৌশল। আর উৎপন্ন হয় পুঁজি দ্রব্য নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি যা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও আভিজাত্য লাভ করে নতুন নতুন উদ্ভাবনে। বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ও অলৌকিক ধরনের প্রভাব প্রদর্শনের বহু পশ্চাতে

www.pathagar.com

পরোক্ষ হয়ে যায় তখন ভিত্তিগত মৌল কথাটি যে মানুষের এ ক্ষমতা আল্লাহ্ প্রদত্ত দান এবং সে দানকে আল্লাহ্‌র বিধান-সম্মত কল্যাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা সঙ্গত। অন্য ব্যবহার বিধি-বহির্ভূত ও অকল্যাণকর অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতির চোখে অসামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রিযকের অপব্যবহার ভিত্তিক।

৪. মু'মিনকে শুধু জড় জীবন ও পার্থিব জীবনের লক্ষ্যেই রিয্ক উপার্জন ও ব্যবহার করতে হয় না। তাকে রিয্ক সন্ধান ও ব্যবহার করতে হয় জীবনের (ইহকাল ও পরকালের সমন্বিত জীবনের) সম্পূর্ণ দীর্ঘতম মেয়াদের সুখ-শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য। এখানে রিয্ক পুষ্টি সাধন ও প্রবৃদ্ধি সাধন করবে মু'মিন মানুষের দেহ, মন ও আত্মার। দেহ, মন ও আত্মার স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য এবং তাদের উন্নতমানের কর্মকুশলতা শুধু জড় ভোগ্য বস্তু ও বিলাসসেবা থেকে আসে না। তার জন্য উপযোগী খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক, মানসিক প্রশিক্ষণ ও যত্ন-পরিচর্যা প্রয়োজন এবং তাছাড়া আত্মার শুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সাধনাও যথাসাধ্য প্রয়োজন। তা হলেই সুসমন্বিত মানুষ সংগঠন সম্ভব। শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত নানা প্রক্রিয়ায় এবং পরিবেশ ও বিধির নিয়ন্ত্রণে এমনি সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন সম্ভব হলে যেখানে যেখানে সীমালংঘন কল্যাণ বিরোধী সেখানে সেখানে ব্যক্তিগত ও সম্পষ্টিগত আচরণে সীমালংঘন বর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থনৈতিক কল্যাণসহ সর্বক্ষেত্রেই তখন কল্যাণ অর্জনের সর্বোচ্চ সুযোগ আসতে পারে। এমনি সর্বোত্তম ব্যবস্থাকে মু'মিন প্রাণের চেয়েও বড় মনে করে। সুতরাং সে ব্যবস্থার প্রতিরক্ষার জন্য যদি তাকে প্রাণও দিতে হয়, সে কুণ্ঠাহীন চিত্তে শাহাদত বরণ করে। শাহাদতের পরে তার জন্য রিয্কের তাৎপর্য রয়েছে অনেক উচ্চ মর্যাদার। তাকে আর মৃত বলা চলে না। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য অথবা প্রতিরক্ষা করার জন্য যাঁরা শহীদ হন তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলাই মর্যাদা দিয়েছেন মৃত্যুহীন জীবিতের ঃ তারা তাদের আত্মায় বেঁচে থাকেন, "তাদের রবের সম্মুখে পেতে থাকেন তারা তাদের অফুরন্ত রিয্ক" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬৯)। ইসলামী সমাজে অথবা অর্থনীতিতে এমনিভাবে 'রিয্ক' ব্যাপকতম তাৎপর্য বহন করে, যাকে এক কথায় বা অন্য কথায় ও অন্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ সকল তাৎপর্যকে গভীরভাবে অনুধাবন করে ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতির সংগঠনমূলক প্রয়োগ করাই বর্তমান কালের সমস্যা। নানা দেশের অন্তর্গত মুসলিম সমাজকে কিভাবে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও নীতি নির্ধারণ করা সঙ্গত ও সম্ভাব্য সে বিষয়ে গবেষণা ও কর্মপন্থা অবলম্বন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে ঃ

www.pathagar.com

(ক) প্রথমেই বর্তমানকালে পাশ্চাত্য ভাবধারণার রাজনৈতিক জাতি সংজ্ঞাভুক্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রে মুসলিম সমাজের অবস্থানকে বাস্তবতার বিশ্লেষণ দিয়ে বুঝতে হবে। সে বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতেই ইসলামী অর্থনীতির ভাবধারণা ও তত্ত্ববাদকে প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করতে হবে। 'রিয্‌ক' ব্যাপারেও সে চিন্তা থেকেই আসবে মৌলিক পরিকল্পনা দিয়ে অর্থবহ বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা। মৌলিক চিন্তা থেকে বাস্তবতার বিশ্লেষণই যুক্তি কাঠামো নির্মাণ আসবে এমনি ঃ 'রিয্‌ক'দানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত মানে, মানুষের গৌণ ভূমিকা নয় বরং মুখ্য ও গতিশীল ভূমিকা কর্মপ্রয়াস দিয়ে উপার্জন দিয়ে উপার্জিত 'রিয্‌ক' বিতরণ দিয়ে দেশের, সমাজের ও অর্থনীতির এবং নিজের ও পরিবারের সুখশান্তি সচ্ছলতা লাভের দিকে। আবার তারই মাধ্যমে পরকালের কল্যাণ অর্জন করে কালজয়ী পুরস্কার লাভের দিকে। 'বিচরণশীল' জীবের জন্য সৃষ্টিকর্তার 'রিয্‌কের' নিরাপত্তার আশ্বাস মানুষকে তো আরো জোর দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা নাজম ঃ ৩৯) প্রয়াস, সাধনা, পরিশ্রম, গবেষণা, শ্রম প্রয়োগ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রয়োগ মানুষকে করেই যেতে হবে। তবে তো প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তিকে রূপান্তরিত করা যাবে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাতে এবং সুখ-শান্তি বা সমৃদ্ধি লাভের সাফল্যে। রাষ্ট্র পরিচালনার অধীনেই আসবে এ সকল সর্ববিধ প্রয়াসের পরিকল্পনা, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধানের অনুসরণ করে। পর্যায়ক্রমে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব হবে তখন মানুষেরই প্রয়াস এবং সে ভিত্তিতেই ইসলামী অর্থনীতির আদর্শের কল্যাণ লাভও ক্রমে ক্রমে হতে থাকবে উচ্চতর ও ব্যাপকতর।

(খ) উপরোক্ত প্রেক্ষিতেই তখন বাস্তব সমস্যার মূল্যায়ন করে 'রিয্‌ক'-এর সংকীর্ণ অর্থ খাদ্যের নিরাপত্তা (food security) ব্যাপারে জাতীয় নীতি অবলম্বন সম্ভব হবে। সারা বিশ্বের মানুষের জন্য বিশ্ব খাদ্যনীতিকেও কার্যকর করা প্রয়োজন বিশ্বের সব জাতির সহযোগিতায়। আবার প্রতিটি দেশের পরিধিতেও জাতিগতভাবে খাদ্যনীতিকে নিরাপত্তা প্রদানের উপযোগী হতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত নানা প্রতিষ্ঠান জাতীয় সরকারগুলোকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করে আসছে, বিশেষ করে পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা ও খাদ্য ঘাটতি সমস্যা নিয়ে এ ধরনের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ খুবই কল্যাণকর। ১৯৮৭-৮৮ সালে বাংলাদেশে যে 'স্মরণকালের ভয়াবহতম' বন্যা দুর্যোগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ ও মানুষের জীবনকে অস্বাভাবিকভাবে বিপন্ন করেছে, সে

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'ইফাদের' বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সর্বপ্রকার সমস্যা সমাধান (স্বল্পকালীন, তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান) সন্ধান করার আন্তর্জাতিক প্রয়াসের দিকে। এতে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দেশগুলোর উদ্যোগ প্রয়োজন– ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান ও চীন দেশ প্রধানত সংশ্লিষ্ট। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি রক্ষার বিধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সমন্বয়হীন ক্রিয়াকাণ্ড আর সত্যিকারের কল্যাণকর সমন্বয় পরিকল্পনার অবহেলা কত ভয়ংকর পরিণতি আনতে পারে, উপরোক্ত আঞ্চলিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমস্যাটি তারই উদাহরণ। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এলহাউট বলেছেন ঃ এ ভয়ংকর বিপর্যয় প্রধানত মানুষের তৈরী (It was the environmental havoc wreaked by the destruction of Nepalese forests which did the most damage)।

সুতরাং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন আর তার বাস্তবায়ন এসব ক্ষেত্রে শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অত্যন্ত জরুরী। পাশ্চাত্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি ছাড়াও এসব ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য-সহযোগিতা লাভকেও বলিষ্ঠ এবং ব্যাপক করার উদ্যোগ গ্রহণ ও কর্মপন্থার বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

(গ) উপরোক্ত ব্যবস্থাদির পরিকল্পনা প্রয়াস সত্ত্বেও প্রশ্ন আসতে পারে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য একটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার উপায় ভীষণ সীমিত ও বিপন্ন হওয়া এবং একটা জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তিও বিপন্ন হওয়ার শংকা দেখা দিতে পারে। আন্তর্জাতিক উৎস থেকে সাহায্যের ওপর একটা জাতির সৃষ্টি সাধন চলতে পারে না। আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তুলতে হবে। সে সম্ভাবনাকে লক্ষ্য না করলে জাতীয় মর্যাদা হয় ব্যাহত ও ক্ষুণ্ন। তাই দেশ ও তার অর্থনৈতিক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্ভাবনার মূল্যায়ন করেও কোন কোন ক্ষেত্রে জনসংখ্যা সীমিত করার নীতি অবলম্বন অবশ্যই প্রয়োজন, যে পর্যন্ত না উন্নয়নের সমন্বিত প্রয়াস সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে এমন স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হয় যখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আর প্রয়োজন হবে না। বর্তমানকালের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের ন্যায়-বিচারহীন আন্তর্জাতিক বন্টনই এমনি নীতি হস্তক্ষেপকে বাঞ্ছনীয় করে। এ হস্তক্ষেপ ছাড়া বিশ্বে সব মানুষের জীবনে অধিকতর কল্যাণ সৃষ্টির প্রয়াস সম্ভব নয়। সউদী আরবের মতো দেশে অন্য দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীতিই বাঞ্ছনীয়। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কর্মী সংখ্যার ভারসাম্যের অভাবেই শুধু জনসংখ্যা

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ অবান্তর নয়, অন্য দেশ থেকে (বিশেষ করে এশীয় স্বল্পোন্নত বা দরিদ্র দেশ থেকে) উদ্বৃত্ত শ্রম আমদানী করা প্রয়োজন হচ্ছে।*

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

গ্রন্থপঞ্জি

১. আয়াতের অনুবাদ ঃ (দ্রষ্টব্য– তরজমায়ে কুরআন মজীদ, মাওলানা সইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ফালাহ্-ই-আম ট্রাস্ট, ১৯৮২) পৃ. ৩৩৫।

২. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফী (অনুবাদ ঃ মওলানা মুহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, চতুর্থ খণ্ড পৃ. ৭২৭-৩১)।

৩. Abdullah Yusuf Ali : The Holy Quran, Lahore, Note No. 1499 p. 515 and Note No. 1450 p. 515.

৪. Prof. Raihan Sharif, Islamic Economics : Principles and Applications, Islamic Foundation Bangladesh, 1985, pp. 276-311 (Vide also by the same author, Islamic Economy : The Concept of Rizq, IFB, 1986.

* বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ Prof, Raihan Sharif, Islamic Economy : Concept of Rizq, IFB, Dhaka, 1986.

www.pathagar.com

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

যে সব লোক শুধু এই দুনিয়ার জীবন ও উহার চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়, তাদের কাজকর্মের যাবতীয় ফল আমরা এখানেই তাদেরকে দান করি আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (তখন তারা জানতে পারবে) তারা দুনিয়ায় যা কিছু বানিয়েছে তা সবই বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়েছে। – সূরা হূদ ঃ ১৫-১৬

তাফসীরকারদের মন্তব্য

উপরোক্ত আয়াতের তফসীরে মুফতী মুহাম্মদ শফী বলেন ঃ ইসলাম বিরোধীদের যখন আযাবের ভয় দেখান হতো, তখন তারা নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলীকে সাফাইরূপে তুলে ধরতো। তারা বলতো যে এত সব সৎকাজ করা সত্ত্বেও তাদের শাস্তি হবে কেন ? জবাবে আল্লাহ্ যা বলছেন তার সারমর্ম হলো ঃ প্রতিটি সৎকাজ গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক মুক্তির কারণ হবার পূর্বশর্ত হচ্ছে যে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে।'

আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান না আনার কারণে তাদের যাবতীয় কাজ প্রাণহীন দেহের ন্যায়, আখিরাতে যা একেবারেই মূল্যহীন। তবে যেহেতু পৃথিবীতে এসব জনহিতকর কাজে অনেক লোক উপকৃত হয়েছে, আল্লাহ্ এসব কাজের ফল তাদেরকে এ পৃথিবীতেই দান করেন। যাদের উদ্দেশ্য ছিল সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি, আল্লাহ্ তাদেরকে তা দান করবেন।

মুফতী শফী বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা مَنْ اَرَادَ না বলে مَنْ كَانَ يُرِيْدُ বা চলমান কাল ব্যবহারের তাৎপর্য হচ্ছে, যারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময়ে কেবল

www.pathagar.com

মাত্র পার্থিব ফায়দাই হাসিল করতে চায়, আখিরাতের মুক্তির কল্পনা যাদের মনের কোণে কখনও উদয় হয় না, তাদের পরকালের মুক্তির প্রশ্নই উঠে না। পক্ষান্তরে যারা আখিরাতে মুক্তির আশায় সৎ কাজ করে, সাথে সাথে পার্থিব সুনাম, যশ কিংবা পদমর্যাদা লাভের আশাও রাখে, তারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন কোন তাফসীরকারের মতে আয়াত দুটি কাফিরদের সম্পর্কে বর্ণিত। তবে অধিকাংশ মুফাসসির মনে করেন যে, আয়াতের লক্ষ্য কাফির ও মুসলমান–উভয়ই হতে পারে।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক একটি সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক নীতি তুলে ধরেছেন। অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক অগ্রগতির জন্য যিনিই সচেষ্ট হবেন, চাই সে ব্যক্তি মু'মিন হোক কিংবা অমুসলিম, আল্লাহ্ তাকে সফলতা দান করবেন অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য চেষ্টার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন ঃ

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى

মানুষ ততটুকুই পাবে যতটুকুর জন্য সে চেষ্টা করেছে।

আখিরাতের সফলতা অবশ্য নির্ভর করবে ঈমান ও নিয়তের ওপর। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সমগ্র কাজের জন্য নিয়ত শর্ত।

এই হাদীসের মর্মানুসারে সৎ উদ্দেশ্যে কেউ যদি এমন কোন কাজ করে ফেলে, যাতে কারো ক্ষতি হয়ে যায় তবু সে সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে অসৎ উদ্দেশ্যে যদি কেউ এমন কাজ করে, যাতে সমাজের উপকার হয়ে যায় তবু সে সওয়াব পাবে না।

এ পৃথিবীর সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ পাক একটি সুশৃঙ্খল নিয়মে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এখানে শস্য উৎপাদনের জন্য জমি তৈরী থেকে শুরু করে সেচ সংরক্ষণ ও ফসল কাটার যেসব পদ্ধতি আছে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। দুনিয়ার প্রাপ্য পাবার জন্য এসব পদ্ধতি অবশ্যই (necessary) ও যথেষ্ট (sufficient) শর্ত (conditions)। কিন্তু আখিরাতের সফলতার জন্য এসব পদ্ধতি necessary condition মাত্র, sufficient condition নয়। অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। Sufficient condition পূর্ণ করার জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান পালন করে আর্থ-সামাজিক প্রয়োগের সঙ্গে ঈমানের এক আধ্যাত্মিক নৈতিক দায়িত্ব পালন প্রয়োজন।

- এ. এ. রুশদী

www.pathagar.com

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرٰكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ التَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ. وَيٰقَوْمِ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً اِنْ اَجْرِيَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ. وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ. وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلاَ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ صلى اِنِّيْ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

তখন তাঁর কওমের কাফির প্রধানরা বলল ঃ আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না, আর আমাদের মধ্যে যারা হীন ও নীচ তারা ব্যতীত কাউকে তো তোমার আনুগত্য করতে দেখি না, এবং আমাদের উপর তোমাদের কোন প্রাধান্য দেখি না, বরং তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি। নূহ্ বললেন ঃ হে আমার জাতি! দেখ তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন তারপরও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি উহা তোমাদের উপর

www.pathagar.com

তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি ? আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র যিম্মায় রয়েছে। ঈমানদারদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়, তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। বরং আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দিই তাহলে আমাকে আল্লাহ্ হতে রেহাই দেবে কে ? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে এবং এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েবী খবরও জানি। একথা বলি না যে, আমি একজন ফেরেশ্‌তা, আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত, আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব। – সূরা হূদ ঃ ২৭-৩১

সাধারণ তাৎপর্য

উপরের কয়েকটি আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর জাতি তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছিল এবং হযরত নূহ (আ.) তার যেসব জওয়াব দিয়েছিলেন, তার আলোচনা করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির কথা ছিল যে হযরত নূহ (আ.) একজন মানুষ ব্যতীত কিছু নয় এবং তাকে অনুসরণ করে কেবল হীন-নীচ এবং স্থুল বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা। সুতরাং নূহ (আ.)-এর নবুয়ত গ্রহণযোগ্য নয়। এর জওয়াবে হযরত নূহ (আ.) বলেন যে তিনি আল্লাহ্‌র থেকে পাওয়া সুস্পষ্ট দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনি প্রকৃত সত্য ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়েছেন। তাই তাদের উচিত তাকে মেনে নেওয়া। তিনি কেবল তাদের সত্য গ্রহণ কামনা করেন, তাদের নিকট থেকে কোন ধন-সম্পদ কামনা করেন না। তিনি অবশ্য ফেরেশ্‌তা নন এবং আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার তাঁর কাছে রয়েছে– এমন দাবীও তিনি করছেন না। এসব নবী হওয়ার জন্য প্রযোজ্যও নয়। তিনি সাধারণ লোকদেরকে তার নিকট থেকে দূরে সরাতে পারেন না। সাধারণ লোকেরা কোন অপরাধ করেনি। সত্য গহণ করা কোন অপরাধ হতে পারে না। তাদের সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না। তা করলে তিনি আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন জওয়াব দিতে পারবেন না।

এসব আয়াতে প্রমাণ হয় যে, নবীরা আল্লাহ্ থেকে ওহী পাওয়ার পূর্বেই বিশ্বপ্রকৃতির নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করে তাওহীদের মূল নিগূঢ় তত্ত্বের সহিত নিবিড় পরিচয় লাভে সমর্থ হন। পরে আল্লাহ্ পাক ওহী দানে তাদেরকে ধন্য করেন। এসব

www.pathagar.com

আয়াতে আরো প্রমাণ হয় যে, সাধারণ লোকদের যেহেতু কোন কায়েমী স্বার্থ থাকে না, তাই তারা সহজেই সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেন। কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং তাদের নেতৃবৃন্দ সহজে কখনো সত্যকে মেনে নিতে পারে না। এখানে আরো প্রমাণ হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থই প্রকৃত সম্পদ নয় বরং ঈমানই মূল সম্পদ, যা আল্লাহ্র নিকট মূল্য পাবে।

–তাফহীমূল কোরআন ও মা'আরেফুল কোরআন তফসীরদ্বয়ের অবলম্বনে

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই হযরত নূহ (আ.)-এর যুগের সামাজিক চিত্র তুলে ধরা যায়। হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ে সুস্পষ্টভাবে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল উচ্চবিত্ত লোকেরা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব উচ্চবিত্ত লোকদের নিকট ছিল। এসব নেতারা নিম্নবিত্তের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখত। এদিক থেকে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা গুণগতভাবে ওহী নাযিলকালীন সময় থেকে ভিন্ন ছিল না। আজকেও বিশ্বের অনেক স্থানে একই অবস্থা বিরাজ করছে। অবশ্য আধুনিক যুগে অনেক স্থানে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তে রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগ জন্ম নিয়েছে।*

এ আয়াতসমূহে অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথাও রয়েছে। এখানে সুস্পষ্ট হয় যে, নিম্নবিত্ত সাধারণ লোক এবং বড় লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে নবীকে বলা হয়নি। বরং তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হলে তা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ হবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য ছিল। দারিদ্র্যের কারণেই তারা নির্যাতিত হতো। এ কারণেই ইসলামের বাণীকে তারা সহজে গ্রহণ করেছিল। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক অধিকারের বেলায়ও যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করাই আল্লাহ্র পছন্দ এবং ইসলামী সরকারের তাই দায়িত্ব হবে। সব মহলের সুযোগ-সুবিধার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। অবশ্য ইসলাম যোগ্যতার নীতিকে কোথাও অস্বীকার করেনি। তাই শিল্প উদ্যোগ বা চাকুরীর ক্ষেত্রে যোগ্যতার নীতিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু সাধারণ অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণী পার্থক্য করা সঙ্গত হবে না।

এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত সাধারণ লোকদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই– এ কথা বলা যায় না। এ কথার অবশ্যই ব্যাপক ধর্মীয় ও

* আধুনিক রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ Milovan Djilas- The New Class.

www.pathagar.com

সামাজিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু এর অর্থনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। সাধারণ লোকেরাই সমাজে বেশী। তারাই সমাজের মূল জনশক্তি। এ জনশক্তির অনেক গুরুত্ব আছে। তারা কর্মী হিসেবে সমাজের অনেক কল্যাণ সাধন করতে পারে। অবশ্য তাদেরকে যথাযোগ্যভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে তার নিদর্শন স্পষ্ট হয়। দেশের উন্নয়ন এই জনশক্তির ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বিশ্বাসী সাধারণ জনগণ অনেক নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। তাদের সততা আর কর্মপ্রিয়তা দেশের কাজে লাগে। ইসলামী সরকারের দায়িত্ব সাধারণ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যবহার করা। ইতিহাসেও দেখা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগে আরবের সাধারণ লোকেরাই তৎকালীন বিশ্বকে জয় করেছিল। তারাই শাসক হিসেবে বিশ্বকে শাসন করেছিল। জ্ঞান জিজ্ঞাসা সব ধরনের অগ্রগতি সাধন করেছিল। এতে প্রমাণ হয় যে, ইসলামে এমন এক নৈতিক শক্তি আছে, যা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মোচিত করে। তাকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। আজও তা সম্ভব, যদি সঠিকভাবে এ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। মু'মিনের প্রাপ্য কেবল দুনিয়াতে নয় বরং আখিরাতেও রয়েছে। আখিরাতের প্রাপ্যই প্রকৃত প্রাপ্য। সুতরাং মু'মিন কখনো তার কাজে কেবল দুনিয়ার প্রাপ্যকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে সে দুনিয়াতে ক্ষতিও বরদাশ্‌ত করে নেয়।

- শাহ্‌ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِيْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَُ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ.

তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর এবং যারা সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না; তারা তো নিমজ্জিত হবে। সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার নিকট দিয়ে যেতো, তাকে উপহাস করত; সে বলত- তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ। সূরা হূদ ঃ ৩৭-৩৮

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে

আয়াতটিতে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে وَاصْنَعِ الْفُلْكَ শব্দ দু'টিতে। শব্দ দু'টিতে আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে, 'নৌকা বা জলযান নির্মাণ কর' এবং এর মধ্যে মূল শব্দটি হলো صَنَعَ যার অর্থ শিল্প কর্ম। এখান থেকেই আভাস পাওয়া যায় নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ সম্পর্কে। ঐতিহাসিকভাবে মানুষের জীবনের ও মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার কৌশলের যে বিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে সর্বকালীন সত্যের প্রতিফলন বুঝবার জন্যই নৌকা বা জলযানের নির্মাণ ব্যাপারে উপযোগী নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ প্রয়োজন। এ প্রয়োগ শিল্পকর্মে নৈপুণ্য, দক্ষতা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির মতোই লক্ষ্য ও কালের উপযোগী হওয়া আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিধানেরই অনুসারী। যুগ যুগ ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি ব্যবহার মাধ্যমে শিল্প সমৃদ্ধি এবং শিল্প বিপ্লবকে মানুষের সে ধরনের প্রয়াসই সম্ভব করেছে। আল্লাহ্‌র নবী নূহ (আ.)-কে যে নৌকা বা জলযান নির্মাণ করতে আদেশ হয়েছে তার তাৎপর্য তাঁর কালোপযোগী

www.pathagar.com

যেমন, পরবর্তী কালের বিবর্তনোপযোগীও তেমনি। কারণ এখানে মানুষের প্রয়াসেরই প্রয়োজনীয় নিদর্শন রয়েছে। নবীকে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ব্যবহার করে মহাপ্লাবনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী নৌকা নির্মাণ করতে বলা হয়েছে। সে নিদর্শন মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে পরবর্তী ঐতিহাসিক কালের জন্য কিভাবে নির্মাণ কৌশল শুধু মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়া নয়, কত অসংখ্যভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে প্রয়োগ করা যায়।

তাফসীরভিত্তিক প্রেক্ষিত আলোচনা

আয়াত দু'টির তাফসীর বর্ণনাতে ইমাম শওকানী (র.), আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.), সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) এবং মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) আলোচ্য আয়াত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্যান্য আয়াত অবলম্বন করে ঐতিহাসিক সেকালীন ঘটনাকেই বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। সাধারণ কথা হিসেবে বর্ণনা প্রায় একই ধরনের। নির্মিত নৌকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি পর্যন্ত বিভিন্ন মতে প্রকাশ রয়েছে।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেছেন ঃ প্রথম আয়াতটিতে রয়েছে আল্লাহ্র চরম নির্দেশ– "তোমার সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। আর এ জন্য তুমি চিন্তিতও হয়ো না। তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ওহী অনুসারে নৌকা নির্মাণ কর। যারা অবাধ্য হয়ে জুলুম করেছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমার কাছে কোন সুপারিশ করো না। তাদের পরিণতি ও অবস্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে। তারা প্লাবনের পানিতে নিমজ্জিত হবে।" দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে উক্ত নির্দেশ অনুসারে নৌকা নির্মাণকালে নূহ্ (আ.)-এর প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের দলপতিদের আচরণের কথা। উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "যখনই তাদের দলপতিরা নির্মাণাধীন নৌকার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে, তখনই তারা তাঁকে উপহাস করেছে। তখন নূহ (আ.) আল্লাহ্র ভাষায়ই সে উপহাসের উত্তর দিয়েছেন।" আসলে তারা শুধু প্রকাশ্য বিষয়ই বুঝত; অন্তর্নিহিত প্রকৃত ব্যাপার কি, আল্লাহ্র হিক্মতই বা কি, সে সব উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। পক্ষান্তরে নূহ (আ.) ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্র নবী। তাই তিনি উপহাসের উত্তর আল্লাহ্র ইচ্ছাকৃত ভাষায়ই বলে দিলেন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন আভাস দিলেন।

মা'আরেফুল কোরআন প্রণেতা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী উল্লেখ করেছেন ঃ হাফেজ শামসুদ্দিন বিরচিত 'আত-তিব্বুন নবী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে মানুষের প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

সর্বপ্রকার শিল্পকর্মের মৌল তত্ত্বজ্ঞান বা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পথ নির্দেশ ওহীর মাধ্যমে কোন-না-কোন নবীর পবিত্র হস্তে সূচিত হয়েছে। তার পরে কালক্রমে তার প্রচার, প্রসার, উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। সর্বপ্রথমে আদম (আ.)-এর প্রতি যেসব ওহী নাযিল হয়েছিল তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকাজ ও প্রাথমিক শিল্প প্রয়াস ক্ষেত্রে। চাকা চালিত গাড়ীর উদ্ভাবন তারই অন্তর্গত বলেও বিশ্বাস করা যায়। সে ভিত্তিতে বর্তমান কালের শিল্প বিপ্লবের প্রগতির বিবর্তনকে একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণতি বলা চলে।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

হযরত নূহ (আ.)-এর নবী জীবনের পটভূমিকায় আয়াত দু'টি নাযিল হয়ে তৎকালীন মানুষ ও সমাজের জন্য প্রত্যক্ষ তাৎপর্য প্রদর্শন করেছে কতগুলো মৌল আর্থ-সামাজিক নীতি সম্পর্কে; যেমন ঃ

১. স্রষ্টা ও স্রষ্টা নির্ধারিত নীতি বিধানকে অবলম্বন করেই সমাজ ও অর্থনীতি সংগঠন করা মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনকে বারবার স্রষ্টা প্রেরিত নবীগণ কর্তৃক সতর্কতা দান সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক উপেক্ষা ও উপহাস করলে এবং নিজেদের সংশোধন ও সংস্কার পথকে নিজেরাই চিরতরে রুদ্ধ করে দিলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়টির ধ্বংস অনিবার্য। ঐতিহাসিক বিবর্তনের শুভ কামনায় সে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত স্বপ্লসংখ্যক দায়িত্বশীল বিশ্বাসী মানুষকে অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। স্রষ্টা নিজেই অসাধারণ কল্যাণের পন্থা হিসেবে নবী মাধ্যমে প্রদর্শন করতে পারেন। এতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য অনুসারে সৃষ্ট মানব জাতি ও প্রাণীজগতের প্রগতির ইতিহাস অব্যাহত থাকবে।

২. সীমালংঘনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের যে ক্ষেত্রে মহাপ্লাবনের পর্বত প্রমাণ তরঙ্গে নিমজ্জিত হওয়ার বিধি নির্ধারিত হয়েছে, সে প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের তাদের উপযোগী পরিবেশে নতুন ইতিহাস সৃষ্টির জন্য জরুরী ভিত্তিতে যে পরিকল্পনা প্রয়োজন, তার নীল নক্‌শা ও রূপরেখা দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসী স্বল্পসংখ্যক নরনারী এবং জীবজন্তু প্রাণীর নির্বাচিত জোড়া জোড়াকে রক্ষা করতে হবে। একটা উপযোগী নৌকা (জাহাজ) নির্মাণ করে তাতে নিরাপদ আশ্রয় দান করতে হবে।

৩. যিনি সর্বজ্ঞ স্রষ্টা, অভিনব জ্ঞানকে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের আকারে তিনিই নবী ও মানুষকে প্রদর্শন ও শিক্ষা দিতে পারেন। নৌকা (জাহাজ) নির্মাণের জ্ঞান ও

www.pathagar.com

প্রযুক্তি নূহ (আ.)-এর কালে তেমনি হয়েছিল। তেমনি নিদর্শন দাউদ (আ.)-এর এবং সোলায়মান (আ.)-এর কালের সংশ্লিষ্ট জ্ঞান প্রযুক্তি ব্যাপারেও আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তার গভীর তত্ত্বগত তাৎপর্য হলো ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে বিবর্তিত হয় এবং কল্যাণের উদ্দেশ্যকে মানুষের চিন্তা মানসে রক্ষা করে ধ্বংসের ইতিহাস এড়িয়ে চলতেই স্রষ্টার (নবী সাহায্যে) আদেশ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অলৌকিক পার্থিব ক্ষমতা-সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অর্জিত হওয়ার পরে মানুষ, বিশেষ করে সম্প্রদায়ের দলপতিরা, সুস্থ কল্যাণ চিন্তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ধ্বংসকে ডেকে আনে। এটা পৃথিবীতে বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আগমনের পূর্বেকার ইতিহাসের শিক্ষা এবং সর্বকালের জন্যই ঐতিহাসিক সত্য।*

আয়াত দু'টির উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বর্তমানকালের উপযোগী শিক্ষণীয় নীতিও অন্তর্নিহিত রয়েছে, যার আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তার কয়েকটি দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়। যেমন ঃ

(ক) মানুষের সভ্যতার নতুন ইতিহাস শুরু হয়েছে বিশ্বনবীর বৈপ্লবিক সর্বমুখী অভিযান থেকে, যার প্রাথমিক উৎসই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসরণ এবং উদ্ভাবন। নূহ (আ.)-এর নির্মিত নৌকা বা জাহাজ থেকে অনেক উন্নত ধরনের জলযান নির্মাণ উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগ থেকে সম্ভব হয়েছে। তবে নৌ বিজ্ঞানের সূত্রপাত যে নূহ্ (আ.)-এর সময়েই হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস অন্ততঃ তাই সাক্ষ্য দেবে।

(খ) ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বিশদ বিবরণ সারাবিশ্বে গবেষণা সাহায্যে মানুষের হাতে পৌঁছাবার প্রয়াস বহুকাল ধরেই চলেছে এবং চলবে। তবু সমস্যার অন্ত

---

* (সূরা সাবার আয়াত নং ১০-১৩ দ্রষ্টব্য)। দাউদ (আ.)কে বিপুল অনুগ্রহ দান করা হয়েছিল। পাহাড়কে ও পক্ষীকুলকে আদেশ দান করা হলো তাঁর আনুগত্য করতে এবং লৌহকে নরম করে আদেশ করা হলো(যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য) আকার-আয়তন নিয়ন্ত্রিতভাবে উপযোগী বর্ম তৈরী করতে। আর সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বাতাসকে অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া হলো– যাতে সকাল বেলা একমাসের পথ (আকাশ পথে) চলা যেতো এবং বিকাল বেলা একমাসের পথ চলা যেতো। তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করা হলো এবং জ্বীনদেরকে অধীন অনুগত হয়ে দক্ষ কারিগরী শ্রম সাহায্যে নানাবিধ দ্রব্য (উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি-প্রতিকৃতি, বড় বড় হাউজ, দেগ ইত্যাদি) নির্মাণ করে দিতে বলা হলো। সুলায়মানের আমলে দাউদ (আ.)-এর রাজত্বকালের গৌরব ও ক্ষমতার শীর্ষ কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছিল। কিন্তু সুলায়মানী কৃতিত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতার জন্য।

www.pathagar.com

নেই। কতখানি সত্যনিষ্ঠ সে ইতিহাস সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে তার মূল্যায়ন চলছে। এখনো ভুল-ভ্রান্তি ও অপূর্ণতার প্রেক্ষিতেই ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান করতে হয় বর্তমান কালে, বিশেষ করে আরবী ভাষীদের অঞ্চলের বাইরে। প্রকাশিত ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থ যে সব ইংরেজী ভাষায় প্রাপ্য, তার মধ্যে ইহুদী ও খৃস্টান লেখকদের পক্ষপাত ব্যাধির ভয়ও রয়েছে। তবু প্রামাণ্য আরবী ইতিহাস গ্রন্থের ইংরেজী ও স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের অভাবে কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর গবেষণা গ্রন্থের বিবরণের ওপর নির্ভর করে যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তেমনি গ্রন্থ অবলম্বন করে আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী নূহ্ নবীর মহাপ্লাবনের জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করেছেন। অবস্থানটি তাঁর মতে একটি সমতলধর্মী উপত্যকা। পারস্য উপসাগরের তটভূমি থেকে আট নয়শো মাইল অভ্যন্তরে টাইগ্রিস নদী ধৌত উচ্চভূমিতে। অঞ্চলটি বর্তমান তুরস্কের বোহ্তান জেলার ভূখণ্ড বলা চলে। আরারাত উচ্চভূমির পর্বতমালা অঞ্চলটিকে ঘিরে আছে। এই পর্বতমালাতে রয়েছে বিরাট বিরাট সংযোগহীন তিক্ত হ্রদ। প্রকাণ্ড ভ্যান হ্রদটির বরফ গলা ঐতিহাসিক বরফ যুগে প্লাবন সৃষ্টি করে থাকতে পারে এবং স্বল্প বৃষ্টি ও ভীষণ মুষলধারের বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে থাকতে পারে। বাইবেলে বর্ণিত আরারাত পর্বতে নূহ (আ.)-এর বিশিষ্ট জলযানের বিরতিস্থান হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবধর্মী নয়। কারণ আরারাতের উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা হলো ১৬,০০০ ফুট। যদি আরারাতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ধরা হয় তা'হলে জুড়ী অথবা গুডি পাহাড়ে বিরতি অবস্থান সম্পর্কিত মুসলিম ধারনার ঐতিহ্যের সঙ্গে তা হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা প্রাচীনতম ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(গ) অর্থনৈতিক বিবর্তন বা রূপান্তরের ইতিহাস নিয়েও এশিয়া আর ভারত উপমহাদেশের তথ্য তত্ত্ব ও ঘটনার সত্যতা নিয়ে মৌল উৎসের সঙ্গে সংযোগের অভাবে সমস্যায় পড়তে হয়। অপূর্ণতার প্রেক্ষিতে কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের পথ প্রসার করার উদ্দেশ্যে কোন কোন ধারনা উপস্থাপিত করা বর্তমানকালে আমাদের পক্ষে সম্ভব বলা চলে ঃ দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমাজ ও অর্থনীতির প্রগতির ইতিহাসকে বিবর্তিত করেছে কালের ধাপে ধাপে এবং মানুষও বিবর্তিত হয়েছে তার সঙ্গে। যে ক্ষেত্রে আদি দর্শনই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে আল্লাহ্ নির্দেশিত নীতি ও বিধানের ভারসাম্য কাঠামোতে রক্ষা করতে পেরেছে সেক্ষেত্রে মানুষও জাতির প্রয়াসসীমা লংঘনের অমার্জনীয় অপরাধ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই আদি দর্শন হলো আল্লাহ্র নিরংকুশ ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসের। যখন যুগে যুগে নবী পয়গম্বর অবতীর্ণ হয়ে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বা জাতিকে

www.pathagar.com

সতর্কতা দান সাহায্যে সংশোধন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, সে প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারেই এসেছে সে সম্প্রদায় বা জাতির ধ্বংস। বর্তমানকালে সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের প্রেক্ষিতে 'আদি দর্শনের' প্রধান ভূমিকায় বিশ্বাসী মানুষ ও জাতি ঐতিহাসিকভাবে পার্থিব কল্যাণের জ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে পশ্চাদপদ। 'আদি দর্শন' থেকে বিচ্ছিন্ন করে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রসার ও প্রয়োগ করে পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমাজতন্ত্রবাদী কম্যুনিস্টবাদী ব্যবস্থা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে গৌরব ও ক্ষমতার উচ্চস্তরে আরোহণ করে মানব কল্যাণের লক্ষ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক ভারসাম্য অর্জনের সীমালংঘন করে চলেছে। এ কালে কোন সতর্ককারী নবীর আবির্ভাব হবে না। সীমালংঘনকারীরা নিজেদের তৈরী পাপচক্রে নিজেরাই ধ্বংসের নাটক মঞ্চস্থ করে যাবে। সে ইতিহাসের প্রক্রিয়াতেই কোন কোন নেতৃত্বের কল্যাণ চেতনা সংস্কারের পথ সন্ধান করে কিছু কিছু উপযোগী সংস্কারকে সমাজ ও অর্থনীতিতে প্রচলিত করতে পারে। তেমনি অনগ্রসর 'আদি দর্শন' অনুসারী মানুষ এবং সমাজ ও তাদের ঐতিহ্য কাঠামোকে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি সাহায্যে উন্নততর করার সংস্কার কাজ ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে প্রয়াসী হতে পারে। ইতিহাসের এমনি নতুন ধারা যখন চলতেই থাকবে, তখনো সীমালংঘনকারী জাতি বা সম্প্রদায় তার কৃতকর্মের পরিণতি হিসেবে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতেই থাকবে। সচেতনতা ও সক্ষমতাই সেসব দুর্যোগের মোকাবিলা ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্য এনে দিতে পারে। আল্লাহ্ যা বিধান দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্ট হবে সমাজে।

(ঘ) আয়াত দু'টির মহাপ্লাবন এবং তার উপযোগী আত্মরক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশিষ্ট নৌকা বা জলযান নির্মাণের দৃষ্টান্ত বর্তমানকালের পটভূমিতে মানুষের জ্ঞানাহংকার সৃষ্টি পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার দিকে উদ্বুদ্ধ করাই স্বাভাবিক। তাই তো বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দরিদ্র দেশ যেমন উদ্বিগ্ন জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাও উদ্বিগ্ন Green house effect-এর ফলে উপকূলবর্তী বিরাট নিম্ন অঞ্চল নিমজ্জিত হয়ে গেলে আর কোটি কোটি মানুষ নিরাশ্রয় ও অর্থনৈতিক সম্পদহীন হয়ে গেলে, কিভাবে মানবিক কল্যাণের পথ রক্ষা করা যাবে। জাপানের মতো সমৃদ্ধ দেশও ভাবছে সমুদ্রের উপরে ভাসমান আবাসস্থান তৈরী করে ভবিষ্যৎ চাহিদা চাপের মোকাবিলা করার কথা। এসব অভিনব প্রচেষ্টা এবং সাধারণভাবে মোকাবিলা করার মধ্যেই চলতে থাকবে সমাজ ও জাতির উত্থান-পতন

www.pathagar.com

ও ভাঙ্গা-গড়ার নতুন ইতিহাস। এ ইতিহাস শুধু অর্থনীতির ইতিহাস নয়, আদি দর্শনের আদর্শ পরিচালিত এবং আদর্শ বর্জিত জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভূমিকার সংঘাতময় ইতিহাস। ভবিষ্যতকালই তার স্বাক্ষর বহন করবে।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর, ১৯৮৩, ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪০।

২. আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৩. আল-মুফরাদাত, রাগেব ইসফাহানী, পৃষ্ঠা ২৫৫।

৪. তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, শাওকানী, দারুল ফিক্‌র, বৈরূত, পৃষ্ঠা ৪৯৭।

৫. তফসীরে কাবীর, ফখরুদ্দীন রাযী, দারুল কিতাবিল ইল্‌মিয়া, তেহরান, ১৭ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২২-২৪

৬. ফী-যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, দারুশ শুরুক, বৈরূত, ১২শ খন্ড, ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ১৭৬-৭৭।

৭. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ১ম সংস্কারণ, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৭৭০।

৮. Abdullah Yusuf Ali, the Holy Quran, Note Nos. 1531 & 1539.

www.pathagar.com

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط وَلَا تَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ. وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি আমরা তাহাদের ভাই শু'আইবকে পাঠাইলাম। তিনি বললেন ঃ হে আমার জাতির মানুষেরা! আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবূল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের প্রভু আর কেহ নাই। আর ওজন ও পরিমাপে কম করিও না। আজ আমি তোমাদিগকে ভাল অবস্থায়ই দেখিতেছি কিন্তু আমার ভয় হয়, কাল তোমাদের উপর এমন দিন আসিবে, যার আযাব তোমাদের সকলকে ঘিরিয়া ফেলিবে। হে জাতির ভাইসব! ঠিক ঠিকভাবে ইন্‌সাফ সহকারে পূর্ণ ওজন ও পরিমাপ কর। আর লোকদের জিনিসে জিনিসে কোনরূপ ক্ষতির সৃষ্টি করিও না। এবং যমীনে (পৃথিবীতে) বিপর্যয় সৃষ্টি করিও না। – সূরা হূদ ঃ ৮৪-৮৫

প্রেক্ষিত আলোচনা ও সারমর্ম

আলোচ্য আয়াত দু'টির প্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্য তফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে সুন্দর বর্ণনার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। সংক্ষেপে সে বর্ণনা অনুসারে বলা যায় ঃ

সিরিয়ার বর্তমান 'মোয়ান' নামক স্থানে 'মাদইয়ান' শহর এক সময়ে অবস্থিত ছিল। সে মাদইয়ান শহরের কওম কুফর ও শিরক ছাড়াও একটা সামাজিক অপকর্মে লিপ্ত ছিল। তা হলো, মানুষকে ওজনে ও পরিমাপে প্রতারণা করা। সে সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই একজনকে অর্থাৎ শু'আইব (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করলেন সে কওমকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। প্রথম আয়াতটিতে

www.pathagar.com

রয়েছে হযরত শু'আইব (আ.)-এর নিজ জাতির লোকের প্রতি ইসলামী আহবান-আল্লাহ্র একত্বের স্বীকৃতির দিকে আহবান, যাতে ভিত্তিগতভাবে তাদের আচরণ বিশুদ্ধ হয়। মাদইয়ানবাসীরা ছিল মুশরিক; তারা গাছপালা পূজা করত। এ ধরনের কুফ্র ও শিরকের সঙ্গে তাদের সামাজিক অপরাধ চলছিল আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়ে ওজন ও পরিমাপে প্রতারণারীতি অবলম্বন মাধ্যমে। প্রথমে ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহবানের পরে প্রথম আয়াতেই বলা হলো শু'আইব (আ.)-এর উক্তি, "ওজন ও পরিমাপে কম করিও না।" দ্বিতীয় আয়াতে এই সে সামাজিক অপরাধ থেকে দূরে থাকার দিকে জোর দিয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হলো এবং তার মারাত্মক পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফর ও শির্কই সকল পাপের মূল। যে জাতি এতে লিপ্ত তাদেরকে প্রথমেই তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও ব্যবসা রীতি ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও সাধারণত ঈমান বা কুফর-এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আল-কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীদের এবং তাদের ও তাদের জাতিসূহের ইতিহাস থেকে তাই বোঝা যায়। তবে দুইটি জাতি ছিল অসাধারণ, যাদের মধ্যে কুফর-এর সঙ্গে মারাত্মক সামাজিক অপরাধও সংযুক্ত হয়েছিল। সে দু'টি জাতি ছিল লূত (আ.)-এর জাতি এবং অন্যটি ছিল, শু'আইব (আ.)-এর জাতি। এতে বোঝা যায় "পুংমৈথুন ও মাপে কম দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অত্যন্ত জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ এ দু'টি এমন কাজ, যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত হয় এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।"

কিছু সংশ্লিষ্ট শব্দ বা বাক্যাংশ সম্পর্কে

مكيال وميزان দু'টি শব্দ সঠিক ও ন্যায়নিষ্ঠ পরিমাপ ও ওজন পদ্ধতি অবলম্বনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মাদইয়ানবাসীরা সমৃদ্ধ ও সচ্ছল জাতিতে পরিণত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই তাদের এ সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা। সুতরাং সঠিক পরিমাপ ও ওজনের মাধ্যমে সে জাতির পক্ষে নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আচরণে উত্তম ভূমিকা পালনই বাঞ্ছনীয়। ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এ জাতি পরকালের কল্যাণও উপলব্ধি করল না, ইহকালের সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার পথে যে সব নৈতিক অন্তরায় কাজ করে এবং সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় সে কথাও উপলব্ধি করল না। শু'আইব (আ.) বললেন ঃ 'আমি বর্তমানে তোমাদেরকে সচ্ছলতায় দেখছি। সমৃদ্ধ ও সচ্ছল থাকলে তো আর প্রতারণার মাধ্যমে আরো বেশী

সচ্ছলতার দিকে লোভ আসা সঙ্গত নয়। তবু তারা এ রকম প্রতারণাকেই নীতি বলে অবলম্বন করল।

তফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদইয়ানবাসীদের কম মূল্য দেওয়ার আরেকটি রীতি ছিল এই যে তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পার্শ্ব থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য কেটে রেখে কম ওজনের মুদ্রা বাজারে প্রচলিত করে দিত। হযরত শু'আইব (আ.) তাদের এমনি সামাজিক দুষ্কর্ম থেকেও বিরত থাকতে বলেছেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলে করীম (স.) মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভগ্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কুরআন পাকের সূরা নামল-এর ৪৯ নং আয়াত تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন ঃ

মাদইয়ানবাসীরা দিনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আত্মসাৎ করত, যাকে কুরআনের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.)-এর খিলাফতকালে এক ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলীফা তাকে দোররা মারার ও তার মস্তক মুণ্ডন করে শহরে প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ দেন" (তফসীরে কুরতুবী)*

মাপে কম দেওয়া (আরবীতে যাকে তাতফীফ বলা হয়) ওলামায়ে উম্মতের 'ইজমা' অনুসারে সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালেক (র.) তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ওজনে ও পরিমাপে কম দেওয়ার কথা বলে আসলে বোঝানো হয়েছে– কারো কোন ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেওয়া, তা ওজন বা পরিমাপ করার কোন বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোন বেতন ভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোন শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোন নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের সুন্নতগুলো পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত 'তাতফীফের' অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে।**

---

* মুফ্তী মুহাম্মদ শফী, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২৭ দ্রষ্টব্য।

** একই উৎস, পৃষ্ঠা ৮৬০।

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আয়াত দু'টির আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য উপরোক্ত বর্ণনা থেকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সামাজিক পর্যায়ে ওজন-পরিমাপ নিয়ে (বা অন্যান্য রীতিতে) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতারণার কুফল এবং মারাত্মক পরিণতি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বিরোধী হয়ে থাকে। সমষ্টিগতভাবে জাতির বিরাট বা প্রধান অংশ যদি এমনি কল্যাণ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় সে জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে বা স্থিতিশীলতাকে প্রথমে অবনতি এবং ক্রমশ ধ্বংস বরণ করতেই হবে, যদি না প্রক্রিয়ার অমোঘ বিধির গতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জাতিটি আত্মসংস্কার করে নেয়। সামাজিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রকৃত নিয়মবিধিকেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল-কুরআনে তাঁর নিদর্শন ও বাণী অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের পার্থিব জীবনের ইতিহাসের নানা সংকট পযায়ে এসেছে সে প্রকৃত জীবন বিধান ও আচরণ বিধানের রজ্জু ধারণ করে থাকার অগ্নিপরীক্ষা। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টির এবং মানুষের আনুগত্যের মৌল সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হলে এবং স্রষ্টার বিধান অনুসারে ইহকাল-পরকালের কল্যাণ অর্জন করার লক্ষ্য থেকে ... পক্ষান্তরে ঈমান ও তাওহীদের শৃঙ্খলা পালনের লক্ষ্য থেকে পথচ্যুত হলে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না কোন মানবজাতি। সমষ্টিগতভাবে বিপুল মাত্রায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অকল্যাণ সৃষ্টি করে সে জাতিই নিজস্ব কর্মফলের পরিণতি হিসেবে সমাজকে ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করে। মাদইয়ান জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া তারই ঐতিহাসিক নিদর্শন। এ জাতি নিজেকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারত যে দু'টি দিকে আত্মশুদ্ধি বা সংস্কার করে তা হলো ঃ এক. আল্লাহ্র একত্ববাদ গ্রহণ ভিত্তিতে আত্মা ও আচরণকে সত্যনিষ্ঠ করা; দুই. অর্থনীতিতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা বর্জন করা। এ দু'টি সংস্কারের কথা তাদের মন ও বিবেক থেকে এলো না অনেক কাল, তাই প্রয়োজন হলো আল্লাহ্র প্রেরিত সংস্কারক শু'আইব (আ.)-এর আহবানের ও সতর্ক বাণী উচ্চারণের। শেষ পর্যন্ত ঈমানের ভিত্তিকেও তারা গ্রহণ করল না, অর্থনীতিকেও সংশোধন করলো না। অনিবার্যভাবেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো এখান থেকেই ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। তাওহীদভিত্তিক জীবন বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবেই ইসলামী অর্থনীতির উৎপত্তি।

আধুনিক কালের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতারণামূলক নীতি বা রীতি প্রচলিত করা হলেও তার পরিণতি অকল্যাণই বয়ে আনবে অনেক দিক থেকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে ঃ (১) প্রথমত, মানুষের

www.pathagar.com

আচরণে ক্রিয়ার জন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে যেসব বিক্রেতা ওজন ও পরিমাপে কম দেওয়াকেই রীতি রেওয়াজে পরিণত করবে, সমাজের মানুষের পক্ষে তাদেরকে চিহ্নিত করে ফেলতে বিলম্ব হবে না। তার ফলে কিছু ক্রেতা তাদের প্রতারণার শিকার প্রথমে হলেও পরে ক্রেতারা প্রতারকদের বর্জনই করবে। প্রতারকদের ব্যবসা তাতে ক্রমে হ্রাস ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে। নিজেদের নীতি পরিবর্তন ও পরিশোধন না করলে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ব্যবসা থেকে বিদায় নিতে হবে। প্রতারক ব্যবসায়ীর সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা আসে। সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী ভাল নাগরিক ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্ষতি ও অকল্যাণের অবিচার থেকে কষ্ট পায়।

২. দ্বিতীয়ত, অবিচারমূলক ক্ষতি সমাজেরই ক্ষতি করে। সেজন্যই রাষ্ট্র পরিচালনাতে সংশ্লিষ্ট জাতির সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধিকে আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রতারক ব্যবসায়ীদের আচরণকে আইনের সাহায্যে সামাজিক কল্যাণের অনুসারী করা হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সে কাজে নিযুক্ত থাকে এবং আইনের বিধি অনুসারে প্রতারণার প্রকার ও পরিমাণ ভিত্তিতে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে; কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি ভিত্তিগতভাবে ন্যায়বিচার ও ইসলামী সমাজ বিধান ও জীবন বিধানের অনুসারী না হয়, তবে অনেক ব্যবসায়ীই প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে স্বার্থসিদ্ধির পথ সন্ধান করতে পারে। তখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও দুর্নীতির শিকারে পরিণত হতে পারে। তখন সমস্যার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।

৩. তৃতীয়ত, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য বেশী মাত্রায় সংশ্লিষ্ট থাকলে দেশের আইনকে ফাঁকি দিয়ে প্রতারক ব্যবসায়ীদের প্রতারণার ষড়যন্ত্র জটিল আকার ধারণ করে। দেশের জাতীয় অর্থনীতির মৌলিক ক্ষতি সাধনও চলতে পারে চোরাচালান ব্যবসার প্রসারের সাহায্যে এবং চোরা চালান ব্যবসার মূলধন গোপনে পাচারের সাহায্যে। বাংলাদেশ অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতাও ইহা। জাতীয় অর্থনীতিতে যত দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় চোরাচালানের সুযোগও তারই সহায়তায় আরো বেশী বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তার ফলে অর্থনৈতিক কারণে (আইনবিধি থাকা সত্ত্বেও) সামাজিক অকল্যাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হতে থাকে। সমাজ-বিরোধী ব্যবসায়ীরাই অধিক সংখ্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদের অধিকারী হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা পর্যন্ত তাদেরই নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে। দৈন্যগ্রস্ত মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে পারে সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচারমূলক আয় বন্টন বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ার জন্য। নৈতিক অবক্ষয় ও অরাজকতা বিপুল আকার ধারণ

www.pathagar.com

করতে পারে। এমনি পরিবেশে জাতীয় সমাজ ও অর্থনীতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি বহন করতে থাকে।*

৪. চতুর্থত, পরিস্থিতি যখন নৈরাশ্যজনক দিকে মোড় নেয়, তখন নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণই সমাজ ও অর্থনীতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভুলগুলো চিহ্নিত করতে পারে। নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রয়াসের ভুলগুলোকেও চিহ্নিত করতে পারে। সেসব মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও সমীক্ষার সত্যকে স্বীকার করে নিলে শুরু হতে পারে জাতির পুনর্গঠনের নতুন অধ্যায়। নৈতিকতাভিত্তিক এবং ন্যায়বিচার ভিত্তিক কল্যাণকে অনুসরণ করে শুরু হতে পারে নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, যাতে নৈরাশ্যের অমানিশা দূর হয়ে ফুটে ওঠে প্রতিশ্রুতি বিস্ময় নতুন প্রত্যয়ের নতুন ঊষা।

উপরোক্ত ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, পথস্খলন ও সংঘাতের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ বর্তমান পৃথিবীতে অবাস্তব আশা নয়। আলোচনাধীন আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করলেই দেখা যাবে– ন্যায়বিচারমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আচরণকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারলেই অবাঞ্ছনীয় ও অকল্যাণময় পরিণতি বর্জন করা যায়। সে লক্ষ্যেই শু'আইব (আ)-এর আহবান। আল্লাহ্ তা'আলার পরিকল্পিত মানবিক জীবন সত্য ও সমাজ এর অর্থনীতির ভিত্তিতে আহবান। সেই জীবন সত্য, সমাজ ও অর্থনীতির ভিত্তিকে উপেক্ষা করে সাময়িক সমৃদ্ধি লাভের অহংকার বলেই প্রতারণামূলক, ব্যবসা বাণিজ্য রীতিতে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছিল মাদইয়ান জাতি। সতর্কতা উচ্চারণও সে ভ্রান্তি থেকে সংশোধিত করতে পারেনি তাদেরকে। কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের যুক্তি তারা কিছুতেই শুনতে চায়নি। নিজেদের ধ্বংসকে তারা তাই করল বরণ।

আধুনিক কালেও উক্ত ধরনের ভ্রান্তি নানা সমাজে বিশেষ করে অনুন্নত অবস্থায় পরিবেশে এবং ঔপনিবেশিক শোষণের ইতিহাস প্রেক্ষিতে প্রবেশ করেছে– যার জন্য সমাজ ও অর্থনীতি প্রচ্ছন্ন প্রতারণাকে অথবা দুর্নীতিকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে। কারণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রশ্ন এমনকি অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণের প্রশ্নও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সাহায্যের লেনদেনের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। যা স্বাভাবিক মানদণ্ডের জীবন এবং যে অর্থনৈতিক আচরণ সে

---

* পণ্যের standard specification ওজন, পরিমাপ ইত্যাদি নিয়ে প্রতারণা দেশের অর্জিত সম্পদকে অন্যায়ভাবে বিদেশে পাচার করার মারাত্মক রূপ নিতে পারে দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রে। over invoicing এবং under invoicing পন্থা মাধ্যমে আর বিদেশী ব্যাংকের সক্রিয় সহযোগিতায়। তারই দৃষ্টান্ত আজকাল অনেক দরিদ্র দেশে।

www.pathagar.com

জীবনের উপযোগী সে দিকে দৃষ্টি রেখে নীতি নির্ধারণ করার এখন আর কোন আগ্রহ বা অনুপ্রেরণা নেই। হযরত শু'আইব (আ.)-এর পরবর্তী উক্তিতে (আয়াত নং ৮৬) বলা হয়েছে। (আল্লাহ্ তোমার জন্যে যা উদ্বৃত্ত দান করেন তাতেই তোমার সর্বোত্তম কল্যাণ) অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করে যদি সমাজের সংশ্লিষ্ট সবাইকে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ দান কর, তাতেই তোমার সর্বোত্তম উদ্বৃত্ত ন্যায্য অর্জন হিসেবে থাকবে এবং সে ভিত্তিতেই তুমি সমাজের সকলের একই নীতি অনুসরণের ফলে তোমার ও সমাজের সমৃদ্ধি সংগঠন করতে সক্ষম হবে*। এর ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং থাকবে। সমাজ থেকে অর্থনৈতিক শোষণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রক্রিয়া দূরীভূত হবে। সেজন্যই মানব কল্যাণের সমাজ ও অর্থনীতির সম্ভাব্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা যাতে বর্তমানকালের পরিস্থিতিতেও সংগঠিত ও বাস্তবায়িত করার প্রয়াস করা যায়– সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মাদইয়ান জাতির ধ্বংস প্রাপ্তির ঐতিহাসিক নিদর্শন।**

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

---

* "If he follows God's Law, what is left him after he renders to others their just dues will be not only enough, but will be the best possible provision for his own physical and spritual growth. (Vide Adbullah Yusuf Ali, The Holy Quran, Lahore, Note No. 1585, p.537) ইসলামী অর্থনৈতিক আচরণ ভিত্তি করে উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করলে ন্যায়বিচার নীতি অনুসারে শ্রমিক পাবে শ্রমের ন্যায্য মজুরী, ঋণ পাবে সুদ, উদ্যোগ গ্রহণকারী পাবে যথেষ্ট মুনাফা পুঁজির জন্য ও উদ্যোগ গ্রহণের জন্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে মুনাফাই সুবিচারমূলক উদ্বৃত্ত, যার তাৎপর্য normal profit বা surplus value তত্ত্ব বহন করে না।

** আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য আলোচনাতে গবেষণা প্রকল্পটির অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে সাধারণধর্মী প্রধান প্রধান দিক নির্দেশনার প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে পরবর্তী পর্যায়ে বিশদ গবেষণার অধীনে আরো গভীর ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ এ সকল দিক-নির্দেশনা থেকে সম্ভব হয়। এমনকি প্রেক্ষিত আলোচনা থেকেও আরো নতুন দিক-নির্দেশনার সংযোজন ও সে ভিত্তিতে নতুন বিশ্লেষণ সঙ্গতভাবেই প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রসূ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আয়াত তিনটির প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দিক থেকে এ প্রবন্ধটিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতির দিকেই দৃষ্টিপাতকে কেন্দ্রীভূত রাখা হয়েছে। পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য সার্বিক আর্থ-সামাজিক দিকগুলোর বিবেচনাই বর্তমান যুগের সমস্যা কাঠামোতে সঙ্গত। দ্বিতীয় আয়াতটিতে যে ন্যায়বিচার সহকারে ওজন ও পরিমাপের ব্যবহার পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সে 'ন্যায়বিচার'-এর জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি আচরণের স্বাতন্ত্র্য থেকেই উৎপত্তি লাভ করবে। সে উৎস থেকে ব্যবহারিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এখনো নতুন আধুনিক কাঠামোতে মুসলিম দেশে বিবর্তিত হয়নি, আইনানুগ হয়ে উঠেনি। সে দিকে বিশ্লেষণ দুইই বাঞ্ছনীয়। তেমনি আবার অন্য একটি ব্যাপক দিক রয়েছে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তরজমায়ে কুরআন মজীদ, ফালাহ্-ই আম ট্রাস্ট, ঢাকা।

২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনুবাদ মওলানা মুহিউদ্দীন খান, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৮২১-৮২৭।

৩. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran. p. 537.

বিনিময়ের প্রসারকে সুগম করার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো; বিশেষ করে মুদ্রানীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা। যে কালে (১৯১৩ সালের মেয়াদ পর্যন্ত কালে) স্বর্ণমান (Gold Standard) ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তখন মুদ্রার স্বর্ণ ধাতু মূল্য এবং জাতীয় সাধারণ আইন বিধিসম্মত মূল্য সমান ছিল। সে মানদণ্ডের আদর্শ থেকে প্রতারণা সম্ভব ছিল স্বর্ণমুদ্রার পাশ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে সেসব অংশ গলিয়ে স্বর্ণের আকারে বিক্রয় করার মাধ্যমে। সে ধরনের রীতিও মাদইয়ান বাসীরা অবলম্বন করেছিল। বর্তমান যুগে স্বর্ণ বা রৌপ্যকে মুদ্রামানের সঙ্গে ধাতুর জন্মগত মূল্য ভিত্তিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্ভব নয় বলে প্রথমে ধাতুর স্থিতিশীল মূল্যহেতু ধাতু (স্বর্ণকে) রিজার্ভ বা সঞ্চিত রেখে তার মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাগজী মুদ্রার প্রচলন করা হয়। পরবর্তীকালে সে সম্ভাব্যতার ভিত্তিও আর থাকল না খনিজ ধাতুর সরবরাহ এবং মূল্যের স্থিতিশীলতার অভাবে। বর্তমানকালে সারা বিশ্বে চলছে কাগজী মুদ্রা আর তাকে সব দেশে জাতীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমে সাধারণ সহনশীল মূল্য মাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত রাখতে চেষ্টা করা হয়। সে ব্যবস্থাপনাতে মুদ্রাস্ফীতিজনিত দ্রব্যমূল্য স্ফীতি সমাজে ও অর্থনীতিতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। একটা দেশের সমাজ ও অর্থনীতি একেবারে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়ে যেতে পারে, যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানীর অবস্থা হয়েছিল। ইসলামী অর্থনীতি এ সকল ধরনের বিশৃঙ্খলা বর্জিত সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক মূল্যমানের স্থিতিশীলতাকেই সমর্থন করে। সে দিক-নির্দেশনাকে গভীর ও ব্যাপকভাবে গবেষণার মাধ্যমে বাস্তব নীতি ও তার কল্যাণময় প্রয়োগের সুযোগ প্রসারিত করা প্রয়োজন, যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে নতুন উদ্ভাবিত নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ
نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰؤُا اِنَّكَ لاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ

তাহারা বলল, হে শু'আইব, তোমার নামায কি ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা এসব মাবুদ পরিত্যাগ করব যাদের ইবাদত আমাদের বাপ-দাদারা করত ? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু আমরা করে থাকি তা ছেড়ে দেব ? শুধু তুমিই একজন মহৎ ও সৎ ব্যক্তি থাকিয়া গেলে।

–সূরা হূদ ঃ ৮৭

তাফসীরকারদের আলোচনা

এ আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে মুফ্তী শফী লিখেছেন ঃ "ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করত। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোন স্থান দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশী ভোগ-দখল করতে পারে; এক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন বর্তমান যুগেও কোন কোন অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

–মা'আরেফুল কোরআন, সূরা হূদের ৮৭ নং আয়ারেত তফসীর

এ আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেন, "ইহাই জুলুমের বিরুদ্ধে জাহিলিয়াতের মতাদর্শের স্পষ্ট প্রকাশ। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী হইল, আল্লাহ্‌র দাসত্ব ছাড়া যে পথ ও পন্থাই গৃহীত হইবে তাহাই ভুল এবং তাহার অনুসরণ করা কিছুতেই উচিত নয়। কেননা অপর কোন পথ ও পন্থার স্বপক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিদ্যা-বিজ্ঞান ও আসমানী কিতাবসমূহে কোনই দলীল বা প্রমাণ নেই। আর দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র বন্দেগী শুধুমাত্র একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়– হওয়া উচিত নয়। বরং তামাদ্দুন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র দাসত্ব বাস্তবায়িত করিতে হইবে। কেবল দুনিয়ার মানুষের নিকট যাহা কিছু

www.pathagar.com

আছে তা সবই আল্লাহ্‌র। মানুষ কোন জিনিসেরই উপর আল্লাহ্‌র মর্জী হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ইচ্ছামূলক হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নহে।

জাহিলিয়াতের মত ও পথ ইহার বিপরীত। তাহা হইল বাপ-দাদার আমল হইতে যে রীতি ও পন্থা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই মানুষের পালন করিয়া চলা কর্তব্য। আর তাহা মানিয়া চলার ব্যাপারে ইহার অতিরিক্ত অপর কোন দলীলের প্রয়োজনই নেই যে, ইহা বাপ-দাদার নিয়মও পন্থা। উপরন্ত দীন ও ধর্ম বলতে শুধু পূজা-উপাসনালয়ই বোঝায়। জীবনের সাধারণ ব্যাপারে তো আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা যাহা আবশ্যক, আমরা সেখানে যাহা ইচ্ছা তাহাই করবার অধিকারী।

ইহা হইতে এ কথারও ধারণা করা যায় যে, জীবনকে ধর্মীয় ও বৈষয়িক এই দুই স্বতন্ত্র বৃত্তে বিভক্ত করা কোন নতুন ধারণা নয়! আজ হতে তিন সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে হযরত শু'আইবের জাতিও এইরূপ ভাগ-বাটোয়ারা করারই দাবী জানিয়েছিল, যেমন বর্তমানের পাশ্চাত্য দেশ ও তাদের প্রাচ্য শাগরেদরা দাবী জানাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন নতুন আলো নয় এবং আজও ইহা মানসিক অবস্থা ও মননশীলতার বিকাশের ফলে জানা যাইতেছে না। বরং আসলে ইহা তো অতি পুরাতন কথা। হাজার বছর পূর্বেকার জাহিলিয়াতেও ইহা এইরূপ প্রাবল্য সহকারে প্রচারিত হইয়াছিল এবং উহার বিরুদ্ধে ইসলামের প্রবল ভূমিকা সংগ্রামও পৃথিবীতে আজ নতুন নয়। বরং ইহাও অতি প্রাচীন ব্যাপার।"

-তাফহীমুল কোরআন, সূরা হূদের তফসীর, ৯৭ নং টীকা

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের জন্য ইহা একটি দিকনির্দেশকারী আয়াত। এ আয়াতে খুব স্পষ্টভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। শু'আইবের কওম মনে করত যে, তাদের কাছে যে সম্পদ রয়েছে তার নিরংকুশ মালিক তারাই এবং তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ধন-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে তারা কোন ধর্মীয় আইনের বা সৃষ্টিকর্তার বিধানের অধীন নয়। নামাযের সঙ্গে বা ধর্মীয় ইবাদতের সঙ্গে অর্থনৈতিক কাজ-কারবারের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে– তা তারা বুঝতেও পারত না, মানতেও চাইত না। হযরত শু'আইবকে এজন্য তারা উপহাস করেছিল। কিন্তু কুরআন বলছে যে, আল্লাহ্‌র বিধানে এ ধরনের চিন্তার কোন সমর্থন নেই। ইসলাম ধর্মকে এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে আলাদা ও সম্পর্কবর্জিত মনে করে না। ইসলামের মতে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধের প্রয়োগ থাকবে। জীবনকে কৃত্রিমভাবে ভাগ করা কুরআন স্বীকার করে

www.pathagar.com

না। আল্লাহ্ ও নবীর আনুগত্য সর্বপ্রকার বিধি-নির্দেশই অমান্য করা নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কুরআনের সংশ্লিষ্ট কিছু আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

"হে মু'মিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ..." –সূরা নিসা ঃ ৫৯

"বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই।" –সূরা ইউসুফ ঃ ৪০

"জানিয়া রাখ, সৃষ্টি তাঁহার (আল্লাহ্র) এবং আদেশ দেওয়ার অধিকারও তাঁহারই।" –সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর।" – সূরা আ'রাফ ঃ ৩

"আল্লাহ্ যা বিধান দিয়েছেন, সে মোতাবেক যাঁরা সঠিক বিচার করে না তারা কাফির (كافر) তারা জালিম (ظالم) তারা ফাসিক (فسق)।"

– সূরা মায়িদা ঃ ৪৩, ৪৫ ও ৪৭

এ সব আয়াতে সুস্পষ্ট হয় যে, অর্থনৈতিক জীবনও আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের অধীন হবে। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের বেলায় কোন শর্তারোপ করা হয়নি অর্থাৎ নিঃশর্তভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধান ব্যক্তিজীবন থেকে আরম্ভ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মেনে চলতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রযোজ্য ইসলামের বিধান মেনে চলতে বাধ্য। মুসলিম রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব জাতীয় অর্থনীতিকে ইসলামের বিধান ও লক্ষ্যের কাঠামোতে নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন করা। বর্তমান কালে সারা বিশ্বেই ইসলামী অর্থনীতিকে সমাজ বিজ্ঞানরূপে বিশ্লেষণ করার গবেষণা চলছে। সেদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আলোচ্য আয়াতটিতে একটি গভীর ধর্মী মৌল নির্দেশনা রয়েছে। আধুনিক কালের অমুসলিম অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে দু'ভাগে ভাগ করে বিবেচনা করে। একভাগে হলো positive economics অর্থাৎ যা যেমন আছে Something is as it is তারই রূপ প্রদর্শন। অন্যভাগে হলো Normative economics অর্থাৎ যেমন এর থাকা বাঞ্ছনীয় as it should be. পরবর্তী ভাগে সাধারণ কোন সমস্যার বিশ্লেষণ করে সমাধানে সুপারিশ পরিবেশনের প্রচেষ্টা হয়। এক্ষেত্রে কোন মূল্যবোধ আগে থেকেই প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে ধর্তব্য থাকে। তারই প্রেক্ষিতে ভাল মন্দ বিচার করে সমাজের জন্য বা কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ বা বিপন্ন ইত্যাদি ব্যাপারে সুপারিশ পরিবেশন করে বিশ্লেষণকারী। আর positive economics-র ব্যাপারে কোন বিষয়ে কিছু ঘটনা ঘটা বা কোন আচরণকে উপলব্ধি করার জন্য প্রথমে একটা সম্ভাব্য কারণ চিন্তা করতে হ

www.pathagar.com

তাকে hypothesis ধরে নিয়ে তার কাঠামোতে যুক্তিবাদ দাঁড় করানো হয়। সে যুক্তিবাদ দিয়ে যদি ঘটনা বা আচরণের কারণ বিশ্বাস্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে সেই আগের ধর্তব্য কারণই তত্ত্ববাদের যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু সে গ্রহণযোগ্যতা সাময়িক। অন্য তত্ত্ববাদী ভিন্ন রকম যুক্তিবাদ দাঁড় করিয়ে গৃহীত তত্ত্বকে ভুল প্রমাণও করতে পারে। তখন পরবর্তী তত্ত্বটিই নতুন সত্যে পরিণত হবে। আগেরটি বর্জিত হবে। এমনি পদ্ধতিতে কোন অপরিবর্তনীয় ধর্তব্য সত্যের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তেমনি পদ্ধতি সে কারণেই কোন অপার্থিব সত্তার দেয়া সৃষ্টি জগতের বিধানের প্রতি বিশ্বাসকেও প্রশ্নাতীত মনে করে না। তখন জ্ঞান ও তত্ত্ব সবকিছু ধর্ম নিরপেক্ষই শুধু হয় না, দিক-নির্দেশনাহীন এবং লক্ষ্যহীন হয়। সেজন্যেই জ্ঞানকে ধ্বংসের লক্ষ্যে ও অকল্যাণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হতে থাকে।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনীতি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকে মানুষের অর্থনীতি-বহির্ভূত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বর্জিত তত্ত্বজ্ঞান বা তার ব্যবহারকে মানুষের জীবনোপযোগী করার জন্য কোনই পদ্ধতিগত সংস্কার করেনি। সে সংস্কার সম্ভব শুধু নৈতিক ও ইসলামী মৌল বিশ্বাস এবং বিধানের ধর্তব্যকে আর ভাব-ধারণাকে অনুশীলন ও গবেষণার অন্তর্গত করে। এগুলোকে বলা হয় Fundamental Assumptions and Concepts.*

শাহ্ আবদুল হান্নান

* বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Prof. Raihan Sharif, Islamic Economics Principles and Applications, Islamic Foundation Bangladesh, 1985. Chap. 5.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইউসুফ

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম এবং এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।

– সূরা ইউসুফ ঃ ২২

তাফসীরকারগণের মতামত

উপরোক্ত আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নবূয়ত প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। শক্তি ও যৌবন কোন বয়সে অর্জিত হল এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ (র.) বলেন ঃ তখন বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। যাহ্‌হাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চল্লিশ বছর বর্ণনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞাও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ কূপের গভীরে যে ওহী তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল তা, যা পয়গম্বর নয় এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায়।

"আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি" এই আয়াতাংশ টুকুর উদ্দেশ্য হল এই যে ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌঁছানো ইউসুফ (আ.)-এর সদাচরণ, আল্লাহ্-ভীতি ও সৎকর্মের পরিণতি ছিল। এটা শুধু তারই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ সৎকর্ম করবে সে এমনিভাবে পুরস্কার লাভ করবে।

–মা 'আরেফুল কোরআন

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সৎকর্মকারীদের জন্য সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য পুরস্কার হিসেবে কোন ধন-দৌলতের কথা নয়, জ্ঞান ও হিকমতের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিতেও

www.pathagar.com

জ্ঞান ও হিকমতকে প্রকৃত সম্পদ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। পশ্চিমের অর্থনীতিসমূহে প্রবৃদ্ধির কারণ হিসেবে উৎপাদনের উপকরণসমূহের প্রবৃদ্ধি ধরা হত। তবে অধুনা অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে– অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ মানব সম্পদ উন্নয়ন। আর মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা হিকমত অপরিহার্য। আজ হতে শত শত বছর আগে ইসলামে যে উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, তার মূল উপজীব্য হল এক উন্নত মানব যে আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে যেমন উন্নয়নের কাজে অংশ নেয়, তেমনি তার চেয়ে কম ভাগ্যবানের জন্য আত্মত্যাগ করে। জ্ঞান ও হিকমতে বলীয়ান এই মানবের কর্মকাণ্ডের ফলে অর্থনীতিতে শুধু যে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ে তাই নয়, আয় ও সম্পর্দের সুষম বন্টনও হয়।

ডঃ সালাহ্ উদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّىْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ. قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْبُلِهٖ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ. ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ. ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ.

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ. وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِىْ الْاَرْضِ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلاَ نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ.

সে বলিল, হে ইউসুফ! হে সত্যের মহাপ্রতীক! সাতটি হৃষ্ট পুষ্ট গাভী রহিয়াছে, সেইগুলিকে অপর সাতটি ক্ষীণাঙ্গী গাভী খাইতেছে, আর সাতটি শস্যগুচ্ছ সবুজ-সতেজ এবং অপর সাতটি শুষ্ক- এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাকে বল। সম্ভবত আমি সেই লোকদের নিকট ফিরিয়া যাইব আর তাহারা জানিতে পারিবে। ইউসুফ বলিল ঃ সাতটি বৎসর পর্যন্ত তোমরা ক্রমাগতভাবে চাষাবাদ করিতে থাকিবে। এই সময় যেসব ফসল তোমরা কাটিবে তাহা হইতে অল্প অংশ যাহা তোমাদের খোরাকের জন্য প্রয়োজনীয় (গুচ্ছ থেকে) ছাড়াইয়া লইবে আর অবশিষ্ট শস্য গুচ্ছের মধ্যেই রাখিয়া দাও। ইহার পর সাতটি বৎসর খুব কঠিন আসিবে। এই সময়ের জন্য তোমরা যেসব শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, তাহা সবই এই (সাত বৎসর) কালে খাইয়া ফেলিবে।

www.pathagar.com

যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তবে শুধু তাহাই– যাহা তোমরা সংরক্ষিত রাখিয়াছ। ইহার পর একটি বৎসর আবার এমন আসিবে, যখন রহমতের বর্ষণ দ্বারা (তৃপ্ত করে) মানুষের ফরিয়াদ শোনা হইবে এবং তাহারা রস নিংড়াইবে।

ইউসুফ বলিল ঃ দেশের অর্থভাণ্ডার আমার নিকট সোপর্দ করুন। আমি হেফাযতকারী ও তাহার জ্ঞানও রাখি। এইভাবে আমরা সেই দেশের উপর ইউসুফের প্রতিষ্ঠা লাভ করার পথ সুগম ও প্রশস্ত করিয়া দিলাম। যেখানে ইচ্ছা নিজের বসবাস স্থান নির্মাণ করার তার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। বস্তুত আমরা আমাদের রহমতের সাহায্যে যাহাকেই চাহি ধন্য করিয়া দেই। সদাচারী লোকদের কর্মফল আমাদের নিকট কখনই নষ্ট হয় না।

– সূরা ইউসুফ ঃ ৪৬-৪৯ এবং ৫৫-৫৬

প্রেক্ষিত ও তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

তাফসীরকারগণ মনে করেন, সূরা হূদের মত সূরা ইউসুফও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ দিকে এক সময় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন কুরায়শ বংশের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স.)-র বিরুদ্ধে চরম নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এ সময়েই মক্কার কোন এক কাফির (সম্ভবত ইহুদীদের পরামর্শে) তার নবূয়ত দাবীর আরো পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করলো ঃ বনী ইসরাঈলের মিসরে যাওয়ার কারণ কি ছিল ? আরব দেশের তৎকালীন অবস্থায় কোন আরববাসীর এ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মুখেও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ শোনা যায়নি। কুরায়শরা তাই ভেবেছিল, তিনি এ বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর দিতে মোটেই পারবেন না এবং হাস্যাস্পদ হয়ে পড়বেন। সে প্রেক্ষিতেই সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হলো আল-কুরআনের একটি অংশ হিসেবে। সে সূরাতে বিস্তারিত সঠিক ঐতিহাসিক বর্ণনার সাহায্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবূয়তের অকাট্য প্রমাণ কুরায়শদের প্রশ্নের উত্তরেই জিবারইল (আ.)-এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) যথাযথ বর্ণনায় উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বুঝিয়ে দিয়ে কুরায়শদের বিস্ময় ও বিপাকে ফেললেন। প্রথম তিনটি আয়াতেই সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো ঃ (উক্ত ইতিহাস বা কাহিনী) আল-কুরআনেরই আয়াত (নিদর্শন অথবা প্রতীক symbol) "আমরা উহা কুরআন বানাইয়া আরবী ভাষায় নাযিল করিয়াছি যেন তোমরা (আরববাসীরা) ইহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পার। হে মুহাম্মদ! আমরা এই কুরআনকে তোমার প্রতি ওহী করিয়া অতি উত্তম ভঙ্গিতে ঘটনা ও প্রকৃত ব্যাপারকে তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। নতুবা ইহার পূর্বে (এইসব বিষয়) তুমি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলে।

www.pathagar.com

এই সূরার বক্তব্য বিষয় শুধু হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের ভাইদের বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনাই নয়। সে ঘটনার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি কুরায়শদের ষড়যন্ত্রের ও নির্মমতার তুলনীয় পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সত্যিকার ঈমানের দিকে কুরায়শদের আহ্বান করাই ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর তরজমায়ে কুরআন মজীদে শানে নযুল বর্ণনাতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"এ হতে এই মহাসত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ যাকে উন্নত করতে চান, সমগ্র দুনিয়া মিলে চেষ্টা করলেও তাকে নীচ করে রাখতে পারে না। বরং ব্যাপার এ রকম দেখা যায় যে, তাকে নীচ করে রাখার জন্য দুনিয়া যেসব ব্যবস্থাপনাকে যতই অকাট্য বলে মনে করুক, সে ব্যবস্থাপনার মধ্য হতেই আল্লাহ্ তা'আলা তার উন্নতি লাভের উপায় করে দেন। আর যারা তাকে নীচ করতে সচেষ্ট হয়, লজ্জা ও অপমান ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না।" উপরোক্ত মূল সত্যের সূত্র ধরে তিনি মানুষের তিনটি শিক্ষালাভের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

১. মানুষের নিজের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ব্যবস্থাপনাতে আল্লাহ্র বিধানের নির্ধারিত সীমালংঘন না করাই তার কর্তব্য।

২. মানুষকে আল্লাহ্র ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রেখে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ করাই কল্যাণকর। এবং

৩. মু'মিন মানুষ যদি প্রকৃত উন্নত স্বভাব চরিত্র সম্পন্ন হয় এবং বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তিতেও সমৃদ্ধ হয়, তাহলে সে নিজের নৈতিক শক্তির বলেই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে।*

আয়াত কয়টির বক্তব্য ও গুরুত্ব

ইউসুফ বৈমাত্রেয় ভাইদের চক্রান্তে কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েও সে পথে গমনকারী জর্দানী ব্যবসায়ী কর্তৃক উদ্ধারকৃত এবং ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রীত হয়। মিসরের আজিজ তাকে সতেরো বছর বয়সে ক্রীতদাস হিসেবে গৃহের কর্মে নিয়োগ করে। সে অবস্থায় তার রূপ, স্বাস্থ্য ও যৌবনে আকৃষ্টা হয়ে গৃহকর্ত্রী অবৈধ লালসা তৃপ্তির দিকে প্রলুব্ধ করে। তাতে ব্যর্থ হয়ে সে সামাজিকভাবে মিসরের অন্য নারীদের সহায়তায় ইউসুফের প্রতি মিথ্যা দুশ্চরিত্রের আচরণাভিযোগে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

* ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি পরিশিষ্টটিতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর একই তাফসীর আলোচনা থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

www.pathagar.com

তখন মিসরের শাসক অন্য দুজন কয়েদীকেও সে কারাগারে নিক্ষেপ করে এক অভিযোগে। তারা ইউসুফের গুণাবলী ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয় কারাগারে সহবস্থানের সময়। সে সময়েই ইউসুফের একটি বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে তারা জানতে পারে। তা হলো ইউসুফের স্বপ্ন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় জ্ঞান। আল্লাহ্ তা'আলারই নিঘূঢ় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় তাঁর এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ জ্ঞান। কারাগারের দু'জন সহকারাভোগকারী ইউসুফকে সদাচারী, সত্যবাদী সম্বোধন করে তাদের দৃষ্ট স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। ইউসুফ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি সাহায্যে ব্যাখ্যা করলেন ঃ তোমাদের একজন মুক্ত হয়ে মিসরের বাদশাহ্কে মদ্যপান করাবে আর অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে। এ ব্যাখ্যা পরবর্তী ঘটনাক্রমে সত্য প্রমাণিত হয়। কারামুক্ত লোকটিকে ইউসুফ (আ.) বলে দিয়েছিলেন তার কথা যেন বাদশাহকে বলা হয়। কিন্তু শয়তান মুক্ত গোলামকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আবার ঘটনাক্রমে এবার বাদশাহ নিজে স্বপ্ন দেখলেন। সে স্বপ্ন ছিল অদ্ভুত ধরনের। তিনি নিজে তার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। অন্য লোকদের জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পেলেন ঃ এ স্বপ্ন জটিল ও অস্বস্তিকর; আমরা এ ধরনের স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝি না। তখন সেই কারামুক্ত গোলামের মনে পড়ল ইউসুফের কথা। সে তখন বললো ঃ আমি এ স্বপ্নের তাৎপর্য আপনাদের জানাবো, আমাকে কিছু সময়ের জন্য জেলখানায় ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দিন। বাদশাহের হুকুমে অতঃপর সে জেলখানায় ইউসুফের কাছে উপস্থিত হয়ে বাদশাহ দৃষ্ট স্বপ্নের বর্ণনা দিল এবং ব্যাখ্যা প্রার্থনা করল। আয়াত নং ৪৬ থেকে ৪৯-এ সে স্বপ্নটি কি এবং ইউসুফ (আ.) কি ব্যাখ্যা দিলেন তারই বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

ইউসুফ (আ.)-কে সত্যের মহাপ্রতীক বলে সম্বোধন করে গোলাম স্বপ্নটি পেশ করলো ঃ সাতটি মোটা তাজা গাভী তাদেরকে খেয়ে ফেলেছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শস্য শীষ আর অন্যগুলো শুষ্ক। আপনি আমাদের এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথ নির্দেশ দিন, যাতে আমি তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারি। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইউসুফ (আ.) জানালেন ঃ তোমরা সাত বছর প্রাণপণে চাষাবাদ করবে। তারপর যা কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ব্যতীত আর সব শস্য শীষসহ রেখে দেবে এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এসব দিনের জন্য যা সঞ্চিত রেখেছিলে তা তখন খেয়ে যাবে– কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা রেখে দেবে (বীজের জন্য)। এর পরেই আসবে এমন এক বছর, যখন মানুষের উপর রহমত বর্ষিত হবে এবং ফলে তারা রস নিংড়াবে (মদ্য ও তেল বানানোর জন্য)।

www.pathagar.com

উপরোক্ত ব্যাখ্যাতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয়েছে। মিসরের বাদশাহ এ ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে পারলেন এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণকারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে মিসরের রাষ্ট্রীয় কল্যাণে ব্যবহার করার সম্ভাবনা চিন্তা করলেন। সে উদ্দেশ্যেই তিনি জেলখানা থেকে ইউসুফকে মুক্ত মানুষ হিসেবে ডেকে পাঠালেন। সে প্রস্তাবে ইউসুফ নিজেকে পূর্ণভাবে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রেরিত দূতের কাছে বার্তা পাঠালেন। তার আগে মিসরের যে মহিলারা আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি আমার জানা প্রয়োজন। এ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বাদশাহ সংশ্লিষ্ট মহিলাদের দরবারে আহবান করেন এবং সে দরবারে যুলায়খা (মিসরাধিপতির পত্নী) প্রকাশ্যে নিজের দোষ স্বীকার করে ইউসুফের সততা, নীতি, নিষ্ঠা ও পূণ্য চরিত্রের প্রশংসা করে। দরবারের এ বিবরণ ও প্রমাণ তথ্য ইউসুফকে জানাবার পরে মুক্ত মানুষ হিসেবে তিনি বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হলেন। তখনকার সংলাপটুকু ৫৫ ও ৫৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বাদশাহর নিজস্ব বিশ্বস্ত সহচর করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দরবারে এলেন ইউসুফ (আ.) এবং বললেন ঃ আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের কাজে নিযুক্ত করুন; আমি বিশ্বস্ত সংরক্ষক ও জ্ঞান সমৃদ্ধ। বাদশাহ তাই করলেন। এমনিভাবে ঘটনাক্রমে ইউসুফ (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার পরিকল্পিতভাবে মিসরের রাষ্ট্র পরিচালনাতে বিশিষ্ট ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। ৫৬-৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ্র পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ 'এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে শক্তি দিয়েছি, সে সেই দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান গ্রহণ করতে পারতো।' এটা যে আল্লাহ্রই রহমতের ও প্রতিদানের পরিকল্পনা সে সম্পর্কে পরে বলা হয়েছে ঃ আমি আমার রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছিয়ে দিই এবং পূণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না এবং ঐ লোকদের জন্য পরকালের প্রতিদান উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন করে। ইউসুফ এখানে আল্লাহ্র নিদর্শন।

মুফতী মুহম্মদ শফী (র.) রচিত তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন সূরা ইউসুফের ব্যাপক বিশ্লেষণ পরিবেশন করেছেন! উপরোক্ত আয়াতগুলোতে যে ঘটনাচক্র আল্লাহ্র পরিকল্পনা এবং ইউসুফের ঐতিহাসিক ভূমিকার উল্লেখ আছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে বাদশাহ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও অফিসার এতে আমন্ত্রিত হন। ইউসুফ (আ.)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাযির

করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়– যাবতীয় রাজকর্ম কার্যত ইউসুফ (আ.)-কে সোপর্দ করে বাদশাহ নির্জনবাসী হয়ে যান। (কুরতুবী, মাযহারী)

ইউসুফ (আ.) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকর্ম পরিচালনা করলেন যে, কারও কোন অভিযোগ রইলো না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং ইউসুফ (আ.)-ও কোনরূপ বাধা-বিপত্তি ও কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ (আ.)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র বিধি-বিধান জারি করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্যে বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে বাদশাহ মুসলমান হয়ে যান। ...

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইউসুফ (আ.) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়ার দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইউসুফ (আ.) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সবাই বলল– মিসর সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধনভাণ্ডার আপনার কবজায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা? তিনি বললেন ঃ সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সে জন্য এটা করি। তিনি শাহী বাবুর্চিদের নির্দেশ দিলেন ঃ "দিনে মাত্র একবার দ্বিপ্রহরের রান্না করবে, যাতে রাজপরিবারের

---

* সূরা ইউসুফের বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা এবং যুলায়খার প্রেম সম্পর্কে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ববাদধর্মী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আর কাব্য সৃষ্টি বিশ্বের সাহিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে ফার্সী ভাষায় রচিত দার্শনিক জামীর (১৪১৪-১৪৯২ সাল পর্যন্ত যিনি জীবন ধারণ করেছিলেন) মহাকাব্য বিশ্বনন্দিত সৃষ্টি। জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় তার অনুবাদও বিশ্বপরিচিত। তাতে দেখা যায় যুলায়খা ছিলেন মাগরেবের অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা। তিনি যৌবনকালে স্বপ্নে দেখেন ইউসুফকে তিনবার এবং স্বপ্নেই প্রশ্ন করেন তার পরিচয়। জানলেন, পরিচয় হলো মিসরের আজিজ (অর্থাৎ শাসনকর্তা)। তাই নিজের আগ্রহে তিনি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ান এবং বিবাহিতা হন। কিন্তু মর্মাহত হন ইউসুফকে স্বামী হিসেবে না দেখে। তাই শুরু হলো মর্মবেদনার সাধনা, যার মধ্যে পার্থিব জীবনের নারীপুরুষের সম্পর্ক ভিত্তিক আচরণ ও সামাজিক অপবাদ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নিদর্শন হিসেবে ঘটনাচক্রের অন্তর্গত হয়। এ সকল প্রতীকধর্মী নিদর্শনই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় মানব প্রকৃতির প্রেম থেকে প্রকৃত সত্যের প্রতি আধ্যাত্মিক প্রেমে পরিণতি লাভ করেছে। তাফসীরকার আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ Just as, in human affairs, there is true and false love, so in our inner and higher life, there is a divine love that transcends all humans love (Vide his Appendix VI, p. 599)

www.pathagar.com

সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।"* বর্ণিত প্রতীকধর্মী কাহিনীটি বাইবেলের যোসেফ এবং যেকবের কাহিনীর সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ। সূরার ৩ নং আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ কাহিনী হলো 'আহসানাল ক্বাসাস বা সুন্দরতম কাহিনী। এ সৌন্দর্যের কারণ তাফসীরকার আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর মতে, (১) কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনমূলক কাহিনীগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে বিশদভাবে বর্ণিত; (২) এতে মানবিক সুখ-দুঃখ, মর্মব্যথা, বিড়ম্বনা, প্রেম-বিরহ-যাতনা ইত্যাদি অনুভূতি উপলব্ধির গভীর অভিব্যক্তি রয়েছে যার জন্য বিশ্বের নরনারী সকলেরই কাছে আবেদনশীল; এবং (৩) এতে সুস্পষ্ট কথায় ও বর্ণে চিত্রিত হয়েছে জীবনের বৈচিত্র্যকে-এ সবের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসহ। কুরআনের কাহিনী বর্ণনাটি বাইবেলের লোকগাথা ধরনের বর্ণনা থেকে অনেক উচ্চ প্রেক্ষিত ও মূল্যবোধের সংযোজনে সমৃদ্ধ। এর অন্তর্গত আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধের শক্তি দিক-নির্দেশনা দিয়েছে নানাদিকে, বিশেষ করে জীবনের আপাত দৃশ্যমান আত্মবিরোধ, সংঘাত ইত্যাদির বিশ্লেষণে, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা জড়িত পৃথিবীর বুকে স্থায়ী সত্য ও মূল্যবোধকে অবলম্বন করার মানবিক প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণে এবং সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তার চিরস্থায়ী পরিকল্পনার নীল নকশার অলৌকিক ও অমোঘ প্রক্রিয়ায় ইতিহাসকে ঘটনা ও কার্যক্রমের বাস্তব রূপ হিসেবে উপলব্ধি বিশ্লেষণে।

নিছক মানবিক চিন্তা, কল্পনা ও আবেগের বর্ণনা যে সূরাটির এবং নির্বাচিত আয়াত ক'টির ব্যাখ্যাতে প্রধান শক্তি ও শিক্ষার উপাদান নয়, তা স্পষ্ট বোঝা যায় ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন বিশ্লেষণ শক্তিটির তাৎপর্য অনুসরণ করলে। সাধারণ মানুষের স্বপ্ন দর্শনকে দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদগণ মানুষের অবচেতন মনের জটিল চিত্রায়ন বলে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। মানুষের যার যার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই তারা জানেন, স্বপ্ন কখনো আংশিক অর্থপূর্ণ, কখনো অদ্ভুত, কখনো অর্থহীন (যাকে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'হিং টিং ছট') তবু আবার কোন কোন স্বপ্নের তাৎপর্য কারো কাছে অর্থবহ নির্দেশ বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের দিক নির্দেশনা দিতে পারে বলে শুনা যায় অর্থাৎ মানুষের মানসিক স্থিরতা, অবচেতন মনের কলুষতাকে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রকৃত সত্য দর্শনের পরিবেশ দান করতে পারে, সেকথাও স্বীকার্য। সর্বোচ্চ গুণমাত্রার এমনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ অবশ্য সৃষ্টি হয় আল্লাহ্ তা'আল্লার ইচ্ছায়, তাঁরই পরিকল্পিত নীল নকশার অন্তর্গত নির্বাচিত প্রতিনিধি বা অসাধারণ মানুষদের মনে তাঁদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের শক্তি, সাধনা ও আধ্যাত্মিকতার ফলে। ইউসুফ (আ.)-এর মধ্যে এ সকল নিদর্শন আল্লাহ্র তরফ থেকেই পরিকল্পিত। সে জন্যই ১০১ নং আয়াতে তারই

www.pathagar.com

ইশারায় ইউসুফের উক্তি হিসেবে বলা হয়েছে ঃ "হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করিয়াছ, আর আমাকে সর্ব বিষয়ের গভীর সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুধাবন শিক্ষা দিয়েছে। আসমান ও যমীনের হে স্রষ্টা, তুমিই ইহকাল-পরকালে আমার পৃষ্ঠপোষক বন্ধু। ইসলামের আদর্শের ওপরই আমার সমাপ্তি কর এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মশীল লোকদের সহিত মিলিত কর।" علمتني من تاويل الاحاديث (অর্থাৎ মানুষের কাছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে শিক্ষা দিয়েছ) বাক্যাংশে ইউসুফ (আ.)-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যাপক অসাধারণ জ্ঞান সম্পদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতগুলোর উপরোক্ত প্রেক্ষিত ও গুরুত্ব আলোচনা থেকেই বোঝা যায় নৈতিক আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনা ছাড়া এগুলোতে আধুনিক কালের জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে সর্বাঙ্গীণ জীবন বিধানের কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত করার অনেক দিক-নির্দেশনা অন্তর্নিহিত রয়েছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতগুলোর আর্থ-সামাজিক নির্দেশনার প্রধান প্রধান কয়েকটি দিকের উল্লেখ, উদাহরণ হিসেবে, এভাবে করা যায় ঃ

১. প্রথম কথা হলো, অর্থনীতির জ্ঞান কোন নিরংকুশ স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান নয়। অর্থনীতি একটি সমাজ বিজ্ঞান, যার ইসলামী দর্শন ও মূল্যবোধ কাঠামোর রূপ হলো ইসলামী অর্থনীতি। সুতরাং সেক্ষেত্রে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনাতে ইসলামী দর্শন, নীতি ও মূল্যবোধের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করতে হয়। এতে ব্যাপক ও যথাযথ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এবং তেমনি জ্ঞান সমৃদ্ধ নেতৃত্বেরও প্রয়োজন হয়। যথাযথ জ্ঞান সমৃদ্ধ নেতৃত্বের অধীনেই বাস্তবায়ন সম্ভব উপরোক্ত সর্বাঙ্গীণ জীবন বিধানের এবং সমাজ বিধানের। উক্ত নেতৃত্বই ইসলামী লক্ষ্য অনুসরণ করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম। প্রথমে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশাসন ব্যবস্থাকে এবং পর্যায়ক্রমে সমাজ ও অর্থনীতির সংগঠন এবং পরিচালনা ব্যবস্থাকে সত্যনিষ্ঠ ও মূল্যবোধ নির্ভর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করতে। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্র ব্যাপক এবং নানাদিকের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাহিদা তাতে অপরিহার্য। আমরা ইউসুফ (আ.)-এর উদাহরণ থেকেই অনুধাবন করতে পারি যে, চাহিদা অনুযায়ী সব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামী দর্শন, নীতি ও মূল্যবোধের কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট ও সমন্বিত করে রাষ্ট্র পরিচালনার সবদিকে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

২. দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির দিক থেকে লক্ষণীয় প্রধান ক্ষেত্রটি হলো কৃষি ও খাদ্য

www.pathagar.com

ব্যবস্থার নিরাপত্তা। কারণ এ হলো মানুষের ও সমাজের মৌলিক প্রয়োজন। এমনি নিরাপত্তা ব্যতীত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ রচনা সম্ভব নয়। সে বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করে সংশ্লিষ্ট ও সংগতভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন সাহায্যে– যেমন ঃ শিল্প, যানবাহন, সড়ক ও পরিবহন, বাণিজ্য, ব্যাংকিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি– সমাজকে ও অর্থনীতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে হয়। কৃষি ও খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে বিশেষ করে মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। ভূমির গুণাগুণ, প্রকৃতির জলবায়ু এবং তার বৈষম্য তো গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিভিন্নতা সৃষ্টি করেই। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা অস্বাভাবিকভাবে অসাধারণ সমস্যা এবং নিদারুণ দুঃখ-ক্লেশ ও ক্ষতির অভিশাপ সৃষ্টি করে। জ্ঞান সাহায্যে পূর্ণ প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্লেশ ও ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব। সম্প্রতি সারা বিশ্বে এ সমস্যার দিকে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে– বিশেষ করে বন্যা ও বৃষ্টিহীনতাজনিত সমস্যা নিয়ে। পরিবেশ দূষণ ও অরণ্য ধ্বংসের পরিণামে মেরু অঞ্চলের পুঞ্জীভূত বরফ বেশী করে দ্রবীভূত হয়ে আরো বন্যা ও সাগর মহাসাগরের জলস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা নিয়ে বিজ্ঞানীরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন। কিন্তু দৈন্যক্লিষ্ট জনবহুল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আরো বেশী জরুরী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বল্পমেয়াদী দুর্যোগের অভিশাপ– যেমন বাংলাদেশে পুনঃপৌনিক বন্যার মহাপ্লাবন। এতে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মহা পরিকল্পনা প্রয়াস প্রয়োজন হবে– এখন সম্প্রতি মনে করা হচ্ছে। অথচ এ শিক্ষা ইউসুফ (আ.) পেয়েছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান হিসাবে। যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক রূপ ছিল না, সেকালের প্রেক্ষিতে মিসরে এসেছিল বাদশাহ এর কাছে স্বপ্নের রূপে সতর্কবাণী। বাদশাহ অথবা তার অধীনস্থ কোন প্রশাসকের জ্ঞান এ সতর্কতার বাণীকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থও হলো না। ইউসুফ (আ.)-এর জ্ঞানই পরিশেষে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের দিক নির্দেশনা দিয়ে সংকট থেকে রক্ষা করল মিসরকে।

৩. তৃতীয়ত, আশংকামুক্ত হয়ে অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করা সম্ভব হলেও সমৃদ্ধিকে নিছক বিলাসে পরিণত করাতে মূল্যবোধ আদর্শবোধ নেই, সেদিকে সমাজ সংগঠনের নীতি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আবার সংকটকালে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে যথাসাধ্য দেশের বা অঞ্চলের সর্বত্র সাহায্য সহায়তা করা যে মানব কল্যাণের নীতি তারও বাস্তবায়ন বাঞ্ছনীয়। মিসরে ইউসুফ (আ.)-এর ব্যবস্থাপনার অধীনে সাত বছর দুর্ভিক্ষের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলো শীষসমেত শস্যভাণ্ডার সঞ্চিত করে তবুও তো সময় যখন এলো, দূর-দূরান্ত থেকে ক্ষুধার্ত মানুষেরা সবাই তো আর রাষ্ট্রীয় সাহায্য

www.pathagar.com

গ্রহণ করতে আসতে পারেনি– সেকালের যানবাহন ব্যবস্থার অধীনে। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের প্রশাসনের সবাইকে সে জন্যই নৈতিক সহানুভূতি ভ্রাতৃত্বের অধিকারে প্রদর্শন করতে হবে। এমনি নীতিকে ইউসুফ (আ.) রাজবাবুর্চিদের শুধু একবেলা আহারের উপযোগী রান্নার নির্দেশে বাস্তবায়িত করলেন। যারা ক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত তাদের যন্ত্রণাকে অনুভূতি দিয়ে অনুভব করাও এক্ষেত্রে সামাজিক কর্তব্য।

৪. চতুর্থত, সেকালের জ্ঞান অনুসারে শস্যের সংরক্ষণ রীতি ছিল শীষের সঙ্গে শস্যকণাকে রেখে দেওয়া। যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি হয়েছে, তার ভিত্তিতে প্রযুক্তিও ভিন্ন ভিন্ন সমৃদ্ধ রীতির উদ্ভাবন করেছে। ফলে আজকাল খাদ্যশস্যকে শুধু গুদামজাতই করা হয় না। আধুনিক পদ্ধতিতে (যেমন সাইলো পদ্ধতিতে) যান্ত্রিকভাবে দীর্ঘকালের জন্য পচনক্রিয়া ও অপচয় থেকে সংরক্ষণ করা যায়। তেমনি আবার অপচয় ও ক্ষতি রোধ করে দ্রুতগতিতে অনেক পরিমাণে গুদামজাতকরণ ও নিষ্কাশন করে যানবাহন মাধ্যমে বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করা যায়। এমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির প্রয়োগও অনুমোদিত হয়েছে ইউসুফ (আ.)-এর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। কিন্তু এ সবের অন্তর্নিহিত শর্তই হলো অর্থনীতিকে এবং কৃষিখাতের উন্নয়নকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন, যাতে সামগ্রিক প্রয়োজন মিটিয়ে (দেশের শিল্পের কাঁচামাল, জনগণের খাদ্য, পশুপাখির খাদ্য, বীজের সংরক্ষণ ইত্যাদি) যথেষ্ট উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য এবং কাঁচামালের শস্য উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। উন্নত পদ্ধতির কৃষি উৎপাদনই তাই ভিত্তিগত অর্থনৈতিক সম্পদের উৎস। সেক্ষেত্রের ভূমির স্বল্পতা সমস্যা, ভূমি ব্যবহার সমস্যা, উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সমস্যাকে পরিকল্পিতভাবে মোকাবেলা করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি প্রতিরোধ ছাড়াও এর নিয়মিত প্রয়োজন জাতীয় পরিকল্পনা প্রয়াস মাধ্যমে।

৫. পঞ্চমত, ইউসুফ (আ.)-এর নিদর্শন থেকেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, একটা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল এবং এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামী দর্শন ও মূল্যবোধ সাহায্যে সমন্বিত করা প্রয়োজন। ইউসুফ (আ.) নিজস্ব ইসলামী সমন্বিত জ্ঞান বিবেচনাকেই ব্যবহার করে বাস্তব ফলের পরিণতি প্রদর্শন করেছেন। এ ছিল তার নিদর্শন দিয়ে মিসরবাসীদের শিক্ষা দেওয়া। সে শিক্ষাকে বাদশাহ নিজে স্বীকার করে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ধর্মান্তর গ্রহণ করবার প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হলো কিভাবে উক্ত ইসলামী সমন্বিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত করে দেশের জনগণকে, বিশেষ করে নেতৃত্বের ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীল যুব

www.pathagar.com

সম্প্রদায়কে উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। সাধারণ ধর্মী শিক্ষাতে কাঠামোগত দর্শন ও মূল্যবোধের প্রশিক্ষণকে সার্বজনীন পর্যায়ে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ও খাতের প্রয়োজন মেটাতে বিশেষ বিশেষ দক্ষতা নির্মাণই হবে ফলপ্রসূ ইসলামী সমাজের কল্যাণের উপযোগী শিক্ষার লক্ষ্য।

- অধ্যাপক রায়হান শরীফ

গ্রন্থপঞ্জি

১. মাওলানা মওদূদী, তরজমায়ে কুরআন মজীদ, ফালাহ এ-আম ট্রাস্ট।

২. মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন।

৩. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা রা'দ

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَجَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদনদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু'প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা করে। এবং যমীনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত রয়েছে– একটি অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দেওয়া হয়। আমি একটিকে অপরটির উপর ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দেই। এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। –সূরা রা'দ ঃ ৩-৪

শাব্দিক ব্যাখ্যা

মওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرً বাক্যাংশ দ্বারা বুঝিয়েছেন (যমীনে/বৃষ্টিতে) বোঝা ও নদনদী সৃষ্টি করেছেন। মওলানা আশরাফ আলী থানবী বলেছেন, এতে পর্বতমালা ও নির্ঝরণীসমূহ উৎপন্ন করলেন এবং মওলানা মওদূদী লিখেছেন এতে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে রেখেছেন ও নদনদী প্রবাহিত করেছেন।

www.pathagar.com

আসল কথা আল্লাহ্ পাক যমীনকে বসবাস ও চাষাবাদের জন্য স্থিতিশীল করার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করেছেন। শব্দটি সৃষ্টি করা, আনয়ন করা, প্রদান করা ইত্যাদি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে পাহাড়-পর্বত 'গাড়িয়ে রাখা' অর্থে ব্যবহৃত। উদ্দেশ্য এতে পানিতে ভাসমান ও নড়বড়ে ভূ-পৃষ্ঠ স্থিতিশীল হবে। উপরোক্ত বঙ্গানুবাদ ও শব্দ বিশ্লেষণের পর উক্ত আয়াতের উপর কতিপয় তাফসীরের সার-সংক্ষেপ পেশ করা হল।

তাফসীরকারদের ব্যাখ্যা

১. মওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) মা'আরেফুল কোরআনে লিখেছেন, পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্ট জীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড়ের শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এজন্য কোন চৌবাচ্চা নেই এবং তৈরী করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র হওয়া বা পঁচে যাওয়ারও আশংকা নেই। অতঃপর ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক পাইপ লাইনের সাহায্যে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পাইপ লাইন থেকে কোথাও প্রকাশ্য নদনদী ও খালবিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই পানি সঞ্চিত থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে পাইপ লাইন আবিষ্কার করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়। পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল উৎপন্ন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের দু' দু'প্রকার সৃষ্টি করেছেন। লাল, সাদা, টক, মিষ্টি। زوجين এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিকও হতে পারে। যাদের সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে– যা زوجين শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। زوجين এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়।

এরপরের অংশে অর্থাৎ فى الاكل থেকে وفى الارض قطع এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে অনেক খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রূপ। কোনটি উর্বর জমি ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম এবং কোনটি শক্ত এবং কোনটি শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী। বৃক্ষের রকমও বিভিন্ন। এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানির দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র ও সূর্যের কিরণও বিভিন্ন প্রকার। বাতাসও সবাই এক রকম পায়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাদের স্বাদ ও রং বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়। সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে এসব কাজ-কারবার কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণের আদেশের অধীনে চালু রয়েছে। শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়, কেননা নিছক রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি

www.pathagar.com

থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট-বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

(মা'আরেফুল কোরআন, সূরা রা'দের তাফসীর)

মওলানা মওদূদী (র.) ঃ তাফহীমুল কোরআনে মওলানা মওদূদী লিখেছেন, আকাশমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহের পরে ভূ-মণ্ডলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখানেও আল্লাহ্‌র কুদরত ও বুদ্ধি-প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন হতে দুটো মহাসত্য-তাওহীদ ও আখিরাত-সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

(ক) পৃথিবীর গঠন-প্রকৃতি, তার উপর পাহাড়-পর্বতের মাথাচাড়া দিয়ে উঠা পাহাড় হতে নদীসমূহের প্রবাহিত হবার ব্যবস্থা করা, ফলফলাদির দুই দুই রকম করে পয়দা করা ও রাতের পর দিনের এবং দিনের পর রাতের নিয়মিত আবর্তনে যে সীমা সংখ্যাহীন বুদ্ধিমত্তা ও কল্যাণ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে এক মহাবিজ্ঞানময় কলাকুশলের পরিচয় পাওয়া যায়, যা তাওহীদের এক অকাট্য দলীল।

(খ) সমগ্র যমীনকে তিনি এক রকম বানাননি। বরং বিভিন্ন অঞ্চল ও এলাকা বানিয়ে দিয়েছেন। যা পরস্পর মিলিত হওয়া সত্ত্বেও রূপে, বর্ণে, গন্ধে, উপাদানে, বিশেষত্বে, উর্বরা শক্তিতে, যোগ্যতায় ফলন ও রাসায়নিক কিংবা খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বিভিন্ন অংশ ও অঞ্চলের সৃষ্টি এবং তাতে নানা ধরনের পার্থক্য বর্তমান থাকা এতই যুক্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় যে, তার হিসেব করে শেষ করা যায় না।

(গ) পরবর্তী আয়াতটিতে (৪র্থ আয়াতে) আল্লাহ্‌র কুদরত ও ব্যবস্থাপনার এক নিগূঢ় তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই বিশ্বলোকে কোথাও এক রকমের অবস্থা রেখে দেননি। যমীন একই কিন্তু তার বিভিন্ন বস্তু নিজ নিজ বর্ণরূপ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যমীন একই, পানিও দুই নয়, কিন্তু ফলফলাদি ভিন্ন ভিন্ন, গাছ একই কিন্তু ফলের স্বাদ আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। এই সব কথা যে ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করবে, সে মানব প্রকৃতি, ঝোঁকপ্রবণতা ও স্বভাব-মেজাযের এত পার্থক্য দেখে বিস্মিত হবে না, বরং এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে আল্লাহ্‌র শোকর করবে। (তাফহীমুল কোরআন, সূরা রা'দের তাফসীর)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আয়াত দুটোর মূল প্রতিপাদ্য হল তাওহীদ। বিশেষ করে শেষের অংশটুকুই হচ্ছে পূর্বের সমস্ত বিবরণের মূল লক্ষ্য। তাওহীদ ও আখিরাতের ধারণাকে মানব মনে

যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য বিশ্বব্যবস্থাপনার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতের يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ শব্দরাজির মাধ্যমে এর পূর্বাভাষ দিয়ে বলা হয়েছে- আল্লাহ্ পাকই বিশ্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। আলোচ্য আয়াত দু'টিতে তিনি কিভাবে এই ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন, তার কিছু নমুনা পেশ করেছেন। মূল লক্ষ্য তাওহীদ ও আখিরাত হলেও আয়াত দু'টির বর্ণনার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে অর্থনৈতিক বিষয়াবলীও এসে গেছে। এ বিষয়গুলো নিম্নে পেশ করা হচ্ছে ঃ আধুনিক অর্থনীতিতে বরং আধুনিক চিন্তা বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে অতি জাগতিক বিষয়াবলীর কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে অতি জাগতিক, আত্মিক ও নৈতিক। জাগতিক বিষয়াবলীর অবতারণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অতি জাগতিক বিষয়াবলী বুঝে উঠার জন্য মানব মন ও চিন্তাকে সহায়তা করা। জাগতিক বিষয়াবলী দু'ভাবে অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমত, বিশ্ব সৃষ্টির বর্ণনা এবং বিশ্ব প্রকৃতির সীমাহীন নিদর্শনাবলীর বর্ণনা ও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা বিশ্লেষণ যা মূলত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural science) বিষয়ক আলোচনা। দ্বিতীয়ত, এই বিশ্ব প্রকৃতি কিভাবে মানব জাতিকে লালন করছে তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, যা মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের (social science) আলোচনার আওতাভুক্ত। অর্থনীতি বর্তমান সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আয়াত দু'টো এই অর্থনীতির দিক থেকেও গুরুত্ববহ।

(ক) মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তি হচ্ছে ভূমি। কৃষি উৎপাদনের আধার হচ্ছে ভূমি। শিল্পকারখানা স্থাপনেও ভূমি অগ্রগণ্য। কেননা শূন্যে বা হাওয়ার উপর কোন কারখানা স্থাপন করা যায় না। আল্লাহ্ পাক প্রথম আয়াতটিতে ভূমিকে মানব জাতির ব্যবহার উপযোগী করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্ পাক এই ভূমণ্ডলকে ভূমির আকারে সুবিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং ভূমিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য পাহাড়-পর্বত সংস্থাপন করেছেন এবং নদনদী প্রবাহিত করেছেন। নদনদীর সাহায্যে পানি প্রবাহের দ্বারা দু'কুলের বিস্তৃত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন সম্ভব হয়।* কৃষি উৎপাদনেও বৈচিত্র্য রয়েছে। নানাবিধ ফলফলাদি ও কৃষিপণ্য উৎপাদিত হচ্ছে এই ভূমি থেকে। এ সমস্ত উৎপন্ন ফলের স্বাদ ভিন্ন, আকার ভিন্ন অথচ এগুলো একই পানির দ্বারা সিক্ত মাটি থেকে উৎপন্ন হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য অথবা অস্ট্রেলিয়া এমনকি পশ্চিম এশিয়াতেও একই ধরনের ফল যেমন আপেল, নাশপাতি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্বাদে গন্ধে এগুলি বিভিন্ন হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হল যে পানি এগুলির উৎপাদনে

* এক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ঠ সৃষ্টির বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও মূল্যবান। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বই ছিল পানি। কালক্রমে তা ঘনীভূত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের আকার ধারণ করে। ভূ-পৃষ্ঠের পানির উপর ভূ-পৃষ্ঠের স্থিতিশীলতায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পাহাড়, পর্বত ও নদীনালা সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

ভূমিকে সিক্ত করে তা কিন্তু একই উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা তৈরী। এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে আবহাওয়া। আর আবহাওয়ার তারতম্য ঘটে দিনরাত্রির আবর্তনে। তাই দিনরাত্রির আবর্তন যেমন উৎপাদন বৈচিত্র্যের সহায়ক হচ্ছে তেমনি এসব উৎপাদনের মান নির্ণয়ের দণ্ড হিসেবেও কাজ করে। যেমন দৈনিক, মাসিক বা বার্ষিক উৎপাদন, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক বেতন ইত্যাদি। তাছাড়া দিন ও রাত্রির আরেকটি তাৎপর্য এই যে তা শ্রমিকের জন্য work ও leisure period স্থির করতে সহায়ক হয়। আর সামগ্রিক দিক থেকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যই আল্লাহ্ পাকের এক নিদর্শন।

ভূ-পৃষ্ঠের উপর বিভিন্ন মহাদেশ মহাসাগরের অপরিসীম জলরাশি দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন; আবার মহাদেশগুলোর অবস্থান পরস্পর সংযুক্তও। তাছাড়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে জলবায়ু ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ বিরাজিত এবং অর্থনৈতিক ভূগোলেরও পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

মানব জাতি শুধু নয়, সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদির সরবরাহ মহান প্রতিপালক এভাবে বিভিন্ন দেশে রেখে দিয়েছেন। মানুষের কাজ হচ্ছে তা প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা।

উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হচ্ছে– অর্থনৈতিক প্রয়োজন পুরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার মূল ব্যবস্থাপক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। আরও দেখানো হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য একটি স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয়। এজন্য কৃষিক্ষেত্রের উর্বরা শক্তিতে, নদ-নদীর পানি প্রবাহের শক্তিতে, স্থানভেদে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য ও পরিবর্তনের পার্থক্যের মধ্য দিয়ে কর্ম প্রবাহ সৃষ্টি করে পৃথিবীকে সচল রাখা হয়েছে। মানুষে মানুষে যোগ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডেও প্রভাব বিস্তার করে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এই সব বিষয় Axiom হিসেবে ধরে নিয়ে নয়া অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি বের করে আনা প্রয়োজন।

- এম. জহুরুল ইসলাম

প্রমাণপঞ্জি

১. মুফ্তী মুহাম্মদ শফী; মা'আরেফুল কোরআন।

২. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফ্হীমুল কোরআন।

www.pathagar.com

لَهُ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ
بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.

তার জন্য একই রকম রক্ষক সকল রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র হুকুমে তার দেখাশুনা করে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজদের (সত্তা) গুণাবলীকে পরিবর্তন না করে। আর আল্লাহ্ যখন কোন জাতির অকল্যাণ করার সিদ্ধান্ত করেন তখন তা কারো প্রতিবাদে রুদ্ধ হয়ে যায় না। এ রকম জাতির কেউ তখন সহায়ক ও সাহায্যকারীও হতে পারে না।

– সূরা রা'দ ঃ ১১

তাফ্‌সীরভিত্তিক প্রেক্ষিত আলোচনা

তাফসীরকারদের অনেকে, বিশেষ করে মওলানা মওদূদী মনে করেন, সূরা রা'দ রাসূলুল্লাহ (স.)-র মক্কায় অবস্থানের শেষ পর্যায়ে কঠিনতম কালে অবতীর্ণ হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যুক্তি সহকারে আহবান এবং সৃষ্টির আইন-নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আর সত্যের দিকে আনয়ন করার আশা প্রস্ফুটিত হচ্ছিল না। সে জন্যই এই সূরাতে আল্লাহ্‌র বাণীর প্রকাশভংগিতে আশা ও ভীতির সংমিশ্রণ এসেছে। ১২ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "তিনিই তোমাদের সম্মুখে বিদ্যুৎ চমকাইয়া থাকেন, যা দেখে তোমাদের মনে ভীতির উদ্রেক হয় আর আশাও জাগে। তিনিই পানিভরা মেঘের সঞ্চার করেন।" ১৩ নং আয়াতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, শুধু বিদ্যুতের চমক নয়, মেঘের গর্জন বা বজ্র নিনাদও রয়েছে তার সঙ্গে এবং যখন লোকেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে ঝগড়ায় নিয়োজিত

www.pathagar.com

থাকে সে অবস্থায়ই তিনি গর্জনকারী বজ্রকে যাহার উপর চাহেন নিক্ষেপ করেন। সত্যের পথে আহবানের উদ্দেশ্যে সাধ্য-সাধনা, অনুনয়-বিনয়েরও একটা সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম করে গেলে যখন আল্লাহ্‌র নবী ও তার সীমিত মু'মিন অনুসারীরা মর্মবেদনায় ও নৈরাশ্যের চরম স্তরে পৌঁছেন তখন আল্লাহ্‌র বজ্র নিক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে কথার গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য সূরাটির নামকরণই হয়েছে রা'দ বা বজ্র-গর্জন। তবু বজ্র-গর্জনের পশ্চাতে আশা (বিদ্যুৎ) থাকার কথা অন্তর্নিহিত, সে দিকেও আভাস দেওয়া হয়েছে।

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রথম আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "......তোমার প্রতি তোমার আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা একান্তই সত্য, কিন্তু (তোমার জাতির) অধিকাংশ লোকই তা মেনে নিচ্ছে না।" যারা মানছে না, তাদেরই এ ভুল, তাদেরই বিপুল ক্ষতি ও অকল্যাণ। সে ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করার সুযোগ আল্লাহ্ যতো দীর্ঘকাল সম্ভব দিয়ে যান। যে চরম পর্যায়ে মক্কার কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ (স.)-র প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে যুক্তি ও বিশ্বাস ত্যাগ করে উপহাস-বিদ্রূপ দিয়ে আক্রমণ করছিল আর তাঁর কাছ থেকে মোজেযা দাবী করছিল, তখনও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধৈর্য ও অবকাশ ক্ষান্ত হয়নি। নিদর্শনের প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ভীতি প্রদর্শন ও অবশ্যম্ভাবী শাস্তির পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। নিজকে ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে তখনো ভুল সংশোধনের সুযোগ অবশিষ্ট রয়েছে বলে আশার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিতে তিনটি দিক সন্নিবেশিত করা হয়েছে ঃ (১) প্রথম-প্রত্যেক মানুষকে ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখার সৃষ্টির বিধানগতই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে আল্লাহ্‌র নিয়োজিত ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে। মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত নিজস্ব সত্তার কল্যাণধর্মী প্রকৃতির অনুসরণ করলে আল্লাহ্‌র বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। (২) দ্বিতীয়, একটা জাতির অন্তর্গত মানুষ উপরোক্তভাবে সত্য পথে জীবন যাপন করলে জাতিটিই কল্যাণের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, আল্লাহ্ তার পরিবর্তন করেন না। (৩) তৃতীয়, জাতির মানুষেরাই যদি আল্লাহ প্রদত্ত সত্তার কল্যাণধর্মী প্রকৃতির বিরুদ্ধে অর্থাৎ প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে, সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনের হুঁশিয়ারীকে উপেক্ষা করে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল বর্ণিত আল্লাহ্‌র এ

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে শাস্তি বিধানের অঙ্গীকারকে অবিশ্বাস করে, সে জাতির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুত শাস্তি অনিবার্যভাবেই আসবে।*

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.) উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তা থেকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(ক) 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ' সম্পর্কে ১০ এবং ১১ নং আয়াত থেকেই বোঝা যায় ঃ 'যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘুরাফেরা করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশ্‌তাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তারা সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের হিফাজত করা তাদের দায়িত্ব।

"সহীহ্ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ফেরেশ্‌তাদের দু'টি দল হিফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। ...

আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী (রা.)-র রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, "প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু সংখ্যক হিফাযতকারী ফিরিশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বংসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশ্‌তাগণ তার হিফাযত করেন। তবে কোন মানুষকে বিপদে-আপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ জারী হয়ে যায়, তখন হিফাযতকারী ফেরেশ্‌তারা সেখান থেকে সরে যান।" – তফসীরে রূহুল মা'আনী

---

* ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "এই লোকেরা ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়া দিতেছে। অথচ তাদের পূর্বে (এসব ক্ষেত্রে) শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তসমূহ অতীত হয়ে গিয়েছে। আসল কথা এই যে, আল্লাহ্ লোকদের অত্যধিক বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে থাকেন আর তাও নিশ্চিত সত্য যে, তোমাদের আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা।" আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ঃ The unbelievers by way of a taunt say : If there is a punishment, let us see it come down now, The answer to it is three fold : (1) Why do you want to see the punishment rather than the mercy of Allah? Which is better? (2) Have you not heard in history of terrible punishments for evil? And have you not before your very eyes seen examples of whickedness brought to book? (3) Allah works not only in justice and punishment but also in mercy and forgiveness, and mercy and forgiveness come first." Vide Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran (English) Lahore, Vol-II, p. 604, Note 1810।

www.pathagar.com

মানুষ ও জাতির অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে

... আলোচ্য আয়াতে অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হিফাযতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। "এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়।"

আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী আয়াতটির এ অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"Allah is not intent on 'punishment. He created man virtuous and pure: He gave him intelligence and knowledge; He surrounded him with all sorts of instruments of His grace and mercy. If, in spite of all this, man distorts his own will and goes against Allah's will, yet Allah's forgiveness open to him, if he will take it. It is only when he has made his own sight blind and changed his own nature or soul away from the beautiful mould in which Allah formed it, that Allah's wrath will descend on him and the favourable position in which Allah placed him will be changed. When once the punishment comes, there is no turning it back. None of the things which he relied upon-other than Allah-can possibly protect him. (Vide note no. 1817, p. 606.)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে আলোচনা ও তাফসীরকারদের বিশ্লেষণ বর্ণনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে আয়াতটিতে মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিবর্তন এবং উন্নয়নের চিন্তাকে ইসলাম ও ঈমানের কাঠামোতে ধারণ করে মানবজাতির কল্যাণ অর্জনের দিকে তাদের আহবান করা হয়েছে। মৌল শর্ত হলো ঃ আল্লাহ্ এবং কুরআন-সুন্নাহর উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন তারই কাঠামোতে সৃষ্ট আইনের এবং সুন্নাহ্ অনুশীলনের শৃঙ্খলার অধীনে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যের দিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা করতে হবে, এটাই মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ব্যক্তিগত আচরণে, সামাজিক আচরণে ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে এবং রাজনৈতিক আচরণে ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত হবে, তাও উক্ত যুক্তিতেই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ধর্তব্য মৌল সত্যটি হলো, এক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যের অনুসন্ধান আধুনিক

www.pathagar.com

কালের ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ও যান্ত্রিক (mechanical) পদ্ধতিতে কখনো সঠিক হয় না। কারণ, মূল্যবোধ বর্জিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মানুষের সমাজবোধ, মানবতাবোধ, নৈতিকতাবোধকে স্বীকৃতি দান করে না। আলোচনাধীন আয়াতটিতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, কোন জাতির অবস্থা (condition) নির্ভর করছে সে জাতির মানুষের আচরণের গুণগত মর্যাদার উপর এবং তার নিজস্ব প্রয়াসের উপর। অর্থাৎ জাতিটির অবস্থার গুণগত মর্যাদা সম্পর্কিত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে তার নির্ভরশীল উৎপাদকটির dependent variable factor গুণ ও মর্যাদাকে উপরোক্ত লক্ষ্যের উপযোগী গুণগত মর্যাদায় (quality) যথা- প্রয়োজনীয়ভাবে উন্নীত করতে হবে এবং মানুষের যথাযথ প্রয়াস ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এটা বহুমুখী বিবর্তন ও উন্নয়নের প্রক্রিয়া-ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে। সে জন্য শুধু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অথবা শুধু রাজনৈতিক বিশ্লেষণ অথবা শুধু সামাজিক বিশ্লেষণ তো এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়ই, বরং উপরোক্ত তিনটি দিকের বিশ্লেষণকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক দিক থেকে পরিশোধিত করে নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য পদ্ধতিগত ও তথ্যগত গবেষণা বর্তমানকালে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে চলছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিশদ জ্ঞান এখনো বিবর্তনশীল। তবু এ কথা বলা চলে যে, আয়াতটিতে একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক চিরন্তন সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা হলো অকল্যাণের পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সংশ্লিষ্ট জাতিকে ও জাতির অন্তর্গত মানুষকেই স্বেচ্ছা প্রণোদিত প্রয়াস মাধ্যমে, প্রয়োজনবোধে বিপ্লব মাধ্যমে, উপযোগী পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে। মানুষ ও জাতিই তাদের ভাগ্যের জন্য দায়িত্ব বহন করে। দেশ, সমাজ ও জাতির সামগ্রিক অবস্থা পরিবর্তনের ইসলামী দর্শন এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপনের নেতিবাচক ভূমিকাকে (অর্থাৎ determinism fatalism, predestination তত্ত্ববাদ নির্ভর আচরণকে) বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সত্য-নির্ভর স্থায়ী কল্যাণের দিকে জাতিসংঘ গঠনের একটি মৌল বিপ্লবাত্মক দিক-নির্দেশনা। এ নির্দেশনা একটি জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবর্তন অথবা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করে থাকে। নিজদের প্রয়াস ও পরিকল্পনার সাহায্যে জাতির মানুষ ও সমাজ প্রয়োজনবোধে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনয়ন করে গৌরবের ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে এবং নিজদের ভাগ্য নতুন করে গড়ে তুলতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র

একটা জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা বা বর্তমান পরিস্থিতি তার অব্যবহিত অতীত কালের অর্থনৈতিক প্রয়োগেরই ফল। যেমন, বাংলাদেশের (১৯৮৭-৮৮) বছরের

www.pathagar.com

পরিস্থিতিকে পূর্বের (১৯৮৬-৮৭) সালের অর্থ নৈতিক প্রয়াসেরই ফল বলা চলে। উক্ত প্রয়াস সরকারী ও বেসরকারী আর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে পরিকল্পিত এবং অপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। জাতির সকল মানুষের অর্জিত ফলকে ধরা যায় জাতীয় আয়ের হিসেব নিকেশ নিয়ে। কিন্তু এ হলো অংকের সংখ্যা দিয়ে অর্জিত জাতীয় আয়ের ছবি তুলে ধরা। জাতির সকল মানুষ জীবিকা অর্জনে অংশ গ্রহণও করে নি, ঘটনাচক্রে আর নীতি-বিভ্রাটে কাজ করতে চাইলেও কর্মী হওয়া যায় না। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইচ্ছা করলেই উৎপাদন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করা যায় না। আর জাতীয় আয়ের ভাগ দাবী করা যায়না বা পাওয়া যায়না। তাই জীবিকা উপার্জনেও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতীয় আয়ের বন্টনেও ন্যায়বিচারের প্রয়োগ হয়নি। ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে অর্থনীতির রূপ ও কাঠামোকে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার ভিত্তিতে সংগঠিত করা সম্ভব। عدل এবং احسان। ভিত্তিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূর করে যে জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি সম্ভব তাতে কর্মপ্রার্থী মানুষই অংশ গ্রহণের সুযোগ পেতে পারে এবং ন্যায় বিচারভিত্তিক মূল্য, মজুরী ও লভ্যাংশ অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কল্যাণ সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। ইসলামী দর্শন, বিধান ও ন্যায়বিধানকে অর্থনৈতিক প্রয়াসে প্রয়োগ করতে পারলে আয়ের উৎপাদন ও বন্টন সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক হতে পারে। তেমনি আবার আয়ের ব্যয় এবং যাকাত অন্যান্য প্রক্রিয়ায় বিত্তশালীর নিকট থেকে আপেক্ষিক কম বিত্তশালী, বিত্তহীন ও কম আয় উপার্জনশীল মানুষের হাতে হস্তান্তর পদ্ধতিতে সামাজিকভাবে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ ভাবে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে সামাজিক প্রক্রিয়ার ও সামাজিক মূল্যবোধের অনুসারী করে তোলা যায়।

বহির্বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রভাব আবার উপরে বর্ণিত জাতীয় প্রয়াসের ফলকে পরিবর্তিত করে দিতে পারে। বহির্বাণিজ্য মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ব্যবস্থাটিতে বিদেশী অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যস্ফীতি, যুদ্ধবিপর্যয়ের পরিণতিতে অস্বাভাবিক উত্থান-পতন ইত্যাদি অবাঞ্ছনীয় বা অকল্পিত অভাবিত প্রতিফল আঘাত হানতে পারে। তাছাড়া বিদেশী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার জন্যও পণ্য-দ্রব্যের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে উঠানামা করতে পারে-- যার ফরে অভ্যন্তরীণ জাতীয় প্রয়াসের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্ভোগ পোহাতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের এবং তার অন্তর্গত বাংলাদেশের অর্থনীতি এমনি দুর্ভাগ্যের শিকার ঐতিহাসিকভাবেই হয়ে আসছে। কোন নির্দিষ্ট দেশে বর্তমানকালে ইসলামী ব্যবস্থাপনার সামাজিক অর্থনৈতিক প্রয়াসকে প্রতিষ্ঠিত করলেও

www.pathagar.com

বহির্বিশ্বের নানা প্রভাবের দুর্ভোগ থেকে যেতে পারে। আর ইসলামী ব্যবস্থাপনার সুদহীন অর্থনীতিতে বহির্বিশ্বের সুদভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি তো করতে পারেই। সে সব নতুন সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিরামহীন গবেষণার দাবী রাখে।

অভ্যন্তরীণ জাতীয় প্রয়াসফলকে আবার নির্ভরশীল দেখা যেতে পারে তৃতীয় এক শ্রেণীর ঘটনা পরিস্থিতির উপর। এ সব হলো একদিকে উন্নত দেশের শিল্পবিজ্ঞান প্রযুক্তিপ্রসূত। আর অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রসূত (যেমন ঃ জল, বায়ু, আকাশ দূষণ* এবং অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, মহাপ্লাবন ইত্যাদি)। আবার শেষোক্ত ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগও অনেকটা মানুষের অকল্যাণমূলক ভূমিকার জন্য হতে পারে। যেমন ঃ জ্বালানি সংগ্রহের জন্য বনের উদ্ভিত সম্পদ উজাড় করা, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে রাসায়নিক ক্ষতিকর পদার্থের নিষ্কাশন এবং কার্বনডাইঅক্সাইড নিষ্কাশনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও ঋতু বিপর্যয়- যার জন্য আশংকা করা হচ্ছে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের 'বরফটুপি' গলে প্লাবন আনবে ঐতিহাসিকভাবে এবং বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলও নতুন অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাসে অনেক পরিমাণে প্লাবিত

* বৈজ্ঞানিক অনুশীলন বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে যে, সারা বিশ্বে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে দ্রুতগতিতে শিল্পায়নের ফলে মানুষের উন্নয়ন প্রয়াসই সৃষ্টি করছে আকাশ বাতাসের দূষণ এবং প্রাকৃতিক আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তন। তাকে বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে Green house effects। যার উৎপত্তি হলো কয়লা ও খনিজ তেল জ্বালানো আর অন্যান্য শিল্প প্রযুক্তি প্রক্রিয়ার জন্য আকাশে-বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস উৎক্ষিপ্ত হওয়া থেকে। বেশি পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কেন্দ্রীভূত অবস্থান বায়ুর উর্ধ্বস্তরে সূর্যতাপকে আটকে ধরে তার ফলে পৃথিবীর গাত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। পরিণতিতে প্রচলিত আবহাওয়ার বিপুল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। শুধু তাপমাত্রার ঋতু প্রচলিত ধারাই পরিবর্তন হচ্ছে না। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফটুপির বিশাল পর্বত গলে সাগর-মহাসাগরের জলরাশির বিপুল বৃদ্ধির আশংকা করা হচ্ছে। আকাশের ওজনস্তরের প্রতিরক্ষা কর্মের ক্রমাগত ক্ষতির জন্যও ভয়ংকর অন্য ক্ষতি পৃথিবীর বুকে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন আকারে আসছে এবং আসবে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক স্টিফেন স্নইডার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে আগামী শতাব্দীতে আবহাওয়ার পরিবর্তন অতীত কালের বরফ যুগের চেয়েও নাটকীয় রূপ নিতে পারে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতে বৈজ্ঞানিকরা অধিবেশন করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এ ভয়াবহ পরিবর্তন নাকি অস্ট্রেলিয়া ও তার চারপাশের অঞ্চলে সংঘটিত হবে। প্রশান্ত মহাসাগরের এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। মালদ্বীপ তার মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী বিরাট দক্ষিণ অঞ্চলও তার অন্তর্গত।

www.pathagar.com

হবে আর ভারত অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাসে অনেক পরিমাণে প্লাবিত হবে আর ভারত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ (মালদ্বীপসহ) সমুদ্রতলে নিমজ্জিত হতে পারে।

মানব জাতির কল্যাণ লক্ষ্যের অবহেলা

উপরোক্ত অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায়, পৃথিবীর বুকে কোন কোন জাতি যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনের প্রয়োগের অহংকারকে জড় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীবনের পার্থিব ভোগ বিলাসের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতায় উদ্ভাবনী শক্তিকে ব্যবহার করে পার্থিব নেতৃত্ব ক্ষমতা অধিকারের লক্ষ্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে, ততই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিজগতে মানব কল্যাণের সাধারণ লক্ষ্য ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমান কালে তারই নিদর্শন হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভারসাম্য হারাচ্ছে, বিশ্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভারসাম্যও ভীষণভাবে বিপন্ন হচ্ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিকে সামগ্রিকভাবে মানব কল্যাণের লক্ষ্য থেকে শৃঙ্খলা এবং সমন্বয়ের অধীনে পরিকল্পনা করার কোন সংগঠন বা শক্তি কার্যকর নেই। যে সকল জাতি পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে, তারা নিজস্ব গোষ্ঠির স্বার্থেই সম্পদের অপচয়, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং ক্ষুদ্র ও অনুন্নত দেশের জাতির অন্তর্গত মানুষদের কল্যাণকে অবহেলা করে আন্তর্জাতিক শোষণেরই নীতি অবলম্বন করে যাচ্ছে। ইহকাল পরকালের সামগ্রিক মানবজীবনের কল্যাণের লক্ষ্য অনুসরণ করলে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, নৈতিকতার নীতি ইত্যাদি সর্বস্তরে সমন্বয় সাধন সম্ভব হতো। সেটাই সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পিত সত্য সরল ভারসাম্যের ও ন্যায়বিচারের পথ। সে পথে জীবন পরিচালনার জন্য মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ এবং জাতিগত আচরণকে সংগঠিত ও প্রচলিত করে কার্যকর কল্যাণ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে মানবজাতির মধ্যকার সম্পদশালী নেতৃস্থানীয় শক্তি জোটগুলো। তার জন্যই আল্লাহ্‌র পরিকল্পিত 'প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা' পর্যন্ত অদৃশ্যভাবে প্রত্যাহার করতে পারেন তিনি। সে আশংকারই নিদর্শনরূপে আজ মানুষের পার্থিব জীবনের পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন। সে হুমকির বিপজ্জনক লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ভয়াবহ গতিতে নষ্ট হতে চলেছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের ভারসাম্যও তেমনি দ্রুতগতিতে অবনতি লাভ করছে। মানুষের নেতৃত্বই এমনি অবস্থায় নতুন চেতনা নিয়ে সমাজকে ও অর্থনীতিকে সঠিক পথে অর্থাৎ ভারসাম্য (Balance)-এর পথে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সংস্কার সাধন করতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলো তাদের চেতনা দিয়ে যে প্রয়াস করতে সক্ষম, তারও গুরুত্ব কম নয়। তাদের অবস্থার পরিবর্তন যতটা তাদের প্রয়াসের ওপর নির্ভর করে,ততটা করাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্ সৃষ্ট-আইনের অধীনে তাঁরই রহমতের শক্তিতে সে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন

ও বৃহৎ পরাশক্তির জাতির নেতৃত্বে নতুন সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের বিবেককে জাগ্রত করতে পারে এবং পূর্ণ কল্যাণমুখী লক্ষ্যের দিকে তাদের সঠিক সংশোধনের উদ্যোগ শুরু হয়ে যেতে পারে- যেমন সামান্য আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী, পরাশক্তি দু'টির সংস্কার উদ্যোগে এবং তাদের সমাজের মানব গোষ্ঠীর মানবাধিকার ও নৈতিকতার নতুন উপলব্ধিতে।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

গ্রন্থপঞ্জি

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তরজমায়ে কুরআন মজীদ, ফালাই-ই-আম ট্রাস্ট।

২. রাগেব ইসফাহানী, আল মুফরাদাত, পৃষ্ঠা ৩৬৮।

৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ৫ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১৯৬-৯৯।

৪. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran, Lahore, Vol, II.

৫. The New Nation, "Pacific, Indian Ocean islands may vanish as earth warms up" Nov. 22. 1988, p. 1 & 8.

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.

যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম রয়েছে। —সূরা রা'দ ঃ ২২

শব্দের ব্যাখ্যা

رِزْقٌ অর্থ-খাদ্য, উপায়, সম্পদ, জীবনোপকরণ, বৃত্তি, পেশা, নিয়ামত, অনুগ্রহ ইত্যাদি। (আরবী ইংরেজী অভিধান)

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী শফী (র.) লিখেছেন, উর্দু ভাষায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করাকেই সবর বলে মনে করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরো অনেক ব্যাপক। কারণ এর আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া। বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। "যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহ্র নামেও ব্যয় করে।" এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না, বরং নিজেরই দেয়া রিযিকের কিছু অংশ চান। এটা দেওয়ার ব্যাপারে তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়। অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً শব্দ দুটি যুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপন করাই সুন্নত নয়, বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ।

– মা'আরেফুল কোরআন, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৮-২০৯

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতে ব্যয়কে সৎ লোকদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যয় সম্পর্কে এ গ্রন্থে পূর্বেও অনেক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে ব্যয়ের প্রথম

www.pathagar.com

মূলনীতিই হল তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। অবশ্য ইসলামে সব ভাল কাজই এ উদ্দেশ্যে করতে হয়। ইসলামে ব্যয়ের অন্যান্য মূলনীতি কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও অপচয়কে নিন্দা করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ .... وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا.

... এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না। বস্তুত যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই ...। - সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭

এ ব্যয় করতে হবে অতিরিক্ত সম্পদ থেকে, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلِ الْعَفْوَ -

তারা তোমাকে কি খরচ করবে তা জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

এ ব্যয় করতে হবে আল্লাহর পথে (সূরা তওবা ঃ ৬০)। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তা ব্যয় করা যাবে কেননা ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল (সূরা বাকারা)। আত্মীয়-স্বজন এবং দরিদ্র জনগণের জন্যও ব্যয় করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করাকে মু'মিনের গুণ বলা হয়েছে। এ কথার ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দকেও আইন মোতাবেক শৃঙ্খলার মাধ্যমে দূর করতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে তা করা যাবে না। তাহলে সমাজে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مَتَاعٌ.

আল্লাহ্ যাকে চান রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণ রিযিক দেন। এ লোকেরা দুনিয়ার জীবনে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে থাকে অথচ দুনিয়ার জীবন পরকালের তুলনায় সামান্য পরিমাণ সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়। – সূরা রা'দ ঃ ২৬

শব্দের অর্থ

রিযক (رِزْقٌ) এই শব্দের ব্যাপক অর্থ সূরা বাকারার ৩ নং আয়াতের উপর কর্মসূত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মওলানা আবুল আ'লা মওদূদী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ তাফসীরে এ আয়াতের পটভূমি এই যে, মূসার কাফিরগণও সাধারণ মূর্খদের ন্যায় আকীদা ও আমলের ভাল-মন্দ দেখার পরিবর্তে ধনী ও দরিদ্র হওয়ার দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারণ করত। তাদের ধারণা ছিল, যে লোক দুনিয়ার আরাম-আয়েশের দ্রব্য সামগ্রীর অধিকারী, সে লোক বুঝি খোদারও প্রিয়– কার্যত সে যতই পথভ্রষ্ট ও অনাচারী হোক না কেন। পক্ষান্তরে যার অবস্থা দীন-দরিদ্র সে খোদারও অপ্রিয়, অভিশপ্ত লোক, তার আমল আখলাক যতই উন্নত ও পবিত্র হোক না কেন। এ কারণেই তারা কুরায়শ সম্প্রদায়কে নবী করীম (স.)-এর সাহাবীদের তুলনায় অনেক মর্যাদাবান ও সম্মানার্হ মনে করত। তারা বলত, "এই দেখই না, আল্লাহ্ কাদের সঙ্গে রয়েছেন।" এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সাবধান করে দিয়েছেন। বলেছেন, রিযিকের কম বেশী হওয়া তো আল্লাহ্র অপর এক নিয়মের অধীন। অপর দিক দিয়া অসংখ্য রকমের বিবেচনার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে বেশী কাউকে কম দান করেন। কিন্তু মানুষের অভ্যন্তরীণ নৈতিক মানদণ্ডের জন্য ইহা কোন মানদণ্ড নয়। মানুষের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যকরণের আসল ভিত্তি এবং সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যশালী হওয়ার আসল

www.pathagar.com

মাপকাঠি হচ্ছে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পন্থা কে গ্রহণ করেছে, কে উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে আর কে খারাপ গুণাবলীর। কিন্তু অজ্ঞ মূর্খ লোকেরা এ ভিত্তি ও মাপকাঠি বাদ দিয়ে কাকে ধন-সম্পদ বেশী দেওয়া হয়েছে আর কাকে কম– তারই ভিত্তিতে বিচার করে থাকে।

আল্লামা শাব্বীর আহ্‌মদ উসমানী লিখেছেন ঃ পৃথিবীতে বেশী মাল ও অর্থ হওয়া ভাল ভাগ্য বা মন্দ ভাগ্যের ব্যাপার নির্ধারণ করে না। এটা সব সময় সত্য নয় যে, যাদের বেশী মাল-সম্পদ আছে তারা আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয়। আল্লাহ্‌র অনেক প্রিয় বান্দা দারিদ্র্যে জীবন কাটায়, অন্যদিকে অনেক অপরাধী লোক আরাম-আয়েশে দুনিয়ায় থাকে। এটিই আখিরাত সংগঠন করার কারণ। সুনিশ্চিতভাবে আর একটি জগত আছে যেখানে ভাল-মন্দ কাজের ফল পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে পৃথিবীর অভাব বা প্রাচুর্য গ্রহণ-বর্জনের মানদণ্ড হতে পারে না।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা রা'দ রাসূলুল্লাহ্ (স.)-র মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। এই সূরাতে নানাভাবে তাওহীদ, পরকাল ও নবুয়ত-রিসালতের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এই সূরার ৩য় রুকূতে সৎ ও মন্দ লোকদের গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে। সৎ লোকদের গুণাবলী পর্যায়ে বলা হয়েছে– তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করে, আল্লাহ্ যে সব সম্পর্ক বহাল রাখতে বলেছেন তা বহাল রাখে, ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক হতে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করে এবং অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। এই সব লোকদের জন্য রয়েছে পরকালে বিশেষভাবে পুরস্কার। সৎ লোক দুনিয়াতে পুরস্কার পেতে পারে আবার নাও পেতে পারে। আল্লাহ্‌র নানা নিয়মে তা ঘটতে পারে। যেমন আল্লাহ্ পাক সূরা বাকারায় বলেছেন ঃ

আমি তোমাদেরকে ভয় ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদিগকে।

–সূরা বাকারা ঃ ১৫৫

দুনিয়াতে কোন সৎ লোকের কম ধন-সম্পদ হওয়া আল্লাহ্‌র নিকট অপ্রিয় হওয়ার লক্ষণ নয়। তেমনিভাবে কারো বেশী ধন-সম্পদ হওয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় হওয়ার লক্ষণ নয়– যেমন মক্কার কাফিররা বিশ্বাস করত। আজকালও পাশ্চাত্যের উন্নতি জৌলুসে প্রভাবিত লোকেরা এ ধারণা বিশ্বাস ও প্রচার করে থাকে। এ বিশ্বাস ও যুক্তির অসারতা ঘোষণা করেই আল্লাহ্ পাক বলছেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিকের প্রাচুর্য

www.pathagar.com

দান করেন আর যাকে ইচ্ছা রিযিক কম দেন। এসব ঘটে থাকে আল্লাহ্র পরিকল্পনা ও নৈতিক আইনের অধীনে।

অবশ্য এখানে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রিযিক অর্জন ও ধন বন্টন সম্পর্কিত আল্লাহ্র আইনের অন্যান্য দিকও রয়েছে। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার রিযিকের জন্য চেষ্টা করতে হবে (সূরা জুম'আ ঃ ১০; সূরা নিসা ঃ ৩২, সূরা হাশর ঃ ৭) তেমনিভাবে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমাজ ও রাষ্ট্র দেখাশুনা করবে এবং তার অভাব দূর করবে (সূরা তওবা ঃ ৬০; সূরা জারিয়াত)।

আলোচ্য আয়াতে ধন বন্টন সম্পর্কিত আল্লাহ্র একটি মৌলিক নীতি সুস্পষ্ট হয়। ইসলামের ধন বন্টন নীতি সম্পর্কিত অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ আয়াতের বক্তব্যকেও ইসলামী অর্থ ও সমাজ নীতিবিদদের মনে রাখতে হবে।

অর্থাৎ এ আয়াত থেকে একথা মোটেই বোঝায় না যে সম্পদে মানুষের হিস্যার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে থাকেন বলে তাকে সম্পদ অর্জনের জন্য কোন চেষ্টা-তদবির করতে হবে না। কেননা এখানে উল্লিখিত বিষয়টি হলো প্রাকৃতিক ও নৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আর সম্পদ অর্জনের জন্য চেষ্টা করা সাধারণ নীতিমালার অন্তর্গত। এ দু'য়ের সমন্বয়েই ইসলামী জীবন দর্শন পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং এতেই ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিহিত।

- শাহ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইবরাহীম

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَاجًا اُوْلٰئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ.

যারা ইহজীবনকে পরকালের জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ থেকে এবং আল্লাহ্র পথ বক্র করতে চায় তারাও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। – সূরা ইবরাহীম ঃ ৩

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ

আয়াতের يستحبون শব্দের আভিধানিক অর্থ ও ব্যবহারিক তাৎপর্য ঃ এর মূল শব্দ حَبٌّ অর্থ দানা, বীজ, গম, যব এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার 'যবর' ও 'যের' যোগে حب ও حب একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন মজীদের বহু স্থানে এবং হাদীস শরীফেও এ শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে حب অর্থে এমন লোককে বোঝায় যার মধ্যে প্রণয়ের আধিক্য বিদ্যমান। ব্যবহারিক অর্থে এভাবে محبوب ، محب ও محبت শব্দগুলো নানারূপে প্রচলিত হয়ে এসেছে। محبت অর্থ যে বস্তুতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে সে বস্তুর আকাঙ্খা বা ধারণাকে বোঝায়। محبت (মহব্বত) তিন প্রকারের হতে পারে, যথা ঃ (১) উপভোগ বা আস্বাদনের জন্য যেমন পুরুষের নারীর প্রতি ভালবাসা; (২) লাভ বা উপকারের জন্য যেমন কোনও বস্তু থেকে কোনও লাভের আশায় তাকে ভালবাসা এবং (৩) মর্যাদার কারণে যেমন বিদ্বান ব্যক্তিকে ভালবাসা। এভাবেই আয়াতের استحباب। (ইস্তিহ্বাব) শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। এ শব্দটি باب استفعال এর

www.pathagar.com

verbal noun, যার অর্থ কোনও বস্তুতে ঐকান্তিক ভাবে কামনা করা বা ভালবাসা। উল্লেখ্য শব্দটির পরে على preposition ব্যবহার করলে তাতে নিবেদিত প্রাণে ভালবাসার অর্থ দেয়। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে يستحبون শব্দ। আলোচ্য الذين...... الاخرة। আয়াতে তারা দুনিয়াবী যিন্দেগীকে নিবেদিত প্রাণে ভালবাসে আখিরাতের উপর বোঝায়।

- রাগেব ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃষ্ঠা ১০৫

প্রখ্যাত তাফসীরকার ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, এরা পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের উপর অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দেয় এবং তা বেশী পছন্দ করে। দ্বিতীয়ত, আয়াতের يستحبون (পছন্দ করে) শব্দের استحباب। ইস্তিহ্বাব অর্থ কোনও বস্তুর প্রতি ভালবাসা বা প্রীতির অন্বেষণ করা। উল্লেখ্য যে, যদিও পাপপ্রবণ মানুষ কখনও কোনও বস্তুকে ভালবাসে, তবু সে তা এ কারণে ভালবাসে না যে, সে বস্তুটির একান্ত বন্ধু হয়ে যাবে। কথাটি আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়, যেমন কোনও লোক সাধারণভাবে কোনও পাপ বা সীমালঙ্ঘনের কাজে ঝুঁকে পড়ে; কিন্তু আসলে সে ঐ পাপ কর্মের বন্ধু হওয়া বা তাতে গভীরভাবে আসক্ত হওয়াটা পছন্দ করে না। কিন্তু যখন সে ঐ কাজকে মনে প্রাণে কামনা করেই তা ভালবাসে, তখন এটাই হল তার চরম ভালবাসা ও গভীর অনুরাগ। অতএব আয়াতাংশ اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا। তাদের পার্থিব জীবনের প্রতি চরম মহব্বত ও পরম ভালবাসারই প্রমাণ দেয়। দুনিয়ার প্রতি মানুষের এরূপ মাত্রাতিরিক্ত অনুরাগ ও আসক্তি কেবল তখনই সৃষ্টি হয়, যখন সে পারলৌকিক জীবনের স্থায়ী সুখ-শান্তি ও ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবনের দোষত্রুটি ও অকল্যাণ সম্পর্কে গাফিল হয়ে যায়। এভাবে যখন সে চরম পর্যায়ে উপনীত হয় তখন সে নিন্দিত বলে চিহ্নিত হয়। আসল কথা এই, কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভালবাসবে যে ব্যক্তি এর কুফল ও দোষত্রুটি সম্পর্কে অসতর্ক এবং পারলৌকিক রূহানী যিন্দিগী সম্পর্কে অনবহিত। এ জন্যই বলা হয়েছে ঃ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ আখিরাতের জীবনই সর্বোত্তম ও স্থায়ী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا। আয়াতাংশে على الاخرة। কথাটির আগে শব্দটি উহ্য রয়েছে। যার অর্থ "এবং তারা আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়।" অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এখানে "তারা পার্থিব জীবনকে

ভালবাসে এবং তাতে আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়" এ দুটি কথা একত্রে বলে দিয়ে বিষয়টির সমন্বয় সাধন করে দিয়েছেন, যাতে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, দুনিয়া-প্রীতি নিন্দার যোগ্য নয়, যদি না তাতে আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আসলে সে লোক বেঁচে থাকার প্রয়োজনে দুনিয়াকে ভালবাসে। এখানে সুযোগ-সুবিধা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে আর সেই সাথে আখিরাতের কল্যাণ লাভও তার উদ্দেশ্য থাকে। সে লোক নিন্দিত হওয়ার যোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে আখিরাতের গুরুত্ব না দিয়ে আখিরাতকে বরবাদ ও বিনষ্ট করে দিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুধু মাত্র দুনিয়ার লাভই অর্জন করে।

আয়াতে পর্যায়ক্রমে কাফিরদের তিন প্রকার কার্যকলাপ ও আচরণের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যথা ঃ (১) তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে তা ভালবাসে; (২) তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করে। এ কথাটির তাৎপর্য এই, যে লোক কেবল দুনিয়ার প্রীতিতে মশগুল সে নিজে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত আর এরই ফলশ্রুতিতে সে অপরকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দেয়; সে হচ্ছে বিভ্রান্তকারী। অতএব এরা উভয় রকম দোষে দোষী। (৩) উপরোক্ত দোষী ব্যক্তিরা শেষ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সোজা ও সরল পথে বিভিন্নভাবে বক্রতা ও দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এটাই তাদের বিভ্রান্তির চরম পর্যায়। অতএব বিভ্রান্তিতে তারা বহুদূর সরে গেছে বলে আয়াতে উল্লেখ হয়েছে এবং তারা আর হিদায়তের দিকে ফিরে আসবে না। – তাফসীরে কবীর, ফখরুদ্দীন রাযী, ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, খোদাদ্রোহী কাফিররা ইহকালকে পরকালের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। দুনিয়ার সুখ-সুবিধা ও ভোগ-বিলাসের জন্যই তাদের সার্বিক প্রচেষ্টা ও সাধনা। তারা আখিরাতকে একেবারেই ভুলে যায় আর রাসূল (স.)-এর অনুসরণ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। আল্লাহ্‌ নির্ধারিত সরল-সহজ পথকে বক্র ও বন্ধুর বলে প্রমাণ করতে চায়। তারা এরূপ মূর্খতা ও বিভ্রান্তির মধ্যেই থেকে যাবে। কেননা যে পথ আল্লাহ্‌র তা কখনও বাঁকা বা বন্ধুর হয়নি এবং হবেও না।

– তাফসীরে ইব্‌ন কাসীর, উর্দু অনুঃ আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্মিরী, পৃষ্ঠা ৫৭

ফী-যিলালিল কুরআন

ফী-যিলালিল কুরআন প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (এক সুদূর প্রসারিত দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছেন)।

www.pathagar.com

তিনি লিখেছেন, আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে ঃ আখিরাতের ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা শূন্য নিরঙ্কুশ দুনিয়া-প্রীতি ঈমানী তকলীফ (কার্য) সমূহের পরিপন্থী এবং সরল ও সহজ পথে বিচরণ, অবস্থান ও স্থিতিশীলতার জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এর সাথে সাথে পরকালের লক্ষ্য ও চিন্তাভাবনা থাকলে তার ফল হয় শুভ, সুন্দর ও চমৎকার। এ অবস্থায় পার্থিব জীবন সংশোধিত হয়ে যায় এবং ইহকালের প্রয়োজনীয় সম্পদ, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ ভারসাম্যরূপে অর্জিত হয় এবং যেহেতু এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও লক্ষ্য থাকে, সে কারণে পরকালের প্রতি ভালবাসা আর দুনিয়ার যিন্দেগীর মাল-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা – এ দুয়ের মধ্যে কোনও সংঘাত ঘটে না। মূলত যাদের অন্তরে আখিরাতের লক্ষ্য থাকে, যাদের মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরকালের চিন্তা-ভাবনাও যুগপৎ জড়িত থাকে, তারা পার্থিব জীবনের সম্পদ থেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না– যেমনটি বিরোধী ভাবাপন্ন লোকেরা মনে করে থাকে। আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে আখিরাতের সংশোধন মানেই পার্থিব জীবনের সংশোধন। আর ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের দাবী পৃথিবীতে উত্তম প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করা; আর উত্তম প্রতিনিধিত্ব অর্থ পৃথিবীকে যথার্থ আবাদ করা এবং পৃথিবীর সম্পদ থেকে বৈধ ও সঙ্গতভাবে উপকৃত হওয়া কেননা ইসলামী দৃষ্টিতে আখিরাতের যিন্দেগীর অপেক্ষায় ইহকালের জীবনে বসে থাকা নয়। এখানে অলস হয়ে শ্রমবিমুখ হয়ে বৈরাগ্যের কোনও স্থান বা অনুমতি নেই। বরং এখানে প্রতিনিধিত্ব অর্থ হচ্ছে জীবনকে আবাদ করা। সত্যের পথে ন্যায়ের পথে তা সংগঠিত করা এবং আখিরাতের ভয়-ভীতির সঙ্গে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকা। এরই নাম ইসলাম, এটাই এর সংজ্ঞা এবং এটাই ইসলামের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য।

কিন্তু যারা পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর গুরুত্ব দেয়, তাদের অবস্থা এই– পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য সব দিক বিসর্জন দিয়ে তারা আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে সক্ষম হয় না। এভাবে চলতে থাকে তাদের অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও প্রচেষ্টা। হালাল হারাম নির্বিশেষে এ প্রয়াসে লিপ্ত থেকে তারা নির্দ্বিধায় অবৈধ রুজী অর্জন করছে, জনগণকে প্রবঞ্চিত করছে, ধোঁকা দিচ্ছে এবং তাদেরকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করছে। এরূপ অসৎ উদ্দেশ্যের ফলশ্রুতিতে ঈমান বিল্লাহর আলো থেকে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং হিদায়তের ছায়ায় আশ্রিত হতে পারে না। এমতাবস্থায় এই স্তর থেকেই শুরু হয়ে যায় তাদের আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদানের

www.pathagar.com

কার্যকলাপ। এতে করে তারা নিজেদেরকেও বাধা দেয় আর অপরকেও বাধা দিয়ে সোজা ও সরল পথ থেকে শত যোজন দূরে সরিয়ে নেয়। তাদের সর্বনাশা প্রচেষ্টার এখানেই শেষ নয়। তারা আল্লাহ্‌র সরল পথে বক্রতা অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ে যায়। এরূপ জঘন্য ক্রিয়াকলাপ ও আচরণে যখন তারা কৃতকার্য হয়ে যায়, তখন তারা ইনসাফ ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং শুরু হয় তাদের অবাধ জুলুম, অত্যাচার, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা এবং জনগণের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। কিন্তু ঈমানের পথ ও গতিধারা হচ্ছে জীবনের গ্যারান্টি এবং দুনিয়ার যিন্দেগীর জন্যও এক মহাসম্পদ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

–ফী-যিলালিল কুরআন, সৈয়দ কুতুব শহীদ, পৃ. ১০৮৬-৮৭, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৯, দারুশ শুরূক, বৈরুত, লেবানন

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা ইবরাহীমের সবগুলো আয়াতই মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কী আয়াতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আকীদা, তওহীদী ধারণা, রিসালত, কিয়ামত এবং হিসেব-নিকেশসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির বর্ণনা সন্নিবেশিত থাকে। এদিক থেকে সূরাটির আওতা ব্যাপক হলেও এ আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির বেশ কিছু ধারণা মিলে। সূরাটির প্রারম্ভিক আয়াতেই বলা হয়েছে ঃ হে নবী (স.)। আমি তোমার প্রতি কিতাব এ উদ্দেশ্যে নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানুষকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় আয়াতে অন্ধকারে নিমজ্জিত অবিশ্বাসী কাফিরদের প্রতি কঠোর আযাবের ভীতি উচ্চারণ করার পর অত্র আয়াতে তাদের তিনটি মারাত্মক দোষের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রথমটি হল– তাদের চরম দুনিয়া-প্রীতি। তাদের কাছে ইহলোকের জীবনের গুরুত্ব পরকালের জীবন অপেক্ষা বেশী। এভাবে এক্ষেত্রে একটি তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। যদিও আয়াতে আখিরাতকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পার্থিব জীবন তথা পার্থিব জীবনের সম্পদ ও প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে ইসলামী অর্থনীতির একটি রূপরেখা ও দিক-নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগৎ নিয়েই মানুষ ও মানুষের জীবন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তাকীদে প্রয়োজনীয় খাদ্য, বাসস্থান, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী আবশ্যক। দুনিয়ার এ সকল বস্তু ও উপকরণ আবশ্যক বলেই সেগুলো আহরণ ও অর্জন করার জন্য শ্রম ও আয়াস নিঃসন্দেহে জরুরী।

www.pathagar.com

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة "বৈধ উপার্জনের অন্বেষণ ফরয বন্দেগীর পর আরেকটি ফরয" (বায়হাকী)। আবার হালাল রুজীর উপার্জন যেমন ফরয, অর্জিত সম্পদ সংরক্ষণেরও তেমনি তাকীদ রয়েছে এবং বলা হয়েছে من مات دون ماله فهو شهيد "সম্পদ রক্ষায় মৃত্যুবরণ করাও শহীদের মর্যাদার তুল্য।" তাই কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে হালাল রুজী অর্জনের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে ঃ

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا- اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

আল্লাহ্‌র দেয়া হালাল রুজী থেকে খাও আর শোকর কর কিন্তু ইসরাফ (অপচয়) করো না। আল্লাহ্ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

সূরা জুমু'আয় বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى اْلاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ-

নামায শেষে রুজীর অন্বেষণে মাঠে ময়দানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়।

–সূরা জুমু'আ ঃ ১০

হাদীসে আছে ঃ "রুজীর দশ ভাগের নয় ভাগ রয়েছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে।" "বিশ্বস্ত সত্যবাদী বণিকের মর্যাদা কিয়ামতের দিন শহীদদের সমতুল্য হবে।" (হাকেম)। এভাবে বহু হাদীসে রুজী-রোজগার ও অর্থোপার্জনের উৎসাহ প্রণিধানযোগ্য।

মানুষ স্বভাবগতভাবে অনেকটা ধন-সম্পদ প্রিয়। অর্থের জন্য সে চালায় শ্রম ও প্রচেষ্টা। তার মধ্যে দেখা যায় অর্থের জন্য অন্তহীন লোভ-লালসা এবং চরম ভালবাসা। এ কারণেই বলা হচ্ছে ঃ

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ

নিঃসন্দেহে মানুষের সম্পদ-প্রীতি বড় গভীর। – সূরা আদিয়াত ঃ ৮

وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

এবং তোমরা মাল সম্পদকে চরমভাবে ভালবাস। –সূরা আল-ফাজর ঃ ২০

www.pathagar.com

সম্পদের মোহে অর্থের এমন ভালবাসায় মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে পরকাল বিনষ্ট করে। সে জীবনের ভারসাম্য ও হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। অর্থের উদগ্র বাসনা ও লোভের ফলে চলতে থাকে গর্ব, অহঙ্কার, জুলুম, অত্যাচার, নিষ্পেষণ, চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবিসহ নানা প্রকার অসামাজিক ও গর্হিত কার্যকলাপ আর এগুলো ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে, সমাজ ও জাতীয় জীবন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে পরম উল্লাসের সাথে চলতে থাকে। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ الَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ

চরম দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মানুষের পিছনে ও উপস্থিতিতে লোকের নিন্দা চর্চা করে, যারা অর্থ জমায়, আর তা বারবার গণনা করে, তারা ধারণা করে যে, অর্থই তাদের অমর করে রাখবে। –সূরা হুমাযা ঃ ১-৩

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের মোহে পুঁজিবাদী ধারায় কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলুক এটা যেমন ইসলাম সমর্থন করে না, তেমনি সমাজতান্ত্রিক নিয়মে ব্যক্তিগত মালিকানা হারিয়ে সকল সম্পদ অপরকে বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব দরিদ্র হোক এটাও অনুমতি দেয় না ঃ

وَلاَتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا -

তোমরা হাত ঘাড়ে আবদ্ধ করে রেখো না– আর তা সম্পূর্ণরূপে প্রশস্তও করো না, যাতে করে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাও। – সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯

সন্তানাদি ও সম্পদের অতি মোহ, মাত্রাতিরিক্ত ধন লিপ্সা ও অর্থ পিপাসার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে না রাখে, আর যে লোক এমন কাজ করবে সে পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। – সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯

www.pathagar.com

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

হে নবী (স.)! বল, তোমাদের পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী গোত্রীয় লোকজন, অর্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার ক্ষতির আশংকা তোমরা কর এবং তোমাদের পছন্দ করা ঘরবাড়ি যাতে তোমরা বাস কর– এগুলোই যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চাইতে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের চাইতে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে এর পরিণতি হিসেবে বিচারের দিনে আল্লাহ্‌র পদক্ষেপ নেওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়ায় কিছুকাল অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ্ ফাসিক জাতিকে সুপথে চালান না। –সূরা তওবা ঃ ২৪

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى. وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى.

অনন্তর যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকেই বেছে নিয়েছে, জাহান্নামই তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিতির ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে জান্নাতই হবে তার বাসস্থান। –সূরা নাযি'আত ঃ ৩৭-৪১

يقول العبد مالى مالى وانما له من ماله ثلث. ما اكل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما ستوى ذلك فهو ذاهب وتاركه الناس –

বান্দা আমার মাল আমার টাকা বলে চিৎকার করে, কিন্তু তার সম্পদের মাত্র তিনটিই অবস্থা। সম্পদ থেকে যা সে খেয়ে নিল, তা তো সে শেষ করে ফেলল আর যা সে পরল, তা পুরানো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল, আর যা সে অপরকে দান করল, আসলে তাই সে সঞ্চিত করল (পরকালের জন্য)। আর এ ছাড়া অবশিষ্ট

www.pathagar.com

যা রইল, তা তার হাত থেকে চলে গেল এবং তা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য ছেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। –মুসলিম

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাটি স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আখিরাতের উপর পূর্ণ গুরুত্ব রেখে প্রয়োজন মত পার্থিব জীবনে সম্পদ অর্জন ও আহরণ এবং ভারসাম্য রূপে তা ভোগ-ব্যবহার করাতে ইসলামী অর্থনীতিতে কোন বাধা নেই। এ কথাটিই আয়াতের দাবী ও মূল বক্তব্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কারুনকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ.

তোমাকে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা দ্বারা আখিরাতের বাসস্থান অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না, পরোপকার কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আর পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো না। কেননা আল্লাহ্ বিপর্যয়কারীদেরকে ভালবাসেন না। –সূরা কাসাস ঃ ৭৭

উপসংহারে বলা যায়, মানুষ এ দুনিয়ায় সব দিক থেকেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করবে– এটাই আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রেত। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও, এখানে যে কিছু সময় থাকতে হবে, তার জন্য জীবনোপকরণসমূহ এ দুনিয়ার জীবন পথের পাথেয় কিন্তু মঞ্জিলে মকছুদ নয়। তাই মঞ্জিলে মকছুদ হল আখিরাতের চিরস্থায়ী যিন্দেগী। তাই এ দুনিয়ার যিন্দেগীর প্রতি আসক্তিহীন থেকেই এখানের জীবনোপকরণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর এ প্রচেষ্টা চালাবার সময় যদি দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বে এক আখিরাতের অনন্ত যিন্দেগীর কথা মনে থাকে, তাহলে মানুষ হারাম এবং অসৎ, দুর্নীতিমূলক পন্থা অবলম্বন করবে না, অর্জিত সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করবে না এবং সীমাহীন ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়বে না। সে উপার্জন করবে হালাল ও সৎ পন্থায় এবং ব্যয় করবে শরীয়ত (কুরআন ও সুন্নাহ্) নির্ধারিত পন্থায়। নিজের প্রয়োজন মিটানোর পর সে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবে না। এর ফলে সমাজে এক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। সম্পদ তখন মুষ্টিমেয় শঠ, দুর্নীতিপরায়ণ ও অসৎ লোকের কুক্ষিগত হয়ে পড়বে না। তা আবর্তিত হবে (circulated) বাঁধাহীন স্রোতধারার মত সমাজের সর্বস্তরের লোকের

www.pathagar.com

মধ্যে। এরূপ আর্থ-সামাজিক অবস্থাই বিরাজমান ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং খুলাফায়ে রাশিদার শাসন আমলে, যেখানে যাকাত দেওয়ার লোক ছিল, কিন্তু যাকাত নেওয়ার লোক ছিল না। একই বিধান প্রচলিত হলে বর্তমান সমাজেও সেই একই আর্থ-সামাজিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে। বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় এ মূল নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে বিলাস সামগ্রীর পরিবর্তে সর্বসাধারণের জরুরী প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বন্টনের ক্ষেত্রে অবৈধ বাধা-বিঘ্ন দূর করলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে এক সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে।

নূর মুহাম্মদ আকন্দ

প্রমাণপঞ্জি

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইমাম এমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর।

২. ফী-যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ।

৩. তাফসীরে কবীর, ফখরুদ্দীন রাযী।

৪. আল-মুফরাদাত, রাগেব ইসফাহানী।

৫. বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ।

www.pathagar.com

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا
ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ. تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ
قَرَارٍ. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَاءُ.

তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন্ জিনিসের সহিত কালেমায়ে তাইয়েবার তুলনা করিয়াছেন। উহার দৃষ্টান্ত এই, যেন একটি ভাল জাতের গাছ, যাহার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া আছে এবং শাখাগুলি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, যাহা প্রত্যেক মওসুমে তাহার ফল দান করে তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এইসব উদাহরণ আল্লাহ্ এইজন্য দিয়েছেন যেন মানুষ ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর নাপাক কালেমার উদাহরণ হইতেছে, একটি খারাপ জাতের গাছ, যাহা মাটির উপরিভাগ হইতে উপড়াইয়া ফেলা যায়, উহার কোন দৃঢ়তা নাই। যাহারা প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত বাক্যে বিশ্বাসী আল্লাহ্ তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাত– দুইখানেই প্রতিষ্ঠা দান করিবেন। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। –সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৭

শব্দের তাৎপর্য

'কালেমা তাইয়েবা'র শাব্দিক অর্থ হইল পাক ও পবিত্র কথা। কিন্তু উহার তাৎপর্য হইল সত্য কথা ও নেক নির্মল আকীদা-বিশ্বাস, যাহা পুরাপুরি প্রকৃত সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তিশীল হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ হলো তওহীদের স্বীকৃতি। কেননা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আসল সত্য কথা।

– তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীমের তাফসীর

www.pathagar.com

কালেমায়ে খবীসা– ইহা কালেমায়ে তাইয়েবার বিপরীত। প্রত্যেক সত্য-বিপরীত ও ভুল ভিত্তিক কথা বা বিষয়কেই খবীসা কালেমা বলা চলে। এখানে ইহার অর্থ প্রত্যেক ভুল মতবাদ যাকে ভিত্তি করে মানুষ নিজের জীবন গড়ে তোলে। তা নিছক নাস্তিকতারও হতে পারে, হতে পারে শিরক বিদ'আত বা নবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত নয় এমন মতবাদ। – ঐ

কাওলে সাবেত– ইহার অর্থ প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণিত কথা। এখানে ইহার অর্থ 'লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'।' –নাসাফী, কাশশাফ

তাফসীর লেখকদের আলোচনা

মওলানা সইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ ক'টি আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, কালেমায়ে তাইয়েবা হচ্ছে মহাসত্য। আসমান হতে যমীন পর্যন্ত গোটা সৃষ্টি এ মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে প্রাকৃতিক আইন ও নিয়ম কোন দিক দিয়েই ইহার সহিত সংঘর্ষশীল হয় না। ইহা এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ কালেমা যে, যে ব্যক্তি বা জাতিই ইহাকে ভিত্তি করে নিজ জীবনের ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, সে সব সময় ইহার সুফল লাভ করবে। সে চিন্তায় পরিপূর্ণতা, স্বভাব-চরিত্রে নির্মলতা, প্রকৃতিতে ভারসাম্য, নীতির দৃঢ়তা ও নৈতিক পবিত্রতা, পারস্পরিক কাজকর্মে ন্যায়পরায়ণতা, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিতে পরিপক্কতা, সামাজিক সুনীতি, অর্থনীতিতে ইনসাফ ও সহানুভূতি, রাজনীতিতে বিশ্বস্ততা, যুদ্ধে ন্যায্যতা, সন্ধিতে আন্তরিকতা, চুক্তিতে নিষ্ঠা সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে 'খবীস কালেমা' বা ভুল বিশ্বাস মূল সত্যের বিপরীত। তা প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ইহা কেবল তিক্ত ফলই দিতে পারে। কালেমা তাইয়েবা সব সময়ই একই ছিল অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা। কিন্তু খবীস কালেমা অসখ্য। কালেমা তাইয়েবাকে কখনো সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে নিত্য নতুন খবীস কালেমা পয়দা হয়েছে। ইতিহাস অসংখ্য মৃত ও বিলুপ্ত খবীস কালেমাতে পূর্ণ।

কালেমা তাইয়েবা একটি দৃঢ় স্থায়ী দৃষ্টিকোণ দেয়। মানুষের সব সমস্যার সমাধান এ মহামন্ত্রে রয়েছে। কালের আকর্ষণ ইহার ভিত্তিকে শিথিল করতে পারে না। অপরদিকে চলার পথে ইহা বিভ্রান্ত হওয়া হতে রক্ষা করে। যখন দুনিয়ার জীবন অতিক্রম করে সে পরকালে পদার্পণ করে সেখানেও তাকে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা, দুঃখের সম্মুখীন হতে হয় না।

- তাফহীমুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ, ষষ্ঠ খণ্ড

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা ইবরাহীমের এ কয়টি আয়াতে ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন, তত্ত্ব এবং নীতির মূল ভিত্তি পাওয়া যায়। কালেমা তাইয়েবাতে তার অন্তর্নিহিত দিক-নিদের্শনা পাওয়া যায়। কালেমা তাইয়েবাতে একদিকে তওহীদের অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বিশুদ্ধ বিধানের নির্দেশ মানব জাতির জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। এই সব আয়াতে বলা হয়েছে যে, একটি সঠিক বিশ্বাসই ভাল ফল দিতে পারে। মন্দ বিশ্বাস থেকে কোন ভাল ফল আশা করা যায় না। কাজেই যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য একটি যথার্থ বিশ্বাসের ভিত্তিমূল প্রয়োজন। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সে বিশ্বাস হচ্ছে তওহীদ। তওহীদের উপর আল-কুরআনের মতে, কেবল অর্থনীতির নয়, গোটা জীবন ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তাতেই সমাজ জীবনে কল্যাণ অর্জিত হবে।

উপরোক্ত সাধারণ উক্তি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে সংগঠিত করা হলে তার স্বরূপ কেন প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্নধর্মী হবে তারই মৌল সত্যটির দিকে আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কালক্রমে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান সন্ধানের জন্য নতুন নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সে সকল তত্ত্বের যুক্তিবাদকে নির্ভর করে নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন সাহায্যে নানা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যবস্থাকেও সংগঠন করা হয়। অর্থনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রেও তা করা সম্ভব। এসব ব্যাপারে গবেষক ও তত্ত্ববিদগণ একটি সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য একটি রূপকে তাদের নিজস্ব জ্ঞানলব্ধ যুক্তি সাহায্যে প্রাথমিকভাবে ধরে নেন এবং তাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের পরিধিতে প্রয়োগ করে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন। প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে অন্য সম্ভাব্য বিকল্পকে ধরে আবার নতুন প্রয়াস শুরু করেন। কিন্তু অর্থনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়াসে প্রমাণের সাফল্য ঠিক বৈজ্ঞানিকভাবে পূর্ণ ও সঠিক না হওয়ারই কথা। তার কারণ, মানুষের আচরণ ও সমাজের অসংখ্য জটিলতার কাঠামোতে আচরণের নানা সংঘাত সম্পর্ককে তথ্যের আকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিই ত্রুটিহীনভাবে গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি। সমাজ ও মানুষের আচরণ যত বেশি আধুনিকতাধীন চাপে পড়ছে তত বেশি বাড়ছে প্রভাব বিস্তারকারী variable factor। সুতরাং ততই বেশি বাড়ছে সামাজিক সমস্যা সমাধান ক্ষেত্রে তত্ত্ববাদকে নির্ভুল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার সংশয়। আংশিক প্রয়োগে আংশিক ফল পাওয়ার তথ্য সাহায্যেই কেউ কেউ পেতে চান নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনকারীর গৌরব। অথচ সে আংশিক

www.pathagar.com

নতুন তত্ত্ববাদ আংশিকভাবে স্বল্পকালের জন্য সুফল দিতে পারলেও কালক্রমে সেটুকু সুফল লাভের ভিত্তিটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নতুন প্রেক্ষিতে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতি একই পূর্ববর্তী সুফলদায়ক তত্ত্ববাদ অসামাজিক অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে। আদম স্মিথ-রিকার্ডো সৃষ্ট ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির তেমনি হয়েছে অবসান, ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি ব্যবস্থার কুফলকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মার্কসবাদেরও হয়েছে অবসান। বর্তমান কালের পৃথিবীতে কল্যাণের সন্ধান করছে পাশ্চাত্য কল্যাণ রাষ্ট্রের নতুন রূপের অর্থনীতি এবং একই কল্যাণের সন্ধান করছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নানা মাত্রার সমাজতন্ত্রবাদ। এখনো সে সকল সন্ধান অনুসন্ধান ও নতুন তত্ত্ববাদের বাস্তবায়ন সঠিক সুগঠিত রূপ নিয়ে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সৃষ্টির উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়নি। তা হতেও পারবে না কোনদিন। কারণ, ভিত্তিগত ধর্তব্য সত্য বা axiom চিন্তা ও অনুশীলন সম্পর্কেই রয়েছে গোড়ায় গলদ।

আলোচ্য আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামী তত্ত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমেই স্বীকৃতি দান করতে হবে ইসলামী ধর্তব্য axiom কে। প্রথম মৌল axiom ই হলো 'তওহীদ' জ্ঞান। এ জ্ঞানের স্বীকৃতি থেকেই আসছে ধর্তব্যের দৃঢ় স্তম্ভ, যার সত্যতার পরিবর্তন হবে না। সেজন্যেই এ ধরনের সত্যতাকে ভিত্তি করে যেসব variable-কে প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হয় তাদের সংখ্যাও সীমিত। সেসব সীমিত variable-গুলোকে কঠোর সত্যনিষ্ঠ পদ্ধতিতে যুক্তি ও আল-কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থন সম্পর্কের মূল্যায়ন সহজ পন্থায় আর সঠিক পন্থায় পরিচালনা করা সম্ভবপর। আর এসব গবেষণা ও তত্ত্ববাদ সংগঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে অসত্য ও অকল্যাণের নির্দেশক তত্ত্ব এবং নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার ঝুঁকি থাকে খুবই কম। সে ঝুঁকি মানুষের উল্লিখিত সঠিক পদ্ধতিকে আয়ত্ত করার এবং প্রয়োগ করার দক্ষতার সীমাবদ্ধতার ওপরই নির্ভরশীল। সে কারণে বর্তমান বিশ্বেও পূর্ণদক্ষতার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ উপযোগী ইসলামী অর্থনীতি-সমাজনীতি ব্যবস্থা সংগঠনের তত্ত্ববাদ ও নীতি নির্ধারণকে প্রতিষ্ঠিত রূপ দিতে পারলে দেখা যাবে, পরিবর্তনশীল পুঁজিবাদ ও পরিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রবাদের চেয়ে সঠিক ভিত্তির ভারসাম্যপূর্ণ শোষণহীন সুবিচারমূলক ইসলামী ব্যবস্থাই বিশ্বের মানুষের জন্য সর্বত্রই সর্বোচ্চ কল্যাণপ্রসূ।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

আল্লাহ্ তিনিই, যিনি পৃথিবী ও আকাশকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। আর তার সাহায্যে তোমাদেরকে রিযিক পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন; যিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও করায়ত্ত করেছেন, তাঁর আদেশে তা নদী সমুদ্রে চলাচল করবে। নদ-নদীকেও তিনি তোমাদের জন্য অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, তারা অবিরত নিয়মানুবর্তী হয়ে চলছে। তিনি রাত্রি ও দিনকেও তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন। –সূরা ইবরাহীম ঃ ৩২-৩৩

কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ শব্দের আলোচনা

মা'আরেফুল কোরআন অবলম্বনে আয়াত দু'টিতে ব্যবহৃত তিনটি শব্দকে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এভাবে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

(ক) ثمرات হলো ثمرة শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثمرات বলা হয়েছে। মানুষের খাদ্য জাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্ত্র এবং বসবাসের গৃহসংস্থান এর অন্তর্গত। আয়াতে ব্যবহৃত رزق শব্দটিতে এ সকল মানবিক প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়।

(খ) سخر শব্দের অর্থ হলো নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্ট জিনিস (যেমন, নদী ও সমুদ্র চলাচলের জলযান) এবং চন্দ্র-সূর্য আর রাত্রি-দিন

www.pathagar.com

সব কিছুকেই মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। প্রথম সৃষ্ট জিনিসটি (নৌযান) আল্লাহ্‌র মৌল সৃষ্টিকে (যেমন– কাঠ, লোহা, তামা, অন্য ধাতু ইত্যাদি উপকরণকে) তাঁরই প্রদত্ত মৌল মানবিক ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে কল্যাণের কাজে ব্যবহার করার জন্য মানুষের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন। অন্যান্য মৌল সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে চন্দ্র-সূর্য ও দিন-রাত্রির দৃষ্টান্ত। এ সকল সৃষ্টি আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট বিধান অনুসারেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত রয়েছে।*

(গ) دائبين শব্দটি دأب থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো অভ্যাস। এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ্‌র বিধির অনুগত থাকাতে অভ্যস্ত। আল্লাহ্ চন্দ্র-সূর্যকে এবং দিনরাত্রির আবর্তনকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন এই অর্থে যে, আল্লাহ্‌র এ সকল মৌল সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের প্রয়োজনে আল্লাহ্‌রই বিধির অনুসারী হয়ে কাজ করে যাচ্ছে ও যাবে– যাতে মানুষের প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণ লাভ সম্ভব হয়।**

তাফসীরভিত্তিক প্রেক্ষিত আলোচনা

সূরা ইবরাহীম সূরা রা'দ-এর নিকটবর্তীকালে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাফসীরকারগণ মনে করেন। মক্কাবাসী কাফিরগণ সে সময়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এবং তাঁর অনুসারী মু'মিনদের প্রতি চরম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। আয়াত নং ১৩-তে বিশেষ করে উল্লেখ দেখা যায় (অতীতের ইতিহাসে আছে) শেষ পর্যন্ত কাফিরগণ তাদের নবী-রাসূলগণকে বলল– হয় তোমাদেরকে আমাদের ধর্মমতে ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব। তখন

---

* শব্দের ব্যাখ্যায় মওলানা মওদূদী বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সেসব বস্তুকে এমন বিধানে শৃঙ্খলিত করে রেখেছেন, যার ফলে সে সমস্ত বস্তু মানুষের জন্য হিতকর ও লাভদায়ক হয়েছে। (পৃ. ৩৯২, টীকা ৮ দ্রষ্টব্য)

** ৩৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে واتاكم من كل ما سألتموه অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তুর সব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। এ কথার তাৎপর্যকে মওলানা মওদূদী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের প্রকৃতির সব চাহিদা পূর্ণ করেছেন। তোমাদের জীবনের জন্য যা প্রয়োজন ছিল, তার সব কিছু সরবরাহ করেছেন এবং তোমাদের অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য যা কিছু উপায়-উপকরণ আবশ্যক ছিল, সে সব কিছুরই ব্যবস্থা তিনি করেছেন। (দ্রষ্টব্য তরজমায়ে কুরআন মজীদ, ফালাহই-আম ট্রাস্ট, ১৯৮২, পৃ. ৩৯২, টীকা নং ৯)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাদের প্রতি ওহী নাযিল করলেন যে 'আমরা এ জালিমদেরকে ধ্বংস করে দেব।' ১৮ নং আয়াতে এমনি কাফিরদের কাজকে এমন ভস্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যাকে এক ঝটিকাপূর্ণ দিনের ঝড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিয়েছে।' ১৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 'তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টিকে মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং এক নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন। এমনি প্রেক্ষিতেই ৩২ ও ৩৩ নং আয়াতে মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে নিয়োজিত করার সত্যকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে শেষ পর্যায়ে হলেও কাফিরদের সত্যের দিকে ঈমানের দিকে আকর্ষণ করা যায়। আল্লাহ্র শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সত্যের পথ কাফিরদের প্রত্যাবর্তনের পথ খোলা রেখে আকর্ষণ ও আমন্ত্রণের শেষ সীমা পর্যন্ত রক্ষা করেই অতীতেও চলেছে মক্কাবাসীদের জন্যও চলেছে। ৩৫ নং আয়াতে মক্কা নগরীকে শান্তিপূর্ণ নগরী ও মূর্তিপূজা বর্জিত রাখার জন্য ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থনাকে স্মরণ করে সঠিক পথে মক্কাবাসীদের প্রত্যাবর্তনের আহবান জানানো হয়েছে।

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) আলোচ্য আয়াত দু'টির সারমর্ম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনিই আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য ফল জাতীয় রিযক সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌকা ও জাহাজকে স্বীয় শক্তির অনুবর্তী করেছেন, যাতে আল্লাহ্র নির্দেশে ও কুদরতে সমুদ্রে চলাচল করে এবং তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। আর তোমাদের উপকারার্থে নদ-নদীকে স্বীয় শক্তির অনুবর্তী করেছেন, যাতে তা থেকে পানি পান কর, জল সেচন কর ও নৌকা চালাও।

আর তোমাদের উপকারার্থে চন্দ্র ও সূর্যকে স্বীয় শক্তির অনুবর্তী করেছেন, যাতে তারা সর্বদাই চলমান থাকে–যা থেকে তোমাদের আলো ও উত্তাপ দানের উপকার হয়। আর তোমাদের উপকারার্থে রাত ও দিনকে স্বীয় শক্তির অনুগামী করেছেন-যাতে তোমাদের জীবিকা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয় এবং যে যে বস্তু তোমরা চেয়েছ আর যা তোমাদের উপযোগী হয়েছে, তার প্রত্যেকটি তিনি তোমাদের দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আয়াত দু'টিতে একদিকে স্রষ্টার সৃষ্টি মহিমাকে সরল ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার সৃষ্ট সর্বপ্রকার সম্পদকে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সে দৃষ্টি আকর্ষণে প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়াস ও বিকাশের দিক নির্দেশনাও মৌল দিক থেকে নিহিত রয়েছে বলা যায়।

প্রথমেই লক্ষণীয় হলো, মানুষের সভ্যতা ও সমৃদ্ধি আল্লাহ্ প্রদত্ত মৌল উপাদান ও সম্পদ ব্যবহার করেই গড়ে উঠেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন এবং প্রগতি ঐতিহাসিকভাবে তার ওপরই নির্ভর করেছে। মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবন শক্তি ইত্যাদি প্রয়োগ করেই এক স্তরের প্রগতি থেকে পরবর্তী স্তরের বৃহত্তর ও উন্নততর প্রগতিতে উন্নীত হতে হয়েছে। এভাবে শুধু জীবনের উপযোগী জড় উপকরণের আকারে ভোগ্য সম্পদের উৎপাদনই বৃদ্ধি পায়নি, ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের–যার সাহায্যে সে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এটাই সংকীর্ণ অর্থে অর্থনীতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগের ইতিহাস। সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে মানুষের সমাজ সংগঠন এবং তার উত্তরোত্তর নতুন নতুন রূপের বিকাশ, যার ফলে জন্মলাভ করেছে সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞান। বিশেষ করে লক্ষণীয় হলো মানুষের শিক্ষা প্রশিক্ষণ, অধ্যবসায় ও গবেষণা সাহায্যে নতুন নতুন যুগান্তকারী উদ্ভাবন–আল্লাহ্ প্রদত্ত মৌল উপাদানের প্রকৃতি ও ব্যবহার থেকে নতুন নতুন উৎপাদিকা শক্তির উদ্ভাবন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে এমনি উদ্ভাবনের সাহায্যে নতুন নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে। কিন্তু সব সমৃদ্ধিই মূলত আল্লাহ্রই সৃষ্ট সম্পদকে ভিত্তি করে। অথচ জ্ঞানের অহংকার এবং মানুষের গড়া অর্জিত সম্পদ ভুলিয়ে দিয়েছে মৌল সত্যটি, যে মৌল সম্পদ মানুষের সৃষ্ট নয়। তখনই এসেছে বিভ্রান্তি ও সত্য পথ ছেড়ে বিপথে চলে ধ্বংসের পরিণতিকে ডেকে আনার ইতিহাস। এ জন্যই আল-কুরআনের চিরন্তন সত্যের দিক-নির্দেশনা হলো, সব রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবনকে মৌল সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত রাখাই মানব কল্যাণধর্মী। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদিকে স্রষ্টা সৃষ্ট শৃঙখলার অধীনে অনুসরণ করাই কল্যাণের পথ। ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও নির্দেশ সেজন্যই মৌল সত্যের সংযোগহীন পাশ্চাত্য অর্থনীতির তত্ত্ব ও পথনির্দেশের রূপ থেকে সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

আলাদা। ইসলামী অর্থনীতি মৌল সম্পদের ও উপাদানের স্রষ্টার স্বীকৃতির সঙ্গে মৌলভাবে সম্পর্কিত।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক সংজ্ঞার পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে যে সকল বস্তু বা সেবার বিনিময় মূল্য ও বাজার আছে, সে সবই শুধু অর্থনৈতিক সম্পদ। ইসলামী অর্থনীতিতে পৃথিবীর সবকিছু, আকাশ-বাতাস, প্রাকৃতিক শক্তি, আবহাওয়া, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি সব সৃষ্ট জিনিসই অর্তনৈতিক মৌল সম্পদ। সে মৌল সম্পদের সঙ্গে যে মানুষের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের উৎপাদন (অর্থাৎ মানুষের জীবিকা অর্জন প্রক্রিয়া) মৌলভাবে সম্পর্কিত সে সত্যকে আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। বৃষ্টি বর্ষণের সাহায্যে নানাবিধ ফসল ও ফল উৎপাদন এবং তার মাধ্যমে মানুষকে রিযক দানের ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে সৃষ্টির বিধান হিসাবেই দেখনো হয়েছে। কৃষি সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য ও পশু সম্পদ ইত্যাদির উৎপাদন, বিনিময় এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ তাই প্রাথমিকভাবেই মৌল সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনেকাংশে প্রতীয়মান হয়।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎপাদন প্রক্রিয়াতে যেখানে মানুষের উচ্চমানের প্রয়াস ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর পুঁজি দ্রব্য বা যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন হয়, সেখানেও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে মৌল সৃষ্টি ও তার ব্যবস্থাপনা বিধির সঙ্গে সম্পর্কিত। সে সত্যটিকে প্রকাশ করা হয়েছে নৌযানের নির্মাণ এবং নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরে নৌ-চলাচল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করার অর্থনৈতিক প্রয়াসের দিক-নির্দেশনার সাহায্যে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ এনেছে নানা স্তরের শিল্প প্রসার ও শিল্প বিপ্লব। প্রয়োজন হয়েছে বিপুল শিল্পসম্ভারের বাজারজাতকরণ এবং দেশে-বিদেশে বাণিজ্য সংগঠন ও সম্প্রসারণ। তাকে সম্ভব করেছে উন্নত থেকে উন্নততর নৌনির্মাণ ও নৌ-চলাচল ব্যবস্থা। বর্তমানকালে পণ্য বাণিজ্যের পরিবহন চলছে 'কনটেইনার' পদ্ধতিতে এবং পণ্যবাহী বিমানে। এমনি সমৃদ্ধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার ব্যবস্থাপনা সম্ভবই হতো না যদি আল্লাহ্র সৃষ্ট মৌল উপাদান, ধাতু, শক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিধি ভিত্তিগতভাবে এ সকল প্রক্রিয়াকে সমর্থন দান না করত। সে জন্যই প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকৌশল ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও প্রয়োগকে উক্ত মৌল সম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখাই সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব।

www.pathagar.com

চতুর্থত, অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধির বিকাশ এবং তার কল্যাণকর ইতিহাস মানুষের উন্নয়ন প্রয়াসকে ও পরিকল্পনাকে ও পরিকল্পনা পদ্ধতিকে মৌল সম্পর্কটির (original relation) শৃঙ্খলায় পরিচালনা করার যুক্তিবাদ রচনা করেছেন। তার সঙ্গে আবার প্রত্যক্ষ উন্নয়ন কাজের সুস্থ পরিবেশ হিসেবে বৃহত্তম বিশ্ব পরিমণ্ডলের ভারসাম্য ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের দিকেও Ecological Balance দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছে। বিশ্ব পরিমণ্ডলের ও ভূপ্রকৃতির নানা দিক নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও উদ্ভাবন পরিচালনা করে অলৌকিক নতুন উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার দিক-নির্দেশ দিয়েছেন এবং নোবেল পুরস্কার অর্জন করে পার্থিব উচ্চতম গৌরব লাভ করেছেন। তা সত্ত্বেও আকাশ দূষণ, বাতাস-দূষণ, সমুদ্র দূষণ, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদির ক্রমাগত বিপজ্জনক অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে শিল্পোন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের অধীনে। বিশ্ব পরিমণ্ডলের এবং মানুষের পার্থিব সমৃদ্ধি রচনার পরিবেশ আজ ভারসাম্যহীন ও বিপদ-সংকুল। সে পরিণতিকে এড়িয়ে কল্যাণ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মপ্রয়াস, গবেষণা প্রয়াস ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়োজিত করার জন্যই মৌল শর্ত ছিল ভার-সাম্য সংরক্ষণ। সে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার দিকে দিক-নির্দেশনা দেয় চন্দ্র সূর্যকে মানুষের জন্য স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং দিনরাত্রিরও নিয়ন্ত্রণ বিধি। মৌল নিয়ন্ত্রণ বিধির কাঠামোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ফলকে মানুষের কল্যাণ লক্ষ্যের উপযোগী করে ব্যবহার করাই ভারসাম্যমূলকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়াস। আসলে সমৃদ্ধি অর্জন আর একই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ মানুষের ভারসাম্যমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণের এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা পালনের ওপর নির্ভরশীল।*

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

---

* আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী বলেছেন ঃ "We must realise that behind all our strength, skill and intelligence there is the power and goodness of Allah who gave us all these things. Man can understand and control the forces of nature so as to bring them to his own service; he can only do so because (1) he has got these gifts from Allah, and (2) Allah has fixed definite laws in nature, of which he can take advantage by Allah's command and permission..........Man, by Allah's command, can use rain to produce food for himself; make ships to sail the seas; use rivers as highways and cut canals for traffic and irrigation. Not only this, but even heavenly bodies can (by Allah's command) contribute to his needs.

www.pathagar.com

প্রমাণপঞ্জি ঃ

১. তরজমায়ে কুরআন মজীদ, মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ফালাহ্-ই আম ট্রাস্ট (বাংলা অনুবাদ) ১৯৮২, পৃ. ৩৯২।

২. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী (বাংলা অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান) ১৯৮২, পৃ. ১৭৯-২৮৩

৩. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran, Notes 1908 & 1909)

The sun gives out heat which is the source of all life and evergy on this planet, and produces the seasons of the year, by utilising which man can supply his needs, not only material, but immaterial in the shape of light, health and other blessings. The sun and the moon together produce tides and are responsible for atmospheric changes which are of the highest importance in the life of a man. The succession of the Day and Night is due to the apparent daily course of the sun through the skies; and the cool light of the moon performs other services different from those of warm day-light. Because there are laws here, which man understand and calculate, he can use all such things for his own services, and in that sense the heavenly bodies are themselves made subject to him by Allah's command.

www.pathagar.com

وَاٰتٰكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ۔

তিনি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা তাঁর নিকট চেয়েছ। তোমরা যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। প্রকৃত কথা এ যে, মানুষ বড়ই অবিচারক ও অকৃতজ্ঞ।

–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৪

শব্দের অর্থ

নিয়ামত (نعمت) অর্থ দান, অনুগ্রহ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পদ ইত্যাদি।

(আরবী ইংরেজী অভিধান)

তাফসীরকারদের আলোচনা

মাওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ উসমানী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ

"আল্লাহ্ মানুষ যা জিহবা দিয়ে চেয়েছে বা অন্যভাবে চেয়েছে তা তাকে দান করেছেন। মানুষ যা কিছু আবিষ্কার করেছে, তা আল্লাহ্ পাকই দান করেছেন। কেননা মানুষের প্রগতির জন্য এসব প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আল্লাহ্ পাক এসব নতুন নতুন চাহিদা পূর্ণ করেছেন।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা ইবরাহীম, ৫৯ নং টীকা)

আল্লাহ্ পাকের নিয়ামতের সংখ্যা এত অধিক ও অসংখ্য যে, গোটা মানব জাতিও একত্র হয়ে তা গণনা করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযী বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নিয়ামত অসংখ্য এবং আল্লামা আবূ সউদ বলেন যে, এসব নিয়ামতের পরিমাণ সীমাহীন।" (ঐ, টীকা নং ৬০)

মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী বলেছেন ঃ তিনি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছ' এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

"অর্থাৎ স্বভাব ও প্রকৃতির প্রত্যেকটি দাবীকেই পূর্ণ করেছেন। তোমাদের জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজনীয়, তা তিনি যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। তোমাদের

www.pathagar.com

স্থিতি ও বিকাশ লাভের জন্য যে সব উপাদান অপরিহার্য সবকিছুই তিনি লাভ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।" – তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীমের ৪৫ নং টীকা

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মক্কী জীবনে শেষভাগে অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় রাসূল ও ইসলামের দুশমনদেরকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত সূরা ইবরাহীমের পঞ্চম রুকূর অংশ এবং এ রুকূ শুরু হয়েছে আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামত অস্বীকারকারীদের পরিণতির কথা দ্বারা। অতঃপর আল্লাহ্ পাক নিয়ামতসমূহের একটি বর্ণনা দিয়েছেন তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে মানব জাতিকে রিযিক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নানা আকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। নদ-নদী ও নৌযানকে মানুষের অধীন করেছেন, সূর্য-চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন মানুষের কল্যাণে। এ পর্যায়ে আয়াত ৩৪-এ আল্লাহ্র অসংখ্য নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে, যা মানুষ গণনা করেও এসবের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না।

আল্লাহ্র উপরোক্ত ঘোষণার আলোকে দেখা যায় আল্লাহ্র নিয়ামত অসংখ্য ও সীমাহীন। নিয়ামত অবশ্য কেবল সম্পদ (resource) অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না। তবে সম্পদও নিয়ামতের অংশ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। কেননা আমরা জানি না যে বিশ্বে এবং সৌরমণ্ডলে কি সম্পদ ছড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে এসব সম্পদ অনুসন্ধান করা এবং তা পাওয়া গেলে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলাম বাস্তবসম্মত আচরণ শিক্ষা দিয়েছে। রাসূলের গোটা জীবনই তার প্রমাণ। এজন্য অর্থনীতিবিদ ও সম্পদকে অচল জানা ও আবিষ্কৃত সম্পদের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত জুলুম ও অকৃতজ্ঞতার কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষকে এত সম্পদ ও নিয়ামত দান করা সত্ত্বেও মানুষ এসবকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সুবিচার ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসে না। সে জন্য দেখা যায় যে সৃষ্টিগতভাবে সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সামাজিকভাবে বহু লোক আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। আদেল ও শাকুর হিসেবে মানুষ তার দায়িত্ব পালন করলে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হিজর

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ.
وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ.
وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ
وَمَا اَنْتُمْ لَهٗ بِخَازِنِيْنَ.

পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আর সেখানে সুপরিমিতভাবে প্রত্যেক বস্তু উদ্গাত করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি আর তোমরা যাদের রিযিকদাতা নও, তাদের জন্যও। আমারই নিকট রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দিই; অথচ উহার ভাণ্ডার তোমাদের নিকট নেই। —সূরা হিজর ঃ ১৯-২১

প্রেক্ষিত

আয়াত চারটি মক্কায় অবতীর্ণ (পরবর্তী কালের) সূরা হাজরের অন্তর্গত—যেখানে নির্যাতন ও উৎপীড়নের চরম পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বিপন্ন অবস্থায় আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ্র রহমত আল্লাহ্র সত্যকে এবং আল কুরআনের অহি-জ্ঞানকে মানবতার উপকারার্থেই রক্ষা করবেন। যেমন তিনি করেছেন লুত সম্প্রদায়ের অসাধারণ অমানবিক সামাজিক অপরাধ সত্ত্বেও। যেমন তিনি করেছেন

www.pathagar.com

আইকা সম্প্রদায়ের এবং হিজ্‌রের সম্প্রদায়ের অসহনীয় অপকর্মের প্রেক্ষিতেও। অপকর্মের পরিণতিতে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কেই ভয়ংকর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মানুষ জাতিকে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকেই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করতে বলা হয়েছে (৮৩-৮৪ নং আয়াতে শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ ও বিকট শব্দ তাদেরকে সকাল হইতেই পাইয়া বসিল এবং তাহাদের উপার্জন তাহাদের কোন কাজেই আসিল না।') প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য ১৯-২২-এ চারটি আয়াতে মানুষ জাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্ট প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ ও শক্তিসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

কোন জাতির সুখ-সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিগত উপকরণ মানুষের নিজস্ব সৃষ্ট কিছু নয়, এ কথা গোড়াতেই মনে রাখলে সুখ-সমৃদ্ধি রচনা করতেও ভুল-ভ্রান্তি আসে না, মারাত্মক সীমালংঘনকারী অসামাজিক অপরাধের শিকারও মানুষকে হতে হয় না। সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, ধ্বংসের নিদর্শন বহনকারী অতীতের ইতিহাস অতিক্রম করে আমরা অন্য প্রজন্মের মানবজাতি এই সভ্যতা-গর্বিত একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি; তারাও যেন অতীতের মতো মারাত্মক সীমালংঘন না করে সে ব্যাপারে বর্তমানেও সতর্ক করে দেওয়ার জন্য। এ সতর্কীকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সত্যনিষ্ঠ ন্যায়নিষ্ঠ অর্থনীতির প্রকৃত রূপকে চিহ্নিত করে দেওয়ার কুরআন ভিত্তিক ধর্তব্য কথা অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতির Fundamental assumption. এ মৌল ধর্তব্য শর্তটি হলো, ইসলামী বিধানের কাঠামোতে ইসলামী অর্থনীতির মৌল উপকরণ ও বৈজ্ঞানিক শক্তির উৎস হলো সৃষ্টি কর্তা, মানুষ নয়। মানুষ এ শর্ত মেনে নিয়েই যেসব উপকরণ ও শক্তিকে নানা পণ্য ও সেবা উৎপাদনে প্রয়োগ করবে এবং উৎপন্ন জাতীয় আয় সমষ্টিকে (National output) উক্ত কাঠামোর বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলায় ন্যায়বিচার-সম্মতভাবে বন্টন করবে—যার ফলে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস রচনাও হবে ন্যায়বিচার সম্মত এবং জীবন ধারণের ভোগ বিলাসের মানও বাস্তব ক্ষেত্রে হবে ন্যায়বিচারসম্মত। এমনি ধরনের জাতীয় অর্থনীতি সংগঠন ভিত্তিগত-ভাবে প্রথমেই সম্ভব হলে পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোও প্রচলিত থাকে ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যের ভিত্তিতে। তখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির শৃঙ্খলাহীনতার প্রশ্ন আসে না এবং সামাজিক অরাজকতা ও নীতিহীনতাও প্রসারিত হতে পারে না।

www.pathagar.com

লক্ষ্য করলেই দেখা যায় কতগুলো নির্দিষ্ট নীতি নির্দেশনা। যেমন ঃ (১) প্রথমেই (১৯ নং আয়াতে) সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে পৃথিবীর প্রাকৃতিক রূপকে। পৃথিবীর মাটি ও জলাশয়কে বিস্তৃত করে দেখা হয়েছে তিন-ভাগ জল এক ভাগ স্থলের আয়তনে। পাহাড়-পর্বত দিয়ে তাকে করা হয়েছে সুস্থির, অবিরাম কম্পনশীল নয়। তার জন্যই পৃথিবীর উপরিভাগ ও মধ্যভাগের খনিজ ইত্যাদিকে মানুষ খাদ্য ও কৃষিভিত্তিক নানা ফসল ও পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে। আবহাওয়া ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীলভাবে উৎপাদনকে সুপরিকল্পিত করতে পারে এবং এ সকল কর্মপ্রয়াসের উপযোগী জ্ঞান সন্ধান, গবেষণা পরিচালনা, পুস্তক ও শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা সাহায্যে পরিকল্পনাকে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে বাস্তবায়ন করতে পারে। এ বাস্তবায়ন দিয়েই সৃষ্ট হয় একটা দেশের ভৌগোলিক সীমায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রাথমিক ভিত্তি রচনা। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই প্রাথমিক অবস্থায় উৎপন্ন হয় সব প্রকারের সৃষ্টি আর উৎপন্ন হয় প্রয়োজনীয় পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভারসাম্য নীতিতে। খনিজ জগৎ সমর্থন করে উদ্ভিদ জগতকে এবং খনিজ ও উদ্ভিদ জগৎ সমর্থন করে প্রাণীজগতকে–তাদের মধ্যে সৃষ্ট রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক। অপচয়ের কোন প্রয়োজন নেই সে সম্পর্কের বিধিতে। একটির অবশিষ্টকে করা হয় অন্যটির খাদ্য এবং একটির খাদ্য অন্যটির অবশিষ্ট–এই হলো বৈজ্ঞানিক বিধি। বিশ্বের অস্তিত্বের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে এই বিধির পরিচালনায়। সৃষ্টারই সৃষ্ট নিয়মে।

২. দ্বিতীয় ধাপে (২০ নং আয়াতে) আবার আরো স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, উপরোক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবস্থা হলো সকল সৃষ্ট প্রাণী-জগতের জীবন ধারণের উপায় হিসেবে–আমরা মানুষ জাতির জন্য, আবার যেসব প্রাণীর জীবন ধারণের দায়িত্ব মানুষের ওপর নয়, সেসব প্রাণীর জন্যও। অনেক সৃষ্ট রয়েছে, মানুষ এখনো দুর্গম স্থানে অভিযান করে, দেখতে বা জানতেও পারেনি। স্রষ্টার জীবিকা সরবরাহের সার্বজনীন বিধিতে সেসব সৃষ্ট প্রাণীর জন্যও রয়েছে জীবিকা। এমনিভাবে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সার্বজনীনভাবে রয়েছে সৃষ্টিকে রক্ষার সুপরিকল্পিত বিশ্ব পরিবেশ।

৩. তৃতীয় ধাপে বলা হচ্ছে, সৃষ্টির এমন কিছু নেই যার উৎস (অফুরন্ত) ভাণ্ডার স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণে নেই (আয়াত নং ২১); অথচ সেসব উৎস আর ভাণ্ডার থেকেই স্রষ্টা পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেন প্রয়োজনীয় মাত্রায় ও নির্ধারণ যোগ্য পরিমাণে। দৃশ্য ও অদৃশ্য সব রকমের উপকরণের ও উপাদানের অস্তিত্ব মানুষের দৃষ্টিতে বা উপলব্ধিতে

www.pathagar.com

ধরা পড়ে না। বৈজ্ঞানিকদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধানেও সর্বদা চিহ্নিত হয় না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিপুণ অনুসন্ধানের প্রযুক্তি ব্যবহারেও কিছু কিছু ধরা পড়ে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উদ্ভাবন বলে চিহ্নিত হয়, যেমন আজকাল আনবিক থেকে পারমানবিক এবং তারো উপরের স্তরের উদ্ভাবনের কথা শুনা যায়। সার্বিক উৎস ও ভাণ্ডারের অনেক কিছু এখনো মনুষের অজানা বা অজ্ঞেয় হয়ে বিদ্যমান আছে। তাই তো বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের জগতে এখনো চ্যালেঞ্জের অভাব নেই। বিশ্বের সর্বত্র উন্নত থেকে উন্নততর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান অব্যাহতই রয়েছে।

৪. অতঃপর একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে (২২ নং আয়াতে) সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিভাবে স্রষ্টার বিধি অনুসারেই সুফল প্রসবের উৎস বায়ুকে করা হয় নিম্নগামী, যার ফলে আকাশ থেকে মেঘ সৃষ্ট হয়ে অবতরণ করে বৃষ্টি বর্ষণধারা। আর এ প্রক্রিয়া থেকেই পৃথিবীর মানুষ ও সৃষ্ট জীবকে সরবরাহ করা হয় পানি সরবরাহের ও সংরক্ষণের উৎস। আর পানিই তো জীবন। এমনিভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা না করা হলে কিভাবে সম্ভব হতো মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাণরক্ষা ?

উপরোক্ত চারটি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে স্রষ্টার মানুষ ও প্রাণীজগতসহ অন্যান্য জগতকে লালন-পালন ব্যবস্থার বিধানকে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে আরো একটি মৌল নীতির কথা। সে হলো, সারা বিশ্বের কল্যাণমুখী ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করার ভিত্তি হিসেবে প্রয়োজন বিশ্ব সম্পদ পরিস্থিতিতে ভারসাম্য রক্ষার, আর বিশ্ব পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষার। মানুষের লোভ-লালসা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাহীন অপহরণ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির অহংকারে সমৃদ্ধি নির্মাণের নামে পানির উৎসের ধ্বংস ও দূষণ, বায়ু দূষণ, প্রাকৃতিক উপকরণের সীমাহীন আহরণ, শিল্পায়িতকরণ ও উচ্ছিষ্ট বর্জন দিয়ে আজ সৃষ্ট হয়েছে বিশ্বের পরিবেশে মানবতার ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তিকে সমূলে ধ্বংস করার নরক-ভীতি। স্রষ্টার সৃষ্টিবিধান উপেক্ষা করার পরিণতিতে।

- অধ্যাপক রায়হান শরীফ

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নাহল

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ. وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ. وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ.

তিনি তোমাদের জন্য জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য খাদ্য ও পোশাক রয়েছে। নানাবিধ অন্যান্য উপকারও এতে রয়েছে। তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য রয়েছে, যখন সকালবেলা তোমরা সেগুলোকে বিচরণের জন্য পাঠাও এবং যখন সন্ধ্যায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আন উহারা তোমাদের ভার-বোঝা বহন করে এমন স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌঁছতে পার না। আল্লাহ্ই বড় অনুগ্রহসম্পন্ন ও মেহেরবান। তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভ পয়দা করেছেন যার উপর তোমরা সওয়ার হও এবং উহারা তোমাদের জীবনে উজ্জ্বল হয়। তিনি আরো বহু জিনিস তোমাদের কল্যাণে পয়দা করেন। যে সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানা নেই। — সূরা নাহল ঃ ৫-৮

www.pathagar.com

আয়াতসমূহের সাধারণ তাৎপর্য

সূরা নাহ্‌লের শুরু হতে তাওহীদের প্রমাণ পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মহান পবিত্র এবং শির্‌ক হতে মুক্ত। তিনি যাকে চান নবী বানান এবং তার নিকট ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন। এ বাণী সহ যে "তোমরা সকল লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক কর এবং কেবল আল্লাহ্‌কেই মান্য কর।" আল্লাহ্ পাক আসমান-যমীনকে সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ক্রমে সামান্য ফোঁটা হতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র অমান্যকারী হওয়া সাজে না।

এরপর জন্তু জানোয়ারের এবং তার মধ্যে মানুষের জন্য যে উপকার রয়েছে তার আলোচনা (আয়াত ৫-৮-এ) দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক জন্তু জানোয়ার পয়দা করেছেন তার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে পোশাক ও খাদ্য। জন্তুর মধ্যে আরো নানাবিধ ফায়দা নিহিত রয়েছে। অনেক জন্তু ভার বহন করে থাকে, অনেক জন্তু দুর্গম স্থানে যাতায়াতে সহায়তা করে। অনেক জন্তুর সৌন্দর্যও মানুষকে মোহিত করে। আলোচ্য আয়াতসমূহের পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাক তওহীদের আরো প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন। তিনি আকাশমণ্ডল হতে বৃষ্টি বর্ষণ করান, যার দ্বারা মানুষ পানি পান করে তৃপ্ত হয়। এ বৃষ্টির সাহায্যে যে ফসল, তৃণ হয় তার দ্বারা মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার খাদ্য পায়। তিনি যে নানা রকম ফসল উৎপাদন করেন, সূর্য ও চন্দ্রকে যেভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন, যেভাবে তিনি নদী-সমুদ্রকে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং যেভাবে তিনি পর্বতসমূহ পৃথিবীর বুকে স্থাপন করেছেন তাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। মানুষ এ সবের মধ্যে এক মহাপরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনা লক্ষ্য করে সেই পরিকল্পনাকারী স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আয়াত ক'টিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মানুষের উপকারী জন্তুগুলোর অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রথমেই লক্ষণীয় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কতকগুলো জন্তু থেকে মানুষের জীবন ধারণ ও জীবনের ক্রমাগত উন্নতির অবলম্বন উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। খাদ্য হিসেবে পাওয়া যায় সুস্বাদু মাংস আর দুগ্ধ। পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরীর উপকরণ হিসেবে পাওয়া যায় জন্তুর গায়ের পশম। জন্তুর চর্ম থেকে তৈরী হয় শৈত্যের পোশাক, পানি

www.pathagar.com

বহন করার মশক আর তাঁবু তৈরী করার ভিন্ন ভিন্ন অংশ। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশে যান্ত্রিক যুগের পূর্বে প্রকৃতির সঙ্গেই তার ছিল নিকট সম্পর্ক। মানুষ বন্য পশুকে বশ করেছে এবং তার জীবনের সাহায্যকারী হিসেবে লালন-পালন করেছে। বন্য অশ্ব, বন্য গবাদি পশু মেষ, হরিণ ইত্যাদি আহরণ করে অর্থনৈতিক কাজে সাহায্য করার সম্পদে পরিণত করেছে। যে অঞ্চলে এসব উপকারী জন্তুর উপযোগী বনজঙ্গল ও পরিবেশ সৃষ্টি ছিল, সে অঞ্চলেই কৃষি খামারের উন্নয়নের সঙ্গে পশু পালন ও তার উন্নয়ন কাজ প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের আয়ত্ত হয়েছে। বিশেষ করে বনবহুল ও জনবিরল ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোতে এমনি বিবর্তন সহজ আর ফলপ্রসূ হয়েছে। উৎপাদনশীলতায় বর্তমান কালেও উৎকর্ষ ফলপ্রসূতার ভিন্ন প্রাকৃতিক ভিত্তিকে অবলম্বন করে প্রতিযোগিতাশীল সমৃদ্ধি অর্জন করা যায়। খামার ও পশুপালনের উন্নত উৎপাদন তাই বর্তমান বিশ্বেও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ইত্যাদি অঞ্চলের দুগ্ধ, মাখন ও ঘি জাতীয় খাদ্য পৃথিবীর সর্বত্রই বাজার লাভ করছে।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করেই জন্তু ছিল মানুষের এবং নানা প্রকার মালসম্পদ স্থানান্তর করার নিরাপদ অবলম্বন। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রগতি ও প্রসার মাল-সম্পদের স্থানান্তর ও দূর-দূরান্তে বিনিময় করার ওপর এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার ওপর নির্ভরশীল। হাতী, উট, অশ্ব, মহিষ, বলদ ইত্যাদিই সে কাজে মানুষকে দিয়েছে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। বর্তমান কালেও যে সব ব্যাপক অঞ্চলে যান্ত্রিক যানবাহন বা জলপথের প্রাধান্য নেই, সে সব অঞ্চলে সব দেশেই পশু বহন করে অথবা পশু যানবাহন টেনে নেয়। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের বিরাট অংশের পরিবহন কাজ করছে পশু। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক যোগাযোগ সৃষ্টি পশুচালিত যানবাহনে চলছে। এ হলো অর্থনীতির অবকাঠামো প্রকৃতির অবদান।

তৃতীয়, প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই নিযুক্ত রয়েছে পশু গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র। বলদ ও মহিষই এক্ষেত্রে পুঁজিযন্ত্রের মতো সাহায্য করছে–কৃষির খামারে মাটি তৈরী কাজে, লাঙ্গল, মই টানা কাজে, সেচের পানি উত্তোলনে, শস্য মাড়াই কাজে। সুস্থ বলিষ্ঠ বলদ ও মহিষ না থাকলে কৃষিকাজে এমনি পশু প্রয়োগের ভুমিকাও হয় দুর্বল, ফসলের উৎপাদন হয় কম, চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থাতে আসে দুর্ভাগ্য। সুতরাং পশুর খাদ্য ও পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থাও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই মানুষকে করতে হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থত, কৃষি খামার, বনজ সম্পদ ও পশুপালনের পরিবেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যেমন পরিকল্পনা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আইনেরই অন্তর্গত, তেমনি আবার এ পরিবেশের মানবিক জীবনে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এ পরিবেশে প্রকৃতির আকাশ-বাতাস, ফুলফল, পাখির কাকলি মানুষের মনকে দেয় বিশুদ্ধতা আর বিশুদ্ধ আনন্দ। অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে পশুপালনের কাজের মধ্যেও মানুষ পায় শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ--পশুর দলকে প্রত্যূষে মাঠের দিকে পরিচালনা করার সময়ে আবার সন্ধ্যার ছায়াঘেরা স্নিগ্ধতায় পশুর দলকে ফিরে আনার সময়ে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের এবং জীবিকা আহরণের সংগ্রামের মধ্যেই সরল সুন্দর সততার অনুরূপ গ্রামবাসীর মনে জাগে শিল্পীর তৃপ্তি এবং তার নিজের হাতের সৃষ্টির মাধুর্য।

- শাহ্‌ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

[সূরা নাহলও মক্কায় অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর চরম নিপীড়ন কালের এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রথম বাণীই হলো ঃ আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে (তবু যারা বিশ্বাসী তারা যেন সে শাস্তিকে দ্রুত কামনা না করে। কারণ এখনো মানুষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার সময় আছে।) সে প্রেক্ষিতেই সূরা নাহলের ১০ থেকে ১৪ নং আয়াতে সূরা ইবরাহীমের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াতের মতো আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে একটু বেশী বিস্তারিতভাবে]

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَ النَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. وَسَخَّرَلَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ. وَمَا ذَرَاَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ. وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ (পানি সরবরাহ) থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। এ পানি দ্বারা (তিনিই) তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল–যয়তুন, খেজুর, আঙুর ও সব রকম ফলের ফসল। নিশ্চয় এতে

www.pathagar.com

চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে। নক্ষত্র-তারকারা তাঁরই বিধানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। তোমাদের জন্য (তিনি) পৃথিবীতে যে সকল বিভিন্ন ও, বিচিত্র বর্ণ ও স্বাদের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস বা মৎস্য খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলংকার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে-যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র করুণা অন্বেষণ করো এবং তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করো।

–সূরা নাহ্‌ল ঃ ১০-১৪

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মর্ম অনুসরণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, তওহীদ তত্ত্বের যুক্তি এবং নিদর্শন বর্ণনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই মানুষের কল্যাণের অপূর্ব সম্পদ ও শক্তিকে সরবরাহ করে রেখেছেন–যে সবকে ভিত্তি করে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে তোলা যায়। এ সমৃদ্ধি রচনা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামাজিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে মানুষের উদ্যোগেই সম্ভব। বিশ্বের সভ্যতার বিকাশ, তার ক্রমোন্নতি, শিল্প-বিজ্ঞানের বিপ্লব ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সেই তওহীদ তত্ত্বের যুক্তিও নিদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক জড় সমৃদ্ধির দিকটাই মানুষের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য। আত্মার বিশুদ্ধতাকে এবং আত্মার সাধনাকে স্রষ্টার কথা আর সৃষ্টির অর্থনৈতিক মৌল সম্পদ মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কথার সঙ্গে যথাযথ সংশ্লিষ্ট রাখার দায়িত্ব ব্যাপারেই মানুষের গোষ্ঠিগুলো ভুল করে। সে ভুলের ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে স্রষ্টাকে অস্বীকার করারও ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সেজন্যই অবিশ্বাসী কুরায়শদের ওহী মাধ্যমে এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.)-র প্রদর্শনে ভুল সংশোধনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। সূরা ইবরাহীমের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াতের চেয়ে নাহলের আলোচ্য আয়াতগুলোতে মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সৃষ্টিকে অধিকতর স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করা হয়েছে যেমন ঃ

www.pathagar.com

সূরা ইবরাহীমের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ	সূরা নাহলের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ
(১) পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন ; (১) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন ; (৩) তার সাহায্যে রিযিক পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন।	(১) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন; (২) এই পানি থেকে তোমরা পান কর; (৩) এ (পানি সরবরাহ) থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় ; (৪) তোমরা সে চারণক্ষেত্রে পশু চারণ কর ; (৫) এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল-সম্পদ---যয়তুন, খেজুর, আঙুর ও সব রকমের ফল ; (৬) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।
উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (১) সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, তারা অবিরত নিয়মানুবর্তী হয়ে চলেছে ; (২) রাত্রি ও দিনকেও তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন।	উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (১) তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে ; (২) নক্ষত্র-তারকারা তাঁরই বিধানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে ; (৩) পৃথিবীতে যে সকল বিভিন্ন ও বিচিত্র বর্ণ ও স্বাদের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের জন্য।

www.pathagar.com

উল্লেখ করা হয়েছে ঃ	উল্লেখ করা হয়েছে ঃ
(১) নৌযানকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও করায়ত্ত করেছেন, তাঁর আদেশে তা নদী সমুদ্রে চলাচল করবে ;	(১) কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্র-কে যা থেকে তোমরা মৎস্যের তাজা মাংস (প্রোটিন) খেতে পার ;
(২) নদ-নদীকেও অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন।	(২) (সমুদ্র) থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলংকার (মোতি জওহর) ;
	(৩) (সমুদ্র পথে) জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে ;
	(৪) যাতে তোমরা আল্লাহ্র করুণা অন্বেষণ কর ;
	(৫) এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্বীকার কর।

এ ভাবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, সূরা নাহ্লের আয়াতে শুধু সৃষ্ট সম্পদকে অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত করে জীবিকা অর্জন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রয়োগের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত দেওয়া হয়নি। বিশিষ্ট নানা দিকের (কৃষি, পশুচারণ সমুদ্র সম্পদ ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ফসলের) উৎপাদন এবং তাকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রাখার অবস্থানের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ সব অবলম্বন করে স্রষ্টার প্রদত্ত মানসিক গুণের (প্রতিভা, উদ্ভাবন শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা) সাহায্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা যে স্রষ্টার পরিকল্পিত বিধান অনুসারে মানুষের মৌল কল্যাণ লক্ষ্যেই হওয়া প্রয়োজন, সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। নিদর্শনকে অধ্যয়ন-অনুশীলন করেই শুধু সে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। সুতরাং সুন্দর যুক্তি উপস্থাপনার সঙ্গে চিন্তাশীল হওয়ার দিকে চিন্তা-ভাবনা করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে বলা হয়েছে। তা হলেই অর্থনৈতিক প্রয়াস ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অনুসরণ হবে আল্লাহ্র করুণা অন্বেষণ।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

www.pathagar.com

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

তোমরা যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

–সুরা নাহ্‌ল ঃ ১৮

তাফসীরকারগণের মতামত

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত এবং জগৎ সৃষ্টির কথা বিস্তারিত উল্লেখ করার পর এ সব নিয়ামত বিস্তারিত বর্ণনা করার কারণ অর্থাৎ তওহীদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা সম্বন্ধে যে সব নিয়ামত উল্লেখ করেছেন। নিয়ামত এতটুকুতেই শেষ নয়, বরং তা এত অজস্র যে যদি কেউ আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা করে তা গণনা করতে পারবে না। কিন্তু মুশরিকরা এর শোকর ও কদর করে না। কিন্তু আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। কেউ শিরক থেকে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং না করলে জীবদ্দশায় সব নিয়ামত বন্ধ হয়ে যায় না। (মা'আরেফুল কোরআন)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এই আয়াতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য গভীর। আল্লাহ্ তা'আলা এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করে মানুষের রিযিক-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর তাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না। এই সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ বিভিন্ন উপকরণের সহায়তায় সমাজের চাহিদা উপযোগী প্রস্তুত করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কথা আধুনিক অর্থনীতি ও সম্পর্কিত বিষয়াদি বলে সে সব ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। আধুনিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি উৎপাদনের উপকরণাদি এই সব উপকরণের সমন্বয়ে উৎপাদন হয়। কিছু কিছু লোকের (exogenous variable) কথা বলা হয়। এই সব ঘটনার ফলে উৎপাদন ব্যাহত/ত্বরান্বিত হয়। এইসব বহির্ভূত লোকদের

www.pathagar.com

সম্বন্ধে কোন ধারণা এই আধুনিক তত্ত্বে নেই। তার ফলে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে উৎপাদন সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গঠিত হয়। এবং psychological অনিশ্চয়তার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। ইসলামে এইসব "বহির্ভূত চালকের" তত্ত্ব রয়েছে। এ সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং আল্লাহ্ সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন মানুষের কাজের জন্য। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দক্ষতা বাড়ে।

এ ছাড়া যেহেতু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের গণনা শেষ করা যায় না, সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার সেসব অনুগ্রহের অনুসন্ধান করে তাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়াস জারি থাকে। এর ফলে অর্থনীতির ক্রমাগত অগ্রগতি ঘটে থাকে। এই দর্শন আধুনিক দর্শনের সাথে মেলে না। আধুনিক দর্শনে বলা হয়ে থাকে যে, সম্পদ ক্রমাগত শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে এ বিষয়ে ইসলামের দর্শন ভিন্ন। ইসলামের দর্শন অনুযায়ী এ কথা বলা যাবে না যে, অর্থনৈতিক সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানের বিশ্বের অর্থনীতিতে যে নৈরাশ্যবাদ বিরাজ করছে ইসলামের এ দর্শন গ্রহণ করলে বাড়িয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে কিন্তু সে জ্ঞান মানুষকে আত্মত্যাগ শিখায় না, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শিখায় না।

যাঁরা সমাজে আয় ও বন্টনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরা অধুনা স্বীকার করেছেন উপরোক্ত গুণাবলী ছাড়া সম্পদের সুষম বন্টন সম্ভব নয়। পরম করুণাময় কুরআন ও হাদীসের মারফত যে জ্ঞান ও হিকমত দিয়েছেন সেই জ্ঞান ও হিকমত ব্যবহার দ্বারা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

- ডাঃ সালাহ্ উদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ. وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ
مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
لِّلشّٰرِبِيْنَ. وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا
وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ. وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى
النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُوْنَ. ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً
يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ
فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ وَمِنْكُمْ
مَنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ. وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا
الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَادِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ
سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ
اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদদ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। তোমাদের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার জায়গা আছে।

www.pathagar.com

আমি তোমাদেরকে পানি দ্বারাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ, (যা) পানকারীদের জন্য উপাদেয়। এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙুর রস থেকে তোমরা মদ ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক-এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আপনার প্রতিপালক মধু মক্ষিকাকে আদেশ দিলেন, পর্বতগাত্রে, বৃক্ষে এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী কর; অতঃপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন প্রতিপালকের উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রকমের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে। ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকে না। আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ তা'আলা জীবনোপায়ে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন! অতএব, তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহ্র নি'য়ামতকে অস্বীকার করে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং যুগল থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে ?

–সূরা নাহল ঃ ৬৫-৭২

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) তফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআনে উল্লেখ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মৃতপ্রায় শুষ্ক ও দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর পানি বর্ষণের মাধ্যমে সবুজ সতেজ করেন (এ ভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা জীবন্ত সমস্ত প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন)। আল্লাহ্র এই নি'য়ামতের মধ্যে মনোযোগী (সচেতন) মানুষদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এ ছাড়াও চতুষ্পদ জন্তুর নিদর্শনের মধ্যেও চিন্তা-ভাবনা করার বিষয় বিদ্যমান আছে। কারণ তাদের পেট থেকে উপাদেয় সুষম খাদ্য দুধ আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য বের করে আনেন এবং এ ছাড়া খেজুর ও আঙুরের ফলসমূহ থেকে যেমন নেশাকর দ্রব্যাদি তেমনি উত্তম খাদ্য সামগ্রীও (যেমন শুকনো খুর্মা, কিশমিশ,

www.pathagar.com

শরবত ও শিকা ইত্যাদি) তৈরী করা যায়। নিঃসন্দেহে এতে সেসব লোকদের জন্য বড় দলীল রয়েছে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

এ বিষয়টিও চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনার যোগ্য যে, বিশ্ব প্রতিপালক মৌমাছির মনে এ কথা ফেলে দেন যেন তারা পাহাড়সমূহে গৃহ (অর্থাৎ মধুর চাক) তৈরী করে এবং বৃক্ষসমূহেও এবং লোকেরা যে দালান-কোঠা নির্মাণ করে তাতেও চাক বানিয়ে নেয়। সে মতে মৌমাছি এ সব স্থানেই মধুচক্র তৈরী করে। অতঃপর খোদায়ী নির্দেশ মত বিভিন্ন প্রকার ফল-ফুল থেকে নির্যাস চুষে নেয়। রস চুষে যখন চক্রের দিকে ফিরে আসে তখন তার পেট থেকে এক প্রকার পানীয় (মধু) নির্গত হয় যার রং বিভিন্ন। এতেও তাদের জন্য তওহীদের বড় প্রমাণ আছে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। এ স্থলে শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয় বরং আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে বুঝিয়ে দেওয়া, যা অন্য কেউ বুঝতে না পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষদের নিজেদের অবস্থা চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে উপদেশ দেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বয়স শেষ হয়ে গেলে মৃত্যুর ফেরেশ্তা তোমাদের জান কব্জ করেন। বয়সের দিক থেকে অনেকের বার্ধক্য এত অধিক হয় যে, তাদের কর্মশক্তি, চলৎ শক্তি এবং জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যেন একদম শিশুর মত হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকটি উপযোগিতা জেনে নেন এবং শক্তিবলে তদ্রূপই করে দেন। তাই জীবন ও মরণের অবস্থা বিভিন্ন রূপ করে দিয়েছে (এটিও তওহীদের এক প্রমাণ)।

৭১ নং আয়াতের তাফসীরের সারসংক্ষেপে মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন এবং (তওহীদের প্রমাণের সাথে শিরকের দোষ এক প্রকার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে জীবিকায় (অর্থাৎ জীবিকার ক্ষেত্রে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (উদাহরণত একজনকে ধনী এবং ক্রীতদাসের প্রভু করেছেন, যার হাত দিয়ে ক্রীতদাসও রিযিক পায়-এবং অন্যজনকে ক্রীতদাস করেছেন। সে প্রভুর হাত দিয়েই রিযিক পায়)। অতএব, যাদেরকে (জীবিকায়) শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, (যে তাদের কাছে ধন, ক্রীতদাস সবই আছে) তারা স্বীয় অংশের ধন ক্রীতদাসকে এভাবে কখনও দেয় না যে তারা (ক্রীতদাস ও প্রভু) সমান হয়ে যায়। (কেননা যদি তাকে দাস বর্তমান রেখে ধন দেয় তবে দাস ধনের মালিকই হবে না; বরং দাতাই পূর্ববৎ মালিক থাকবে। পক্ষান্তরে মুক্ত করার পর দিলে সমতা সম্ভবপর; কিন্তু সে তখন দাস থাকবে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, সমতা

www.pathagar.com

ও দাসত্ব এক সাথে সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদি যখন মুশ্‌রিকদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন দাস, তখন দাস হওয়া সত্ত্বেও উপাস্য তার আল্লাহ্র সমতুল্য কিভাবে হবে ? এতে শিরকের চরম দোষ বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তাদের দাস রিযিকে তাদের অংশীদার হতে পারে না তখন আল্লাহ্ তা'আলার দাস উপাস্যতায় তার অংশীদার হতে পারে কি ?) এর পরও (অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তু জানার পরও) কি আল্লাহ্র নিয়ামত অস্বীকার করে।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ আয়াতের ব্যাখ্যায় সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে এবং কুদরতের প্রমাণাদি ও বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতের মধ্য থেকে একটি বড় নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণ হচ্ছে মানব জাতির ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ তাদের জাতি ও শ্রেণী থেকে) স্ত্রী করেছেন এবং স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন (কারণ এটা হচ্ছে মানবজাতির শ্রেনীগত স্থায়ী এবং কে ভাল ভাল বস্তু ও পানীয় ক্ষেতে ও পান করতে দিয়েছেন) তারা কি এতসব দেখার পরও ঈমান আনবে না ?

অন্যান্য তাফসীরের সারসংক্ষেপ

সূরা নাহলের উক্ত আয়াতগুলোর তাফসীর করতে গিয়ে ইব্‌ন কাসীর, তাবারী, মাওলানা মওদূদী ও মুফতী মুহাম্মদ শফী তাঁদের স্ব স্ব তাফসীর গ্রন্থে প্রায় অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। উপরে আমরা মুফতী মুহাম্মদ শফী-র তাফসীরের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছি। অন্যদের তাফসীরে ভাষাগত পার্থক্য ও উপস্থাপনার পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলেও তাফসীরের সার-সংক্ষেপ ও তত্ত্বগত পরিবেশন মূলত একই ধাঁচের। বিশেষ করে মনিব ও ক্রীতদাসদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার ব্যাপারটির তাফসীর করতে তাঁদের কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন নি। তৎকালীন ক্রীতদাস প্রথা মানবিক মূল্যবোধ রক্ষিত ছিল। মনিব ক্রীতদাসদের সাথে যে আচরণ করত এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে যে বিস্তর বৈষম্য বিদ্যমান ছিল, তার আলোকে উক্ত দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে এ পুরো আয়াতের পরবর্তী অংশও এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য প্রণিধানযোগ্য।

আইয়ামে জাহিলিয়াতের শিরক প্রথার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি পেশ করা হয়েছে, ক্রীতদাস ও মনিবের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কিত যুক্তিটি তন্মধ্যে অধিক বলিষ্ঠ। সে যুগের মানুষের মন-মগজে ক্রীতদাসকে মনিবের সমপর্যায়ে মনে করা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। আল্লাহ্র সাথে তাঁর সৃষ্টিকে উপাস্য বানিয়ে সমপর্যায়ভুক্ত করার যে প্রথা সেটাও অযৌক্তিক। তওহীদের সারমর্ম বোঝানোর জন্য এ দৃষ্টান্ত সমকালীন সমাজে ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখেছিল।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ পাকের তওহীদ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ যে সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা মানব ও জীবজগতের জন্য ব্যবস্থা করেছেন তাই বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পূর্ণভাবে অবহিত এবং সে প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যবস্থাপনাও তিনি তাঁর সৃষ্টির ভেতর দিয়ে করে রেখেছেন। এ ব্যবস্থাপনা ৩টি উদ্দেশ্য/লক্ষ্যকে সমর্থন দিচ্ছে।

১. প্রথমত, ইহা আল্লাহ্ পাকের একত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্বের নিদর্শন।

২. দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তাঁর ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য যে রিযিকের বন্দোবস্ত করেছেন তার পরিচয় দান।

৩. মানব জাতির স্থায়িত্বের জন্য প্রাকৃতিক বিধান প্রদান। আল্লাহ্‌র এ ব্যবস্থাপনার কথা কুরআনুল করীমের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। কুরআনুল করীমের এ সব বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য রিযিক প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। রিযিক সরবরাহের জন্য সমস্ত উপাদান পৃথিবীতে ছড়ানো রয়েছে। কতিপয় উপাদান মানুষ কর্তৃক সরাসরি ব্যবহৃত হয় যেমন দুগ্ধ ও মধু জাতীয় পানীয়, মাছ, মাংস জাতীয় খাদ্য। জীবন ধারণের জন্য আরও প্রয়োজন হয় বস্ত্র, ঔষধ, গৃহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। তা ছাড়া মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মিটে গেলে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় বিলাসদ্রব্যের। তাই দেখা যায়-যে সমস্ত দ্রব্য মানুষ ব্যবহার করে সেগুলো কোন-না-কোনভাবে প্রক্রিয়াজাত করে নিতে হয়। রিযিক উৎপাদনে মানবীয় ভূমিকা মূলত আসে এখানেই। এই processing-ও নির্ভর করে Technology-র মানের উপর অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট কারিগরী উন্নয়নের পরিবেশে মানুষ প্রয়োজন মাফিক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট উপাদানসমূহ ব্যবহার করে নিজেদের জন্য ভোগ্য পণ্য consumption goods তৈরী করে। পাশ্চাত্য অর্তনীতির সঙ্গে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এখানে। capital-এর সংজ্ঞায় আধুনিক অর্থনীতি বলা হয় produced means of production। এক্ষেত্রে produced means বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করা হয় না অর্থাৎ এই produced means-এর অধিকার তৈরী করতে যে original factor endowment প্রয়োজন, তার কথা বিবেচনা করা হয় না। তেমনিভাবে ভূমি একটা উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হলেও কিভাবে ভূমি পাওয়া গেল, তার কোন সূত্র আধুনিক অর্থনীতিতে অনুল্লিখিত। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমকে অন্যতম উপাদান এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একমাত্র। মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ সকল উপাদানের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও

www.pathagar.com

সরবরাহকারী সম্পর্কে কোন কথা আধুনিক অর্থনীতিতে নেই। আধুনিক বীমা নীতিতে কিন্তু Act of God কথাটি বহুল প্রচলিত। আর সেক্ষেত্রে ধ্বংসলীলা বোঝাতেই এই phrase টি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড, ভূ-কম্পন ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য বীমা বা নিরাপত্তা প্রয়োজন। আর ঐ সমস্ত সংগঠিতব্য ধ্বংসলীলাকে Act of God বলে বিধিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু সৃষ্টিতে Act of God-এর কোন প্রসঙ্গ নেই। বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

অতঃপর উৎপাদনে শ্রম সম্পদের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন–কাউকে বেশী বয়স দেন। এত বেশী যে সে চলৎ শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং এমনকি জ্ঞানও সঠিক পর্যায়ে থাকে না। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শ্রমশক্তি একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। অতঃপর যখন শ্রমশক্তি লোপ পায় তখন উক্ত শ্রমিকের শ্রমদাতার ভরণ-পোষণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর অন্যতম অনিবার্য চাহিদা হচ্ছে শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলীতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং পেনশন স্কীম বলবৎ রাখতে হবে। বিষয়টির সঙ্গে আরও একটি সংশ্লিষ্ট বিষয় হল শ্রমিকের যোগ্যতা। এক-একজনের যোগ্যতা এক-এক রকম। তার ফলে জীবিকা লাভের তারতম্যও অনেকটা অনিবার্য পড়ে। আলোচ্য আয়াতে দেখা যায় জীবিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং এটা আল্লাহ্র অপর রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিত এবং মানব জাতির জন্য প্রয়োজনীয়ও। যদি এরূপ না হয় এবং ধনদৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায় (যেমন আহ্মক কমুনিস্টরা বলে বা ভাবে) তবে বিশ্ব ব্যবস্থায় ত্রুটি অনর্থ ও ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত যে, যে দিন থেকে মানব জাতি সমাজ তথা জীবন শুরু করেছে কোন যুগে ও সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়ে যায়নি এবং তা হতেও পারে না। যদি কোথাও জোর জবর-দস্তি এরূপ সাম্য কায়েম করা হয়, তা কিছুদিনের মধ্যে বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। মোট কথা আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা একত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্বের নিদর্শন হিসেবে উল্লিখিত বিষয়াবলীর মধ্যে অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়-গুলোও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর সেগুলো হল ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতিপালক হিসেবে মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য তিনি পানি/বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী, শিল্প কারখানার জন্য কাঁচামাল ইত্যাদি উৎপাদনের এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু রেখেছেন আবহমানকাল ধরে।

www.pathagar.com

জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমেও তিনি উপরোক্ত ব্যবস্থার আঞ্জাম দেন। প্রসঙ্গত নিদর্শন হিসেবে তিনি চতুষ্পদ জন্তুর উদর থেকে দুগ্ধ এবং মধু মক্ষিকা কর্তৃক অত্যন্ত কৌশল নৈপুণ্যে ভরা নির্মিত চাক থেকে মধুর নিঃস্বরণের এক অপূর্ব সৃষ্টি নৈপুণ্যের উল্লেখ করেছেন।

উৎপাদনশীল উপাদান হিসেবে কাঁচামালের উপর তিনি শ্রম সম্পাদনের উৎপাদন ও ক্রমবৃদ্ধি তার দৈহিক ও মানবিক যোগ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কিত প্রাকৃতিক বিধানের উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর মানব জীবনের সচল পদযাত্রা ও অগ্রযাত্রার জন্য প্রাকৃতিক বিধানের অঙ্গ হিসেবে ধন-সম্পদ বন্টনে বৈষম্য করেছেন। এ বৈষম্য এমন প্রয়োজনীয় যে, তা না থাকলে জগত সংসার অচল হয়ে পড়বে। আবার এ বৈষম্য যেন অমানবিক পর্যায়ে না পৌঁছে তার জন্য তাঁর প্রদত্ত সংবিধানের আওতায় compensatory ব্যবস্থাও করেছেন।

মানব সাধারণের দায়িত্ব হলো এসব বিধি-বিধান অনুধাবন করা এবং তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলা।

- মোঃ জহুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَائِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি নির্লজ্জতা, অসৎ কাজ ও অবাধ্যতা নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

– সূরা নাহল ঃ ৯০

তাফসীরভিত্তিক প্রেক্ষিত আলোচনা

সূরা নাহ্লও রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মক্কী জীবনকালে চরম উৎপীড়ন ও নিপীড়নের পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে (পূর্ববর্তী ছয়টি অন্য সূরার মতো) তাফসীরকারগণ মনে করেন। এ সূরাটিতে কাফির কুরায়শদের আল-কুরআনের সত্য ও সঠিক পথে আনয়ন করার জন্য আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য এবং মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে অতি সুন্দরভাবে নানা নিদর্শনের উল্লেখ আর বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সীমালংঘনকারী হয়ে অসত্যের অন্ধকার থেকে সত্যের পথপ্রদর্শক ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে সহিংস বিরোধিতা করার পরিণতিরও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অংশে (১-২৫ আয়াতে) প্রকাশ করা হয়েছে সৃষ্টির রূপ দিয়েই সৃষ্টিকর্তার অতুলনীয় মহিমাকে। আর মানুষকে প্রকৃতির ওপরে প্রভুত্ব দান সাহায্যে তওহীদ তত্ত্ব এবং আল্লাহ্র প্রেরিত সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে (২৬-৫০ আয়াতে) মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় এবং সত্যের পথ প্রদর্শকদের শিক্ষা গ্রহণ না করে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার পরিণতির ইতিহাসের দিকে পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে (৫১-৮৩ নং আয়াতে) স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্র সৃষ্টি সাহায্যে মানুষকে অসীম করুণা ও কল্যাণদানের কথা এবং তা সত্ত্বেও মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা। চতুর্থ অংশে (৮৪-১০০ নং আয়াতে) দৃষ্টি আকর্ষণ তরা হয়েছে যে, পরিণামে মানুষকে বিশ্বাস ও কৃতকর্মের ভিত্তিতে বিচার করা হবে এবং সত্যের বার্তাবাহক নবী ও রাসূলদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে স্রষ্টার আদালতে।

www.pathagar.com

পরিশেষে (১০১-১২৮নং আয়াতে) সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে আল কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও সুসংবাদ বর্ণনার মাধ্যমে। ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টির উত্তম ও বৈধ উপকরণ সাহায্যে জীবনের সুখশান্তি অর্জন করতে বলা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলা হয়েছে ধৈর্যের সঙ্গে হতাশা বর্জন করে। কারণ, আল্লাহ্ তাঁদেরই সঙ্গে যাঁরা তাকওয়ার অনুসরণ করে এবং 'ইহ্সান' নীতিতে কর্ম ও আচরণ করে।

আলোচ্য আয়াতটির বিশেষ গুরুত্ব ও কতিপয় শব্দের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা

আলোচ্য আয়াতটিতে একটি ব্যপকধর্মী দিক-নির্দেশনা দান করা হয়েছে। মানুষের আল্লাহ্‌র আদালতে নিজের কৃত কর্মফল ও আচরণের হিসেব নিয়ে হাযির হওয়ার যোগ্য প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পর্কে। ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থেকে ইসলামী বিধান অবলম্বন করে সফল সুন্দর জীবন যাপন করার অনুপ্রেরণা যোগাবার জন্যই সাধারণ নীতিনির্দেশ রয়েছে আয়াতটিতে ইতিবাচক ও নিষেধাজ্ঞাবাচক কর্মপন্থা এবং আচরণ সংগঠনের দিক। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল বাণী যা শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রথম কঠোর সংকটের দিনে উল্লেখযোগ্য গোত্রের প্রধানদের কেউ কেউ সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুফতী মুহম্মদ শফী (র.)-র মা' আরেফুল কোরআন' এ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

১. হযরত আকসাম ইব্‌ন সায়ফী (রা.) এ আয়াতের কারণেই মুসলমান হয়েছিলেন,

২. হযরত উসমান ইব্‌ন মাযউন (রা.) এ আয়াত শুনে দৃঢ়ভাবে ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং

৩. ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মুখে এ আয়াত শুনে কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনো কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না। আয়াতটির বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার জন্যই জুমা' এবং ঈদের নামাযের খুতবার শেষদিকে এ আয়াত সাধারণভাবে সর্বত্র পাঠ করা হয়।*

আয়াতটিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি ব্যাপকধর্মী শব্দের ব্যবহার রয়েছে। তার মধ্যে عدل এবং احسان। উল্লেখযোগ্য। ইব্‌ন আরাবী বলেনঃ 'আদ্‌ল' শব্দের

---

* মুফ্‌তী মুহম্মদ শফী, মা'আরেফুল কোরআন, বাংলা অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃষ্ঠা ৪৩৩-৩৭।

www.pathagar.com

প্রকৃত অর্থ সম্মান করা। তাতে অবশ্য বিভিন্ন সর্ম্পকের কারণে অর্থ বিভিন্ন হয়ে যেতে পারে। যেমনঃ (১) প্রথম 'আদ্‌ল' হলো মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে (হক আদায়ের দিক থেকে) আদ্‌ল করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হককে নিজের ভোগ- বিলাসের ওপর এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা বাসনার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া, আল্লাহ্‌র বিধান পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা। (২) দ্বিতীয় হলো, মানুষের নিজের সাথে 'আদ্‌ল' করা। অর্থাৎ দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণ থেকে নিজকে বাচাঁনো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হবে, সবর ও স্বল্পে তুষ্টি অবলম্বন করা, এবং নিজের ওপর অহেতুক বোঝা না চাপানো। (৩) তৃতীয় 'আদ্‌ল' হলো নিজের ও সকল সৃষ্ট জীবের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোট বড়ো ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে কথা বা কাজ দিয়ে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় বিচারককে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে, সত্যের অনুকূলে রায় দেওয়াও 'আদ্‌ল'। প্রত্যেক কাজে অতি স্বল্পতা ও বাহুল্যকে বর্জন করাও 'আদ্‌ল। আবু আবদুল্লাহ্‌ রাযী এই অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, 'আদ্‌ল' শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (বাহ্‌রে মুহীত) ইমাম কুরতুবী 'আদ্‌লের' অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেনঃ এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরো জানা গেল যে, আয়াতের 'আদ্‌ল' শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও মন্দ চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত আছে।

আয়াতটিতে দ্বিতীয় আদেশটি হলো احسان। সম্পর্কে। এ ব্যাপকধর্মী শব্দটির সাহায্যে দু'টি অর্থের গুরুত্ব ধরা যেতে পারেঃ (১) কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসকে সুন্দর করা এবং (২) কোন ব্যক্তির সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। ইমাম কুরতুবী (র.) মনে করেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যবহৃত 'ইহ্‌সান' শব্দে উভয় প্রকার অর্থই শামিল রয়েছে। অর্থাৎ কাজ ও আচরণগত যা কিছু করার আদেশ দেওয়া হয়েছে-- কাজকর্ম, ইবাদত, চরিত্র গঠন, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদি সবকিছুকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয়েছে 'ইহ্‌সান'।

কোন কোন তাফসীরকার 'আদল' ও 'ইহ্‌সান'কে এভাবে স্পষ্টতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ আদ্‌ল হচ্ছে অন্যের অধিকার পূর্ণভাবে আদায় করে দেওয়া আর নিজের অধিকার পূর্ণভাবে নিয়ে নেওয়া। 'ইহ্‌সান' হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের

www.pathagar.com

চাইতে বেশী দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা, বরং কিছু কম হলেও তাই গ্রহণ করা।

তৃতীয় আদেশ হলো ايتاء ذى القربى। অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনকে তার প্রাপ্য দেওয়া। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবাকরা, অসুস্থ হলে দেখাশুনা, পরিচর্যা করা ইত্যাদি!

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তাফ্হীমূল কুরআন তাফসীর গ্রন্থে এ ব্যাপারে সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণকে সংক্ষেপে সংযোজন করা যায় এভাবে ঃ

'ইহ্সান' ইনসাফ অপেক্ষাও উন্নত এক অতিরিক্ত জিনিস। আর সামাজিক সামগ্রিক জীবনে এর গুরুত্ব 'আদ্ল' অপেক্ষা ও বেশী। 'আদল' যদি হয় সমাজের ভিত্তি, ইহ্সান হলো তার সৌন্দর্য আর পূর্ণত্ব। ন্যায়ের চুলচেরা হিসেব করে চলা সমাজ দ্বন্দহীন সমস্যাহীন সমাজ, যা হতে পারে কঠোর, অবাস্তব সমাজ। সে সমাজের মানুষ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রেম, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য, বদান্যতা, নিষ্ঠা, সম্প্রীতি, আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনার মহামূল্য উপাদান ও জীবনের মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। সমাজের সামগ্রিক সৌন্দর্যের ও সমৃদ্ধির জন্য এ সকল উপাদান ও মূল্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আয়াতে তৃতীয় নির্দেশটি হলো নিকট-আত্মীয়দের পরস্পরের মধ্যে 'ইহ্সান' করার একটি বিশেষ ব্যবস্থা। শুধু আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, সুখ দুঃখে তাদের অংশীদার হওয়া এবং ন্যায্য সীমার মধ্যে থেকে পরস্পরের সাহায্যকারী হওয়াই নয়। প্রত্যেক সচ্ছল সম্পদশালী মানুষ নিজের সন্তান সন্ততিদের অধিকারের সঙ্গে সম্পদের উপর অন্য নিকট আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারকেও স্বীকৃতি দান করবে। ইসলামী বিধান পরিবারকে সমাজ সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছে। তারই সংশ্লিষ্ট নীতি হলো, প্রত্যেক পরিবারের অর্ন্তগত দরিদ্র লোকদের প্রথম অধিকার হলো তাদের পরিবারের সচ্ছল অবস্থার লোকদের সম্পদের উপর। তার পরে সে অধিকার পরিবারের বাইরের মানুষের সম্পদের উপর। বিভিন্ন হাদীসেও 'নিকটবর্তীদের' অধিকার আদায় করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে প্রথমে আত্মীয় স্বজনদের এবং তার পরেপরেই অন্যান্য নিকটবর্তীদের লালন-পালনের ব্যবস্থা প্রত্যেকটি সচ্ছল পরিবার দায়িত্ব হিসেবে সম্পন্ন করলে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি দৃঢ় হবে। আর তার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশ

www.pathagar.com

হবে সুন্দর। নৈতিকতার দিক থেকে এবং প্রীতিমাধুর্যের ও জীবন সংস্কৃতি সংরক্ষণের দিক থেকে।

নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত তিনটি বিষয়েও তার বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। যেমন ঃ

'প্রথম জিনিসটি হলো فحشاء। এ শব্দটি দিয়ে সর্বপ্রকার অর্থহীন ও লজ্জাকর কাজকর্ম বোঝায়। যে সব অন্যায় অশ্লীলতা স্বতঃই অন্যায় ও বীভৎস, তাই فحش যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার, নগ্নতা, বিবস্ত্রতা, লুত কওমের বিকৃত যৌন রুচি, নিষিদ্ধ স্ত্রী-পুরুষে বিবাহ, চুরি, মদ্যপান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগাল ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা ইত্যাদি ধরনের প্রকাশ্য খারাপ কাজ করা অথবা সেসব কাজের সাহায্যে প্রসার প্রচারও فحشاء যেমন ঃ মিথ্যা প্রচারণা, মিথ্যা অভিযোগ রচনা ও কারো উপরে আরোপিত গোপন অপরাধসমূহের প্রচার, যিনা, ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধকারী গল্প নাটক ও ছায়াছবি, উলঙ্গ ছবি-প্রতিকৃতি, নারীদের মোহনীয় প্রলুব্ধকর সাজসজ্জা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নারীদের মঞ্চে নৃত্যগীত পরিবেশন, রূপ-যৌবনের স্থূল প্রদর্শন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় জিনিসটি হলো منكر। এতে এমন সব মন্দ কাজ বোঝায় যা সাধারণভাবেই জনগণের মধ্যে খারাপ বলে বিবেচিত ও খারাপ বলে অভিহিত এবং সেজন্যই আল্লাহ্‌র বিধানেও নিষিদ্ধ।

তৃতীয় জিনিসটি হলো بغى যার শাব্দিক অর্থ হলো সীমালংঘন করা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা--সে অধিকার সৃষ্টিকর্তারই হোক কি সৃষ্টিরই হোক। অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ হলো কল্যাণের বিধির লংঘন এবং অত্যাচার উৎপীড়ন।

উপরোক্ত তিনটি ইতিবাচক আদেশ ও অন্য তিনটি নিষেধাজ্ঞা বিধিকে প্রকৃতপক্ষে ইসলামী নীতি, আদর্শ ও শর'ঈ যা বিধানের সংক্ষিপ্তসার বলে গ্রহণ করা যায়। তাকে ভিত্তি করে কালোপযোগী অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির বিশ্লেষণও করা যেতে পারে। ব্যাপকতাপূর্ণ তাৎপর্যের জন্যই তা যুক্তিসম্মত ও কল্যাণকর।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

৮৯ নং আয়াতে 'আল-কুরআন' সম্পর্কিত প্রেক্ষিতটি হল ঃ 'আল-কুরআন' অবতীর্ণ করা হয়েছে সব কিছু বিশ্লেষণ সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং মুসলিমদের জন্য পথপ্রদর্শক, রহমত ও শুভসংবাদ হিসেবে। এ পথ নির্দেশনা, রহমত ও কল্যাণের সুসংবাদকে প্রকৃতপক্ষে সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক কথায় তিনটি আদেশ আর তিনটি নিষেধাজ্ঞার উপস্থাপনায় মৌল নীতির রূপ দেওয়া হয়েছে। এ মৌল নীতির

www.pathagar.com

যথাযথ বিশ্লেষণ করলে ইলসামী সমাজ বিধান ও জীবন বিধানের এবং তার অন্তর্গত অর্থনীতির দিক নির্দেশনা প্রধান প্রধান দিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভিত্তিগতভাবে ন্যায়নীতির (Justice) উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমানকালে একটা দেশ বা রাষ্ট্রের অধীন সমাজকে সুসংহত, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণভিত্তিক করা হয় মৌল ব্যয়নীতি প্রথমে নির্ধারণ করে ও তাকে ভিত্তি করে সংবিধান ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং সেসবের বাস্তবায়ন করে। রাজনীতির ও অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উক্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল। ইসলামী রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত হবে ইসলামী মৌলনীতি পরিচালিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। এ দু'টি প্রধান প্রক্রিয়ার ভিত্তি নির্মাণ হবে ইসলামী ন্যায়নীতির (Justice) উপরে। আইনের বিধি-নিষেধ প্রণয়ন হবে তারই শৃঙ্খলায়। আইন প্রয়োগ বা আইনের শাসন (Rule of law) হবে তারই শৃঙ্খলায়। নাগরিক অধিকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মপরিচালনার মূল্যায়নও হবে তারই শৃঙ্খলার অধীনে। এমনকি বিচারকের বিচার কর্মেরও মূল্যায়ন হবে তারই শৃঙ্খলার অধীনে। এমনি পরিবেশে ন্যায়নীতি হবে সব মানুষের (সব নাগরিকের এবং প্রশাসকের) চরিত্রগত আচরণ।

দ্বিতীয়ত, এমনি পরিবেশে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা হবে ন্যায়নীতিভিত্তিক। এখানেই ইসলামী সমাজ ও অন্য সমাজের (পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক) অর্থনীতিতে ভিন্ন প্রকৃতি স্পষ্টভাবে বিকাশ লাভ করবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ন্যায়নীতির অনুসরণ অভাবেই গড়ে ওঠে অসামাজিক কৃত্রিম অসাম্য। প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমের শোষণ এবং লোভ-লালসার সাফল্যময় ভূমিকা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মানুষ হারায় ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা আর আত্মা ও বিবেকের ভূমিকা। ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষ নিজস্ব শ্রমকে বিবেক ও আত্মার মূল্যবোধ আর সামাজিক নৈতিকতা অনুসরণ করেই সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদে প্রয়োগ করে ইহকাল-পরকালের সমন্বিত কল্যাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। অর্থনীতিতেও ন্যায়নীতি (Justice) -র ভিত্তিমূল ক্রিয়াশীল থাকে ব্যাপকভাবে। এ ন্যায়নীতিকে বিশ্লেষণ করা যায় আত্ম-ন্যায়নীতি (Self-justice), সামাজিক ন্যায়নীতি (Social justice) এবং অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি (Economic justice)--তিনটি ক্ষেত্রে। আত্ম-ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষ হিসেবে মুসলিম ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে, যে গঠন প্রক্রিয়া হলো 'আদ্‌ল' 'ইহ্‌সান' এবং আয়াতে উল্লিখিত সবক'টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ গ্রহণের বাস্তবায়ন। তারই ফলশ্রুতিতে সর্বক্ষেত্রে মানবিক ব্যক্তিগত ও

www.pathagar.com

সমষ্টিগত আচরণে এবং কর্ম সম্পাদনের সাহায্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হবে সামাজিক ন্যায়নীতি এবং অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি। গণতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে শুধু একটি ক্ষেত্রে মানবিক ন্যায়নীতি বা Human justice অথবা Human rights ইসলামী সমাজের তুলনা করা যায়। এ মূলনীতিটি সমাজতন্ত্রবাদী সমাজ ও অর্থনীতিতে অনুপস্থিত বা ভয়ংকরভাবে উপেক্ষিত বলেই বর্তমানকালে সমাজতন্ত্রবাদী দেশগুলোতে চলছে সংশোধন ও সংস্কারের বিপুল অভিযান।

তৃতীয়ত, ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ও নৈতিক কাঠামোতে ন্যায়বিচারের বিবেচনা ভিত্তিগতভাবে প্রবেশ করে সব রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে যার ফলে শুধু বন্টনের ন্যায়নীতিই কার্যকর হয় না। সম্পদের মৌল উৎপাদকগুলোর মধ্যে (ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ/শক্তি, শ্রম, পুঁজি, সংগঠন/উদ্যোগ) বন্টন নীতিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করাও ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। কারণ, তাতে উৎপাদন ব্যবস্থাকেও ন্যায়নীতি عدل ভিত্তিক করা যায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তা করতে পারেনি। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বন্টনের তত্ত্ববাদ (প্রান্তিক বা Marginal productivity Theory) ভিত্তিতে শুরু করে তাকে বর্জন করেছে। কারণ তার মধ্যেই শ্রমের শোষণ অন্তর্নিহিত রয়েছে। মার্কসীয় তত্ত্ববাদ অন্যদিকে শুরুই করেছে উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus value) নিয়ে, যে মূল্য শ্রমেরই প্রাপ্য অথচ পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদী যুক্তি দিয়ে নিজেদের প্রাপ্য বলে গ্রহণ করে। ইসলামী সমাজে ব্যক্তিকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয় 'আদ্‌ল' বৈশিষ্ট্যের দিকে। তাকে হতে হয় শুধু ন্যায়বিচার করেই ক্ষান্ত না হতে বরং অতিরিক্ত কিছু (প্রাপ্যেরও বেশী) দান করে নিজের ত্যাগের অন্যের প্রাপ্যাংশেরও বেশী দান ভিত্তিতে উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই শ্রমিককে শোষণমুক্ত করতে হয় তাকে। একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আরেকটু বিস্তারিতভাবে ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রয়োগ উৎপাদন প্রক্রিয়াতে যেমন হয় বলা যায় ঃ

"The producer or entrepreneur, in an Islamic economy, is internally induced to seek 'economic justices in the decision making process in the whole eoonomics of production and the earning of profit income. He is similarly oriented internally to distribute the gross output to participants in production, mainly the workers. The workers deserve and will receive just wages and the exploitation of the Marxian contention will disappear. And additionally, a large part of profit income of the producers will be

www.pathagar.com

spent, after meeting the requirements of re-investments, on social security (as indicated in the standards of 'rightheousness) so that the tend of equalization of income is supported and ensured. In the event of difficulties about producing such 'economic justice' results and the desired social impact, the state has to step in for organizing the institutions necessary towards achieving the objective. Thus the socially just system of distribution of income is integrated into the operations of the economic forces in an Islamic economy.

উপসংহার হিসেবে বলতে হয়, এ সংক্ষিপ্ত আয়াতভিত্তিক বিশ্লেষণের কাঠামোতে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকে মূলনীতি করে সমাজ এবং অর্থনীতি সংগঠনের রূপরেখা নিয়ে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। সে সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত কথা পরিশিষ্টে সংযোজন করা হলো। তা সত্ত্বেও উদাহরণস্বরূপ দুয়েকটি দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন বলেই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিধিতে তার উল্লেখ করছি ঃ

১. প্রথম সর্বাঙ্গীনভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, যে সমাজে মানুষের আচরণ ও কাজকর্ম আর প্রতিষ্ঠান-প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে উক্ত ছয়টি স্তম্ভের উপরই ক্রিয়াশীল, সে সমাজ গড়ে উঠবে আদর্শবাদী কল্যাণ রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিতে। কারণ সেখানে থাকবে তিনটি আদর্শের বাস্তবরূপ। আদর্শ তিনটি হলো ঃ ন্যায়বিচার, উক্ত কর্ম সম্পাদনের অনুপ্রেরণা এবং পরিবারের সদস্যদেরসহ সকল নিকটবর্তী মানুষের প্রতিপালন দায়িত্ব সম্পাদন। আর থাকবে তিনটি শৃঙ্খলা নীতির অনুসরণ। তা হলো ঃ কাজে-কর্মে ও আচরণে বর্জন করতে হবে-যা লজ্জাকর, যা অসৎ (অবৈধ) এবং যা (স্রষ্টার বিধানের) সীমালংঘন। সুস্থ সুন্দর কল্যাণময় জীবন গড়ে উঠার জন্য আদর্শের প্রেরণা এবং শৃঙ্খলার নিয়ম নিষ্ঠা দুই-ই প্রয়োজন। সে ভাবমূর্তি জীবনের সব ক্ষেত্রেই—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে—বিকাশ লাভ করবে।

২. দ্বিতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেখা যাবে ঃ উৎপাদন ব্যবস্থা, বিতরণ ব্যবস্থা ও ভোগ ব্যবস্থার ভিন্নতর ধারা বিবর্তিত হচ্ছে। যা লজ্জাকর ও অকল্যাণকর আপাতদৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষক হলেও সে জাতীয় আচরণ ও কর্মপ্রয়াসের ভিত্তিগত সমর্থন এ সমাজে থাকবে না। উৎপাদন, বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন প্রক্রিয়া থেকে সে সব পণ্য বা সেবা হবে নির্বাসিত। সুতরাং এ সব লজ্জাকর পণ্য বা সেবা কাজের ভোগও হবে বর্জিত। বর্তমান যুগের কল্যাণ রাষ্ট্রেও লজ্জাকর পণ্য এবং অসৎ অবৈধ কর্ম আর আচরণের উদ্দীপক-উত্তেজক পণ্যও সেবার সীমাহীন বিস্তার লাভ

www.pathagar.com

করেছে আর করেই যাচ্ছে (মদ, গাঁজা, হাশহিশ, হিরোইন ইত্যাদিতে আসক্তি, যৌন ব্যভিচার, সংশ্লিষ্ট চুরি-ডাকাতি-হাইজ্যাকিং ভিডিও আর নীল ছায়াছবির আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যায়)। যে সমাজে এসব ব্যাপারে অর্থনীতিতে আদর্শের প্রেরণার সঙ্গে নিষেধাজ্ঞার শাসন অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি, সেখানে সাধারণ মানুষ আচরণে বিশৃঙ্খলাকেই বরণ করতে প্রলুব্ধ হতে পারে—আইনের দৃশ্যমান নিয়ন্ত্রণ প্রয়াস আনে নিয়ন্ত্রণের সীমালংঘন করার নতুন ও জটিল দুর্নীতির ব্যবসা-বাণিজ্য। ন্যায়বিচার ও কল্যাণের আদর্শের অনুসরণ লোপ পায়। লক্ষ্যহীনভাবে চলে অর্থের আর জড় সম্পদের সন্ধান। স্রষ্টার বিধি বা জ্ঞান থেকে মানুষ হয় সম্পূর্ণ বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত। জাতিগতভাবে এ হয় সৃষ্ট আইনের সীমালংঘন, যার ফলে আসে ধ্বংসের পরিণতি। তারই নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে আসছে বর্তমান যুগের সাম্প্রতিক সংকটসমূহে ঃ

(Ecological crisis, Green summer effect, AIDS epidemic)

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

প্রমাণপঞ্জী

১. মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

২. মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

৩. অধ্যাপক রায়হান শরীফ Islamic Economics : Principles and Applications ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৫।

৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফ্‌হীমুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০-৮৩।

www.pathagar.com

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَعَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَيُفْلِحُوْنَ. مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ص وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অতএব আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক। আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালংঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তখন আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান। তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। যৎসামান্য সুখ-সম্ভোগ করে নিক। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

— সূরা নাহল ঃ ১১৪-১১৭

প্রেক্ষিতে ও তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

রিযিকের অন্তর্ভুক্ত হালাল ও হারাম খাদ্যের নির্ধারণ সম্পর্কে আয়াত চারটিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে পূর্ববর্তী সূরা বাকারা (আয়াত

www.pathagar.com

নং ১৭২-১৭৪); সূরা মায়েদা (আয়াত নং ৪-৬) এবং সূরা আন'আম (আয়াত নং ১২১) সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য। উপরোক্ত আলোচনাধীন আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। রাসূলুল্লাহ (স.) অতঃপর মদীনার রাষ্ট্র গঠনকালে সূরা বাকারার আয়াতে (ওহী মাধ্যমে) একই বিধানকে রাষ্ট্রীয় বিধানের অন্তর্গত করা হয়েছে। মক্কার পরিবেশে সূরা নাহলের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কালে সত্যকে কুরায়শদের কাছে দলীল তথ্যসহ যুক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত চলছিল। সেজন্যেই ১১৪ নং আয়াতে বর্ণিত খাদ্য সম্পর্কিত বিধিকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দান করার আগে তার পটভূমি হিসেবে দু'টি আয়াতে (১১২ এবং ১১৩) জনবসতিপূর্ণ শহরটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের যা ছিল নিরাপদ নিশ্চিন্ত, সেখানে প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত রিযিকের প্রচুর উপকরণ, তারপরেও তারা আল্লাহ্র নিয়ামতের প্রতি 'কুফরী' করল, তখন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের জন্য পরিণতির স্বাদ আস্বাদন করালেন— ক্ষুধা ও ভীতির। তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছিল, কিন্তু তারা তার প্রতি দোষারোপ করল, তখন আযাব এসে তাদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই তারা ছিল জালিম।" অনির্দিষ্টভাবে একটি জনপদের কথা উল্লেখ করে উপরোক্ত ঘটনা ও পরিণতির কথা বলা হলেও অনেকে মনে করেন, মক্কা নগরীর দুর্ভিক্ষের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর মা'আরেফুল কোরআন তফ্সীরে বলেছেন ঃ "অধিকাংশ তাফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। (মানুষে) এমনকি মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এ ছাড়া মুসলমানদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আরয করল যে, কুফর ও অবাধ্যতার দোষে তো পুরুষরা দায়ী। শিশু ও মহিলারা নির্দোষ। এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের জন্য মদীনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন। (মাযহারী) আবূ সুফিয়ান কাফির অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.)-কে অনুরোধ করে যে, আপনি তো আত্মীয় তোষণ, দয়াদাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। এতে রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের জন্য দোয়া করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।* (কুরতুবী)

১. মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) তফসীরে মা'অরেফুল কোরআন, বাংলা অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৪৫৯।

www.pathagar.com

অন্য কারো নাম উচ্চারিত হওয়া (জবেহ্ করা) মাংস মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য খাদ্য ব্যাপারে বিধির পূর্ণ পালন বিশেষ পরিস্থিতির কারণে সম্ভব না হলে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি অমান্য করা না হলে এবং সীমার মধ্যে হলে নিষিদ্ধ প্রকারের খাদ্য বাধ্য হয়ে খেতে হলে এমনি আচরণ দোষমুক্ত হবে বলে স্বীকৃত হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

রক্ত, মৃত জন্তুর মাংস, শূকরের মাংস, তাকবীরহীন জবেহ্ করা মাংসকে নিষিদ্ধ করার বিধান উপরোক্ত আয়াতে বিশেষভাবে আলোচিত হলেও জানা যায় যে, আল-কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 'ইজ্‌মা' সাহায্যে আরো অনেক বস্তুকে ইসলামী ফিক্‌হর অধীনে হারাম ধার্য করা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো জাহিলিয়াত আমলের মুশরিকদের পদ্ধতির অসামাজিকতার কথা ও অবৈধতার কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া। মুশরিকরা আল্লাহ্‌র বিধানকে সত্য ও মিথ্যা মিশিয়ে বিদ্রূপ উপহাসচ্ছলে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মারাত্মকভাবে বিরোধিতা করছিল। এমনি আচরণ যে সীমালংঘনের দৃষ্টান্ত আর সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র শাস্তিই পরিণতি হবে সে দিকে সতর্কতা বাণী অন্তর্নিহিত রয়েছে এখানে। সে উদ্দেশ্যেই আবার পরবর্তী (১২০-১২৪ নং আয়াতে) ইবরাহীম (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে শিরক ত্যাগ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং মতবিরোধ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করার উক্তি তুলে ধরা হয়েছে।

তারই প্রেক্ষিতে আমরা খাদ্য ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারি এভাবে ঃ

১. একটি সুস্থ সমাজকে মানুষের কল্যাণাদর্শ ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত সার্থকতার লক্ষ্যে রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুন গড়ে তুলতে হয়। ইসলামী জীবনাদর্শে সে লক্ষ্যের প্রতি ব্যক্তি ও সমাজকে আহ্বানের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সে লক্ষ্য আল-কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ করেই স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায়।

২. তারই কাঠামোতে নির্ধারণ করা যায় খাদ্যনীতি। তার মধ্যে স্পষ্ট শর্ত হলো ঃ বিশুদ্ধতা, স্বাস্থ্যের ভারসাম্য, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও ভারসাম্যের সমর্থন,

www.pathagar.com

মিতাচারিতা ও মিতাহার ইত্যাদি। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের যুক্তি ছাড়া আধ্যাত্মিক শক্তির সমন্বয় সাধনও এক্ষেত্রে প্রয়োজন।

৩. উপরোক্ত খাদ্যনীতির কাঠামোতেই গড়ে উঠবে ইসলামী অর্থনীতির খাদ্যভোগ প্রক্রিয়া অথবা সাধারণ পর্যায়ের ভোগ প্রক্রিয়া (Consumption process)। সাধারণ পর্যায়ের সমষ্টিগত ভোগ ক্রিয়া (Aggregative consumption function)। আজকাল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে জনপ্রিয় পদ্ধতির অংগ বিশেষ। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে জ্যামিতিক ও অংক ভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক রূপ এবং কৌশল আজকাল গড়ে উঠেছে। মৌল ধর্তব্য তার মধ্যে হলো, আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির অনুভূতিকে অংকের সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করে জ্যামিতিকে ছবিতে উত্থান, পতন, স্থিতিশীলতা ইত্যাদি অবস্থাকে গ্রহণযোগ্যভাবে প্রকাশ করা সম্ভব এবং সে ধারা দিয়ে ব্যক্তির আচরণ ও সমাজে গোটা অর্থনীতির সাধারণ আচরণ প্রদর্শন করা সম্ভব। এটা সম্ভব হবে শুধু স্থূল দৈহিক প্রতিক্রিয়া ও তারই সংশ্লিষ্ট মানসিক অনুভূতির ভিত্তিতে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভিত্তিতেও নয় এবং সমন্বয়কারী সুস্থ দৈহিক মানসিক ভারসাম্যের ভিত্তিতেও নয়। স্থূল প্রতিক্রিয়ার প্রবণতার পরিমাপ করার মধ্যেও তাই সঠিকতার মানদণ্ড নেই, প্রয়োজনীয় সমাজ ও জীবনের আদর্শ ভিত্তিক সমন্বয় প্রয়াসও নেই।

৪. ভোগের সামগ্রিক বিশ্লেষণ ও বিবেচনাকে স্থূল অনুভূতির বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়াজাতকরণে কি ধরনের বিভ্রাট বা ভুল-ভ্রান্তি আসে তার দুয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ (ক) ভোগের অন্তর্গত হয় আজকাল সীমাহীন পণ্য ও সেবা। তার সামান্য অংশ হলো ক্ষুধার অন্ন আর তৃষ্ণার পানীয়। ক্ষুধার অন্ন বা খাদ্যও তেমনি আবার অনেক উপাদান-উপকরণে বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন মানের জীবনযাত্রার উপযোগী করার জন্য শস্য ও পণ্যের উৎপাদন এবং শ্রম মিশ্রণে প্রক্রিয়াজাত ও সমৃদ্ধ করা হয়- নানা মাত্রায়, নানা স্থানে এবং বাড়িতে বাড়িতে ও হোটেল রেস্তোরায়। কারো এ দুর্ভিক্ষটি অতীত হয়ে গিয়েছিল বলেই মনে হয় ১১৩ নং আয়াতের বর্ণনা থেকে। দুর্ভিক্ষ অতীত হওয়ার পরেও মুশরিকদের প্রকৃত শিক্ষা হয়নি। তাই রিযিক, খাদ্য ও ঈমান নিয়ে ওহী অবতীর্ণ হওয়া অব্যাহত ছিল। মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.) আয়াত তিনটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ "মুসলমানদেরকে পূর্বোক্ত প্রেক্ষিতের তাৎপর্য উপলব্ধি করে কাফিরদের মতো অকৃতজ্ঞ হতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যেসব হালাল ও

www.pathagar.com

পবিত্র বস্তু দান করেছেন সেগুলোকে কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'হালাল' করা অনেক বস্তুকে নিজদের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে 'হারাম' বলা এবং আল্লাহ্ তা'আলার 'হারাম' করা অনেক বস্তুকে 'হালাল' বলা- এটা ছিল কাফির ও মুশরিকদের অকৃতজ্ঞতার অন্যতম পদ্ধতি। মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে, তারা যেন এরূপ না করে। কোন বস্তুকে 'হালাল' অথবা 'হারাম' করার অধিকার একমাত্র সে সত্তারই রয়েছে যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে এরূপ করা আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়।" এমনি সীমালংঘনের জন্য লাভ আর কি হবে? সামান্য পার্থিব অহংকারের আনন্দ লাভের সুযোগ মাত্র। এর পরিণতিতে কঠোর শাস্তি তাদের ভাগ্যে আসবেই।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ হারাম খাদ্য হলো রক্ত, শুকরের মাংস, মৃত জন্তু এবং যে জন্তুকে জবাই করার সময়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয় (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তকবীর পাঠ করা হয় না)। ফিক্‌হবিদগণ গবেষণা করে উপরোক্ত চার বস্তু ছাড়াও নিষিদ্ধ হারাম খাদ্যের কথা বলেছেন। সে বিশদ আলোচনা ও যুক্তিতর্কে প্রবেশ না করে এক্ষেত্রে মৌল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা চলে- ইসলামী দর্শন ও যুক্তিবাদ সমর্থন করে হালাল ও পবিত্র খাদ্যের আহার। মানুষের স্বাভাবিক রুচি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ থেকেই মৃত জন্তুর মাংস, শূকরের মাংস ও রক্ত আহারের প্রতি অনীহা আসা সংগত। তারপরে বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্য গবেষণার যুক্তি থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ রয়েছে যে এ সকলকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করলে ব্যাধির অনেক রকম নতুন আশংকা থাকবে।* আর আল্লাহ্‌র নামে তকবীর না পড়ে উদরের জন্য ডালভাত, কারো জন্য ডালভাতের সঙ্গে আমিষ ও সবজি, কারো জন্য ষোড়শোপচার। নিছক ক্ষুধার খাদিম উদর-যন্ত্রণা দূর করার জন্য বেশী কিছু লাগে না, ডালভাত বা ডালরুটিই যথেষ্ট।

---

* ইউসুফ আলী বলছেন ঃ মৃত জন্তুর মাংস ও রক্ত খাদ্যবস্তু হিসেবে সুস্থ নাগরিকের কাছে ঘৃণার উদ্রেক করবে। তেমনি হবে নোংরা, ময়লা খাওয়া শুকরের মাংসের বেলায়। যে ক্ষেত্রে পরিস্কার খাদ্য খাওয়ানো হয় শুকরকে, সেক্ষেত্রেও প্রতিবাদ আসে যে, শূকর অন্যায়ভাবেও নোংরা এবং নোংরা প্রভাব মাংসেও বর্তায়। (২) শুকরের মাংসে চর্বি থাকে বেশী পেশী নির্মাণের উপাদানের চেয়ে। (৩) অন্য মাংসের তুলনায় এ মাংসে বেশী ব্যাধির উৎপত্তি করে এক প্রকার বিশেষ পোকা জন্মে, যাতে হয় Trichinosis (Vide the Holy Quran, Lahore, Note No. 174, p-68.

www.pathagar.com

(খ) খাদ্যের সঙ্গে পানীয়ও তো প্রয়োজন। উদরান্ন যদি ডালভাত বা ডালরুটি হয়, তার সঙ্গে দুয়েক গ্লাস বা এক ঘটি বিশুদ্ধ পানিই পানীয়। কিন্তু এর ওপরের স্তরে যারা জীবনযাত্রা পরিচালনা করছে, তাদের জন্য তো পানীয়েরও রয়েছে বিপুল সমাহার। কোক, পেপসি নরম পানীয় থেকে শুরু করে সীমাহীন মাদকতাপূর্ণ পানীয়ের দেশী-বিদেশী বিপুল উৎপাদন, বিতরণ ও সেবন সমারোহ। যে সকল Alcoholic পানীয় নেশার আচ্ছন্নতা ও মাদকতার প্রভাবে মানুষের মানসিক চিন্তাধারা ও ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, সেগুলোকে বলা হয় কঠোর পানীয়।

কঠোর পানীয় মনের সূক্ষ্ম গুণাবলী ও চিন্তাশক্তি নষ্ট করে স্থূল প্রবৃত্তিকে উদ্দীপনা দিয়ে অশালীন ও অসামাজিক কাজ করায়। যৌন ব্যভিচার থেকে শুরু করে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও খুন-খারাবি পর্যন্ত করায়। এসব ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধেই ইসলামী নির্দেশের নিয়ন্ত্রণ। (আয়াত নং ৯০-এর বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)

(গ) উপরোক্ত কঠোর পানীয়ের কথা পাশ্চাত্য সভ্যতার অধীনে তেমন নির্লজ্জতা বা অশ্লীলতা বলে গণ্য নয়। তাদের কাছে এটা কাঙ্ক্ষিত মানসিক বিলাসের পলায়নী রূপ (escapism) যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেন মিঃ ডুকাকিস, তার মনোকষ্ট দূর করার জন্য মিসেস ডুকাকিস ধরলেন এল্‌কোহল। এমনভাবে ধরলেন যে, ভীষণ অসুস্থ হয়ে Alcoholic center-এ চিকিৎসাধীন থাকলেন একমাস। যুক্তরাষ্ট্রের Drug trade-এর বার্ষিক মূল্য হলো ৪৮৩ বিলিয়ন ডলার। দরিদ্র দেশেও চলছে আত্মঘাতী মাদকতা আসক্তির অভিযান আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের চোরাচালানি ষড়যন্ত্রের অসাধারণ কৌশলে ও ব্যাপকতায়। কোকেন-হিরোইনের ব্যবহার ধ্বংস করছে যুবশক্তি, ধ্বংস করছে পরিবার, ধ্বংস করছে সমাজ। ইসলামী বিধির শাসন নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করার জন্যই চলছে এ ধ্বংসলীলা। এ সকল উন্নতমানের ব্যয়বহুল মাদকতাপূর্ণ দ্রব্যের মারাত্মক আক্রমণ ছাড়াও সাধারণ দরিদ্র পরিবারে তামাকের মতো একটি সামান্য নেশা দ্রব্যে কি ধ্বংসলীলা পরিবার ও সমাজের সর্বনাশ করতে পারে, তার দৃষ্টান্তরূপে একটি ভারতীয় ঘটনা মুদ্রিত হয়েছে সংবাদপত্রে। সামান্য বেতনভোগী কেরানী তার বেতনের অর্ধেকই নেশার তামাকে ব্যয় করে বলে শেষ পর্যন্ত স্ত্রী ও দুই কন্যা বিষপান

www.pathagar.com

করে আত্মহত্যা করল।* ইসলামী অর্থনীতির অধীনে ইসলামী জীবনধারা ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত থাকলে খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার উপরে উল্লিখিত ধরনে সমাজ ও পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারত না।

---

* পিতা রঘুবীর সিং নেশার তামাক সেবন কিছুতেই ছাড়বেন না, স্ত্রী যথাসাধ্য বাপের বাড়ি থেকে কিছু সাহায্য এনে চালাতো দুই মেয়ের স্কুলের বেতন। তবু ধার-দেনা বেড়েই চলেছে। রঘুবীর সিংহ শুনল না পরিবারের সকলের কাকুতি-মিনতি। তাই দুই মেয়ে ও মা ইনসেক্টিসাইড বিষপানে করল আত্মহত্যা। মেয়ে দু'টি মৃত, মা হাসপাতালে। রঘুবীর সিংহ বিলাপ করছে, "আমি আমার সংসারকে ভালবাসি, আমি কেবল নেশাটুকু থেকে পেলাম না মুক্তি।" (New Nation. 13 March, 89, p. 1. Mother, Daughter, suicide pact)

প্রমাণপঞ্জি

১. মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, বাংলা অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ১৯৮২, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৯-৪৬৩।

২. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran, Lahore, P. 68.

৩. The New Nation, 13th March, 1989, P. 1.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা বনী ইসরাঈল

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ
السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلاً. وَكُلَّ اِنْسَانٍ
اَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهُ فِيْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ
مَنْشُوْرًا. اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. مَنِ
اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط
وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ
رَسُوْلاً.

আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিষ্প্রভ করে দিচ্ছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসেব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসেব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের

জন্যই সৎপথে চলে আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তিদান করি না। – সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১২-১৫

প্রেক্ষিত

সূরাটির শুরুই হয়েছে পবিত্র মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিস্ময়কর অলৌকিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতার উল্লেখ দিয়ে।* এ সূচনা পথভ্রষ্ট মানুষকে তার আত্মিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করে আল্লাহ্র নিদর্শন উপলব্ধির দিকে আকর্ষণ করে। মানুষ তার প্রকৃতির দুর্বলতা ও পথভ্রষ্টতার জন্য কল্যাণের এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সত্যের বিরোধিতা করতে থাকে। বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাস তার সর্বোত্তম সাক্ষ্য বহন করে। সে ইতিহাসের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাসূলুল্লাহ (স.)-র মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে শেষ সুযোগ দানই আল্লাহ্র উদ্দেশ্য, যাতে কাফির কুরায়শদের এবং বনী ইসরাঈলের তৎকালীন সম্প্রদায়ের সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন শেষ মুহূর্তে হলেও সম্ভব হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানুষের ইহ্কাল পরকালের অস্তিত্ব ও অবস্থানের কথা এবং কর্তব্য পালনে নিজ নিজ ব্যক্তিগত দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার বহন করার কথা। সতর্ক করার সাথে সাথে শিক্ষাদানেরও শেষ প্রয়াস দেখা যায় সূরাটির প্রথম অংশে। ৯-১০নং আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে ঃ "এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।" তারই প্রেক্ষিতে আলোচ্য তিনটি আয়াতে দিন রাত্রির নিদর্শন, মানুষের জীবনযাপনের অর্থনৈতিকসহ সবদিকের রীতি-নীতির বিশদ বিবরণ এবং মানুষের কর্ম সম্পাদন সম্পর্কিত সর্বপ্রকার অপরিবর্তিত লিপিসহ হিসেব-নিকেশের জন্য আল্লাহ্র কাছে পরিণামে হাযির হওয়ার অনিবার্যতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

---

* হাদীসে মি'রাজের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তার অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ উক্ত বিস্মরকর ভ্রমণের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। রাসূলুল্লাহ (স.)-কে মসজিদে হারাম থেকে প্রথমে নেওয়া হয় জেরুযালেমের মসজিদে আকসাতে এবং সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্ত আসমান, এমন কি আরশের নিকটে এবং মানুষের আত্মার সংগ্রাম যেমন হওয়ার কথা তার আধ্যাত্মিক পরিদর্শনও করানো হয়। স্পেনের মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী অধ্যাপক মিগুয়েল আসিন দেখিয়েছেন যে, এসব বর্ণনা ইউরোপের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপর, বিশেষ করে দান্তের মহাকাব্য রচনাকে প্রভাবিত করেছে।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী তাঁর 'তাফহীমুল কুরআন' তাফসীরে ১২ নং আয়াতের একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আয়াতটির শাব্দিক অনুবাদ হলো ঃ "মানুষ অকল্যাণ চাহে এমনভাবে যেমন কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী হয়ে পড়েছে।" ব্যাখ্যায় পটভূমিটি তুলে ধরা হয়েছে এভাবে ঃ "মক্কার কাফিররা রাসূলে করীমের নিকট বারবার যেসব নির্বুদ্ধিতাসূচক কথাবার্তা বলিত ইহাই উহার জওয়াব। তাহারা বলিত ঃ 'আচ্ছা ঠিক আছে, সেই আযাবটাই একবার আনিয়া ফেল, তুমি আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ।" উপরের আলোচনার পর সঙ্গে সঙ্গে এই বাক্যাংশ বলার উদ্দেশ্য হইতেছে লোকদিগকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দেওয়া যে, হে নির্বোধেরা, কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে আযাব চাহিতেছ ? আল্লাহ্‌র আযাব যখন কোন জাতির উপর আসে, তখন তাহার কি কঠিন দুর্দশা হয়, তাহা কি তোমরা ধারণা করিতে পার না ?

"সেই সঙ্গে এই বাক্যাংশে মুসলমানদের জন্যও এক সূক্ষ্ম সতর্কীকরণ রহিয়াছে। এই মুসলমানরা কাফিরদের অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতন এবং তাহাদের হঠকারীতার দরুণ অতিষ্ঠ হইয়া কখন কখন তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য বদদোয়া করিত। অথচ তখনও এই কাফিরদের মধ্যেই এমন অনেক লোক রহিয়া গিয়াছিল যাহারা পরে ঈমান আনিবে ও সারা দুনিয়ায় ইসলামের পতাকা উন্নত করিয়া ধরিবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ মানুষ বড়ই ধৈর্যহীন। সে এমন সব জিনিসই চাহিয়া বসে, যাহার প্রয়োজন উপস্থিতভাবে অনুভব করা হয়। অথচ পরে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে নিজেই বুঝিতে পারে যে, তখন তাহার দোয়া কবুল করা হইলে তাহার নিজের পক্ষেই তাহা ভাল হইত না।"

আয়াতভিত্তিক তাফসীরবিদদের অভিমত

(খ) মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.) তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ দিবারাত্রির পরিবর্তন- দিন ও রাত্রিকে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন বলা হয়েছে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দিনকে উজ্জ্বল করা হয়েছে যাতে রাত্রির অবকাশে মানুষ ও প্রাণীরা নিদ্রার বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। আর দিনের আলোতে মানুষ রিযিক উপার্জন করতে পারে- নানা দিকে ও নানাভাবে। অন্যদিকে দিনরাত্রির পরিবর্তন মানুষকে সাহায্য করে হিসেব করতে সময়, দিন, মাস ও বছর। দিবা-রাত্রির এমনি পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরী, চাকুরী এবং লেনদেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা ভীষণ কঠিন হতো।

www.pathagar.com

আমলনামা গলায় বাঁধা থাকা ঃ মানুষ যেকোন জায়গায় যেকোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রাখা হয়। কিয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দেওয়া হবে, হাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য না আযাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, "সে দিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমল নামা পড়ে ফেলবে।"

পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আযাব না হওয়া ঃ এ আয়াত দৃষ্টে কোন কোন ফিকহ্‌বিদ মনে করেন, কোন নবী ও রাসূলের দাওয়াত যাদের কাছে পৌছেনি তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ইমামের মতে, ইসলামের যে সব আকীদা বিবেকবুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় (যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ ইত্যাদি) সেসব যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে।

(খ) মাওলানা মওদূদী তাঁর 'তাফহীমুল কুরআন' তাফসীরে উল্লেখ করেছেন ঃ আমলনামা গলায় বাঁধা থাকা ঃ প্রত্যেকটি মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং তার পরিণামের ভালমন্দকরণ সকল তারই সত্তায় নিহিত রয়েছে। নিজস্ব গুণাবলী স্বভাব-চরিত্র, বিবেক-বিবেচনা শক্তি, বাছাই ও সিদ্ধান্ত করার শক্তির ব্যবহার প্রয়োগ সাহায্যে সে নিজেই নিজকে সৌভাগ্যের অধিকারী বানাতে পারে, আবার দুর্ভাগ্যে বিড়ম্বিত করে তুলতে পারে। অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ভাগ্যের কারণ বাইরে কোথাও তালাশ করে বেড়ায় এবং সব সময় বাহ্যিক কারণেই নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করে। কিন্তু আসল কথা এই যে, তাদের ভালমন্দের লিখন নিজেদেরই গলার মালা হয়ে ঝুলে রয়েছে। তারা নিজেদের দিকে চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাবে সব কিছু (অর্থাৎ করতে পারবে সঠিক মূল্যায়ন)।

কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না ঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সত্য। আল-কুরআনের নানা জায়গায় এ সত্যের দিকে চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এ সত্য না বুঝলে মানুষের আচরণ ও জীবনযাত্রা সঠিক হতে পারে না। বাক্যাংশটির তাৎপর্য হলো, প্রত্যেকটি মানুষ একটি নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নৈতিক দায়িত্বের অধিকারী এবং সে নিজে ব্যক্তিগতভাবেই আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী ও জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ব্যাপারে অপর কেউ অংশীদার হবে না।[২]

২২ —

www.pathagar.com

(গ) ইউসুফ আলী তাঁর ইংরেজী সংস্করণ পবিত্র কুরআনে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সংক্ষেপে বাংলায় একটির উল্লেখ করছি ঃ

দিনের আলোর নির্দেশ ঃ প্রাকৃতিক আলোকে আমরা প্রাকৃতিক সত্য হিসেবে দেখি কিন্তু আল্লাহ্‌র দান হিসেবে এর কল্যাণ আমাদের জন্য আসে দু'দিক থেকে ঃ (১) আমরা আমাদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারি এর আলোতে অথবা আমরা প্রাকৃতিক জগতের সব রকমের বিজ্ঞানের জ্ঞান গবেষণার সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারি। (২) প্রত্যেক দিন সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়া আমাদের দিন দিন করে বছর গণনা করতে সাহায্য করে, কারণ, প্রকৃতির স্বাভাবিক বছর হলো সৌর বছর। কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো আধ্যাত্মিক আলো, এ আলোর সাহায্যে আমরা অর্জন করতে পারি (১) আমাদের আধ্যাত্মিক জীবিকা ও জ্ঞান; (২) আমাদের আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উত্তরোত্তর উন্নততর স্তরে পৌছার মূল্যায়ন।৩

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

যেকোন দেশেই সমাজ ও অর্থনীতির মৌল স্তম্ভ হলো ব্যক্তি ও পরিবার। ব্যক্তি ও পরিবারের চরিত্র, আচরণ, ন্যায়পরায়ণতা, নিষ্ঠা, কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি সমাজকে গড়ে তোলে, অর্থনীতিকেও গড়ে তোলে। ইসলামী সমাজ ও ইসলামী অর্থনীতির সংগঠন যে-কোন প্রকারে উপরোক্ত মৌল স্তম্ভের কথা স্বীকার করে নিলেই চলে না। সর্বপ্রথমেই এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ব্যক্তির চরিত্র। ব্যক্তিত্বকে ইসলামী আকীদার কাঠামোতে গড়ে তোলা। সে জন্যই আয়াত তিনটির প্রথমেই রাত্রি ঃ অন্ধকারের প্রেক্ষিতে দিনের আলোর নিদর্শনের উপর গুরুত্ব দিয়ে সূচনা করা হয়েছে ... ..যার বহুমুখী তাৎপর্য রয়েছে। জীবিকা অন্বেষণ ও অর্জনের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে মু'মিন মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপযোগী শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভের প্রয়োজনের দিকে দিক-নির্দেশ রয়েছে নিদর্শনটির ব্যাখ্যায়। বলা চলে, অর্থনীতিসহ সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং বর্তমানকালে সমাদৃত বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে সমন্বিত করে শিক্ষা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার জন্যই প্রথম মৌল পদক্ষেপের প্রয়োজন। তা'হলে ব্যক্তি গঠন দিয়েই দৃঢ় সমাজ বোধ গঠনের সম্ভাবনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে

www.pathagar.com

পারে। সে হিসেবে আলোচ্য আয়াত তিনটির মৌল গুরুত্ব ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের উপর।

আয়াতের নিদর্শনে দিনের আলোতে জীবিকা অন্বেষণ ও অর্জনের দিক নির্দেশের কথাটাকে একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে ঃ অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান ভিত্তিতে ভূগর্ভে, পর্বতের গুহার অভ্যন্তরে, সমুদ্র তলে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে বর্তমান কালে। দিনের আলো যেসব পরিস্থিতিতে সাহায্য করে না। আলোর বিশিষ্ট ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়েছে উৎপাদনের অবকাঠামো হিসেবে। বর্তমানকালে বিদ্যুতের ব্যবহার এবং প্রযুক্তিজাত নানা যন্ত্র ব্যবহার ছাড়া শিল্প উন্নয়নই সম্ভব নয়। কারখানা ফ্যাক্টরিতে দিন-দুপুরেও বিদ্যুতের আলো ছাড়া কর্মীরা কাজ করতে পারে না, যন্ত্র চালকও যন্ত্র চালনা করতে পারে না আর যন্ত্রও চলবে না। তারই তো অন্তর্নিহিত দিক নির্দেশনা ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা, উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যার ১২ নং আয়াতের রাত্রি-দিনের নিদর্শনে (এবং وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا উক্তিতে) "সব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনার" কতটুকুই বা আমরা বুঝি আর অনুসরণ করি। চিন্তা ও বিশ্লেষণ সাহায্যে আয়াতগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনা সন্ধান করলে সমাজ ও অর্থনীতি সংগঠনের অনেক মৌল নীতিও আত্মপ্রকাশ করে, যেসবের যথাযথ ব্যবহার জ্ঞান ও উন্নয়নের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর করে তুলতে পারে। সেদিক থেকে উল্লেখ করা যায় কয়েকটি দিকের কথা যেমন ঃ

১. ইসলামী জীবন দর্শনে মানুষের ইতিবাচক সৃজনের ভূমিকা সুস্পষ্ট জীবনের সর্বক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনের কৃতিত্বই তাকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছে। ভ্রান্ত ধারণা ও অজ্ঞানতাবশত অনেক সময় ভাগ্যলিপির ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানুষকে তেমনি প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে দেয় না। উপরোক্ত আয়াত কয়েকটিতে স্পষ্ট নীতি নির্ধারণের সুযোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে- প্রথমে আলোর পরিবেশে জ্ঞানের সর্বপ্রকার কল্যাণ রূপ সন্ধান করতে এবং অতঃপর কর্ম সম্পাদনের 'আমলনামা'র ভাণ্ডারকে সাফল্যজনকভাবে পরিপূর্ণ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নরনারীর এ ভূমিকা। আর এ ভূমিকার অবলম্বন ও সাফল্য অর্জন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। সে দায়িত্ব অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আপনা আপনি পালন করা সম্ভব হয় না। পরিবারের পিতা-মাতার প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সামাজিক পর্যায়ে সমাজ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার

www.pathagar.com

ভূমিকাও প্রয়োজনীয়। তেমনি আবার প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বাঙ্গীন কল্যাণমুখী (রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক) লক্ষ্যের সমন্বয়ে উন্নয়ন প্রয়াসের। তারই পটভূমিতে মানুষ (নরনারী) সর্বক্ষেত্রে কর্মসাহায্যে সৃষ্টি করবে বাঞ্ছনীয় ও কাঙ্ক্ষিত রেকর্ড। সে রেকর্ডই অদৃশ্যভাবে প্রত্যেক মানুষের গললগ্ন হয়ে থাকবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

২. ইসলামী জীবন বিধানে উপরোক্ত কর্মপ্রেরণা ও কর্ম সম্পাদন লক্ষ্যকে পার্থিব জীবনে দায়িত্ব হিসেবে বক্তিগতভাবে পালন করলে তার সমষ্টিগত জাতীয় ফল হয় সামগ্রিক সাফল্য। তাতেই প্রমাণিত হয়- ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে মানুষ ও জাতির পক্ষে সক্রিয় প্রয়াসের গুরুত্ব। [আল্লাহ্ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজকে পরিবর্তন করে (সূরা রা'দ ঃ ১১) এবং আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি (বনী ইসরাঈল ঃ ১৩) একসঙ্গে বিশ্লেষণ করলে এ গুরুত্ব সুন্দরভাবে বোঝা যায়]। ইসলামী জীবন বিধানের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সে গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে শ্রেষ্ঠ 'রেকর্ড' সৃষ্টির সহায়তা করে। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে ও আচরণে ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি, পথচ্যুতি, অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতির অনুসরণ ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতি ব্যবস্থায় নির্বাসিত হয় সেই নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কারণেই। কর্ম ও আচরণের নির্ধারিত মান ও ন্যায় বিচার রক্ষা করে চলার তাকীদ রয়েছে অদৃশ্য রেকর্ড রক্ষার ও পরকালের হিসেব-নিকেশের দিনে সে রেকর্ডের মুখোমুখি হওয়ার ব্যবস্থার জন্য। ভোগ ব্যাপারে, সঞ্চয় ব্যাপারে, জীবনোপকরণের পণ্য, ফসল ও সার্ভিস উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যাপারে, উৎপন্ন পণ্য ইত্যাদির সমষ্টিগত আয় বণ্টন ব্যাপারে যার যার নিজস্ব আয় অর্জন ব্যাপারে এবং আর ব্যয় করার ব্যাপারে ইসলামী নীতিও দিক-নির্দেশনা সম্পর্কিত দায়িত্ব ও (অন্যান্য দায়িত্বের সঙ্গে) পালিত হচ্ছে কিনা উক্ত রেকর্ডের মুখোমুখি হলেই প্রত্যেকের চোখের সম্মুখে কম্পিউটারের রেকর্ড করা লিপির মতো প্রকাশ পায়। প্রশ্নাতীতভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দায় (Liabilities) ও সম্পদের (Assets) ব্যালেন্সশীট প্রত্যেক মানুষের চোখের সম্মুখে প্রকাশিত হবে। এমনি ব্যবস্থাপনার অধীনে মু'মিন মুসলিমের জন্য পার্থিব জীবন আর তার উপযোগী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা হবে উপরোক্ত দীর্ঘতম মেয়াদী জীবন লক্ষ্যের সঙ্গেই সমন্বয়ভুক্ত।

৩. জীবনকে সংগঠিত করার জন্য মানুষের রয়েছে পথ নির্বাচনের এবং নীতি নির্বাচনের সীমিত অধিকার। স্বাধীন চিন্তাকে ইসলামী জীবন দর্শনের যুক্তবাদের

www.pathagar.com

কাঠামোতে ব্যবহৃত হবে সে অধিকার। প্রথমেই তাকে সম্মুখীন হতে হবে মৌলিক পথ নির্বাচন প্রশ্নের ঃ কোন্ পথ আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র সত্য, সহজ ও সরল পথ, না অসত্য, বক্র মুশরিকী পথ ? সে নির্বাচন একবার হয়ে গেলে পরবর্তী নির্বাচনগুলো হবে নির্বাচিত পথেরই অনুসরণে দায়িত্ব সম্পূর্ণ মানুষের নিজের, তার আত্মার,তার চেতনার, তার বিবেকের। সব ব্যাপারেই অর্থনৈতিক ব্যাপারসহ। তাই তো স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে যে সৎ (ও সরল সহজ-ইসলামী) পথ নির্বাচন করবে, তার নিজস্ব মঙ্গলের জন্য কল্যাণ অর্জন করার জন্যই করবে আর যে সে পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন পথে চলবে সে তার নিজস্ব অমঙ্গল ও অকল্যাণকেই নির্বাচন করে। সুতরাং এ নির্বাচন পার্থিব ও পরকালের সমন্বিত মঙ্গল অর্জনের লক্ষ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্র উদ্দেশ্য তাই। মানুষ যদি দায়িত্বহীনভাবে নির্বাচন অধিকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে সে তার নিজস্ব কল্যাণ উপার্জনের লক্ষ্য অর্জনেই ব্যর্থ হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কল্যাণ উপার্জনের ইসলামী লক্ষ্যও তার অর্জিত।

৪. নিজের জন্য, পরিবারের জন্য সমাজের জন্য আচরণ ও জীবিকা অর্জন/ব্যয় সম্পর্কিত (এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোতে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত) দায়িত্ব পালনের বোঝা হস্তান্তরযোগ্য নয়। দায়িত্ব যার, দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কল্যাণ/অকল্যাণের হিসেব ও তার যার যার দায়িত্ব যে পর্যায়ে যে স্তরে যেমন মান ও পরিমাপে নির্ধরিত রয়েছে নির্বাচিত পথটির মানদণ্ড বা নীতি আদর্শ হিসেবে সেভাবেই সূক্ষ্ম ও বিশদভাবে হিসেব-নিকেশের ব্যালেন্স শীট তৈরি হচ্ছে ও হতে থাকবে-সাধারণ মানুষের সাধারণ মানদণ্ড অনুসারে সমাজেরও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয়দের হচ্ছে ও হতে থাকবে তাদের প্রযোজ্য বিশিস্ট মানদণ্ডে। তেমনি আবার হবে পরিবারের পিতা-মাতার বেলায় তাদের মানদণ্ডে এবং সন্তান-সন্তুতিদের হবে তাদেরই প্রযোজ্য মানদণ্ডে।

৫. সম্মিলিত সমন্বিতভাবে (Consolidated) হিসেবে দাঁড়াবে সামগ্রিক ব্যালেন্স শীট ও তার পরিণতিতে প্রাপ্য পুরস্কার বা শাস্তি। পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অগণিত বার চলে দৃষ্টি আকর্ষণ, যাতে মানুষকে অমঙ্গল ও অসত্য থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। শাস্তি যদি অনিবার্যই হয়ে পড়ে পার্থিব জীবনের মেয়াদে রাসূল প্রেরিত হন সতর্ক করার জন্য আরো বিশিষ্টভাবে যাতে রক্ষা করা যায় পার্থিব পর্যায়ের বিপর্যয় থেকে। অতঃপর পরকালের জীবনে অকল্যাণের বোঝার পরিণতিতে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে দোযখের অগ্নি আর কল্যাণ অর্জনের কৃতিত্বের জন্য রয়েছে

www.pathagar.com

জান্নাতের চিরশান্তি। সে জন্যই ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক আচরণ ও কাজ ইসলামী নীতির দিক থেকে দায়িত্বশীল আচরণও কাজ।[৪]

- অধ্যাপক রায়হান শরীফ

প্রমাণপঞ্জী

১. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, বাংলা অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন (বাংলা) ৭ম খণ্ড।

৩. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran, Lahore, p. 691.

৪. Prof. Raihan Sharif, Islamic Economics. IFB, 1985 (of. "The Foundation of Islamic Ideology is personal responsibility for achieving the standards of behaviour spiritual, social and economic behaviour and accountability to Allah." P. 73)

www.pathagar.com

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ
جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ج يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ
وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا.
كُلاًّ نُّمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ط وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُوْرًا. اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط وَلَلْاٰخِرَةُ
اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً.

যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দিই। অতঃপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি। সে তাতে নিন্দিত বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে এবং যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌছে দিই এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত। দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের ওপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠত্বে শ্রেষ্ঠতম।

– সূরা নবী ইসরাঈল ঃ ১৮-২১

আয়াত চারটির তাফসীরভিত্তিক প্রেক্ষিত আলোচনা

(ক) মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ বাক্যটির সাহায্যে একটি তাৎপর্য প্রকাশ করা হয়েছে বলে মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর 'মা'আরেফুল কোরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যারা নিজেদের আমল দিয়ে শুধু ইহকাল লাভ করারই ইচ্ছা করে ও সদা সর্বদাই সে কামনা করে, তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারিত

www.pathagar.com

হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন উক্ত ব্যক্তি তার প্রত্যেক কর্মকে সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্য দিয়েই আচ্ছন্ন করে রাখে, পরকালের প্রতি কোন লক্ষ্য না থাকে। অন্য অবস্থার কথা পরবর্তী ১৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ বাক্য সাহায্যে। এখানে বলা হয়েছে মু'মিনকে উদ্দেশ্য করে অর্থাৎ মু'মিন যখন যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সে কাজ গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়। প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফির বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। পরবর্তী অন্য অবস্থাটি হলো মু'মিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

চেষ্টা ও কর্মের সঙ্গে سعيها শব্দ সংযুক্ত করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও প্রত্যেক চেষ্টা মঙ্গলকর ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না, বরং গ্রহণযোগ্য হবে যা পরকালের লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া ও না হওয়া শুধু আল্লাহ্ এবং রাসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। মনগড়াভাবে নয়। তফসীরে রূহুল মা'আনী, سعيها শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নাত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে এ কথাও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে অর্থাৎ কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় (অর্থাৎ সার্বক্ষণিক) হতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে কখনো করা হয় কখনো করা হয়নি, এরকম হলে পূর্ণ কল্যাণ অর্জন হয় না।

(খ) মাওলানা মওদূদী ঃ মাওলানা মওদূদী তাঁর তাফ্হীমুল কুরআন তাফসীরে পরবর্তী ১৯ ও ২০ নং আয়াতে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোকের পারস্পরিক পার্থক্যকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন এভাবে -

রিযিক সম্পর্কে

পার্থিব স্বার্থের পূজারীরা দুনিয়ার রিযিক ও জীবন সামগ্রী পেতে থাকে। পরকালকামী মু'মিনরাও সেসব থেকে বঞ্চিত হয় না। এ সবই আল্লাহ্‌র দান সবার জন্য। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে সেসব দান থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা বা অধিকার লাভ করেনি।

কিন্তু পরকালকামী মু'মিন লোকেরা অপর শ্রেণীর তুলনায় অনেক মর্যাদাবান। মর্যাদার পার্থক্যটি পার্থিব জীবনেও প্রকাশিত হয় এভাবে ঃ পরকাল-কামীদের খাওয়া, পরা, আবাস, যানবাহন ইত্যাদি ব্যয়বহুলতা ও চাকচিক্যের দিক থেকে মর্যাদাবান না

www.pathagar.com

হয়ে মর্যাদা বহন করে অর্জন-উপার্জনের পদ্ধতির দিক থেকে। তাদের পদ্ধতি হয় সত্য, সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ইত্যাদি মানদণ্ডের প্রয়োগের দিক থেকে মর্যাদাপূর্ণ। অন্যদিকে পার্থিক স্বার্থের পূজারীরা এ সকল মানদণ্ড বর্জন করে এবং অসত্যের ও অবিচার, অত্যাচার ও দুর্নীতির পথ ধরে সম্পদ ও রিযিক উপার্জন তার হস্তগত করে।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

পূর্ববর্তী সুরা ইবরাহীম-এর আয়াত নং -৩-এ ইতিপূর্বে আলোচনাধীন ছিল কাফির বা মুশরিকদের জীবন পদ্ধতি পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যহীনতার কথা। পার্থিব জীবনের জড় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যই তাদের জীবনের অবলম্বন। তেমনি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক কাঠামোতে তারই নিদর্শন থাকবে। বর্তমান আলোচনাটিতে আরো একটু স্পষ্টভাবে কাফির (মুশ্‌রিক) শ্রেণীর অর্থনৈতিক জীবনধারাকে মু'মিন শ্রেণীর জীবন ধারার সঙ্গে তুলনা করে পার্থক্য চিহ্নিত করা যায়।

যেক্ষেত্রে একটি দেশে ইহকালকামী ও পরকালকামী দু'টি সম্প্রদায়েই নিজ নিজ অবস্থানে জীবন পরিচালনা করতে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে অর্থনীতি সামগ্রিক রূপ নিতে সক্ষম হয় না এবং শ্রেণীগতভাবে পাস্পরিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি মূল্যায়নের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হিজরতের প্রাককালে তওহীদের দাওয়াত গ্রহণকারী মু'মিন সম্প্রদায় মক্কা শহরে কিছু এবং বাইরের অঞ্চলে গোত্রে গোত্রে দু'চারজন করে বিস্তৃতভাবে অবস্থান করছিল। তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আচরণের সঙ্গে অর্থনৈতিক আচরণ ওহী ভিত্তিক আল্লাহ্‌র আদেশ এবং হাদীসভিত্তিক রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুসরণ করেই চলেছে। আহারের খাদ্য সম্পর্কে, হালাল-হারাম বিধি পালন সম্পর্কে ইয়াতীমদের হক আদায় করা সম্পর্কে ইত্যাদি নানা দিকে ইসলামী জীবন বিধান অবলম্বন মাধ্যমে তাঁদের মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সমাজবোধ ভিন্ন কাঠামোতে গড়ে উঠছিল, বিশেষ করে ইহকাল-পরকালের লক্ষ্যে সমন্বয় সাধনের আদর্শ। সে আদর্শ অর্থনৈতিক আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে মু'মিনের জীবনের উপযোগী করে প্রয়োজনীয় পার্থিব সুখশান্তিও অভাবমুক্তিও এনেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে অর্থনীতি ও সমাজ সংগঠন তখনও সম্ভব হয়নি। তাই কাফিরদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাদের পুরাতন ঐতিহ্যকে ভর করে শুধু পার্থিব জীবনে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যেই প্রচলিত ছিল। সে সব পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান পার্থিব লক্ষ্যের অনুসরণেই চলছিল। সে আদর্শহীন এবং পারলৌকিক লক্ষ্যহীন জীবন বিধানের বিরুদ্ধেই আল্লাহ্‌র ওহী এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের

www.pathagar.com

আহ্বান। এ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তিত রূপেরই স্পষ্ট গোড়াপত্তন এবং বিবর্তনের ক্রমবিকাশ হয় মদীনাতে হিজরতের পরে। নতুন ইসলামী রাষ্ট্র সমাজ ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার পরে।

বর্তমানকালের জীবনের পরিস্থিতিতে নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইহকালে বিশ্বাসী মানুষেরা ইহকালের অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রতি আকৃষ্ট। ভোগ-বিলাসের দিক থেকে সর্বোচ্চ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভই তাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ্ই তাঁর সৃষ্ট সম্পদ ব্যবহার থেকে তাদের বঞ্চিত করেন না। ইহকালকে পরকালের জীবনের সাফল্যের উপযোগী করে পরিকল্পিত করার সুযোগ তাদের দেওয়া হয়েছে এবং সে লক্ষ্যই যে সর্বোত্তম লক্ষ্য তার পথ নির্দেশ ইসলামী দর্শন এবং অর্থনীতিতে রয়েছে। তবু সে পথ নির্দেশ উপেক্ষা করেই তারা নিজস্ব ভ্রান্তিমূলক পথ নির্বাচনের জন্যই বিপথগামী হয় আর বিপথ গমনকে সত্যপথ অনুসরণ বলে দাবি করে নিষিদ্ধ ভোগ-বিলাস ও আচরণ নিয়ে গর্ব অনুভব করে। এতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নৈতিকতাহীন ইসলামী আদর্শহীন পদ্ধতিতে গড়ে ওটে, যার ফলে সে সমৃদ্ধি সমাজে আনে অকল্যাণ। উৎপাদনের দিক থেকে, ভোগের অবাঞ্ছিত রূপের ধরনে, সমন্বয়হীন ন্যায়বিচারহীন বণ্টন ব্যবস্থার অসামাজিকতায় এবং দুর্নীতি আর অপরাধ প্রবণতার মারাত্মক আত্মপ্রকাশে। বর্তমানকালে সমৃদ্ধ উন্নত দেশের সমাজেও তারই ভয়াবহ রূপ প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুন্নত দেশের সমাজেও তার ভয়ংকর প্রভাব পড়ছে এবং বিস্তার লাভ করে যাচ্ছে। মানুষেরই নিজস্ব ভুলের জন্য আয়াত চারটিতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, যে মানবগোষ্ঠী এমনি শুধু ইহকালের সমৃদ্ধিই শুধু চাইবে এবং পরকালের লক্ষ্যের কথা বর্জন করতে চাইবে, আল্লাহ্ সে মানবগোষ্ঠীকে তার নির্বাচিত পন্থার সমৃদ্ধিই দেবেন অর্থাৎ সে সমৃদ্ধি অর্জনের পথ রোধ করবেন না। বরং পরকালের সাফল্যের লক্ষ্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে বর্জন করলে আল্লাহ্ সে মানবগোষ্ঠীর ভুল পথযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে দেন, যাতে অবনতি আধোগতির অকল্যাণ সত্বর প্রকাশ পেতে থাকে এবং ধ্বংসের পথ নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি অর্থনীতির প্রক্রিয়াতেই ভুল পন্থা অবলম্বনের জন্য সঠিক মূল্যবোধ ও সমাজবোধ মানুষের উপলব্ধিতে লোপ পেতে থাকে। অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পারিবারিক ব্যক্তিগত ও সামাজিক শান্তি তাই লোপ পেতে থাকে। অর্থের প্রাচুর্য থাকে, গোষ্ঠীগত বা জাতিগত সমৃদ্ধির অহংকার থাকে, কিন্তু মানুষের সম্মিলিত সমাজের সুখ-শান্তি থাকে না। এমনকি অর্থই অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্পদই অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

সেজন্যই স্মরণ করে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন ব্যক্তিত্ব চরিত্র নিয়ে ইসলামী আদর্শের অধীনে সদা-সর্বদাই পরকালের কল্যাণ লাভের লক্ষ্যে ইহকালের অর্থনৈতিক ভোগ, উৎপাদন বণ্টন ইত্যাদি কাজকে পরিকল্পিতভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং সামাজিক পর্যায়ে সম্পন্ন করে চলে তাদের প্রয়াস আল্লাহ্র কাছে স্বীকৃত। কারণ সে প্রয়াসই সর্বোত্তম ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

গ্রন্থপঞ্জি

১. মা'আরেফুল কোরআন, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.)।

২. তাফহীমুল কুরআন, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

www.pathagar.com

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا. وَلاَتَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.

নিজেদের হাত গলার সহিত বেঁধে রেখো না এবং উহাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না, তা করলে তোমরা নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। তোমার রব যার জন্য চান রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সবার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন এবং তাদেরকে দেখছেন। আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা একটি বিরাট অপরাধ। – সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯-৩১

আয়াতসমূহের সাধারণ তাৎপর্য

উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রথমত খরচের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এমন কৃপণ হওয়া সঙ্গত নয় যে, সে প্রয়োজনীয় খরচও করে না- তা তার নিজের জন্য হোক বা অন্যের জন্য বা পরিবারের জন্য হোক। কৃপণতা ধন-সম্পদের আবর্তন ব্যাহত করে এবং অপচয় ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে নষ্ট করে। তারপর বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে রিযিক বিতরণের ব্যাপারে কম বেশির পার্থক্য করেছেন। অবশ্য এ অসাম্য আল্লাহ্র নিয়মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তারপর বলা হয়েছে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা যাবে না। সন্তানের রিযিক তেমনি আল্লাহ্ দেন যেমন দেন তাদের পিতামাতার রিযিক। সন্তান হত্যা করা একটি বড় অপরাধ। এ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা চিরতরে সন্তান হত্যার রেওয়াজ বন্ধ করে দিয়েছেন। তা অভাবের ভয়ে হোক বা অন্য কারণে হোক। প্রকৃতপক্ষে আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া সব হত্যাই নিষিদ্ধ বা হারাম।

www.pathagar.com

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

সাইয়্যেদ আবুল 'আলা মওদূদী এসব আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ 'হাত বাঁধা' একটি রূপক কথা। তা হতে বোঝায় কার্পণ্য। যার হাত খোলা, ছেড়ে দেওয়ার অর্থ অপচয় বেহুদা খরচ করা। লোকদের মধ্যে যতদূর মধ্যম নীতিবোধ থাকা আবশ্যক যে তারা না কৃপণ হয়ে ধন-সম্পদের আবর্তনকে ব্যাহত করবে, আর না অপচয় ও অপব্যবহারকারী হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিকে বিনষ্ট করবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন এক নির্ভুল অনুভূমি বর্তমান থাকবে যে, তারা প্রয়োজনীয় খরচ হতে বিরতও থাকবে না এবং বেহুদা খরচের বিপর্যয়েও তারা নিমজ্জিত হবে না। অহংকার, রিয়া ও লোক দেখানোর জন্য আয়-ব্যয় বিলাসিতা ও পাপ কাজে অর্থ ব্যয় আল্লাহ্‌র নিয়মের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা। যেসব লোক নিজের ধনদৌলত এসব পথে ব্যয় করে তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ভাই।"

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে রিযিক বিতরণের ব্যাপারে যে কম-বেশীর পার্থক্য রেখেছেন মানুষ তার কল্যাণকারিতা বুঝিতে পারে না। এ বাক্যটি দ্বারা যে স্বাভাবিক নিয়মের দিকে অঙ্গুলি সংকেত রাখা হয়েছে তার দরুন মদীনার সমাজে সংশোধনমূলক কর্মসূচিতে এই কথা মনে করার কোন কারণই কখনও দেখা দেয় নি যে, রিযিক উপার্জনের উপায়-উপাদানে কম-বেশী হওয়া মূলতই খারাপ জিনিস। কাজেই উহাকে নির্মল করা এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে মদীনা শরীফে মানবীয় সমাজকে সুস্থ ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা ছিল এই যে, আল্লাহ্‌র সম্মত নীতি মানব সাধারণের মধ্যে যে পার্থক্য রেখেছে উহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে এবং পূর্বোক্ত হেদায়াত অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা, চালচলন ও কর্মনীতির এমন সংশোধন করে দিতে হবে যে, অর্থ-সম্পদের পরিমাণ পার্থক্য যেন কোনরূপ জুলুম-না-ইনসাফীর কারণ হয়ে না দাঁড়াতে পারে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈলের ২৯ ও ৩০ নং নোট হতে উদ্ধৃত)।

মুফতী মুহাম্মদ শফী ৩০ নং আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

"জাহিলয়াতের যুগে কেউ কেউ জন্মের পর পরই সন্তানদের বিশেষ করে কন্যাদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কর্মপন্থাটি যে জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিক-দাতা কে ? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্‌র কাজ। তোমাদেরকে তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি

www.pathagar.com

তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ। (মা'আরেফুল কোরআন, সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ নং আয়াতের তাফসীর)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

প্রথম দু'টি আয়াতে (২৯ এবং ৩০ নং) রিযিক এবং তা থেকে ব্যয় সম্পর্কিত নীতির প্রতি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সূরার পূর্ববর্তী অন্য দু'টি (২৬ ও ২৭) আয়াতের সঙ্গেও উক্ত নীতি বিশ্লেষণের সম্পর্ক রয়েছে। তা ছাড়া মৌলভাবে সূরা বাকারার ২নং আয়াতে যে মু'মিনের চরিত্র-বিশেষত্ব বোঝাবার প্রেক্ষিতে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ বলা হয়েছে তার সঙ্গেও যথেষ্ট বিশ্লেষণ প্রেক্ষিতে সম্পর্ক লক্ষণীয় (এ সম্পর্কে সূরা বাকারার উল্লিখিত ২ নং আয়াত নিয়ে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ব্যয়নীতির নির্ধারণে ইসলামী অর্থনীতির জন্য ধর্তব্য কাঠামো হলো প্রধানত তিনটি ঃ (১) ইসলামী ঈমানে প্রতিষ্ঠিত মানুষের জীবনধারা ও আধ্যাত্মিক আচরণ-শৃঙ্খলার বিদ্যমানতা (সালাত, যাকাত ও রিযিকের সমন্বয় সাধন যার জন্য সম্ভব); (২) আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের অধীনে উৎপাদন, বিতরণ ও জীবন যাপন ব্যবস্থার সংগঠন (যাকাত, সাদাকাত, সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য অনুসরণ এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয় বর্জন যাতে সম্ভব হয়); এবং (৩) রিযিক, আয় উপার্জন ও সম্পদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে ব্যয়নীতিতে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা (যার ফলে বাঞ্ছনীয় মাত্রার তুলনায় অল্প ব্যয়ে কার্পণ্যের আচরণ সমর্থিত না হয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে অপব্যয় ও ভ্রান্তিমূলক সম্পদ বিনাশ দেশ ও অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করে)।

উপরোক্ত কাঠামোর যুক্তিতে আমরা বিশেষ করে অনুধাবন করতে পারি একটি মৌল কথা ঃ ইসলামী জীবনদর্শনের অন্তর্গত হলো ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং সে নীতিমালা কাঠামোর শৃঙ্খলার অধীনে ক্রিয়াশীল হলো অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। (উদ্যোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা, বিতরণ ও ভোগ ব্যবস্থা, সম্পদ ও আয়-উপার্জনের ব্যয় ব্যবস্থা)। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া মাধ্যমে একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে যথাযথভাবে পরিচালিত না করলে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে ব্যয়নীতিকে কোন যুক্তিবাদ দিয়ে মানবতার দিক থেকে ও সামগ্রিক কল্যাণের দিক থেকে পরিচালনা করা অবাস্তব প্রয়াস। সে কথা স্মরণ রেখেই এখানে ব্যয়নীতি সম্পর্কে লক্ষণীয় হলো ঃ (১) অমিতাচারী, অমিতব্যয়ী ও অপচয়কারী (সর্বক্ষেত্রে সর্বব্যাপারে) প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ বিরোধী (তাই শয়তানের ভাই), (আয়াত নং ২৭) এবং (২) ব্যয়ের হাতকে যে বেঁধে

www.pathagar.com

রাখে অথবা দিগন্ত প্রসারিত করে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক আচরণ নিন্দনীয় আর দৈন্য সৃষ্টিকারী (আয়াত নং ১৯) একটা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুস্থতা ও সচ্ছলতা এবং তার কারণে মানুষের কর্মসংস্থান, আয় উপার্জন ক্ষমতা, উৎপাদনের ও পণ্য সরবরাহের সন্তোষজনক অবস্থা, সাধারণ দ্রব্য মুল্যহার, সকল স্তরের মানুষের জীবন ধারণের স্থিতিশীলতা ইত্যাদি বহুবিধ পরিণতি নির্ভর করে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে আল্লাহ্ নির্দেশিত বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় ভোগ্য পণ্য, পুঁজিদ্রব্য (যন্ত্র ইত্যাদি রূপে রূপান্তরিত করার উপর, সে সবের বিতরণ ব্যবস্থাকে ন্যায়বিচার ভিত্তিক করার উপর যাতে আয় উপার্জন হিসেবে সংকীর্ণ তাৎপর্য রিযিক লাভ ও মানুষের জন্য ন্যায়ভিত্তিক হয় এবং সে রিযিক থেকে নিজের জন্য, পরিবারের সদস্যদের জন্য, প্রতিবেশী অভাবগ্রস্তদের জন্য, এমনকি অপরিচিত অভাবগ্রস্ত পথিকের বিশেষ অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয় অর্থাৎ এভাবে সম্পদের ও আয়ের বন্টন দিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণকে সার্বিকভাবে ন্যায় বিচারভিত্তিক করা সম্ভব হয়।

অর্থনৈতিক সামগ্রিক পদ্ধতিতে (Macro analysis) বা সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে কেইন্সীয় তত্ত্ববাদ প্রয়োগ করে বর্তমানকালে দেখানো হয়, সম্পদের বৃত্তাকার ঘূর্ণন (circular flow) সাহায্যে উপার্জিত আয় থেকে আসে দু'টি প্রক্রিয়া ঃ (১) ব্যয় মাধ্যমে ভোগ এবং (২) সঞ্চয় এবং সঞ্চয় থেকে আসে পুঁজি বিনিয়োগ investment আর পুঁজি সংগঠন (capital formation)। এখানেই ভারসাম্য (equilibrium) রক্ষার প্রয়োজন আছে। অর্জিত আয় থেকে সামান্য ব্যয় করে কৃপণের মত বাঁচার জীবন যাপনকে দেশের মানুষ যদি অধিকাংশই গ্রহণ করে এবং অব্যবহৃত আয়কে স্বর্ণ-রৌপ্যের আকারে লুকিয়ে রেখেই তৃপ্তি লাভ করে, তা হলে সামগ্রিকভাবে এ পদ্ধতি সমাজের সকল মানুষের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সৃষ্টি করবে না। কারণ অব্যবহৃত গচ্ছিত গোপন আয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতে পুঁজি বিনিয়োগ এবং পুঁজি সংগঠনে সাহায্য করছে না। ফলে পূর্বেকার বিদ্যমান পুঁজি সংগঠন থেকে সামান্য পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ চলতে থাকবে এবং কালক্রমে সে ধারাটিও ধীরে ধীরে মরুপথে ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর মতো শুষ্ক হয়ে যাবে। দেশের অর্থনীতিই ভয়ংকর পণ্য দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে। তেমনি আবার আয়ের সব অংশই যদি মানুষ ভোগ্য পণ্য সেবা ক্রয় এবং ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলে, উদ্বৃত্ত রাখে না, সঞ্চয় করে না, পুঁজি সংগঠনে এবং নতুন পণ্য উৎপাদন আর বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থার সংরক্ষণও করে না, সে ক্ষেত্রেও একই শোচনীয় পরিণতি আসবে। অর্থনীতির

www.pathagar.com

অবনতি মানুষকে দুর্ভোগ ও দুর্দশায় নিক্ষেপ করবে। সেজন্যই আল-কুরআন ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতির আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য নীতির উপর জোর দিয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট মানব কল্যাণের ব্যবস্থাপনা রক্ষার উদ্দেশ্যে। তার জন্য ব্যক্তিগত আচরণ থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মাধ্যমে উপরোক্ত ভারসাম্য নীতির বাস্তবায়নকে সুনিশ্চিত করেছে।

এমনি ভারসাম্য নীতির বাস্তবায়নকে সুনিশ্চিত করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যে সকল মানুষ নিজস্ব ভ্রান্ত চেতনার অহংকার ভারসাম্যের পথ বর্জন করে, তাদেরকে ইসলামী জীবন দর্শনের আদর্শবাদের যুক্তিতে সতর্ক করে দিলেও দুর্ভোগ-দুর্দশার পরিণতি ঘাড়ে এসে পড়ার আগে তারা আত্মবিশ্লেষণ করে না, অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির মুল্যায়নও করে না আর নীতির যথাযথ সংশোধন বা সংস্কারও করে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ববোধের ব্যবহার করে না বলেই তা করে না।

সেজন্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে (৩০ নং আয়াতে), রিযিক তো প্রচুর পরিমাণে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা তাঁর সকল বান্দাদের জন্য। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পৃথিবীর অভ্যন্তরে, আকাশে বাতাসে অর্থাৎ সারা বিশ্ব সৃষ্টিতে। সে ব্যাপক পরিধির আল্লাহ্ প্রদত্ত দান বা উপাদান-উপকরণকে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির সমন্বিত ও ভারসাম্যমূলক ব্যবহার সাহায্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং যথাযথ মানব কল্যাণে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা বান্দাদেরই দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেই অকল্যাণ সৃষ্টির পাপচক্রের হয় আবির্ভাব। যুদ্ধ-বিগ্রহ, উপনিবেশবাদী আক্রমণ, অত্যাচার, রাষ্ট্র ও প্রকৃত সমাজের ভাঙ্গা-গড়া, ভারসাম্যমূলক ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক রিযিক বা উপাদান-উপকরণের ব্যবস্থার হয় আমূল পরিবর্তন। তার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে আসে বৈষম্য, শোষণ, অবিচার, মৌল সম্পদের দৈন্য, ব্যবস্থাপনার দৈন্য, উৎপন্ন দ্রব্যের (পুঁজি দ্রব্য ও ভোগ্য পণ্য দুইয়েরই) দৈন্য, কর্মসংস্থানের স্বল্পতা ও আয় উপার্জনের সংকীর্ণতা। তারই ফলে সৃষ্টি হয় ধনী দেশ ও দরিদ্র দেশ, উন্নত দেশ ও অনুন্নত দেশ এবং উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের মতো উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র দেশ আর অর্থনীতি। শেষোক্ত দেশ ও অর্থনীতির জন্য সৃষ্টি হয় বিপুল অভিশাপরূপী দৈন্য আর বেকারত্ব। সকল বান্দাদের জন্য প্রদত্ত সম্পদের ভিত্তিগত পরিস্থিতিতে ন্যায়-সম্মত অবস্থান এ সকল দেশে এখন আর নেই। শোষক মানুষের অবিচার ও অন্যায় আচরণ এর অন্যায় নীতি অনুসরণের জন্যই নেই। এমনি অমানবিক-ভাবে সৃষ্ট ভারসাম্যহীন দেশ ও সমাজের পরিস্থিতিতে বর্তমান কালে দৈন্য ও বেকারত্বের কাঠামোতে কিভাবে জনসংখ্যা সমস্যার মুকাবিলা করার জন্য ইসলামী বিধানকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে তাই হলো পরবর্তী ৩১ নং আয়াতের বিশ্লেষণের প্রধান তাৎপর্য।

www.pathagar.com

১. প্রথমত, এ প্রসঙ্গে নীতিগতভাবে এ কথা বলা চলে যে, মানুষের আয় উপার্জনের যে স্বাভাবিক অসাম্য বিদ্যমান (মানুষের স্বাভাবিক গুণাগুণ, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োগ কারণে) তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ শুভ, তাকে কৃত্রিমভাবে সমান করে দেওয়ার নীতি ইসলামী রাষ্ট্রের ও সমাজের বিবেচ্য নয়। কট্টরপন্থী সমাজতন্ত্রবাদ সেদিকে চেষ্টা করে অকল্যাণ সৃষ্টিই প্রত্যক্ষ করেছে এবং সে পন্থা পরিত্যাগ করেছে–যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার ও চীন দেশের সাম্প্রতিক আমূল পরিবর্তিত নীতিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট (অতীতের শোষণ ও অবিচারের জন্য) অসাম্য ও দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ আল্লাহ্ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সেই জাতি তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্রিয় হয়। এ দায়িত্ব বর্তমানকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে যথাসম্ভব পালন করা প্রয়োজন।

২. দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যাকে উপরোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূরা আন'আমের ১৫১ নং আয়াতের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে তার আলোচনা করা হয়েছে। তবু সংক্ষিপ্ত যেটুকু পুনরুল্লেখ এখানে প্রয়োজন, তা হলো সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরে তাকে হত্যা করা যায় না এবং স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রীর ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান লাভ করে, তারপরে তাকে গর্ভপাত মাধ্যমে নিঃশেষ করাকেই সন্তান হত্যা হিসেবে অপরাধ ও নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. তৃতীয়ত, আধুনিক পদ্ধতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বন ব্যাপারে আধুনিক ফকীহ্দের মধ্যে মতামতে বিভিন্নতা রয়েছে। অনেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শরীয়াহ্ সঙ্গত বলেন নাই।[১] আবার অন্যরা সঙ্গত বলে ধরেছেন।[২] আবার দেখা যায়, ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও. আই. সি.) ফিকাহ্ একাডেমীর কুয়েত বৈঠকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্গণ মত প্রকাশ করেছেন, যে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ ইসলাম সম্মত।[৩]

৪. চতুর্থত, সামগ্রিক প্রেক্ষিতে এবং জাতীয় আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে বর্তমানকালের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, সম্পদের উদ্বৃত্ত আর জনসংখ্যার স্বল্পতা যে সব মুসলিম দেশে রয়েছে, সেখানে প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয় বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উৎসাহ দান নীতি। দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য,

www.pathagar.com

বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতার এবং অতীতের উপনিবেশবাদী শোষণের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিত-করণ। তার জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে জন্মহার হ্রাস ইসলামী বিধানমতে সঙ্গত বলে অভিমতকেই সমর্থন করা যায়। তাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে জাতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রমের অন্তর্গত করাই যুক্তিযুক্ত। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অপব্যবহার করে সামাজিক দুর্নীতি ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌন স্বেচ্ছাচারের সুযোগ দিয়ে যেন অকল্যাণ সৃষ্টি না করা হয় সে দিকে পূর্ণ সচেতনতাসহ মনোযোগ এবং কর্মপন্থা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন।[৪]

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

এবং

শাহ্ আবদুল হান্নান

প্রমাণপঞ্জি

১. এ আলিমদের মধ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। –ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

২. এদের মধ্যে ইউসুফ আল-কারযাভী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশিত ইসলামে হালাল হারাম বিধান) হাম্মুদাহ্ আবদুল আতী The Family Structure in Islam, published by American Trust; Publication's (U. S. A.) উল্লেখযোগ্য।

৩. দৈনিক ইনকিলাব ১৮/১২/৮৮ ইং তারিখে প্রকাশিত খবর।

৪. Prof. Raihan Sharif, Islamic Economy; Concept of Rizq, Islamic Foundation Bangladesh, Publication 1986 (Vide chap. pp. 66-67, esp.) population discouragement (and hence reliance on fertility control) has in such cases to be integrated into the stategies of socio-economic department.

www.pathagar.com

যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্কে আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ পশু সম্পদ সৃষ্টি করেছেন, যা ভার বহনে ও যোগাযোগ সহায়তা দান করে থাকে। আজও অনেক উচ্চ স্থানে, বনে-জঙ্গলে ও মরুভূমিতে পশু যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে (সূরা নাহ্‌রের আয়াত নং-৫-৮ এর আলোচনা দ্রষ্টব্য) এ সূরার ৭০ নং আয়াতেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলভাগকে নৌযানের গুরুত্ব বোঝা যায়। বিশাল সমুদ্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলভাগকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নৌযানের মাধ্যমে এ সবের মধ্যে যোগাযোগ সংস্থাপন করা হয়। তেমনিভাবে মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদ আহরণে নৌযানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অনুসন্ধানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সমুদ্র..... ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এ সব অনুসন্ধান করা মানুষের দায়িত্ব। অনুগ্রহ বলতে অনেক কিছু বোঝাতে পারে। প্রথমত এর দ্বারা আল্লাহ্‌র দেয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ বোঝানো যেতে পারে, যা আহরণ-অর্জন করে মানবজাতির প্রয়োজন মেটানো যায় ও তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা যায়। এর দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যে জ্ঞানভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে (যা মানুষের কল্যাণকর), তা অর্জন করাও বোঝানো যায়।

এ আয়াতে এই ইশারাও পাওয়া যায় যে, সমুদ্রে সম্পদ আহরণে সব জাতির অধিকার রয়েছে। সে জন্য সমুদ্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে না রেখে আন্তর্জাতিক থাকাই সঙ্গত মনে হয়।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ط
اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। – সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬৬

আয়াতের প্রেক্ষিত

এ আয়াতের প্রেক্ষিত বুঝতে হলে এ রুকূর প্রাথমিক কথাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তাতে বলা হয়েছে যে, ইবলিস সৃষ্টির প্রথম দিন হতে মানব সন্তানের পিছনে লেগে আছে। সে তাদেরকে নানাবিধ আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিলাষ ও মিথ্যা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির কুঞ্জজালে বেঁধে সর্বদা নির্ভুল পথ হতে ভূলিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে আসছে। সে প্রমাণ করতে চায় যে, মানুষ আল্লাহ্‌র দেয়া শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার যোগ্য নয়। এ বিপদ হতে মানুষকে যদি কোন জিনিস......উদ্ধার করতে পারে তবে তা শুধু এ যে মানুষ তার রবের বন্দেগীর উপর অবিচল থাকবে। হেদায়াত ও সাহায্যের জন্য কেবল তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এতদ্ব্যতীত আর যে পথই মানুষ গ্রহণ করবে, শয়তানের ফাঁকি ও ধোঁকা হতে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। এ আলোচনা হতে এ কথা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, সব লোক তওহীদের দাওয়াতকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে আর শিরক-এর উপর অবিচল থাকে, তারা......নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস সাধনে নিয়োজিত। এ সম্পর্কের কারণেই এখানে তওহীদকে প্রমাণিত ও শিরককে বাতিল করা হয়েছে।

–তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ৮২ নং টীকা

তাৎপর্য

এ আয়াতে সামুদ্রিক সফরের সাহায্যে যে সব অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফায়দা লাভ সম্ভব, সে দিকে ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র দেয়া

www.pathagar.com

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً.

নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম (রিযিক) জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর এদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। — সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০

আয়াতে উল্লিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতাংশের অর্থ

এ আয়াতে বিশ্বনিয়ন্তা মানবজাতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ অর্থাৎ রাব্বুল আলামীন নিশ্চিতভাবে আদম সন্তানকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। এ সম্মান ও মর্যাদায় মানুষ জাতি সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে। এ সম্মান ও মর্যাদা উদ্দেশ্যহীনভাবে দেওয়া হয়নি। এ মর্যাদার বিকাশ হবে মানুষের চাল-চলন, আচার-আচরণ ও কাজ-কর্মের মাধ্যমেই। এরপরই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষের মর্যাদাশীল কাজের দু' একটি দৃষ্টান্তও দিয়েছেন এবং তা হল وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ তাদেরকে স্থলে ও জলে চলা-চলের বাহন দিয়েছি। এই বাহনের সাহায্যে চলাচল করা একমাত্র মানুষের কাজ। সৃষ্টিকুলে যে সব জলজ প্রাণী আছে, তারা নিজেদের দেহের সাহায্যেই জলের মধ্যে চলাচল করে, অন্য কোনও বাহনে আরোহণ করে না। স্থলের প্রাণীরাও নিজেদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারাই স্থলে ভ্রমণ করে। পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়, তাও নিজেদের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাহায্যেই। প্রাণীকুলের কেউই কোনও বাহন তৈরী করে তার সাহায্যে জলে, স্থলে বা আকাশে ভ্রমণ করতে পারে না।

এর পরে আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ এবং তাদেরকে (মানুষকে) উত্তম এবং পবিত্র রিযিক বা জীবনোপকরণ দিয়েছি। رزق রিযিক শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এ দ্বারা শুধু খাদ্যদ্রব্য বোঝায় না। বরং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণই বোঝায়, এর মধ্যে রয়েছে অন্ন, বস্ত্র বাসস্থান, চিকিৎসা

www.pathagar.com

ব্যবস্থা ইত্যাদি সব। আর এ সব কি ধরনের হবে তা طيبات শব্দ দ্বারা ইরশাদ (ইঙ্গিত বা প্রকাশ) করা হয়েছে। এ দ্বারা ভাল এবং পবিত্র (Good and pure) উভয়ই বোঝান হয়েছে। এই ভাল এবং পবিত্র জীবনোপকরণ উত্তম জীবন মান (Good standard of living)-এরই প্রতীক। সৃষ্টিকুলের অন্য কোনও জীবকে এরূপ জীবনোপকরণ দেওয়া হয় নি। আর এ সব দিয়েই আল্লাহ্ মানুষকে অন্য সব সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ আয়াত সম্বন্ধে প্রখ্যাত তাফসীরকারদের আলোচনা

আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন কাসীর বলেন, মানুষ হল বিধাতার সুন্দরতম সৃষ্টি। সূরা ত্বীনে (৪ আয়াত) আল্লাহ্ বলেন, "আমিও মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি। সে তার কাঠামোতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং সঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারে, হাতের সাহায্যে বাছ-বিচার করে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। অথচ অন্যান্য জীব-জন্তু হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করে, মুখে ধরে খাবার, ঘাস, লতাপাতা, ফল ইত্যাদি ভক্ষণ করে। অন্যদিকে মানুষ পেয়েছে মেধা, বুদ্ধিমত্তা, যাতে সে তার লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে। দুনিয়ার সব কিছু উপকার-অপকার জেনে নিতে সক্ষম। তার চলাচলের জন্য বাহন হিসেবে স্থলভাগে রয়েছে চতুষ্পদ জন্তু যেমন উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি এবং জলভাগে নৌকা, জাহাজ আর এগুলো তৈরীর পদ্ধতিও তার জানা আছে, তাদের দেওয়া হয়েছে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু পানাহার; সামগ্রী ক্ষেত্র-খামার, ফুল-ফল, গোশ্ত, দুধ এবং রকমারি ভোজ্য, লেহ্য ও পেয় দব্যাদি। তাদের প্রদান করা হয়েছে সুরম্য অট্টালিকা, বসবাসের জন্য মনোমুগ্ধকর আবাসস্থল, রুচিশীল পোশাক, বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন প্রকারের, নানান রঙের। সে বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী স্থান হতে স্থানান্তরে আনা-নেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে সক্ষম। এ ভাবে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে তাকে দেওয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব।

এমন কি ফেরেশতারাও মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারেনি। তাফসীরের বিস্তারিত আলোচনায় জানা যায়। ফেরেশ্তারা আবেদন-নিবেদন করেও মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারেনি। দুনিয়ায়ও না, আখিরাতেও না।

তফসীরে তাবারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আদম সন্তানকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে সমুদয় সৃষ্টিকে তার অনুগত ও কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তফসীরে জালালাইন, সাফওয়াতুত তাফসীর, আলী হাসান, মা'আরেফুল কোরআন, তাফহীমুল কুরআন–এর তাফসীর

www.pathagar.com

থেকে উপরোক্ত বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ্ মানুষকেই জীবন ধারণের শ্রেষ্ঠ উপায়-উপকরণ দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এই আয়াতে স্থূল দৃষ্টিতে সরাসরি কোনও অর্থনৈতিক বিষয় নজরে না আসলেও একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে মানব জাতি সম্পর্কে এমন কিছু মৌলিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে, যার আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। এ আয়াতের প্রথম কথা হ'ল আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করা! কাউকে মর্যাদা দিলে সে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সে মর্যাদা রক্ষার জন্য তাকে আনুষ্ঠানিক আরও অনেক কিছু দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে অন্যত্র বলেছেন তিনি দুনিয়ায় মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। এই হিসেবে সৃষ্টিকুলের অন্য সব কিছুকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়েছে। এরই একটি উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, মানুষকে জলে-স্থলে চলাচলের জন্য বাহন দান করা হয়েছে। আর দেওয়া হয়েছে উত্তম পাক পবিত্র রিযিক বা জীবনোপকরণ। জীবনোপকরণ বলতে খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ এবং তার আসবাবপত্র এবং রোগের চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও ঔষধপথ্য ইত্যাদি সবকিছু বোঝায়। মানুষ প্রাকৃতিক জগতে ছড়িয়ে রাখা বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার হতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করে নিজের মেধা-বুদ্ধি বলে পবিত্র এবং উত্তম আহার্য দ্রব্য, সুন্দর ও সুরম্য বাসগৃহ, অট্টালিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরী করে নেয়। জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীরা এরূপ কিছু করতে পারে না। খাদ্যদ্রব্য ছাড়া তাদের জীবনোপকরণ (রিযিক) বলতে আর বিশেষ কিছু নেই। খাদ্যদ্রব্য তারা নিজেরা কিছু তৈরী করতে পারে না। তাদের খাদ্যের মধ্যে এমন সব কিছু রয়েছে, যা মানুষের কাছে পুঁতিগন্ধময় ময়লা আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাণীকুলের অনেকেই এ সব ভক্ষণ করে পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়। এদিক থেকে পরোক্ষভাবে তারা মানুষের তাবেদারী করে। এ আয়াতে যে উত্তম রিযিক বা জীবনোপকরণের কথা বলা হয়েছে, তা ভোগ ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় সাধারণত কোনও মানুষ নিজের কাছে পায় না। আয়াতে যেমন বলা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়। তা ভোগ ব্যবহার উপযোগী করে তৈরী করতে হয়। কখনও একের জিনিস অন্যের সাথে আদান-প্রদান (exchange) করতে হয়। এ সব কিছুর জন্য যে কার্যকলাপ মানুষকে করতে হয়, তা প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন ও বন্টনেরই (Production and distribution) কাজ। তাই প্রকৃত পক্ষে মানুষের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ মোট কথা জীবনোপকরণের (রিযিকের) সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপই (activities connected with means of livelihood) অর্থনীতির প্রধান বিষয়বস্তু। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জলে-স্থলে বাহন দান করার কথা বলেছেন। এর আগে এই সূরার ৬৬ নং আয়াতে 'জল-সমুদ্রে' নৌযান পরিচালনাকে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে জলে-স্থলে বাহনের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে কোনও জিনিসই অহেতুক উল্লেখ বা বর্ণনা করেন নি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৃথিবীর কোনও এক জায়গায় পুঞ্জীভূত করে রাখেন নি। তা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে জলে-স্থলে সর্বত্র। এ কারণেই মানব সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ ছুটে চলছে দেশ হতে দেশান্তরে পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি প্রান্তর নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর অতিক্রম করে উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, নৌকা, পালের জাহাজ, ইঞ্জিনচালিত জাহাজ এবং আকাশপথে উড়োজাহাজে আরোহণ করে। তাই দেখা যায়, মানুষের জীবিকা অর্জনে, সম্পদ আহরণে ও উন্নয়নে যানবাহন এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় যানবাহনকে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো (Infrastructure) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এ আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়ায় জীবন ধারণের জন্য মানুষকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছেন এবং ইহা দ্বারা মানুষের জীবন মান (standard of living) সৃষ্টিজগতের অন্যান্য সব প্রাণীর জীবন মানের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এ পৃথিবীতে মানুষকে কোনও নিকৃষ্ট জীবন যাপনের জন্য পাঠান হয়নি। আর এই উন্নত জীবন মান (decent standard of living) সকল মানুষের জন্যই। মানুষ আশরাফুল মাখ্লুকাত। এই মর্যাদা সব মানুষেরই। এ মর্যাদা বা উন্নতি জীবনোপকরণ, কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ বা জাতির জন্য একচেটিয়াভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি। জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামতরাজি। কোনও জাতি বা গোষ্ঠী কোনও রূপ কুট-কৌশল বা শক্তিবলে প্রাকৃতিক সম্পদরাজি নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখা সঙ্গত নয়। কোনও মানুষ সীমাহীন বিলাস-ব্যসনে উপভোগ করবে, আর কোনও মানুষ সহায়-সম্বলহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করবে। তা বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত নয়। এরূপ বৈষম্যমূলক অবস্থার সৃষ্টি হলে দুনিয়ায়

www.pathagar.com

ফিত্না-ফাসাদ, হানাহানি, রক্তারক্তির সৃষ্টি হওয়া অবধারিত, আল্লাহ্ তা'আলার যা আদো অভিপ্রেত নয়। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অবস্থা এরূপ হতে পারে না। রাব্বুল আলামীন সকল মানুষকেই মান-মর্যাদা এবং উত্তম জীবনোপকরণ দেওয়ার কথা বলেছেন। তাই সকল মানুষকেই প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করার সমান সুযোগ দিতে হবে। আর এই উদ্দেশেই বিশ্বব্যাপী আল্লাহ্র দেয়া ন্যায়বিধান ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানই প্রতিটি মু'মিনের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নূর মুহাম্মদ আকন

প্রমাণপঞ্জি

১. তফসীরে ইব্ন কাসীর।

২. তফসীরে জালালাইন।

৩. তাফহীমুল কুরআন।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কাহ্‌ফ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلاَتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا.

আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আহ্‌বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৮

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

১। وجهه তাঁর সন্তুষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রেযামন্দি। وجه অর্থ সন্তুষ্টি, চেহারা, সম্মতি, বহুবচন وجه (আল-কাউসার)।

২। فرطاء সীমালংঘন করা, হারিয়ে ফেলা, তাড়াহুড়া করা, বাড়াবাড়ি করা, কারো নিকট প্রেরণ করা (আল-কাউসার)।

নাযিলের প্রেক্ষিত

উক্ত আয়াতগুলো সুহায়ব, আম্মার, খাব্বাব ও আসহাবে সুফ্‌ফা সম্পর্কিত। উআইনা ইব্‌ন হিসন নামক নাস্তিক কাফিরের আহ্‌বানের প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল

www.pathagar.com

হয়। উপরোক্ত বিষয়ে লক্ষণীয় যে, নবী করীম (স.)-এর প্রাথমিক দিকে সঙ্গী সাথী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র এবং দুর্বল। এমনি একদিন তাদের সর্দার উআইনা ইব্‌ন হিসন নবী করীম (স.)-কে বললেন আপনার-চার পার্শ্বে যারা আছে তারা এত হীন যে, আমরা সর্দাররা এবং অধিপতিবৃন্দ তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে পারি না। তাদের বক্তব্যের জবাবে নবী করীম (স.)-কে উপদেশ দিচ্ছেন, যেন তিনি কাফিরদের উপদেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হন।

মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী ঃ বিখ্যাত মনীষী বগভী বর্ণনা করেন, একদা মক্কার সর্দার উআইনা ইব্‌ন হিসন রাসূলুল্লাহ্ (স.)-র দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তার কাছে হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বসা ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আকার-আকৃতিতে তিনি ফকীরের ন্যায় থাকতেন। তাঁর মত আরো কিছু সংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। উআইনা বলল, এ লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদের মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্য আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপর এক বর্ণনায় ইব্‌ন মারদুয়াহ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদের আপনি নিজের কাছে রাখবেন না; বরং কুরায়শ সর্দারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের দ্রুত উন্নতি হবে। তখন এ আয়াত-গুলো অবতীর্ণ হয়। (পৃষ্ঠা ৬৬৭, খণ্ড ৫ম)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ ইব্‌ন আব্বাস বরেন, কুরায়শ সর্দারগণ রাসূলে করীমকে বলত ঃ বিলাল, সুহায়ব, আম্মার, খাব্বাব ও ইব্‌ন মসউদের ন্যায় গরীব লোকেরাই দিনরাত তোমার সংসর্গে থাকে, আমরা কিন্তু তাদের সঙ্গে একত্রে বসতে পারব না। এ লোকদের সরিয়ে দাও। তাহলেই আমরা তোমার দরবারে উঠাবসা করতে পারি। তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (পৃষ্ঠা ২৩৩, খণ্ড ৭ম)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আয়াতটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল নৈতিক সংশোধন। আল্লাহ্‌কে যে সকল বান্দা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সার্বিক দিক থেকে প্রভু বলে স্বীকার এবং পার্থিব জীবনের সকল বিষয়ে যারা নবী করীম (স.)-কে অনুসরণ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যতই নিম্নগামী হোক না কেন, আল্লাহ্‌র কাছে তারাই সম্মানিত। কাজেই নবী করীম

www.pathagar.com

(স.)-এর উচিত তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া। যদিও কাফির সর্দারদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিপত্তি অনেক গভীরে প্রোথিত, তথাপি আল্লাহ্ পাকের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। ইসলামী জীবন বিধানের যে কোন বিভাগের আলোচনায় এ বিষয়টি মুখ্য বিষয় হিসেবে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। "আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজেদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না" বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ স্থলে পার্থিব সম্পদের চেয়ে ঈমান ও আমলসহ নৈতিক গুণাবলীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে আত্মস্বার্থ সবচেয়ে বেশী জড়িত। পাশ্চাত্যের ধারণায় আত্মস্বার্থ হচ্ছে মানবীয় কর্ম প্রচেষ্টার মূল চক্রযান। কথাটা কিছুটা সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। এর সঙ্গে ব্যক্তির নৈতিকতা, আদর্শ পদ ও দর্শনের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। অন্তত এতটুকু নৈতিকতা এতে গ্রাহ্য, যতটুকু উহা বর্তমান ধারাকে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য চিন্তা নৈতিক-চেতনা নিরপেক্ষ। তা যেমন সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমনি তা অর্থনীতির ক্ষেত্রেও। ফল যা হবার তাই হয়েছে এবং এ জন্যই বর্তমান পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে (সমাজবাদ ও পুঁজিবাদ উভয় ক্ষেত্রে) এই অবক্ষয়ের পালা শুরু হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির শুরুতেই কাশাইল, রাফিল প্রমুখ দার্শনিক একে Gospel of Mammon worship বলে নিন্দা করেছিলেন। ইসলামী জীবন বিধানের ক্ষেত্রে অর্থনীতির বিষয়টি তাই আরও গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থনীতি সম্পূর্নরূপে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল এবং এই নৈতিকতার উপর গড়ে উঠে বলে ইসলামী অর্থনীতির আওতায় ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে পারে না এবং রাষ্ট্রও নিপীড়নমুলক কর্ম-নীতি গ্রহণ করতে পারে না। ফলে যেমন ব্যক্তি-উদ্যোগ থেকে তেমনি রাষ্টযন্ত্রের পক্ষ থেকে ভারসাম্যমূলক কর্মনীতিই স্বভাবত প্রণীত হয়, যা সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি ও যথাযথ অর্থনেতিক উন্নযনকে নিশ্চিত করে।

- জহুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لاَ حَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ
وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ
اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَارًا. وَّكَانَ لَهُ ثَمَرٌ
فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَّاَعَزُّ نَفَرًا.
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ج قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهِ
اَبَدًا.

আপনি তাদের কাছে দু'ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দু'টি আঙুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং এ দু'টিকে খেজুর গাছ দিয়ে বেষ্টন করেছিলাম এবং দুয়ের মাঝখানে করেছিলাম শস্যক্ষেত। উভয় বাগানই ফলদান করত এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছিলাম। তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল ঃ আমার ধন-সম্পদ তোমার চেয়ে বেশী এবং জনবলে আমি বেশী শক্তিশালী। নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।

–সূলা কাহ্ফ ঃ ৩২-৩৫

সূরাটির নাযিল হওয়ার পটভূমি

তাফসীরবিদদের মতে সূরা কাহ্ফ অবতীর্ণ হয় রাসূলুল্লাহ্ (স.)-র মক্কী জীবনের তৃতীয় অংশে (অর্থাৎ প্রায় পঞ্চম নববী সালের প্রথম থেকে শুরু করে দশক নববী সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে)! সে কালে মুসলমানরা কুরায়শ কাফিরদের হাতে নিদারুণ নির্যাতনের অধীনে ভীষণ কষ্টে কাল কাটাতে বাধ্য হয়। সে নির্যাতনের চাপে কিছু মুসলমানকে দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়াতে হিজরত করতে হয়। আর অবশিষ্ট

www.pathagar.com

মুসলমানকে এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে ও তাঁর পরিবারবর্গকে পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিতে হয়। সে আশ্রয় লাভের অর্থ হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের অবস্থায় পতিত হওয়া। সূরা কাহফের আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করে বোঝা যায়–এ সূরাটি সম্ভবত সেই তৃতীয় মক্কী জীবনের সময়কালে তা অবতীর্ণ হয়। মক্কার কুরায়শদের তিনটি প্রশ্নের উত্তরদানের একটি প্রশ্ন ছিল অর্থাৎ প্রথমটি ছিল ঃ আসহাবে কাহ্ফ কারা ? সে প্রশ্নের উত্তর দান করতে আল্লাহ্র কাছ থেকে সাহায্য এবং মুসলমানদেরকে উৎপীড়নের কঠিন অবস্থায় শক্তি-সাহস দানই এই সূরা নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য বলে ধরে নেওয়া যায়।

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী সম্পর্কে নানা অভিমত ও বর্ণনা বিদ্যমান। সে সব থেকে সঠিক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আধুনিককালে থানভী (র.) তাঁর বয়ানুল কুরআন'-এ তাফসীরে হাক্কানীর উৎস থেকে ঐতিহাসিক তথ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "যে অত্যাচারী বাদশাহ্র ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তার সময়কাল ছিল ২৫০ খৃস্টাব্দ। এর পর তিন শ' বছর পর্যন্ত তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। ফলে ৫৫৫ খৃস্টাব্দে তাদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ (স.) ৫৭০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-র জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহ্ফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তফসীরে হাককানীতেও তাদের স্থান আফসুস অথবা তরতুম শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানে এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।"

তবু অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআনের কোন আয়াত বোঝা এ সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। সঠিক সত্য আল্লাহ্ তা'আলারই কাছে। তাফসীরবিদ ইব্ন কাসীর বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আসহাবে কাহ্ফের কুরআনে বর্ণিত অবস্থাসমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তা-ভাবনা করি। তিনি এ বিষয়ের সংবাদ দেন নি যে, গুহাটি কোন্ জায়গায় এবং কোন্ শহরে অবস্থিত। কারণ এর মধ্যে আমাদের কোন উপকার নিহিত নেই এবং শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। (ইব্ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

তবে অধিকাংশ বর্ণনার অভিমত থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, আসহাবে কাহ্ফ খৃস্টধর্মের অনুসারী ছিল। তাদের সময়কাল খৃস্টজন্মের পর এবং যে মুশরিক বাদশাহ্র কাছ থেকে তারা পলায়ন করেছিল, তার নাম ছিল দাকিয়া-নুস। তিনশত নয় বছর পর জাগ্রত হওয়ার সময় যে ঈমানদার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর রাজত্ব ছিল ইব্ন ইসহাকের

www.pathagar.com

রেওয়ায়েতে তার নাম 'বায়দুসীস' বলা হয়েছে। এর সাথে বর্তমান ইতিহাস মিলিয়ে দেখলে আনুমানিকভাবে তাদের সময়কাল নির্দিষ্ট হতে পারে।" (মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, বাংলা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৮)

আয়াতসমূহের প্রেক্ষিত আলোচনা

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বিব্রত করার জন্য ইহুদীদের নিকট থেকে পাওয়া আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কিত প্রশ্ন করার পরে ওহী মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উত্তরের তথ্য হিসেবে নাযিল হলো (আয়াত নং ৯ থেকে আয়াত নং ২৫ দ্রষ্টব্য)। ১১ নং আয়াতে আভাস দেওয়া হয়েছে যে, তারা কয়েকজন যুবক সঠিক ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অত্যাচারী মুশরিক বাদশার চরম অত্যাচারের আশংকায় নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সে অবস্থায়ও ভীত-সন্ত্রস্ত রূপ নিয়ে আল্লাহ্‌রই ইচ্ছায় নিদ্রিত হয়ে বহু বছর অতিবাহিত করে। সে অবস্থায় তাঁরা সজীব জীবন্তই ছিলেন। সে জীবন্ত অবস্থায় নিদ্রিতভাবেও তাদের পাশ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ১৪ নং আয়াতে। অতঃপর ১৬ নং আয়াতে বলা হলো তাদেরকে জাগ্রত অবস্থায় আসন গ্রহণ করার কথা। তারা সংখ্যায় ক'জন ছিলেন সে কথা নিয়ে বিতর্কে যোগদান করতে নিষেধ করা হয়েছে ২৩ নং আয়াতে। অতঃপর ২৬ নং আয়াত থেকে ৩০ নং আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার প্রেক্ষিতে মক্কী জীবনে কুরায়শদের সঙ্গে কিভাবে মুকাবিলা করা প্রয়োজন অত্যাচার নিঃপীড়নের অভিজ্ঞতার মধ্যে সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে, তাদের থেকে আপনি নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। (আয়াত নং ২৭)

অতঃপর আলোচ্য আয়াত ক'টিতে একটি উদাহরণ সাহায্যে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে উপলব্ধিকে গভীরতর করে ঈমানকে ষড়যন্ত্র ও প্রতিরোধের প্রেক্ষিতে সুদৃঢ়তম পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়োজনকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারই উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াত চারটিতে তুলনামূলক উদাহরণ (مثل) সাহায্যে দুই ধরনের লোক বা দলের আধ্যাত্মিক আত্মিক ঈমানী প্রকৃতিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে উদাহরণটিতে এক-দিকে পার্থিব জীবন অভিলাষীর জীবনের সৌন্দর্য ও ভোগ-বিলাসের আকর্ষণকে প্রাকৃতিক শোভা ও প্রাচুর্যের তুলনা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে সে জীবনকামীর সম্পদ ও জনবল নিয়ে অহংকারের আচরণ এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে পরলোকের জীবনে সাফল্য লাভের

www.pathagar.com

চিন্তা-ভাবনা বিসর্জন দিয়ে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রাচুর্যের সাফল্যকে চিরস্থায়ী মনে করার প্রবৃত্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ শ্রেণীর মানুষ পরকাল ও কিয়ামত বিশ্বাসই করে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত উদ্যান, শস্য-সম্পদ ও জনবলকে তারা মনে করে তাদেরই কীর্তি বলে। আবার পরবর্তী ৩৬ নং আযাতেই বলা হয়েছে, এমনি অহংকারের মনোবৃত্তি নিয়েই তারা যে আরো মারাত্মক দম্ভ প্রকাশ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তারা একদিকে কিয়ামত আসবে বলে বিশ্বাস না করলেও দম্ভ প্রকাশ করে বলে যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌছিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেখানে এখানকার সৌন্দর্য, সম্পদ ও শক্তির চেয়ে আরো উৎকৃষ্ট কীর্তি পাবো। প্রাসঙ্গিকভাবেই অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ে পার্থিব জীবন বিলাসী মানুষদের মন-মানসিকতা ব্যাপারেও আলোকপাত করা হয়েছে আয়াত ক'টির উদাহরণে।

তফসীরে ইব্ন কাসীর অবলম্বনে বর্ণনা

পূর্বেকার আয়াতে দরিদ্র মুসলমান ও ধনী কাফিরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারই চিত্রটি স্পষ্টভাবে উপমা সাহায্যে আলোচ্য আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। উপমাটি দু'জন লোকের। একজন ছিল খুবই সম্পদশালী, তার আঙুরের উদ্যান খেজুর বৃক্ষের সারি দিয়ে ঘেরা নানা শস্য ও ফল-ফুলে উদ্যানটি সুশোভিত, ফাঁকে ফাঁকে প্রবহমান ছিল ঝর্ণা ও স্রোতস্বিনী।

তার কাছে সর্বদা বিভিন্ন রকমের উৎপন্ন শস্যের মজুদ থাকত। ফলে সে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। সে তার দরিদ্র বন্ধুকে অহংকার ও দম্ভ নিয়ে বলল ঃ আমি তোমার চাইতে ধন-সম্পদ ও জনবলে শক্তিশালী এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং বিপুল পার্থিব সম্পদ সর্বদাই আমার কাছে মজুদ থাকে। একদিন তার সুজলা-সুফলা উদ্যানে প্রবেশ করে বলল ঃ এ শস্য-শ্যামল প্রাণ জুড়ানো উদ্যান আমার কখনো ধ্বংস হবে না (প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল তার নির্বুদ্ধিতা, বেঈমানী, বৈষয়িক ও পার্থিব চাকচিক্যে বিভোর হওয়ার এবং আল্লাহ্তে অবিশ্বাসের মূল কারণ)। এ জন্যই সে বলল কিয়ামত তো হতেই পারে না আর যদিও বা সংঘটিত হয়, তাহলে এটা তো স্পষ্ট যে আমিই আল্লাহ্র প্রিয়তর ব্যক্তি। তা না হলে তিনি আমাকে এত ধনরত্ন ও প্রাচুর্য দান করবেন কেন ? এ ধরনের অহংকারের উক্তি আল-কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে ঃ আমাকে যদি প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করতেই হয় তাহলে তাঁর কাছে আমার জন্য অধিক কল্যাণকর সামগ্রী বিদ্যমান।" (সূরা হামীম আস্সাজদা ঃ ৫০) অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ "তুমি কি তাকে দেখেছ যে, আমার নির্দেশসমূহ

www.pathagar.com

অবিশ্বাস করেছে। এতদসত্ত্বেও সে বলেছে যে কিয়ামতের দিনে আমারই প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি হবে।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৭৭) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ আয়াত আস ইব্‌ন ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। (দ্রষ্টব্য তফসীরে ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আল-কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানই নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও মানব সমাজের পরিচালনার সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিধানের সমন্বিত রূপ, যার মধ্যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপরেখা এবং বিধি-নিষেধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির পরিচালনা করছেন বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'আলা। তা হলো মৌল সত্য। সে মৌল সত্যকে স্বীকার করা ও বিশ্বাস করাই উপরোক্ত সর্বপ্রকার সমন্বিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি। আল-কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যেই বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ্ (স.)-র মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। সারা বিশ্বে মানুষের সমাজ ও অর্থনীতিকে সত্যিকার কল্যাণ লাভের জন্য সংগঠিত করতে হবে। সেজন্যই বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনবী সম্পর্কে মৌল সত্যকে ভিত্তি করে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন করে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। অর্থনীতির জ্ঞানকে তেমনি কাঠামোতেই গড়ে তুলে সমাজের ও মানুষের কল্যাণ সৃষ্টিতে প্রয়োগও উপরোক্ত মৌল সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মানুষের সমাজ নানা স্তর অতিক্রম করে বর্তমান আধুনিককালে পাশ্চাত্য সভ্যতার অধীনে জ্ঞানের গবেষণা, জ্ঞানের অর্জন ও জীবনে প্রয়োগকে আল-কুরআনের নির্দেশিত মৌল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এবং তাকেই নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে ন্যায়ের মানদণ্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। অথচ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে অন্যায়, অবিচার, অকল্যাণ ও সামাজিক শোষণ। বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সৃষ্টির ব্যাপারে প্রকটভাবে উৎপত্তি এবং প্রসার লাভ করেছে সে সকল অকল্যাণের রূপ।

আলোচ্য আয়াত চারটিতে যে উদাহরণটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে ঈমানের মৌল সত্যকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করলে কি পরিণতি হয়। এ পরিণতিতে প্রাথমিকভাবে কখনো হয়তো জীবন ও সমাজে আসে প্রভূত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ। আর তা বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের ও তার শোভা, সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। দু'টি ক্ষেত্রেই মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মনৈপুণ্যের পরিচয়

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ কোন উৎস থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের অসীম ভাণ্ডার এবং মানবিক দক্ষতার মৌল শক্তি ও গুণাগুণ লাভ করে সে কথা শুধু ভুলে যায় না। মিথ্যা একটা বিশ্বাসের অহংকার নিজের মনেই তওহীদের বিরাধিতা করার জন্য গড়ে তোলে। সে অহংকার দিয়েই সে গড়ে তোলে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নত থেকে উন্নততর সমৃদ্ধি। এ সমৃদ্ধি রূপ নেয় ক্রমে ক্রমে কৃষি খামারে, শস্য প্রাচুর্যে, নদীনালা সেচের পানি ও ব্যাবহার্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থায়, ফলমূল, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থায়, শিল্পজাত পণ্য নির্মাণে, গৃহ নির্মাণে, গৃহ নির্মাণের গুণমর্যাদা ও অভিজাত্য বৃদ্ধিতে, আসবাবপত্র ও আরাম-আয়েশের বিলাস দ্রব্য নির্মাণে আর ব্যবহারে। এ সব বিভিন্ন পর্যায়েই আবার মানুষের প্রকৃতিগত আকর্ষণ রয়েছে জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর দিকে আর সুন্দর করে রুচিশীল করে ভোগ করার জন্য। তারই জন্য নিপুণ চিত্রকলা, কারুকলা ও চারুকলার আভিজাত্যপূর্ণ পণ্যের ব্যবহার আনে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি। মিসরের পিরামিড থেকে শুরু করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অমূল্য রত্নের মৃত-জীবিত অহংকারী মানুষেরা সাংস্কৃতিক শোভা বর্ধনের ইতিহাস সেই সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। মানুষের আত্মার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার যে সম্পর্ক রয়েছে, তার স্বীকৃতি ও বিশ্বাস নিয়ে জীবনের সমৃদ্ধির অনুসন্ধান করলে এ সমৃদ্ধির রূপ ও বিকাশে অর্থনীতি ও সংস্কৃতি অহংকার ও দম্ভের ভোগ-বিলাস ও তার রাজনৈতিক ও সামাজিক সমর্থন থাকত না। থাকত স্রষ্টা প্রদত্ত মৌল সম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও ব্যবহারে সৃষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং মানব কল্যাণের লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত প্রয়াস।

উদাহরণটিতে যে দু'টি লোক বা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে আবার সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা যায় উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমৃদ্ধি নিয়ে অহংকারের ইতিহাসকে এবং পরবর্তীকালে আবার সে সমৃদ্ধিপ্রসূত শ্রমিক ও পুঁজিপতি অথবা বিত্তশালী ও বিত্তহীন দরিদ্র দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মার্কসবাদী আলোড়নের ইতিহাসকে জড় সম্পদকে পুঞ্জীভূত করে জীবনের সার্থকতা সন্ধান করলে এমনি সংঘাত এবং দু'টি দলেরই তত্ত্ববাদের যুক্তি বিলুপ্ত হতে বাধ্য। ইসলামী জীবনের লক্ষ্য হলো পার্থিব জীবনের প্রয়াসকে সামগ্রিকভাবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য অর্জন। তার অনুভূতি ও প্রয়াসের মধ্যে যে সুখশান্তি ও প্রশান্তির স্বাদ পাওয়া যায়, তার মধ্যে ভোগে ও আধ্যাত্মিকতার এবং স্থায়ী মূল্যবোধের অস্তিত্ব থাকে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জীবনদর্শনে অর্থনীতি ভোগ-বিলাসের অনুসারী। সংস্কৃতিও তারই আভিজাত্য ও অলংকরণের অনুসারী। গণতন্ত্রের মূল্যবোধ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করা হয় এ সবেরই শক্তিশালী সমর্থন। কম্যুনিস্ট সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শবাদের প্রতিফলনে অনুসরণ করা হয়ে এসেছিল মানুষের নির্যাতন নীতি ও সাধারণ কল্যাণের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তির অনুসরণ। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ভূমিকা নিয়েছে তারই আজ্ঞাবহ ভৃত্যের। সাম্প্রতিক-কালের আত্মবিশ্লেষণের ফলে কম্যুনিস্ট/ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট, রাশিয়া, গণচীন এবং তাদের অনুসারীদের জীবনধারার দর্শনে এসেছে সুস্পস্ট পরিবর্তন। এ পরিবর্তন ধারা জনকল্যাণমুখী মনে হলেও তার বিকাশ ও স্থিতিশীল রূপ এখনো বিবর্তনশীল। এর গতি মানুষের আবেদনশীল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে অনুমান করা যায় যে, এতেও অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভূমিকা পাশ্চাত্য জীবন দর্শন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সে রূপের জীবন ভোগ লক্ষ্য অনুসরণ করবে। আলোড়ন সৃষ্টিকারী নতুন বিবর্তন ধারাকে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের সহধর্মী ধরে দেখা যাবে, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক মানুষ সেই প্রাচীনকালের সত্যের উপর বিশ্বাসহীন ব্যক্তিগত/গোষ্ঠীগত ক্ষমতার অহংকার দিয়ে গড়া লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করারই নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা। তাতে জন্মলাভ করতে পারে নতুন নতুনভাবে প্রাকৃতিক (আল্লাহ্ প্রদত্ত) সম্পদ ও শক্তির অপচয় ও অপব্যবহার। অকৃতজ্ঞতার সঙ্গে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ লক্ষ্যের বিরোধী উৎপাদন ও ভোগের এবং বিতরণের দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রয়োগ।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সুসংহত জীবন দর্শন ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা এখনো যথেষ্ট পশ্চাদপদ। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানব কল্যাণের উপযোগী করে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে পাশ্চাত্য ও সমাজতান্ত্রিক অপচয়ধর্মী কৃতজ্ঞতাহীন জীবন ভোগ ব্যবস্থার বিকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে। আর আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক ও মানবিক দক্ষতা সম্পদকে এমন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি নির্মাণে, যার মধ্যে জীবনভোগে বিলাসিতা ও অপসংস্কৃতির দম্ভের প্রাধান্য থাকবে না, অসামাজিকতা ও জীবন মূল্য ধ্বংসী নির্লজ্জতার সমর্থন থাকবে না, অথচ মানব কল্যাণের লক্ষ্য অর্জন হবে সর্বোচ্চ মাত্রার। ঈমানী বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কল্যাণময় বিশিষ্ট রূপের তুলনামূলক উৎকর্ষকে পৃথক ও স্বতন্ত্র ধরনের সমৃদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন যে, জীবনে তওহীদের স্বীকৃতি রয়েছে, কিয়ামত ও পার্থিব জীবনের সাফল্য/ব্যর্থতার হিসেব-নিকেশ সংঘটিত হওয়ার স্বীকৃতি রয়েছে, সে জীবনের সমর্থন দানকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান আর বিশেষ করে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পরিবর্তিত পরিশোধিত রূপরেখা নির্মাণ প্রয়োজন। অতঃপর সে

www.pathagar.com

রূপরেখার সমন্বিত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণের পার্থিব জীবন সর্বস্ব অহংকারী অস্থায়ী সমৃদ্ধি তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে অনতিবিলম্বে অর্থাৎ ৪০ নং আয়াতে বর্ণিত আসমান থেকে প্রেরিত আগুনে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এমনভাবে যে ৪২ নং আয়াতের বর্ণনা মতো সে সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল....হায়! আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম! আগে থেকে উক্ত শোচনীয় পরিণতির সম্ভাবনাকে ঈমানের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়ে দেখে মুসলিম সমাজের জীবন সংগঠন নতুন স্বতন্ত্র ছাঁচে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রদর্শন করেই আসতে পারে স্থায়ী মূল্যবোধের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। বিশ্বের মুসলিম নেতৃত্বের পক্ষে এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা অপরিহার্য।

- অধ্যাপক রায়হান শরীফ

প্রমাণপঞ্জি

১. মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ৫ম খণ্ড, সূরা কাহ্‌ফের সংশ্লিষ্ট অংশ।

২. ইব্‌ন কাসীর, তফসীরে ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, সূরা কাহ্‌ফ।

৩. মাওলানা মওদূদী, তাফ্‌হীমুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, সূরা কাহ্‌ফ।

www.pathagar.com

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا. اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا.

ওদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা পেশ কর, এটা তো পানির ন্যায় যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তা থেকে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, তারপর তা শুকিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় যে, বাতাস একে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা আর স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।

– সূরা কাহ্ফ ঃ ৪৫-৪৬

শব্দগত নোট

১. "الباقيات الصالحات" স্থায়ী সৎকর্ম। কিছু সৎকর্ম মৃত্যুর পরও অবশিষ্ট থাকে–যথা সুশিক্ষা প্রদত্ত সন্তান, জ্ঞান বিতরণ বা জনকল্যাণমূলক কাজ। এরূপ উত্তম কাজ স্থায়ী সৎকর্ম নামে অভিহিত। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষ মারা যাবার পর সব ধরনের কর্মই বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিন প্রকার কর্ম স্থায়ী থাকে ঃ (ক) সাদকায়ে জারিয়া, (খ) জনকল্যাণ ধর্মী জ্ঞান, (গ) সুসন্তান।

২. امل। বাসনা, আশা, প্রত্যাশা। (লুগাতুল কুরআন)

তাফসীরে জালালাইন

'الباقيات الصالحات।' হল 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়ালহাম্‌দুলিল্লাহ্ ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে الباقيات الصالحات। বলে উপরোক্ত কালামসহ সাধারণ সৎকর্ম বোঝান

www.pathagar.com

হয়েছে, পাঞ্জেগানা নামাযই হোক অথবা অন্যান্য সৎ কর্মই হোক–সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদাহ থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। (মাযহারী)।

ইব্ন কাসীর

পার্থিব জীবনটা ধ্বংস ও বিলুপ্ত হবে। এ দৃষ্টিতে এর সাথে আসমানী বৃষ্টির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা বৃষ্টি হলে মাটির অভ্যন্তর থেকে অগণিত উদ্ভিদ অংকুরিত হয়ে সতেজ হয় এবং তা পত্র-পল্লবে সজীবতার সমারোহ সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছু দিন পরে সেগুলো আবার শুষ্ক হয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে বাতাস সেগুলোকে যেদিক ইচ্ছা উড়িয়ে নিয়ে যায়। পার্থিব জীবনটাও ঠিক তদ্রূপ। আল্লাহ্ বিভিন্ন আয়াতে জীবনকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতিকে পার্থিব জীবনের শোভা ও সৌন্দর্যের প্রতীক বলেছেন। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ নারী, সন্তান, ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি ও গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট শোভা ও মনোরম করা হয়েছে। এগুলো হল ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ্---তাঁর কাছে তো রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪)

অপর এক আয়াতে আছে ঃ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনাস্বরূপ–আল্লাহ্র কাছে উত্তম প্রতিদান বিদ্যমান।

স্থায়ী সৎ কাজ হল সর্বোৎকৃষ্ট যেমন নামায পড়া, তাসবীহ্ পড়া ইত্যাদি।

তাফহীমুল কুরআন

তিনি জীবনও দান করেন, মৃত্যুও দেন। তিনি উন্নতি-উত্থানও দান করেন, আর অবনতিও এনে দেন। তাঁরই আদেশে আসে বসন্তের সমারোহ এবং তাঁরই বিধানমত হয় শীতের অবক্ষয়। আজ যদি আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সরঞ্জাম তোমাদের করায়ত্ত হয়ে থাকে, তবে একে চিরস্থায়ী মনে করে অহংকারে মেতে উঠো না। যে আল্লাহ্র হুকুমে তোমরা এসব কিছু লাভ করেছ, সে আল্লাহ্রই হুকুমে এসব তোমার হাত হতে ছিন্ন হয়েও যেতে পারে। (পৃষ্ঠা ২৪১, ৭ম খণ্ড)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

ঐ আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে মানুষের জীবনের এক নিগূঢ় তত্ত্ব কিছু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়ে দিতে ইরশাদ করেছেন। এর আগে ৩২ হইতে ৪২ পর্যন্ত আয়াতের বর্ণনায় পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদের বড়াই ও তার ক্ষণস্থায়িত্ব ও পরিণতি একটা ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এ বিষয়টিই একটি সামগ্রিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলা যখন আকাশ হতে পানি বর্ষণ করান তখন সে বৃষ্টির পানিতে সিক্ত যমীন হতে ঘন সবুজ বৃক্ষলতা গজিয়ে উঠে, পত্র-পল্লবও ফুল-ফলে সুশোভিত হয়। পরে আবার সে শ্যামল বৃক্ষলতাই প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভূষিতে পরিণত হয় এবং বাতাসে উড়িয়ে গিয়ে বিলীন হয়ে যায়।

এর পরই বলা হয়েছে পার্থিব ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি শুধু এ দুনিয়ার জীবনেরই শোভা-সৌন্দর্য। এ শোভা-সৌন্দর্য ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী ক্ষণস্থায়ী, যেমন ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার যিন্দেগী। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগীর জন্যও কিছু জীবনোপকরণ এবং পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন আছে। পার্থিব জীবন স্থায়ী নয় বলে, দুনিয়ার যিন্দেগীর জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করা সম্ভবও নয় এবং সেরূপ কিছু করার জন্য আল্লাহ্ ও রাসূল কোন নির্দেশও দেন নি। কারণ এ দুনিয়ায় মানুষের অবস্থান স্বল্প-কালীন হলেও এ সংক্ষিপ্ত জীবনকালে ঐ পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ ইত্যাদির প্রতি অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয়। আর এ জন্য প্রয়োজন হয় নানাবিধ উপায়-উপকরণের। উল্লেখ্য, এ সব দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা না করার বিষয়ে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। মোটকথা এ দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের কার্যকলাপ দ্বারাই আখিরাতের অনন্ত জীবনের দেনা-পাওনার ফয়সালা হয়ে যাবে। তাই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী পান্থশালার মত হলেও এ জীবনকে অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই। আর এ দুনিয়ার নির্ধারিত কাজকর্মের সঠিক আঞ্জাম দেওয়ার জন্য সহায়-সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। তাই এ দুনিয়ার স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য অর্থ-সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা চালাতে যেমন বলা হয়েছে, তেমনি সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করতেও বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

যখন সালাত শেষ হয়ে যাবে, তখন দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর।

আমাদেরকে মুনাজাত শিখান হয়েছে, "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।"

অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে পরিবার-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততিরও প্রয়োজন আছে। কোন মানুষই এ দুনিয়ার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করতে পারে না। পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি তার জীবনকে আনন্দ ও শান্তিময় করে তোলে।

www.pathagar.com

তাই এ দুনিয়ায় তারা আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামত। সন্তান-সন্ততি যখন মানুষকে আল্লাহ্র নির্ধারিত পথে চলতে প্রেরণা যোগায়; উৎসাহ দেয় হালাল পথে সম্পদ আহরণ করতে এবং হালাল পথে ব্যয় করতে, তখন সে সন্তান-সন্ততি আখিরাতের অনন্ত জীবনের সহায়। আর তারা যদি আল্লাহ্র পথে চলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাহলে তা হবে এক ফিতনা। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য, সুখ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ক্ষণস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী হচ্ছে আখিরাতের জীবন আর সেখানের সুখ-শান্তি, যার সুসংবাদ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে, এ দুয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ বা contradiction নেই। দুনিয়ায় জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদাদি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য কর্মপ্রচেষ্টা চালাতে হবে। তা আখিরাতকে উপেক্ষা করে নয়। সে প্রচেষ্টা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে এবং জায়েয পন্থায় চালাতে হবে। নৈতিকতা ও শরীয়তের বিধি-বিধানের সীমালঙ্ঘন করে কোনরূপ হারাম পন্থা অবলম্বন করে তা উপার্জনও করা যাবে না এবং অর্জিত সম্পদ হারাম পন্থায় ব্যয় করা বা জমা করে রাখা যাবে না। এ দুনিয়ায় জীবন ধারণের জন্য স্বাভাবিক সচ্ছলতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং কিছুটা শোভা-সৌন্দর্যের প্রয়োজন আছে এবং তা না হলে দুনিয়ার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় কোনও মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত ও সৎকর্ম করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, দরিদ্র্যে জাহিলিয়াত আনয়ন করে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায়–দারিদ্র্য এবং অভাব-অনটন আল্লাহ্র ইবাদত ও সৎকর্ম করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাই জীবন পথে চলার প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করা একান্তই জরুরী এবং তা যদি আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে পালনের নিয়তে করা হয় তাহলে জীবনোপকরণ উপার্জনের এরূপ প্রচেষ্টাও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু দুনিয়ায় সম্পদ-ঐশ্বর্য যদি একটা মোহে পরিণত হয়, তাহলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় এবং সম্পদ উপার্জনে তখন আর ন্যায়-অন্যায় অর্থাৎ হালাল-হারাম পন্থার বাছ-বিচার থাকে না। যে কোন পন্থায় সম্পদ উপার্জন তখন একটা নেশায় পরিণত হয়ে যায় এবং সেই সম্পদ জমা করে রাখা আরও ঘোরতর নেশায় পরিণত হয়। এরূপ পার্থিব সম্পদ জমা করার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন---এরূপ সম্পদ জমাকারীদের স্থান হবে নিকৃষ্টতম দোযখ। অবৈধ বা অন্যায় পন্থায় সম্পদ অর্জন করতে গেলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যেমন ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হয়, তেমনি সম্পদ জমা করে রাখলেও সম্পদের যথাযথ বিলি-বন্টনের (distribution এবং circulation) অভাবে সমাজে এক ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার পরিণতিতে মানব সমাজে এক চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে ন্যায় বা হালাল পন্থায় এ পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ উপার্জন করলে এবং তা যথাযথভাবে ভোগ-ব্যবহার এবং বিলি-বন্টন করলে সমাজের অন্য লোকের কোনও অনিষ্ট হওয়ার আশংকাও নেই, বরং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অনেক উপকার সাধিত হতে পারে। আর এরূপ অর্জিত সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে যদি আমলে সালেহ অর্থাৎ সৎ ও মঙ্গলজনক কাজ করা হয়, তাহলে এ দুনিয়াই এক শান্তির রাজ্য সৃষ্টি হবে। তাই দেখা যায়, পবিত্র আয়াতে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে এ দুনিয়ার আর্থ-সামাজিক অবস্থার এক গূঢ় তত্ত্বেরই অবতারণা করা হয়েছে। তা হল ঃ এ দুনিয়ার সুখ-সম্পদ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। তবু ক্ষণিকের জন্য হলেও তার কিছু সীমিত প্রয়োজন আছে। কিন্তু এর গুরুত্ব ঐ পর্যন্তই অর্থাৎ প্রয়োজন মিটান পর্যন্ত। আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল সৎ কর্ম এবং দুনিয়ার সম্পদ দ্বারা শুধু সৎকর্ম করাই মানব জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

- নূর মুহাম্মদ আকন

www.pathagar.com

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. قَالَ مَا
مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
رَدْمًا. اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ط حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ
قَالَ انْفُخُوْا ط حَتّٰى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا لا قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ
قِطْرًا.

তারা বলল, হে যুল-কারনায়ন! য়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আমরা কি তোমাকে কর দেব এ শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবে ? সে বলল, আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তাই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়ে দেব। তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে এস। অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে লৌহস্তূপ যখন দুটো পর্বতের সমান হয়ে গেল, তখন সে বলল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন তা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল, তখন সে বলল, তোমারা গলিত তাম্র নিয়ে এস, আমি তা এর উপর ঢেলে দিই।

– সূরা কাহ্ফ ঃ ৯৪-৯৬

প্রেক্ষিত আলোচনা

সূরা কাহফ্ অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (স.)-র মক্কী জীবনের শেষ দিকে বলেই মনে করেছেন তাফসীরকারগণ। সে পর্যায়ে কাফিরদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও বিরোধিতা চরম রূপ ধারণ করেছিল। চরম বিরোধিতার অস্ত্রকে বুদ্ধি বিচক্ষণতা পরীক্ষার কৌশল হিসেবে এ সূরাতে রাসূল্লাহ (স.)-কে বিপাকে ফেলার জন্য আহলে-কিতাবের পণ্ডিতদের সহায়তা নিয়ে মক্কার কাফিরগণ তিনটি প্রশ্নের উত্তর

জানতে চায়। সে তিনটি প্রশ্ন হলো ঃ আসহাবে কাহ্ফ কারা, খিযির সংক্রান্ত ঘটনা কি এবং যুল্-কারনায়নের বৃত্তান্ত কি ? উল্লিখিত আয়াত তিনটিতে যুল-কারনায়নের বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান উপলক্ষে। এ বর্ণনাতে দুটি ব্যাপার সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত কথা উল্লেখযোগ্য ঃ

১. যুল-কারনায়ন বাস্তব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কিনা সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে উত্তর দেওয়া হয়নি, কিন্তু গবেষণা সাপেক্ষভাবে প্রতীকধর্মী শব্দের তাৎপর্যের বিস্ময়ের আড়ালে রাখা হয়েছে; এবং ২. একটি সম্প্রদায়কে বিদেশী বিজাতীয় লুণ্ঠনকারী অন্য এক অত্যাচারী জাতির আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষা করার নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা নির্মাণও বাস্তবায়নের নিদর্শন কল্যাণকামী যুল্-কারনায়নের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়ার সত্য ব্যক্ত হয়েছে। সেজন্যই ইসলামী দর্শনের মৌল তওহীদ বাণীতে বিশ্বাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের স্বরূপ প্রকাশ এ আয়াত কয়টিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রস্ফুট হয়েছে।

৮৩ নং আয়াতে শুরু করা হয় এ তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর। বলা হলো ঃ তারা তোমার কাছে যুল্-কারনায়ন সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে। তুমি তাদেরকে বল, আমি তাহার কিছু শুনাইতেছি। সে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া হলো ঃ আমরা তাকে যমীনে আধিপত্য দান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে সব রকমের উপায়-উপাদানও দান করিয়াছিলাম। সে যুল-কারনায়ন পশ্চিমে অভিযান শুরু করার পরে সমুদ্রের কালো পানিতে সূর্যাস্ত হতে দেখেন এবং একটি জাতির সম্মুখীন হন, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হলো ঃ 'হে যুল-কারনায়ন, তোমার শক্তি আছে, তাহাদের কষ্ট দিতে পার, আর তাহাদের সহিত ভালো ব্যবহারও করিতে পার।' যুল-কারনায়ন উত্তর দিল অর্থাৎ তার নীতির ঘোষণা দিল এমনই কথায় ঃ এদের মধ্যে যারা জুলুম করবে, তাদেরকে শাস্তিদান করা হবে এবং তারপর তাদেরকে তাদের প্রভুর দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। আর যারা ঈমান আনবে ও সঠিক আমল পালন করবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার; তাদের জন্য থাকবে সহজ জীবন বিধান।' অতঃপর তার অভিযান হলো সূর্যোদয়ের দিকে। সে দিকে শেষ প্রান্তে যুল-কারনায়ন দেখলেন আরেকটি জাতিকে। এ জাতির লোকদের সূর্যতাপের প্রখরতা থেকে বাঁচবার উপায় ছিল না। অতঃপর তৃতীয় অভিযানে তিনি পৌছুলেন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক অঞ্চলে, সেখানকার লোকেরা যুল-কারনায়নের কথাবার্তা খুব কমই বুঝতে পারল। তবু তারা বুঝতে পারল তাদের সমস্যার কথা। এ সমস্যা সম্পর্কিত বর্ণনাই রয়েছে উপরোক্ত তিনটি আয়াতে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত তাৎপর্য

সমস্যাটি হলো ঃ অঞ্চলটির মানুষদের ওপর বহিরাগত দস্যু জাতীয় দুর্ধর্ষ লোকদের আক্রমণ ও অত্যাচারের জন্য জাতিটি শান্তিতে বসবাস করতে পারছিল না এবং জীবিকা নির্বাহের নিজস্ব ব্যবস্থাদির পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক-সামাজিক-নৈতিক দিকে অগ্রসর হতে পারছিল না। তারা যুল-কারনায়নের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল ঃ য়াজুজ-মাজুজ দস্যুদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের প্রয়োজন হলো দুই পর্বতের মধ্যে এমন একটি বাঁধ নির্মাণ, যাতে ওরা আর আমাদের অঞ্চলে আসতে না পারে, তুমি যদি আমাদের জন্য এ কাজটি করে দাও আমরা উপকৃত হবো, তার জন্য আমরা কি কর দেব বলো।" এ প্রার্থনার উত্তরে যুল-কারনায়ন বললেন ঃ করের কোন প্রয়োজন নেই- আমার রব আমাকে যা দিয়েছেন তাই প্রচুর। তোমাদের শুধু সাহায্য, শ্রম ও সহযোগিতা প্রয়োজন। অতঃপর যুল-কারনায়নের পরামর্শ মতো লোহার চাদর আনা হলো। তা দিয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। অতঃপর পরামর্শমতো অগ্নির কুণ্ডলি উত্তপ্ত করা হলো, যাতে লৌহপ্রাচীর উত্তপ্ত রক্তিম রূপ ধারণ করল। তখন যুল-কারনায়ন সংগ্রহ করা তামাকে গলিত আকারে আনতে বললেন এবং নিজে গলিত তামা প্রয়োগ করলেন। এভাবে একটা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রকৌশলী জ্ঞানের অলৌকিক অর্জন ও ব্যবহারের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান করা হলো।

সমস্যা সমাধানের ফলে সে অঞ্চলের জাতিটির ভাগ্যে আমুল পরিবর্তন আসাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। সে কথা বিস্তারিতভাবে আয়াতের বর্ণনাতে না থাকলেও সে পরিণতিকে ঐতিহাসিক সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। সে পরিবর্তনের কল্যাণরূপকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তি-কারিগরী ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য বলে ধরা যায়- এ রকম প্রধান প্রধান যুক্তিতে ঃ

১. একটি দেশ বা জাতির ভাগ্য নির্ভর করে তার নিজস্ব প্রয়াসের ওপর।

সে সম্পর্কে কুরআনের বাণীও আছে (اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَابِىْ اَنْفُسِ)। কিন্তু জাতিটির প্রয়াস আবার নির্ভরশীল বিবিধ শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির উপর। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক সত্যও বিদ্যমান আছে এরকম প্রবাদ বাক্যে ঃ ধান ফুরালো পান ফুরালো বর্গী এলো দেশে। বর্গী অর্থাৎ পর্তুগীজ দস্যুরা লুটে নিত বলেই মানুষের হয়েছিল কষ্ট। তেমনি য়াজুজ-মাজুজদের লুণ্ঠন আর অত্যাচার স্থায়ীভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা না হলে কর্ম প্রয়াস ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। সেই মৌল

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান হলো লৌহ প্রাচীর নির্মাণে। যুল-কারনায়নের রাজনৈতিক নেতৃত্বে তারপরেই সম্ভব হলো সংশ্লিষ্ট জাতিটির কর্ম প্রয়াস ও নিজদের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দিকের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা।

২. জাতিটির মানুষের মধ্যে উন্নয়নের চেতনা বিদ্যমান ছিল। তাদের উদ্যম ও প্রয়াসের দিকে লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে কথা বোঝা যায় আয়াতের বর্ণনা থেকেই। জাতির লোকেরাই যুল-কারনায়নকে বলল ঃ "হে যুল্-কারনায়ন, য়াজুজ ও মাজুজ এই অঞ্চলে চরম অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে। আমরা কি তোমাকে এই কাজের জন্য- যে তুমি আমাদেরও তাহাদের মাঝে একটি বাঁধ বাঁধিয়া দিবে- তোমাকে কোন কর দিব ?" (আয়াত নং ৯৪) মানুষদের শুধু সমস্যা নিয়েই দুঃখ ও হতাশা ছিল না। সাধারণভাবে একটা কারিগরি চিন্তার সচেতনতাও ছিল যে দুই পাহাড়ের মাঝে একটা স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হলেই সমস্যার উপযোগী মুকাবিলা করা যাবে। সুতরাং বোঝা যায় জাতিটির মানুষদের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাজের উদ্যোগ, চেতনা ও কারিগরি দক্ষতা নিয়ে প্রস্তুতি ছিল, সাধারণভাবে হয়তো প্রশিক্ষণও ছিল। তাই যুল-কারনায়নের নেতৃত্বে তাদের শ্রম ও দক্ষতাকে লৌহ প্রাচীর নির্মাণ কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া লোহার পাত ও তামা গলানোর উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, এ সকল খনিজ পদার্থের আবিষ্কার ও ব্যবহার সে জাতির অঞ্চলেই সম্ভবত প্রচলিত ছিল।

৩. যে প্রযুক্তি প্রক্রিয়াগুলো প্রয়োগ করা হলো, যুল-কারনায়ন জাতির লোকদের শ্রম ও দক্ষতাকে ব্যবহার ছাড়া লৌহ পাত ও তামা গলানোর কাজটা হাতে-কলমে শিক্ষা দিলেন কারখানাতে শিক্ষা দেওয়ার মতো। আজকালের ওয়েলডিং কাজের মতো কঠিন কাজ তখন কি করে সম্ভব হয়েছিল, সেটা বিস্ময়কর হলেও বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় প্রত্যক্ষ সত্য। আর যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সত্যটি প্রতীয়মান হয়, সে হচ্ছে যুল-কারনায়নের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও প্রকৌশলী জ্ঞান সম্পর্কে। তার সে অলৌকিক নেতৃত্ব ও জ্ঞানের প্রয়োগ ছাড়া এমন অসম্ভব কাজকে বাস্তবতায় পরিণত করা যেতো না।

উপরোক্ত তাৎপর্য বিশ্লেষণকে আরো ভালো করে অনুধাবন করতে হলে বিশদভাবে গবেষণার প্রয়োজন এ বিষয়টির উপর। ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রকৌশলী-প্রযুক্তিগত নানা দিকে এ গবেষণা প্রয়োজন। গভীরতর গবেষণার্থীরা সে দিকে আকৃষ্ট হবেন বলে আশা করা যায়।

তবু উপসংহারে সংক্ষিপ্তভাবে সেদিকে সামান্য আলোকপাত করা হলো শুধু য়াজুজ-মাজুজ ও যুল-কারনায়নের ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পটভূমি সম্পর্কে। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর The Holy Quran-এ সংযোজিত পরিশিষ্ট অবলম্বনে ঃ

www.pathagar.com

য়াজুজ-মাজুজ ঃ কিছুটা মতানৈক্য সত্ত্বেও বলা চলে, প্রায় সর্বসম্মত গবেষণা ফল নির্দেশ করে যে য়াজুজ-মাজুজ (ইংরেজীতে Gog and Magog) বলে যাদের ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে, তারা ছিল মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের দুর্ধর্ষ গোত্রের সম্প্রদায় এবং তারা পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, কোথাও কোথাও অত্যাচারী অভিযান দিয়ে দখলেও রেখেছিল। চীন সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য তাদের অভিযানের দুর্ভোগ ভুগেছে মাঝে মাঝে। তেমনি তাদের অভিযান বৃহদাকারে চলেছে ইউরোপে, যার ফলে অনেক জনবসতি ধ্বংস হয়েছে এবং পরিশেষে রোমান সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। এসব গোত্রের দুর্ধর্ষ মানুষকে গ্রীক ও রোমানরা নাকি 'সাইথিয়ান' (Sythians) নামে জানত। বাঁধ বা প্রাচীর নির্মাণের ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করলে দেখা যায়, চীন সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে চীনের প্রাচীন নির্মাণ করা হয়, তার নির্মাণের উপকরণ ও ঐতিহাসিক সময় যুল-কারনায়নের সময়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সুতরাং আল-কুরআনে উল্লিখিত লৌহপ্রাচীর ও য়াজুজ-মাজুজ ঐতিহাসিক তথ্যকে চীন সাম্রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সময় ও ঘটনার সঙ্গে তুলনা না করে অন্যত্র সন্ধান করা প্রয়োজন। যুল্-কারনায়নের সম্পর্কে অনুসন্ধানকে গভীরতর দৃষ্টিতে অনুসরণ করলেই তথ্যের ও কালের সঙ্গতি স্থাপন সম্ভব হয়।

- অধ্যাপক রায়হান শরীফ

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আম্বিয়া

وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ. لَوْاَرَدْنَا اَنْ
نَّتَّخِذَ لَهْوًا لاَّ تَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا- اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ
عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا
تَصِفُوْنَ. وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلاَ يَسْتَحْسِرُوْنَ.

আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে, তা আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তা হলে আমি আমার কাছে যা আছে, তা দ্বারাই তা করতাম। আমি তা করি নাই। বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি; অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। অতঃপর মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বলছ, তার জন্য তোমাদের দুর্ভোগ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা তাঁরই আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর ইবাদতের অহংকার করে না এবং আলস্যও করে না। -সূরা আম্বিয়া ঃ ১৬—১৯

শব্দগত নোট

১. لعب لا عبين 'মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন। বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে لعب বলে। ক্রীড়া, খেলা ইত্যাদি (রাগিব)। অর্থহীন কাজ, খেলাধূরা (আল-কাউসার)।

২. لهو 'উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন কর্ম, অমনোযোগী অন্যমনস্ক যা মানুষকে লক্ষ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখে। (রাগিব)

www.pathagar.com

ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত لهو শব্দের একটি অর্থ স্ত্রীসংগম (জালালাইন)।

৩. قذف 'ছুঁড়ে মারা, নিক্ষেপ করা। নদী-খাল ইত্যাদি কিনারা তীরভূমি। অপবাদ বা তুহমাত দেওয়া।

৪. يدمغ মস্তকে আঘাত করা।

৫. زاهق 'মূল زهق নিম্নভূমি, হালকা ইত্যাদি। নিশ্চিহ্ন হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া। যেমন অপর আয়াতে আছে ঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

সত্যের আগমনে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই।

– সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮১

ইব্‌ন কাসীর ঃ মহান আল্লাহ্ আসমান-যমীনকে আছল ও ইনসাফের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি ও ন্যায়ের পুরস্কার দেন। এগুলোকে অনর্থক ও ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য সৃষ্টি করেননি। কাফিরদের ধারণা এরূপ যে এসব সৃষ্টি তো খেলাচ্ছলে হয়েছে। আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ বলেন যে, আমার ইচ্ছা যদি খেলা ও ক্রীড়া কৌতুকই থাকত, তাহলে তাই সৃষ্টি করতাম। ইয়েমেনবাসীদের পরিভাষায় স্ত্রীকে لهو বলা হয়। আর্থাৎ আমি যদি স্ত্রী সৃষ্টি করতে চাইতাম তাহলে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুর আমার কাছেই আছে। ইচ্ছেমত বানিয়ে নিতাম। বরং আল্লাহ্ এসব হীন বক্তব্য থেকে পবিত্র। তাওহীদ ও একত্ববাদের সুমহান আদর্শ এসব ভ্রান্ত ধারণাকে উৎপাটিত করে। কেউ কেউ ফেরেশতাকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্ তাদের বলছেন তাদের অবস্থা শোন আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য দেখ। আসমান-যমীনের সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই। ফেরেশতারাও তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব করে চলেছে, তাদের পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব। ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র বান্দা (দাস) হওয়াতে কোন লজ্জাবোধ করেননি এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না (পৃষ্ঠা ৮, ৩য় খণ্ড)

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) ঃ আসমান যমীনকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করা হয়নি। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে কতগুলো জনপদের ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সব কিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও রহস্যের অধীনে ছিল অর্থাৎ পথিবী, আকাশ ও সমগ্র সৃষ্ট বস্তু আমার পূর্ণ শক্তি, অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণ তার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর

www.pathagar.com

হয় তাওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও বুঝে না। তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেছি।

মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী ঃ যে জীবন দর্শন গ্রহণ করার কারণে তারা নবী (স.)-এর ইসলামী দাওয়াতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করত না, এখানে তারই সর্বাত্মক সমালোচনা করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল- দুনিয়ার মানুষকে বুঝি এমনি স্বাধীন ও বিমুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তারা যা ইচ্ছে করতে পারে। যেরূপ ইচ্ছে জীবন-যাপন করতে পারে; তাদের নিকট কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, তারা হিসেব-নিকেশ দিতে বাধ্য হবে না। কয়েক দিনের জীবন ভালো-মন্দে কাটিয়ে দিয়ে সকলেই নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে। পরবর্তী জীবন বলতে আর কিছুই নেই। যেখানে ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি হতে পারে। তাদের ধারণা মূলত বিশ্বলোকের এ গোটা ব্যবস্থা কোন খেলোয়াড়ের অর্থহীন খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর তাৎপর্যপূর্ণ কোন অর্থই নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই, তাদের এ চিন্তা ভাবনাই নবীর দাওয়াতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের মূল কারণ ছিল। আল্লাহ্ বলেছেন, খেলা করাই যদি আমাদের ইচ্ছে থাকত তাহলে খেলা না বানিয়ে আমরা নিজেরাই খেলতে পারতাম। এক অনুভূতি সম্পন্ন চেতনাশীল, দায়িত্বশীল জাতিকে পয়দা করে তাদের পরস্পর হক ও বাতিলের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও টানা-হেঁচড়া ব্যবহার করে নিজেদের আনন্দ বিধানের জন্য অন্যদের কষ্টের মধ্য নিক্ষেপ করব- এটা বড়ই জুলুম হত। (১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা, ৯ম খণ্ড)

ফখরুদ্দীন রাযী ঃ আমি এ সুইচ্চ ছাদ আসমান, এ সুবিন্যস্ত বিছানাস্বরূপ পৃথিবী এবং এতদুভয়ের রহস্যজনক ও বিষয়পূর্ব সৃষ্টিরাজি ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য সৃষ্টি করিনি। এগুলো দীন ও পার্থিব উপকরণ সৃষ্টি করেছি। দীন উপকার এভাবে যে, চিন্তাশীলগণ যেন আল্লাহ্র বাণী নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। পার্থিব উপকার হল, এ সব সৃষ্টি যেসব কারণ ও কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। (পৃষ্ঠা ১৪৮; ২১-২২ খণ্ড) তা থেকে কল্যাণের দিক নিয়ে গবেষণা করবেন।

প্রমাণপঞ্জি

১. তফসীরে ইবনে কাসীর।

২. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) মা'আরেফুল কোরআন।

৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন।

৪. তফসীরে কবীর, ফখরুদ্দীন রাযী।

www.pathagar.com

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ط وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ. وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ.

তোমাদের এই উম্মত প্রকৃতপক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের দীনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে- সকলকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

-সূরা আম্বিয়া ঃ ৯২-৯৩

তাফসীরকারদের আলোচনা

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ "তোমরা আমার ইবাদত কর" বলে সম্বোধন করা হয়েছে সমস্ত মানুষকে। বক্তব্য এই যে, হে মানুষ, তোমরা সকলেই আসলে এক উম্মত ও একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। দুনিয়ায় যত নবী-রাসুলই এসেছেন, তাঁরা সকলে একই দীন নিয়ে এসেছিলেন। আর সেই আসল দীন এ ছিল যে, একমাত্র আল্লাহ্ই মানুষের রব এবং কেবল এক আল্লাহ্র পূজা-উপাসনা ও ইবাদত আরাধনা করা আবশ্যক। উভয়কালে যত ধর্মমতই আবির্ভূত হয়েছে, তা এই মূল দীনকে ঠিক করে, রদ-বদল করে তৈরি করা হয়েছে। ... ... একজন মূল দীন হতে একাংশ গ্রহণ করে উহার সহিত নিজের পক্ষ হতে আরো অনেক জিনিস যোগ করে এক নতুন ধর্মমতের রূপ দিয়েছে। এভাবে অসংখ্য মিল্লাত গড়ে উঠেছে। এখন একথা বলা হয় যে, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। মানব সমাজে এমন বহু ধর্ম ও বহু মিল্লাতের বিভেদ নবী-রাসূলগণ সৃষ্টি করেছেন বলা সম্পূর্ণ ভুল কথা। বিভিন্ন মিল্লাতের লোকেরা নিজেদেরকে বিভিন্ন যুগেও বিভিন্ন দেশের নবীর প্রবর্তিত ধর্ম প্রচার করিতেছে বলেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, ধর্ম ও মিল্লাতের এ পার্থক্য নবী-রাসূলগণই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রাসূলগণ দশ রকেমের বিভিন্ন ধর্ম প্রচার করেননি এবং এক আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো বন্দেগী করার দাওয়াত বা শিক্ষা দেননি। (তাফ্হীমূল কুরআন, সুরা-আম্বিয়ার তাফসীর, নং ৯১)

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ দু'টি আয়াতে অর্থনৈতিক তাৎপর্যের প্রত্যক্ষ কোন কথা নেই। তবে পরোক্ষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। প্রথমত, ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্কেই করতে হবে। ইবাদতের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্য করতে হবে। এ আনুগত্য কেবল নৈতিক ও সামাজিক জীবনে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্র দীনকে বা আল্লাহ্র নির্দেশকে টুকরা টুকরা করার কোন অধিকার কারো নেই অর্থাৎ এ কথা বলা অবৈধ যে, আল্লাহ্র এক নির্দেশ মানব এবং অন্য নির্দেশ মানব না। আল্লাহ্র নির্দেশ সর্বক্ষেত্রেই মানতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যেখানে যেখানে আল্লাহ্র নির্দেশ আছে, সেগুলোর সবটুকুই মানতে হবে। তৃতীয়ত, আল্লাহ্ হচ্ছেন রব অর্থাৎ প্রকৃত পালনকর্তা। অন্যেরা নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহ্ই প্রকৃত স্রষ্টা। মানুষের এবং সম্পদের। সুতরাং সে রবের নির্দেশের ভিত্তিতেই সব চলা উচিত এবং তাঁরই শোকরিয়া করা উচিত।

আলোচ্য আয়াতটিতে আরো দু'টো বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, তোমাদের উম্মত একই উম্মত এবং আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। সবাই মিলে একই উম্মত হওয়ার ধারণা ব্যাপক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। দুনিয়া, সমগ্র মানুষ এবং তথাকথিত জাতিগুলি এক জোড়া মানব-মানবী থেকে উদ্ভূত। ফলে সকল জাতি মিলে দুনিয়ার সম্পদ সমভাবে ভাগ করে ভোগ ব্যবহার করার ধারণা অপ্রাসঙ্গিক নয়। দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এমনভাবে গঠিত এবং সম্পদপূর্ণ, যেন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ একটি বিশ্বজনীন অর্থনীতির ধারণা করা সম্ভব, যা ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কোন ধর্ম বা তন্ত্র বর্তমান নেই। সব দীন বা তন্ত্রই জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে। কিন্তু ইসলাম জীবনের সবগুলো দিককে নির্দেশ করে একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছে। এই অবস্থায় অর্থনীতি ও দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, নৈতিক নীতিমালার উপর নির্ভরশীল।

শাহ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ.

কিয়ামতের দিন আমরা সঠিক ওজন করার দাঁড়িপাল্লা সংস্থাপন করব। তার ফলে কোন লোকের উপরই এক বিন্দু পরিমাণ জুলুম হবে না। যার এক বিন্দু কৃতকর্ম থাকবে তাকে আমরা সম্মুখে আনব। আর হিসেব সম্পূর্ণ করার জন্য আমরাই যথেষ্ট। – সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৭

প্রেক্ষিত আলোচনা

আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনারীতির দিক থেকে তাফসীরবিদগণ এ সূরার অবতীর্ণ হওয়ার কালকে রাসুলুল্লাহ্ (স)-এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি বা তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ধারাবাহিকভাবে বহু সংখ্যক নবী ও রাসূলের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে বলেই সূরার নামকরণ 'আল-আম্বিয়া' করা হয়েছে মনে করা হয়। সে ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সঙ্গে কুরায়শ সরদারদের যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘটিত হয়েছিল, সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এ সূরায়। রাসূলূল্লাহ্ (স.)-এর নবুয়তের দাবি, তাওহীদের দাওয়াত, পরকাল সংক্রান্ত আকীদা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল কুরায়শ সরদারগণ। এ সূরায় তার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটিতে বিশেষ করে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে পরকালের জীবনে এবং কিয়ামতের হিসেব-নিকেশে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। অবিশ্বাসী সরদারগণ কিয়ামতের নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে উপহাস করতে শুরু করল এবং সে শাস্তির সময় আসে না কেন, প্রশ্ন করে নিজেদের প্রচলিত প্রথা বিলাসী জীবনের অহংকার নিয়েই ব্যস্ত। তার উত্তরে তাদেরকে ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ (মানুষকে তাড়াহুড়া করার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে) অর্থাৎ শাস্তির সময়কে তাৎক্ষণিকভাবে জীবনে আহ্বান করে বিপন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকাই মু'মিনের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ী চরিত্র। অবিশ্বাসীরা নিজেদের

www.pathagar.com

অবস্থার মূল্যায়ন করছেনা বলেই কিয়ামতের শাস্তির পরীক্ষাকে বিদ্রূপ করতে পারে। ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

بَلْ مَتَّعْنَا هٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ– (আসল কথা এই যে, এই লোকদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাকে আমরা জীবনের সামগ্রী দান করে চলেছি, শেষপর্যন্ত তারা দিনের অর্থাৎ কালের মোহের নাগাল পেয়েছে)। এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফহীমুল কুরআনে মাওলানা মওদূদী বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র "লালন- পালন ও অনুগ্রহ" সম্পর্কে তারা এক ভুল ধারণায় পড়ে গেছে। তারা মনে করে, এটা বুঝি তাদের কোন ব্যক্তিগত অধিকারে লাভ করা জিনিস এবং একে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। নিজেদের স্বাচ্ছন্দ-সচ্ছলতা ও সরদারী কতৃত্বকে তারা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী মনে করে এবং এতে তারা এতদূর মশগুল হয়ে গিয়েছে যে, উপরে যে কোন (সর্বশক্তিমান প্রভু) আছেন, যিনি তাদের গড়া ও বিগড়ানোর ক্ষমতা রাখেন- সে কথা চিন্তা করার অবকাশও তারা পায় না।"* সুরা কাহ্‌ফের ১০৫ নং আয়াতে ব্যর্থ ও অসফল অবিশ্বাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ "এরা সেই লোক, যারা তাদের আল্লাহ্‌র আয়াত (নিদর্শন)সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর কাছে (পরকালে) উপস্থিত হওয়ার কথাও বিশ্বাস করে নি। এ কারণেই তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল হয়ে গেল। কিয়ামতের দিন আমরা তাদের (কৃতকর্মের) 'ওজন' দেব না।" এ আয়াতের মর্মার্থ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মওলানা মওদূদী বলেছেন ঃ "এ ধরনের লোকেরা দুনিয়ার জীবনে যত বড় কাজই সম্পন্ন করুক না কেন, তার সবই তাদের জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। তাদের নির্মিত রাজপ্রাসাদ, বালাখানা, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরীসমূহ, তাদের কারখানা ও ফ্যাক্টরী, প্রশস্ত রাজপথ ও রেলগাড়ী, তাদের যাবতীয় আবিষ্কার-উদ্ভাবন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আর্ট গ্যালারি ও অন্যান্য জিনিস-যা নিয়ে তারা গৌরব করত, এদের কোন জিনিসই তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহ্‌র সম্মুখে যেতে পারবে না। আল্লাহ্‌র দাঁড় করা দাঁড়ি-পাল্লায় এর কোন ওজনই হবে না।"*

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আয়াতটিতে ইসলামী জীবন দর্শনের প্রেক্ষিতে জীবনের কাজকর্ম এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর সে লক্ষ্যকে অনুসরণ করে সমৃদ্ধি লাভের প্রয়াস না করলে আপাত দৃষ্টিতে সাফল্য ও গৌরব দৃশ্যমান কীর্তির পরিচয় দিলেও পারলৌকিক ইসলামী লক্ষ্যের দিক

* তাফহীমুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) অষ্টম খণ্ড, টীকা নং ৪৪, পৃষ্ঠা নং ১৫৯।

* তাফহীমুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) অষ্টম খণ্ড, টীকা নং ৭৭ পৃষ্ঠা ২৭২-২৭৪।

www.pathagar.com

থেকে তার কোন মূল্য নেই। কিয়ামতের জন্য প্রতিষ্ঠিত মাপকাঠিতে বা দাঁড়িপাল্লার মাপে এর কোন মূল্য নেই- সেদিকে গুরুত্ব আরোপ করার তাৎপর্য হলো ব্যাপকধর্মী।

১. প্রথমত, ইহকালের জীবনকে পরকালের কল্যাণ ও পুরস্কার লাভের উপযোগী করার জন্য মানুষকে সর্বমুখী সাধনা করতে হয় এবং তারই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রয়াসের নীতিমালা অবলম্বন করতে হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সেজন্যই দেখা যাবে তাওহীদ ও কিয়ামতের হিসেব-নিকেশে বিশ্বাসী মানুষের আচরণ ও জীবন পরিচালনা অবিশ্বাসী মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এখানে শুধু জড় জীবন ভোগ করার প্রশ্ন নিয়ে আর পার্থিব জীবন নিয়েই কথা নয়, মানুষের সার্বিক জীবন ও আচরণেই ভিন্নধর্মী নীতিমালার বাস্তবায়ন ঘটবে।

২. দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত কারণেই ইসলামী কাঠামোতে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আচরণের গুণমাত্রা বা মর্যাদা পরিমাপ করার দাঁড়িপাল্লা বা মাপকাঠিকে ভিন্নধর্মী হতে হবে। এ মাপকাঠি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির পরিমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ (Quantitative analysis) হতে পারে না। প্রচলিত পাশ্চত্য অর্থনীতির বিশ্লেষণে উপাদন প্রয়োগ ও তার ফলকে বিশদভাবে বিন্যাস করা সম্ভব হয়েছে অংক, হিসেব এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে।

বর্তমানকালে কম্পিউটার প্রযুক্তি হিসেব সংরক্ষণ পদ্ধতিকে বৈপ্লবিক গতিতে পরিবর্তন করে চলেছে। তাতে মানুষের শ্রম হ্রাস পেয়েছে এবং স্বল্প সময়ে জটিল ও বিরাট হিসেবের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। প্রধান কথা হলো, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধর্তব্য পরিমাণ বা সংখ্যাকে হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে। তবুও যান্ত্রিক প্রযুক্তির অধীনে ভৌত ভুল প্রমাদ ধরা পড়ছে। যে মানুষের হাত কম্পিউটার যন্ত্র চালায় সে হাতও ভুল করে আবার যন্ত্রও বিকৃতভাবে কাজ করে কখন কখন। তখন ভীষণ বিভ্রাট। তাছাড়া যা পরিমাণভিত্তিক তাকেই পরিমাণের পদ্ধতিতে হিসেব করা যাবে, যা গুণ মর্যাদাভিত্তিক তার মূল্যায়ন আর হিসেব কিভাবে হবে? যে ব্যবসায়ী ওজনে কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকালো,সে তাওহীদ ও পরকালে অবিশ্বাসী হলে মেপেই ঠকানোর পরিমাণ অতিরিক্ত লাভ করল বলে মনে করবে। আর যে এক ডজন আমের দামে ১০টা ভালো এবং ২টা পঁচা আম ব্যাগে ভরে দিল, সে পরিমাণ অর্থাৎ গণনায় সঠিক দিয়েও ঠকালো- সে ঠাকানো অংশই তার অতিরিক্ত লাভ। সে বিক্রেতা বিশ্বাসী মু'মিন হলে দুই ক্ষেত্রেই (Quantitative। Quantitative) ঠকানো থেকে বিরত থাকবে। পরকালের দাঁড়িপাল্লায় তার আচরণের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলাফল, চূড়ান্ত হিসেব Final accounting হবে বলে।

www.pathagar.com

৩. তৃতীয়ত, চূড়ান্ত হিসেব প্রক্রিয়ার দাঁড়িপাল্লার সংস্থাপন ও বিশ্বস্রষ্টার নিজস্ব কাজ আর রূপ, প্রভৃতি ও ক্ষমতাও তাঁরই পরিকল্পিত। সেজন্যই সে হবে কালজয়ী সর্বোত্তম নিখুঁত অতুলনীয় প্রযুক্তি- যার আওতা থেকে অণু-পরমাণু মাত্রার কর্মফলের শুভ ও অশুভ ধর্তব্য হিসেব একটিও বাদ পড়ে না এবং গুণবাচক পরিমাপ আর পরিমাণবাচক পরিমাপের সমস্যাও থাকবে না। এমনি চেতনা ও চলমান বিশ্বাস নিয়ে ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতির কাঠামোতে চলে পণ্য উৎপাদন, পণ্য ভোগ, প্রাকৃতিক উপকরণকে সম্পদরূপে আহরণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৪. চতুর্থত, পরিমাপ ও হিসেব ব্যাপারে মানুষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য অথবা প্রতারণার জন্য যে কল্যাণের প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তার প্রশ্ন আসে, সে প্রশ্নের যুক্তিসম্মতভাবে পরিপূর্ণ সমাধান সম্ভব শুধু ইসলামী ব্যবস্থাপনার 'ন্যায়বিচার' নীতি প্রয়োগে। এ নীতির ভাবধারণা সংখ্যা/পরিমাণভিত্তিক এবং গুণমাত্রাভিত্তিক অনিশ্চয়তা দূর করে। পার্থিব জীবনে মু'মিন মানুষ ও এ সার্বিক মাপকাঠির রূপ ও প্রয়োগ বুঝতে পারে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান ও বিশ্লেষণ থেকে। কিয়ামতের পরিস্থিতি হলো সৃষ্টিকর্তার বিচারের পরিস্থিতি। সে বিচারালয়েই রয়েছে চূড়ান্ত হিসেবের দাঁড়িপাল্লা। সে দাঁড়িপাল্লা অতুলনীয় ও কালজয়ী ন্যায়বিচারের প্রতীক। ইসলামী সমাজ কাঠামোতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাফল্যকে মু'মিনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আচরণকে ও ভোগ ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যবস্থা বিতরণ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার পরে। ন্যায় বিচারের নিক্তিকে আয়ত্ত করতে হয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ মাধ্যমে এবং সেনিক্তিকে সে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি স্তরে। সেজন্যই ন্যায় বিচারহীন শোষণ ইসলামী অর্থনীতিতে স্বাভাবিকভাবেই বর্জিত হয়। যেক্ষেত্রে বর্জিত হয় না, তার জন্য রয়েছে শরীয়া'র ন্যায়বিচার। অতঃপর শেষ পর্যায়ে কিয়ামতের বিচারে হবে চূড়ান্ত ন্যায় বিচারভিত্তিক হিসেব-নিকেশ। তাতে সব আচরণের সঙ্গে অর্থনৈতিক আচরণেরও হবে চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশ। সে লক্ষ্যের কথা স্মরণ রেখে কর্ম সম্পাদনই মু'মিনকে পৌঁছে দেয় সর্বাঙ্গীন সাফল্যে, যে সাফল্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনও অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যাপক রায়হান শরীফ

www.pathagar.com

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ. فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَاْسَنَا اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ. لاَتَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا اِلٰى مَااُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ. قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ- فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ. بَلْ مَتَّعْنَا هٰؤُلاَءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ط اَفَلاَ يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ.

অতঃপর আমি তাহাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলাম, যথা- আমি তাহাদিগকে এবং যাহাদিগকে ইচ্ছা রক্ষা করিলাম এবং ধ্বংস করিয়া দিলাম জালিমদিগকে। আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ, যাহার অধিবাসীরা ছিল জালিম এবং তাহাদের পর সৃষ্টি করিয়াছি অপর জাতি। অতঃপর যখন তাহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল, তখনই তাহারা জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'পলায়ন করিও না, এবং ফিরিয়া আস তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে; হয়তো কেহ তোমাদিগকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে।' তাহারা বলিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম জালিম। তাহাদের এই আর্তনাদ (চলিতে থাকে) যতক্ষণ না আমি তাহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করি।

বস্তুত আমিই তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম; অধিকন্তু তাহাদের আয়ুষ্কালও হইয়াছিল দীর্ঘ। তাহারা কি

www.pathagar.com

দেখিতেছে না যে, আমি তাহাদের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি। তবুও কি তাহারা বিজয়ী হইবে ?

-সূরা আম্বিয়া ঃ ৯-১৫, ৪৪

শানে নযুল বা প্রেক্ষিত

'সূরা আম্বিয়া' হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে তাফসীরকারগণ সিদ্ধান্ত করেছেন। অবিশ্বাসী কুরায়শগণ যখন কুরআন ও নবীর নামে নানা মিথ্যা অপবাদ প্রদান করছিল, তখনই কাফিরদিগকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য এ সূরা নাযিল হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে জালিমদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনিবার্য শাস্তির ঘোষণা এবং তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্‌র ঘোষণা এই যে, সীমালংঘনকারীদেরকে ইহকাল এবং পরকাল উভয় সময়ের আযাবের জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছেন, কারণ তার অধিবাসীরা ছিল জালিম বা কাফির এবং তার জায়গায় সৃষ্টি করেছেন নতুন জাতি। প্রথমে হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও অবিশ্বাস করলেও জালিমরা যখন আযাব আসতে দেখল, তখন জনপদ থেকে পলায়ন করতে লাগল (যাতে আযাবের কবল থেকে বেঁচে যায়)। আল্লাহ্ বলেন ঃ পলায়ন করো না এবং নিজেদের বাসগৃহ ও বিলাস-সামগ্রীর নিকট ফিরে চল! সম্ভবত কেউ তোমাদিগকে জিজ্ঞেস করবে (যে, তোমাদের কি হয়েছিল? উদ্দেশ্য হলো, ইঙ্গিতে তাদের ধৃষ্টতার জন্য হুঁশিয়ার করা যে, যে সামগ্রী ও বাসগৃহ নিয়ে তোমরা গর্ব করতে, তখন সে সামগ্রীও নেই, বাসগৃহও নেই এবং কোন সহানুভূতিশীল মিত্রের নাম-নিশানাও নেই)। তারা তখন নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য আর্তনাদ করতে থাকল।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে, এই আয়াতসমূহে ইয়েমেনের হাযুরা ও কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে যেহেতু কোন বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করা হয়নি, তাই আয়াতসমূহকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করা দরকার।

৪৪ নং আয়াতে জালিম ও গাফিলদের প্রতি আল্লাহ্‌র হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, পুরুষানুক্রমে তারা বিলাসিতায় মত্ত রয়েছে এবং নিজেদের দম্ভ প্রকাশ করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা কি দেখছে না যে, তিনি তাদের দেশকে (ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে) চতুর্দিক থেকে অনবরত সংকুচিত করে আনছেন ? তাদের বিজয়ের আর কোন সম্ভাবনা নেই।

(মা'আরেফুল কোরআন থেকে সংকলিত)

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আয়াত নং ৯ ও ১১ অনুরূপ। ৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ জালিমদিগকে ধ্বংস করার কথা বলেছেন। ১১ নং আয়াতে জালিমদিগকে ধ্বংস করে সেখানে নতুন জাতি সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। ১২-১৫ নং আয়াতে শাস্তির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সূরা হজ্জ-এ-ও অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত দু'টো আয়াত রয়েছে। ৪৫ নং আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ "আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ, যেইগুলির বাসিন্দারা ছিল জালিম। এইসব জনপদ তাহাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও! (২২ ঃ ৪৫)

৪৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ "এবং আমি অবকাশ দিয়াছি কত জন পদকে, যখন উহারা ছিল জালিম; অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমার নিকট।" (২২ ঃ ৪৮)

উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে অতীতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলেও, এই আয়াতগুলো তাৎপর্যপূর্ণ সব সময়ের জন্যই। বারবার একই কথা ঘোষণার মাধ্যমে জালিমদের প্রতি শাস্তি যে অনিবার্য তাই বোঝানো হয়েছে।

শোষকরাও জালিমের শ্রেণীভুক্ত। আর অর্থনৈতিক শোষণ তো হচ্ছে শোষণ প্রক্রিয়ার অন্যতম দিক। সুতরাং তাদের পরিণতিও এই আয়াতগুলো নির্দেশ করছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক অবিচারের পরিণতিতে অনেক সভ্যতা আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দেখেছি। তার জায়গায় গড়ে উঠেছে নতুন সভ্যতা। এখানে ১১ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এক সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবার কথা বলা হয়েছে।

অর্থাৎ এর দ্বারা ঐতিহাসিক সামাজিক উত্তরণের ধারণার প্রতি ইসলামের সমর্থন পাওয়া যায়। তবে বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে বিভিন্ন তত্ত্বে সামাজিক উত্তরণ প্রক্রিয়া, সামাজিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে যেরকম অনমনীয় বক্তব্য রাখা হয়েছে, সেরকম কিছুই এখানে বলা হয়নি। সেদিক থেকে ইসলামী ধারণাটি খুবই নমনীয় ও অনির্দিষ্ট।

বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বলা হয়, কোন উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান উৎপাদন শক্তিগুলোর বিকাশের ফলে যখন আর সেগুলো ঐ উৎপাদন-সম্পর্কের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারে না, তখনই অনিবার্য সংঘাত উপস্থিত হয়। এর ফলে ঐ উৎপাদন-সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ে এবং গড়ে উঠে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক। ঐতিহাসিকভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, একটি ব্যবস্থায় শোষণ, নির্যাতন যখন সীমাহীনভাবে বেড়ে গিয়েছে, তখনই ঐ ব্যবস্থা তার গ্রহণযোগ্যতা (Viability)

www.pathagar.com

হারিয়েছে এবং সেখানে জন্ম নিয়েছে নতুন ব্যবস্থা। ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সেখানে দেখানো হচ্ছে তথাকথিত আদিম সাম্যবাদী সমাজের অবক্ষয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছে দাস সমাজের। দাস সমাজে নির্যাতন, অবিচার, শোষণ যখন মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তখনই বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ, সংঘর্ষ। সেই সাথে তা হারিয়েছে অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং তখনই দাস সমাজের বিলুপ্তি ঘটেছে। ভূ-স্বামীদের নির্যাতন, অর্থনৈতিক শোষণ ইত্যদির কারণে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে জন্ম নিয়েছে সামন্তবাদের পতনের বীজ। সমাজ ব্যবস্থার এই শ্রেণীবিভাগ বা বিশ্লেষণ সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক উত্তরণ এ রকম সুনির্দিষ্ট কোন ধারায় হয়নি। আবার ইতিহাসে একই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন রকম পরিবর্তন। তবে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হচ্ছে যে, শোষক, প্রবঞ্চকও নির্যাতনকারীদের পতন 'অনিবার্য। তা-ই ইতিহাসের শিক্ষা। কুরআনের এ আয়াতগুলোতে সে কথাটা খুব দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে। শুধুমাত্র শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাই নয়, একই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও যারা শোষক, প্রবঞ্চক তাদেরও পরিণতির কথা এ আয়াতগুলো নির্দেশ করছে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি যেমন আকাশ থেকে আসতে পারে, তেমনি তা পৃথিবী থেকেও সৃষ্টি হতে পারে। শোষকদের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চিতদের প্রতিরোধ এবং জয়লাভ তার দৃষ্টান্ত।

ধ্বংসপ্রাপ্তদের তুলনা করতে যেয়ে আল্লাহ্ কর্তিত শস্য নির্বাপিত অগ্নির উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তাদেরকে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, যা অন্যভাবে বললে, তারা চূড়ান্তভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

সূরা আম্বিয়ার ৯৫ নং আয়াতে এ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ্ বলছেন ঃ" যে জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে যে, তাহার অধিবাসীবৃন্দ ফিরিয়া অসিবে না।" (২১ ঃ ৯৫) ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেসব সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের আর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়নি।

আলোচ্য আয়াতগুলোর সাথে সূরা আম্বিয়ার আয়াত নং ৪৪ এবং সূরা রা'দের আয়াত নং ৪১ সম্পর্কযুক্ত।

সূরা আম্বিয়ার ঐ আয়াতটিতে বলা হয়েছে ঃ "বস্তুত আমিই তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম; অধিকন্ত তাহাদের আয়ুষ্কালও

www.pathagar.com

হইয়াছিল দীর্ঘ। তাহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি তাহাদের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি। তবুও কি তাহারা বিজয়ী হইবে ?" সূরা রা'দের সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে বলা হয়েছে ঃ তাহারা কি দেখে না যে, (২১ ঃ ৪৪) আমি তাহাদের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি? আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাহার আদেশ রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি হিসেব গ্রহণে তৎপর।" (১৩ ঃ ৪১)

সূরা আম্বিয়ার আয়াতটিতে বিধর্মীদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলছেন যে, তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদিগকে তিনি প্রচুর ভোগসম্ভার দান করেছিলেন। তাদের আয়ুষ্কালও হয়েছিল দীর্ঘ। কিন্তু সে সবের জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং কল্যাণকর পথে সে সম্পদ ব্যবহারের পরিবর্তে তারা বিলাসিতায় মত্ত হয়েছিল। তাই অনিবার্যভাবেই তারা তাদের পতন ডেকে এনেছে। বস্তুত, পৃথিবীতে সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত মালিকানা আল্লাহ্র (২১ ঃ ৮৯)। পৃথিবীর মানুষকে বিভিন্ন ভোগ-সম্ভার বিভিন্ন পরিমাণে আল্লাহ্ই দান করেছেন। সে সবের বিভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে (কুরআনের অন্যত্র তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে)। কিন্তু তার কল্যাণকর ব্যবহার আল্লাহ্র কাছে কাম্য। সেই সম্পদ নিয়ে বিলাসব্যসনে নিয়োজিত থাকার অধিকার তাদেরকে দেওয়া হয়নি, যদিও এখানে স্পষ্টভাবে এসব বলা হয়নি। তবে আল্লাহ্কে মান্য করার কথা সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশ করা হয়েছে। আর তাকে মান্য করার অর্থ তো হচ্ছে তার নির্দেশিত পথে পরিচালিত হওয়া।

আয়াত দু'টোতে (২১ ঃ ৪৪ এবং ১৩ ঃ ৪১) আল্লাহ্ বিধর্মীদের রাষ্ট্র তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সংকুচিত করে আনার কথা বলেছেন। এটি চূড়ান্তভাবে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে। মোট কথা শোষণ, নির্যাতন, অকল্যাণের সব ব্যবস্থা যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য, এখানে আরেকবার সেকথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

- মো. আবুল হাসনাত দেওয়ান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হজ্জ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُنِ
اطْمَانَّ بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُنِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ج خَسِرَ
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধার মধ্যে ইবাদত করে, তার মঙ্গল হলে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটে গেলে সে তার পর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে দুনিয়াতে ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

– সূরা হজ্জ ঃ ১১

শব্দগত নোট

(ক) حرف অর্থ প্রান্ত, এক পার্শ্ব, সমুদ্রের কিনারা ইত্যাদি (মসবাহুল্লুগাত) এ আয়াতে حرف অর্থ হলো ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ দ্বিধার সাথে কাজ করা।

(খ) انقلب على وجهه। এটি আরবী বাগধারা। অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া।

ইবন কাসীর

حرف-এর অর্থ সন্দেহ ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে এমন প্রান্তসীমায় অবস্থান করা-যদি লাভবান কিছু দেখা যায় তাহলে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় এবং ক্ষতিকর কিছু দেখা দিলে পলায়ন করে -বুখারী শরীফে আছে, এমন কিছু লোক হিজরত করে মদীনায় এসেছিল, তাদের ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য দেখে বলত, এ ধর্মটি

www.pathagar.com

খুবই কল্যাণকর, খুবই ভালো। আর যদি এগুলো না হতো তখন বলত যে, না, এ ধর্মটিই খারাপ ও ক্ষতিকর।

ইব্‌ন আবি হাতেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেদুঈনগণ নবী (স.)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি ফিরে যেতো এবং যদি দেখত যে, গৃহপালিত পশুর মধ্যে বরকত দেখা দিয়েছে, সহজে পানি পাওয়া যাচ্ছে। তা হলে তারা বলত, এ ধর্মটি খুবই ভাল। আমরা শান্তি পেয়েছি। আর যদি এর ব্যতিক্রম কিছু দেখত তাহলে সমস্ত দোষ ধর্মের উপর চাপিয়ে দিয়ে বলত যে, এ ধর্মের মধ্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নেই।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এমন কিছু লোক ছিল, যারা মদীনা আসার পর দেখত যে তাদের উটনী বাচ্চা ধারণ করেছে এবং সুস্থ আছে, তখন বলত এগুলো এ ধর্মের বরকতেই হচ্ছে। আর যদি কোন বিপদাপদ দেখা দিত কিংবা মদীনার আবহাওয়া সহ্য হয়নি অথবা কন্যা সন্তান প্রসব করেছে, তখন বলে দিত যে এ ধর্মেই যত মুশকিল ও বিপদ। আঃ রহমান বলেন, এগুলো কপট বিশ্বাসীদের আচরণ। যদি পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য হাতে এসে গেল, তখন ধর্মের প্রতি খুবই খুশী। আর যদি কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় বা আর্থিক সংকট দেখা দেয় তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়। এদের বদনসীব। ইহ ও পরকাল এদের ঝরঝরে। (ইবনে কাসীর, ৩য় খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

তাফহীমুল কোরআন

তারা দীনের চৌহদ্দির মাঝখানে নয় বরং এক প্রান্তে অবস্থান করে। অন্য কথায় কুফর ও ইসলামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে বন্দেগী করে যেমন একজন দ্বিধাপূর্ণ ও সংকল্পশূন্য মানুষ কোন সৈন্যবাহিনীর একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। জয় হলে এমনি এসে শামিল হয়ে যায়, আর পরাজয় হতে দেখলে চুপে চুপে পালিয়ে দূরে সরে যায়। যে সব লোক দুর্বল চরিত্রের, অস্থিরমনা ও নফসের দাস, তারা ইসলাম গ্রহণ করে বটে, কিন্তু তার ফায়দা ও সুযোগ-সুবিধা লাভের শর্তে তাদের ঈমানের পেছনে একটি শর্ত থাকে। আর তাহল এই যে, তাদের কামনা-বাসনা যেন অবশ্যই পূর্ণ হতে থাকে। পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তাই শুধু বিরাজিত হতে হবে চারদিকে। না খোদার দীন তাদের কাছে কোন ত্যাগ ও কুরবানী দাবি করবে, না দুনিয়ায় তাদের কোন কামনা-বাসনা অপূর্ণ থাকবে। এ ব্যবস্থা যদি হয় তাহলে তারা খোদার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁর দীন

www.pathagar.com

ইসলামও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, খুবই ভাল কিন্তু যখনই কোন বিপদ আসার আশংকা দেখা দেয় কিংবা খোদার পথে কোন বিপদ মুসীবত কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হবার আশংকা দেখা দেয় অথবা কোন বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়, তখন আল্লাহর রাসুলের রিসালত, দীন ইসলামের সত্যতা কোন জিনিসের উপরই তারা সন্তুষ্ট থাকে না। (তাফহীমুল কুরআন, ৯ম খণ্ড, ৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

সাফওয়াত তাফসীর

এমন অনেক ধার্মিক আছে, যারা দীনের এক প্রান্তে অবস্থান করে। এটা সেসব দোদুল্যমান ব্যক্তিদের উপমা, যারা পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে ইবাদত করে না বরং তারা দ্বিধা-সংকোচ ও সন্দেহ নিয়ে ধার্মিক সাজে। যেমন কোন লোক যুদ্ধরত সৈনিকদের পাশে অবস্থান নেয়। যদি অনুভব করে যে, বিজয়ী হতে পারবে এবং গনীমত পাবার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান তাহলে দৃঢ়পদে অবস্থান গ্রহণ করে আর না হলে পালিয়ে যায়। হাসান বলেন, এরা মুনাফিক। মুখে মুখে ধার্মিক বলে পরিচয় দেয়, অন্তরে ভিন্নমত পোষণ করে।

ইব্‌ন আব্বাস বলেন, কেউ কেউ হিজরত করে মদীনায় চলে আসত, যদি তার স্ত্রী এ সময় ছেলে সন্তান প্রসব করত এবং উটনী গর্ভবতী হতো তা হলে বলত এ ধর্মটিই কল্যাণকর, খুবই ভালো। আর এর ব্যক্তিক্রম হলে বলত এ ধর্মটিই কুলক্ষুণে। (পৃষ্ঠা ৩১-৩২, খণ্ড ৯ম)

জালালাইন

সন্দেহ ও দ্বিধা নিয়ে ইবাদত করা। একে পাহাড়ের ক্ষয়িষ্ণু ও ভংগুর পার্শ্বদেশের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যা মোটেই দৃঢ় ও স্থায়ী নয়। (পৃষ্ঠা ২৭৮)

তফসীরে কবীর

তফসীরে ইবনে কাসীরের অনুরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

ইসলামের যাবতীয় বিধান তাদের নিজস্ব প্রকৃত মূল্যের আলোকেই মূল্যায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এসবের সাথে বাস্তব ফলাফলের কোন সম্পর্ক বিবেচনায় না আনাই সাধারণ নিয়ম। অর্থাৎ ইসলামী বিধানগুলো মানার মূল ভিত্তি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালন করা। এর বিপরীতে পার্থিব কোন প্রতিদান লাভ না করা। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, ইসলামী অনুশাসন মুতাবিক জীবন যাপন করলে

www.pathagar.com

জাগতিক কোন সুফল লাভ করা যাবে না। এর অর্থ হলো জাগতিক সুফল অর্জন করা যাবে, তবে তা লক্ষ্য নয়।

ইসলামী অর্থনীতির নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে, এসব নীতিমালা বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হলো সমাজের অবস্থার উন্নতি। বরং মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহ্র আদেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করার দায়িত্ব পালন। এ কারণে ইবাদতের সাথে পার্থিব লাভ-লোকসানের সম্পর্ক স্থাপনকে আলোচ্য আয়াতে নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

- হাফেজ মোহাম্মদ জাফর

মো. শামসুল আলম খান

www.pathagar.com

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, যাবতীয় ভাল কাজের হুকুম দেবে এবং যাবতীয় অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। আর সব ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহ্র হাতে।

-সূরা হজ্জ ঃ ৪১

বিশেষ শব্দের অর্থ

মা'রূফ (معروف) মূল ধাতু معروف هرفان معرفة عرف অর্থ পরিচিত, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, সৎকর্ম ইত্যাদি (আল-মুনজাদ ও মিসবাহ) ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ন্যায়, সৎ ও উৎকৃষ্ট বলে পরিচিত কর্ম বা বিষয়কে معروف বলে।

মুনকার (منكر) মূল ধাতু نكرة، نكر অর্থ অস্বীকার, অপরিচিত, অজানা, ঘৃণা ইত্যাদি পরিভাষায় গর্হিত ও নিষিদ্ধ কর্ম ও বিষয়কে منكر বলা হয়। অর্থাৎ যাবতীয় অকল্যাণকর ও অসৎ কর্ম 'মুনকার'-এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রেক্ষিত

৩৯ নং আয়াত হতে সূরা হজ্জের ষষ্ঠ রুকু শুরু হয়েছে। রুকুর শুরুতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি ছিল মদীনায় হিজরতের পর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সর্ব প্রথম অনুমতি। বলা হয়েছে যে, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং যাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো। তারপর যুদ্ধ সংক্রান্ত আল্লাহ্র একটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ এক দল অন্য দলের প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করতেন তা হলে মসজিদ, গির্জা উপাসনালয় যাতে আল্লাহ্র

www.pathagar.com

নাম লওয়া হয় তা সবই চুরমার করে দেওয়া হতো, যুদ্ধ সংগঠনের এই কারণেই পূর্ববর্তী সব নবী ও উম্মতকে কাফিরদের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরূপ না করা হলে কোন মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না। ইতোমধ্যে হিজরতের পর নবী করীম (স.)-এর নেতৃত্বে মদীনা সনদের মাধ্যমে কার্যত মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই ভিত্তিকে আরো সংহত এবং যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করার সুযোগ দানের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করার অনুমতিও দেওয়া হল। এখন ইসলামী রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব হবে তার উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। আর তাই দেখা যাচ্ছে ৪১ নং আয়াতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তাফসীরবিদদের আলোচনা

মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেছেন ঃ "পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত ওসমান গনী (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। চারজন খুলাফায়ে রাশিদীন ও মুহাজিরগণ এ আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও স্কীতি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন, তারা তাদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন। এ কারণেই আলিমগণ বলেন, এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে রাশিদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তা সত্য, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল (রূহুল মা'আনী)

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে নযুল ভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য কুরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে যায়, এ কারণেই তাফসীরবিদ দাহ্হাক বলেনঃ এ আয়াতে তাদের জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লহ্ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আঞ্জাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খুলাফায়ে রাশিদীন তাদের যামানায় আঞ্জাম দিয়েছিলেন। (কুরতুবী)

www.pathagar.com

[মুফতী শফী (র.) তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ষষ্ঠ খণ্ড, সূরা হজ্জের তাফসীর অংশ থেকে]

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, তাঁহার (আল্লাহ্‌র) সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভের অধিকারী লোকের গুণাবলী এই যে, তাদেরকে দুনিয়ায় শাসনক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করা হলে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র আল্লাহ্-দ্রোহিতা ও নাফরমানীর এবং অহংকার ও গৌরবের পরিবর্তে এই হবে যে, তারা সালাত কায়েম করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের ধন-সম্পদ বিলাসিতা, জাঁকজমক ও নফসের দাসত্বের কাজে ব্যয় হওয়ার পরিবর্তে যাকাত দানের কাজে ব্যয় হবে, তাদের সরকার যাবতীয় ন্যায় কাজকে দমন করার পরিবর্তে উহাকে বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত হবে। তাদের ক্ষমতা অন্যায় ও পাপকে বিস্তার করার পরিবর্তে উহাকে দমন করার কাজে ব্যবহৃত হবে। বস্তুত এই একটি বাক্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উহার কর্মধারা ও কর্মচারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল কথা বলে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র মূলত কি ধরনের রাষ্ট্র, তা কেউ বুঝতে চাইলে এই একটি আয়াত হতেই বুঝতে পারে।

(তাফ্হীমুল কুরআন, সূরা হজ্জের ৮৫ নং টিকা)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে এ আয়াতে মূলনীতি, দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে যাকাত কায়েম করা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থে পূর্বেই করা হয়েছে। পরিশিষ্টেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে এ আয়াতে মারূফের প্রতিষ্ঠা ও 'মুনকারকে' নির্মূল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'মারূফ' বা সুনীতি এবং 'মুনকার' বা দুর্নীতি শব্দ দুটির ব্যাপক নৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরু বিল মারূফের সঠিক প্রয়োগের অর্থ হবে সর্ববিধ উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং "নাহি আনিল মুনকার"-এর তাৎপর্য হবে অর্থনৈতিক অবিচারের সব উপায় ও পন্থা বন্ধ করা। অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম ও জুলুমের অবসানের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন তৈরী করতে পারে এবং তার প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা কুরআনের এ আয়াতে ইসলামী সরকারকে দান করা হয়েছে। অবশ্য কি ধরনের পন্থা ও উপায়ে জুলুম গণ্য করা হবে তা নির্ভর করবে ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের উপর। এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইসলামী সরকার সব ধরনের মুনাফাখোরী, মওজুদদারী, কার্টেল, মনোপলী ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে পারে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিবেচনার শরীয়াহ্ ও ইসলামী আইনের লক্ষ্য সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের মতামত উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ্ তা'আলার সব নবী পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, গোটা সৃষ্টির মূল নীতি। আল্লাহ্র নাযিল করা প্রতিটি বিষয় এ কথা প্রমাণ করে যে, এ সবের সত্যিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য ও ইনসাফ এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। .. .. আমরা তাই ন্যায়সঙ্গত সরকারী নীতি ও আইনকে শরীয়তের অংশ মনে করি, শরীয়তের বরখেলাফ হওয়া মনে করি না। এ সবকে রাজনৈতিক নীতি বলা কেবল পরিভাষার ব্যাপার। আসলে এগুলো শরীয়তেরই অংশ। তবে শর্ত এই যে, এগুলোকে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। (ইলাম আল মুআক্কিন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯-১১)

ইবনুল কাইয়্যেমের ভাষ্য অনুযায়ী ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের প্রতিটি বিভাগে ইনসাফ কায়েম করা। আলোচ্য আয়াতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করার বিষয়টি ইসলামী সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিভাবে ইনসাফকে বাস্তবায়ন করা হবে, তা বিস্তৃত নীতি ও পদ্ধতির উদ্ভাবনের ব্যাপার! এই বিস্তৃত নীতিমালার পরিধি হিসেবে বলে দেওয়া হচ্ছে যাবতীয় সৎ, সাবলীল ও উত্তম পদ্ধতি ও কর্মসমূহ সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বপ্রকার নাহক, অসৎ, বাতিল ও বেইনসাফী, জুলুম, অপচয় ইত্যাদি উৎখাত ও বর্জন করা হবে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে 'মারূফ' প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে যাকাতের উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

এ আয়াতে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাও নিহিত রয়েছে বলা যায়। একটি কল্যাণ রাষ্ট্র সংগঠনে শুধু অর্থনৈতিক নীতি যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের আনুকূল্য সালাত কায়েমের কথা বলে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের পাপ মার্জনা করা হবে এবং সম্মানজনক জীবন সামগ্রী প্রদান করা হবে।

– সূরা হজ্জ ঃ ৫০

কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা

১. 'আমালুস্ সালেহাত' শাব্দিক অর্থ তথা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সকল সৎকার্য বা সকল ধরনের সৎকর্মাবলী।

২. 'রিযকুন কারীম' এর অর্থ হচ্ছে সম্মানজনক জীবন সামগ্রী। এখানে বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল নিয়ামত যা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হয় তা সবই এই রিযকুন কারীমের অন্তর্ভুক্ত। মাওলানা মওদূদী মনে করেন সম্মানজনক রিযকের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অতি উত্তম রিয্ক এবং দ্বিতীয়টি হল সম্মান মানের রিযক দেওয়া হবে। তাফসীরে জালালায়নে এর অর্থ করা হয়েছে জান্নাতের রিযক। আখলাকে ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছে–রিযক বলতে জীবন যাপনের উপায় বৃত্তি, আহার, সামর্থ্য, দয়া ইত্যাদী। ব্যপক অর্থে জীবিকা বলতে শুধু খাদ্যই নয় বরং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব সামগ্রীই অন্তর্ভুক্ত। যেমন আলো-বাতাস, আগুন পানি, ইট, বালি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি-সবই রিয্ক।

তাফসীরকারদের আলোচনা

তফসীরে কবীরঃ 'রিযকুন কারীমের' দ্বারা সওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে' অর্থাৎ মর্যাদা ও সম্মান প্রতিপত্তির জীবিকা। তা এই যে বিশ্বাসী মানুষ উপার্জনের বাধা ও কষ্ট অবসাদ থেকে এবং অন্যায় ও হীনতা থেকে পবিত্র থাকবে। আর পার্থিব জীবনটাকে ঐশ্বর্য ও ক্ষতিকর দিক থেকে মুক্ত অবস্থায় দিন যাপন করবেন। মান সম্মান ও মর্যাদায় থাকবেন অধিষ্ঠিত। এগুলো একজন মু'মিনের প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা। অবিশ্বাসীদের রিয্ক যাই হোক না কেন তা মর্যাদার রিযক নয়। (পৃষ্ঠা ৪৮, ২৩-২৪ খণ্ড)

www.pathagar.com

যীলালিল কুরআন

সাইয়েদ কুতুব বলেন, যারা ঈমান এনেছে এবং এর ফলাফলের প্রতি অনুকরণ করেছে আর সৎকর্মশীল জীবন কাটিয়েছে তাদের প্রতিদান হল—তাদের প্রভুর কাছ থেকে মার্জনা পাবে। তারা পেছনে যা কিছু অন্যায় ও গোনাহ করেছে তা মাফ করা হবে। পার্থিব ও পরজীবনে তাদের দেওয়া হবে সবদিক সম্পন্ন রিযক। তাতে কোন অপবাদও থাকবে না এবং লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হবে না। (৪র্থ খণ্ড, ২৪ ও ৩১)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামী জীবন বিধানের আওতায় জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো মূলত দুভাগে বিভক্ত। ইবাদত ও মু'আমিলাত অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সরাসরি আনুগত্য এবং পারস্পরিক লেনদেন। আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাধারণত ইবাদত সমূহের সম্পাদনাকে আমালুস সালেহ বা সৎকাজ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর পারস্পরিক লেনদেন তথা অর্থনৈতিক কার্যাবলী দুনিয়াদারী হিসেবে হেয় চোখে দেখা হয়। কিন্তু ইসলামের সামগ্রিক কল্যাণকর পথ পরিক্রমায় এই বিভাজন অবান্তর। আল কুরআন অর্থনৈতিক কার্যাদি পরিচালনা করে রিযক সংগ্রহে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অন্যদিকে হাদীসে বলা হয়েছে "পথ থেকে কাটা সরিয়ে ফেলাও ঈমানের একটি অংশ।" যেহেতু পথের কাটা সরিয়ে ফেললে জাগতিক কোন কল্যাণ নাও হতে পারে। তাই অর্থনীতি- বহির্ভূত কাজ বলে গণ্য করে উহাকে সৎকর্ম হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুরআনে বর্ণিত সৎকর্মসমূহের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক এবং তা মানুষের জন্য কল্যাণকর সকল কাজই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আধুনিক সামাজতত্ত্বে সাধারণভাবে নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত সমাজ কর্মগুলোকে (social services) সৎকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উদারণতঃ (chambers Dictionary-তে social service বলতে বোঝানো হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের যাবতীয় কাজ ছাড়া অন্য কোন উৎপাদনশীল প্রয়োজনীয় কাজ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু একজন উদ্যোক্তা যখন নিজের মানসিক ও দৈহিক শ্রম, পুঁজি দিয়ে একটি উৎপাদনশীল শিল্প কারখানা গড়ে তুলবে, সাধারণভাবে এটাকে একটি শুধু অর্থনৈতিক কার্য হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ ধরনের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত 'ভাল কাজ' গুলো সংশ্লিষ্ট হয়।

(ক) মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের যোগান বৃদ্ধি পায়।

(খ) প্রকল্পে নিয়োজিত হয় বেশ কিছু সংখ্যক বেকার শিক্ষিত, যুবক ও দুর্গত শ্রমিক গোষ্ঠী কাজ করে অর্থ উপার্জন করে তাদের পরিবার পরিচালনা করে থাকে।

www.pathagar.com

এমন কি সামাজিক কর্ম হিসেবে বিবেচনা করলেও উক্ত প্রকল্পের মত সৎকাজ হতে পারে কি ? কাজেই দেখা যাচ্ছে—সকল ইসলামী আইনসিদ্ধ অর্থনৈতিক কার্যাবলী 'আমালুস সালেহ' এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের সর্বশেষ অংশে " সম্মানজনক জীবন সামগ্রী প্রদান করা হবে।" উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রতি সরাসরি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সম্মানজনক রিয্ক আল্লাহ পাক সরাসরি প্রদান করবেন না। তিনি মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমেই এ রিযকের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাদি করে রেখেছেন। অন্যদিক থেকে দেখা যায় ইসলামে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবন এক ও অবিচ্ছিন্ন। এখানে কতিপয় প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন সম্মানজনক ও অসম্মানজনক কাজ বলে কিছু আছে কি? অমুসলিমদের উৎপাদনশীল কাজ সম্মানজনক রিযক হবে কিনা ? অন্যদিকে Transfer payment বলে পরিচিত অনুদান / পরিশোধ সম্মাজনক কাজ হবে কিনা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত প্রশ্নবলীর প্রেক্ষিতে বলা যায় শরীয়তে হালাল সমস্ত কাজই সম্মানজনক কাজ বলে গণ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত অমুসলিমদের উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত মুসলমানদের রিযক সম্মানজনক তা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে অমুসলমান মালিকদের রিযক সম্মাজনক কিনা তা ইসলামী ফিকহ্ বিশেষজ্ঞগণ পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন।

Transfer payment বিষয়টি দু'ধরনের। প্রথমত, 'কর' দ্বিতীয়ত, 'যাকাত'। কর গ্রহণ করে সরকার এবং যাকাত গ্রহণ করে দরিদ্র জনগণ। উভয় ক্ষেত্রে প্রদান ও গ্রহণ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বিধায় তা সম্মাজনক।

- জহুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ث فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তার দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন নি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ্ পূর্বেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন। যা এ কুরআনেও তোমাদের এই নাম। যাতে রাসূল (স.) তোমাদের উপর সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকের জন্য। অতএব নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মাওলা-মনিব। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা-বড়ই উত্তম সাহায্যকারী। – সূরা হজ্জ ঃ ৭৮

সাধারণ তাৎপর্য

পূর্বের ৭৭ নং আয়াতে ঈমানদারদের সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ ৭৮ নং আয়াতে নির্দেশসমূহ ও ঈমানদারদের লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছে। আয়াতের সাধারণ তাৎপর্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহ্‌র নামে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। কেননা আল্লাহ্ মুসলিম জাতিকে তার কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কাজ হচ্ছে সারা বিশ্বে আল্লাহ্‌র বাস্তব সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ সবাই যেন বাস্তবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে- এটাই হচ্ছে মুসলিমদের মিশন। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ দীনের মধ্যে অর্থাৎ

www.pathagar.com

ইসলামের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। মুসলমানদেরকে ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে বলা হয়েছে। কেননা ইবরাহীমের দাওয়াত ও মিশন ইসলাম থেকে ভিন্ন ছিল না।

এখানে মুসলিম জনগণকে সমগ্র মানবতার জন্য সাক্ষী হতে বলা হয়েছে এবং অর্থ হচ্ছে মুসলমানদেরকে সমগ্র মানবতার নিকট ইসলাম পৌছে দিতে হবে এবং সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধরার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, হিদায়ত কেবল আল্লাহ্‌র নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে, কেবল তাঁকেই ভয় করতে হবে। কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। অন্যসব আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অধীন হবে।

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

"দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আল্লাহ্ চাপিয়ে দেন নি" এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় তাফ্‌হীমুল কুরআনে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন, "তোমাদের যিন্দেগীকে সে সমস্ত অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় বাধা-বন্ধন হতে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যা অতীত উম্মাতের উপর তাদের আইনবিদ, পীর আলিম ও পোপেরা চাপিয়ে দিয়েছিল। এখানে যা চিন্তা ও কল্পনা গবেষণার উপর এমন কোন নিয়ন্ত্রণ আছে যা জ্ঞান গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হতে পারে না বাস্তব কর্মজীবনের উপর সে বিধি নিষেধ আছে যা তমদ্দুন ও সমাজের উন্নতির পরিপন্থী। এক সহজ সরল আকীদা ও আইন বিধানেই তোমাদের দেওয়া হয়েছে। এটি নিয়ে তোমরা যতদূর অগ্রসর হতে চাও অনায়াসেই হতে পার। এ কথাটিই অন্য সূরার এ পর্বে বলা হয়েছে ঃ

"এই রাসূল তাদের জানা চেনা নেক কাজের আদেশ করে এবং যে সব খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে যা মানুষের প্রকৃতিই খারাপ মনে করে। আর সেসব জিনিস হালাল করে যা পাক ও পবিত্র এবং হারাম করে সেসব জিনিস যা খারাপ। আর তাদের উপর হতে সেসব দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দেয়, যা তাদের উপর চাপানো ছিল সেই জিঞ্জিরগুলো খুলে ফেলে যাতে তারা বন্দী ছিল। (সূরা আ'রাফ ঃ '১৫৭, তাফ্‌হীমুল কুরআন, সূরা হাজ্ব ঃ ১৩০ টীকা)

মুফ্‌তী শফী উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

"ধর্মে সংকীর্ণতা নাই" এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ ধর্মে এমন কোন গোনাহ্ নেই, যা তাওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না।

www.pathagar.com

কেউ কেউ বলেন সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এ ধর্মে কোন বিধান নাই। (মুফতী শফী, সূরা হজ্বের ৭৮ নং আয়াতের তাফসীর হতে)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ আয়াতের অর্থনৈতিক তাৎপর্যবহ একটি কথা হচ্ছে-আল্লাহ্ পাক দীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন নি। দীন এর অন্যতম অর্থ হচ্ছে জীবন ব্যবস্থা। এ অর্থই এখানে যথাযথভাবে প্রযোজ্য। অন্য কথায়, আল্লাহ্ বলেন যে, মানুষ তার জীবনের কাজকর্মে অপ্রয়োজনীয় সংকীর্ণতা সৃষ্টি করুক বা বোঝা বহন করুক। যদি তা করা হয় তা হলে তা আল্লাহ্র মর্জি কার্যকর করা হবে না এবং আল্লাহ্র মর্জির বিপরীত কাজ করা হবে। এখান থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে,অর্থনৈতিক জীবনেও তা রাষ্ট্রীয় হোক, কি ব্যক্তিগত অহেতুক সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা ইসলাম সম্মত কাজ হবেনা। বরং তার বিপরীত হবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র যদি অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি নিষেধ আরোপ করে, বিধি-নিষেধ প্রয়োগে যদি কঠোরতা দেখায় , অপ্রয়োজনীয় অযথা জনগণের সাধ্যাতীত কর ধার্য করে শিল্প সাবান উৎপাদন ও বাণিজ্যে যদি অহেতুক ও সমাজের উন্নতির পরিপন্থী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তা ইসলামের বিপরীত কাজ হবে। মূল কথা হলো- কঠোরতা পরিহার ও সহজতা অবলম্বন। এটাই ইসলামের অন্যতম প্রধান মূলনীতি, যার প্রয়োগ অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, “তিনি তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠোরতা চান না” উল্লিখিত এ আয়াতে মানব জাতির জন্য মুসলিমদের সাক্ষ্য হওয়ার মধ্যে এ তাৎপর্য ও অন্তর্ভুক্ত যে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালা পৃথিবীকে জানানো, সবখানে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তা কায়েম করা ও মুসলিমদের দায়িত্ব।

এ আয়াতে যাকাত দেওয়ার কথা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যাকাত প্রসংগে সূরা বাকারা , সূরা তাওবার বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং পরিশিষ্টে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মু'মিনুন

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ص وَاِنَّا عَلٰى
ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ. فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ
لَّكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ
سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ. وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ
لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ
وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ.

আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর আমি তা ভূভাগে সংরক্ষিত রেখেছি এবং আমি তা অপসারণ করলে ও করতে পারি। আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহার কারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। এবং তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্য থেকে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর এবং তাদের পিঠ ও জলযানে আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক। সূরা মু'মিনুনঃ ১৮-২২

www.pathagar.com

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মুফ্তী শফী (র.) লিখেছেন, মানুষের জীবন ধারণের জন্য যেসব জিনিস অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশী হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আযাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হলে প্লাবন এসে যায়। ফলে আযাব নেমে আসে। তাই সবকিছু بِقَدَرٍ অর্থাৎ পরিমিতভাবে হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন اسكنه فى الارض। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে তা সংরক্ষণ করেছি। প্রাত্যহিক জীবনে যেভাবে যেস্থানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যেন পেতে পারে সে জন্য পানির বিরাট অংশকে পাহাড়ের শৃঙ্গে বরফ হিসেবে রেখে দিয়েছি।

অতঃপর আরবের রুচি অনুযায়ী কিছুসংখ্যক ফলমূল যেমন আঙুর, খেজুর, জলপাই ইত্যাদির নাম উল্লেখ হয়েছে। চতুস্পদ জন্তু দুধ, গোশত, লোম, অস্থি মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে উল্লেখ করেছি। উপকারের বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। মানুষ জন্তু জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করে এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত করে। অতঃপর নৌকা ও চাকার মাধ্যমে চলে-এমন সব যানবাহনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। (মা'আরেফুল কোরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আয়াত কয়টিতে আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ ও নিয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বৃষ্টির সাহায্যে পৃথিবীকে জীবিত করেন এবং খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর এক বিরাট এলাকার অর্থনীতিতে খেজুর খাদ্য ও ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের কোন কোন অংশের কথা বলা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা জলপাই উৎপাদনের কথা বলেছেন, যা তৈল হিসেবে এমনকি সবজি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনের অন্যান্য স্থানে অন্যান্য শস্যের উল্লেখ রয়েছে এবং এ সবই আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ। আয়াতসমূহে এর পর চতুস্পদ জন্তুসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের কারো কারো দুধ মানুষ পান করে থাকে। এসব জন্তু থেকে মানুষ অন্যান্য অনেক উপকারিতা পেয়ে থাকে। এসব পশুর মধ্যে অনেক পশুর গোশ্ত মানুষ খেয়ে থাকে। তাদের চামড়াও মানুষের কাজে লাগে। কিছু কিছু পশু ভারবাহী জন্তুও যান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সবই আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামত ও সম্পদ।

www.pathagar.com

তাছাড়া এসব আয়াতে আল্লাহ্ পাক জলযানের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্রই দেয়া গাছের কাঠ দিয়ে মানুষ এসব নৌকা তৈরি করে। আধুনিক যুগে মানুষ ইস্পাত দিয়ে বড় বড় জাহাজ তৈরী করছে। তাও আল্লাহ্র দেয়া আকরিক লৌহ দিয়ে। মানুষ তার পরিশ্রম দিয়ে আল্লাহ্র দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ সব যান তৈরী করেছে। এ সবও সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। মূলত মূল প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সম্পদ মানের দিক দিয়ে একই রকম।

সম্পদ ও আল্লাহ্র নিয়ামত বিষয়ে এ গ্রন্থে অনেক আলোচনা হয়েছে। তাই এখানে তার পুনরুক্তি করা হলো না।

- মোহাম্মদ শামসুল আলম খান

এবং

শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط اِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর ও সৎকর্ম কর, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। – সূরা মু'মিনুন ঃ ৫১

শব্দ গত ব্যাখ্যা

طيبات এক বচনে طيبة অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। শরীয়ত একে হালাল হিসেবে ঘোষণা না করলে ও সৃষ্টিগতভাবে যা উৎকৃষ্ট তাই তাইয়্যিবাহ।

তাফসীরে ইবনে কাসীর

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর লিখেছেন, মহান আল্লাহ্ সমস্ত নবী (আ.)-দের নির্দেশ দিয়েছেন যেন হালাল ও বৈধ উপায়ে রিযিক অন্বেষণ করেন এবং হালাল গ্রাস গ্রহণ করেন আর সৎকর্ম সম্পাদন করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হালাল খাবার গ্রহণ করাও সৎকর্মের সহায়ক। কাজেই নবীগণ সব ধরনের সৎকর্মের আঞ্জাম দেবেন। মৌখিক, কর্মগত, উপদেশ ও পথ প্রদর্শনের যাবতীয় তৎপরতা তাঁরা পরিচালনা করবেন। এতে অতিরঞ্জন কোন বর্ণনা নেই বরং তাদের হালাল খাবার খেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর মায়ের কাপড় বুনানোর পারিশ্রমিক দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সব নবীই ছাগল চরিয়ে জীবিকা চালাতেন। উপস্থিত জনতা রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল! হুজুর আপনিও কি ছাগল চরান ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও কয়েকটি কীরাতের (তাৎকালীন প্রচলিত মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম। অপর হাদীসে আছে যে, হযরত দাউদ (আ.) নিজে কায়িক পরিশ্রম করে উপার্জন করতেন। উম্মে আবদুল্লাহ্ বিনতে শাদ্দাদ (রা.) বলেন, একদা আমি নবী (স.)-এর কাছে সন্ধ্যাবেলায় এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তা দ্বারা রোযার ইফতার করেন। শেষ বেলায় রোদের প্রখরতা ছিল, তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে এই বলে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন যে, যদি তোমার

www.pathagar.com

নিজের বকরীর দুধ হতো তা হলে ভিন্ন কথা ছিল। তিনি এই বলে পাঠালেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল (স.)! এই দুধ আমি নিজের অর্থ দিয়ে কিনেছি। অতঃপর তিনি তা পান করেন। পরে একদিন উক্ত মহিলা নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সে দিনে ফেরত প্রদানের ঘটনা ব্যক্ত করাতে তিনি বললেন, আমাকে ঐশী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নবীগণ শুধু হালাল খাবেন এবং সৎকর্ম করবেন। অপর এক হাদীসে আছে, মহান আল্লাহ্ পবিত্র আর তিনি শুধু পবিত্রকে কবুল করে থাকেন। তিনি নবীদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করো এবং সৎকাজ করো। বিশ্বাসীদের প্রতি একই নির্দেশ। (পৃষ্ঠা ১৬-১৭, ৩য় খণ্ড)

তাফসীরে হাসান হাকীম লিখেছেন

রাসূলগণের মানবীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে তৎকালীন অবিশ্বাসীদের সন্দেহ ও কুধারণা অথাৎ স্বর্গীয় ফেরেশতাগণের ন্যায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিবর্জিত না হয়ে তারাও সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করে থাকে, এরই উত্তরে আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতে বলে দিয়েছেন যে, বিভ্রান্ত অংশীবাদী সম্প্রদায়সমূহের ন্যায় কুসংস্কারের বশে বৈধ পবিত্র বস্তুসমূহ অযথা বর্জনপূর্বক অনাহারে সাধন-ভজন করার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব নেই। বরং আমার নির্দেশিত বৈধ-পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে বিশ্ব হিতকর কাজ করাই শ্রেয়। অতএব হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও বৈধ বস্তুসমূহ থেকে ভক্ষণ কর এবং কল্যাণকর কাজ সাধন কর,আমি তোমাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছি। (পৃষ্ঠা ১০৯১, ৩য় খণ্ড)

তাফহীম ঃ মওলানা মওদূদী লিখেছেন

পবিত্র জিনিসসমূহ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে এমন সব জিনিস, যা নিজস্বভাবেও পবিত্র এবং হালাল উপায়ে উপার্জিত। এ পাক জিনিস খেতে নির্দেশ দিয়ে বৈরাগ্যবাদ ও দুনিয়া পূজা বা বৈষয়িকবাদ—এ দুয়ের মাঝে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানগণ না বৈষ্ণব আর বৈরাগীদের মত পবিত্র রিযিক খাওয়া থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখে, আর না তারা দুনিয়া পূজারীদের মত হালাল হারাম নিবিচারে সব জিনিসকেই মুখে পুরতে প্রস্তুত হতে পারে। নেক আমল করার নির্দেশের পূর্বে পাক জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় এ কথা স্পষ্ট যে, হারাম খাওয়া ও নেক আমল এক সঙ্গে চলতে পারে না, হারাম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেক আমলের কোন অর্থ হয় না। নেকীর জন্য হালাল রিযিক গ্রহণ পূর্বশর্ত। হাদীসে এসেছে, নবীজী (স.) বলেন, হে লোকেরা, আল্লাহ্ নিজে

www.pathagar.com

পাকও পবিত্র। এ জন্য তিনি পাক জিনিস পছন্দ করেন। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করে নিম্নের হাদীস বলেন ঃ

الرجل بطيل السفر اشعت اغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعذى بالحرم يمديديه الى الماء- يارب يارب فانى يستجاب اذالك-

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে ধূলিমলিন হয়ে আসে, আর আসমানের দিকে হাত তুলে দোয়া করে ঃ হে আল্লাহ! হে আল্লাহ্ অথচ অবস্থা এই যে, তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক হারাম ও তার দেহ হারাম খাদ্যে লালিত পালিত। এরূপ ব্যক্তির দোয়া কবূল হবে কিরূপে ? (কুরতুবী, পৃষ্ঠা ৩৯, নবম খণ্ড) তাফহীমুল কুরআন

সাফওয়াতুত তফসীর

আল্লামা সাবুনী লিখেছেন, মহান আল্লাহ রাসূলদের সম্বোধন করে বলছেন, তোমরা হালাল খাদ্য ভক্ষণ কর এবং সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ কর। যদিও রাসূলদের সম্বোধন করা হয়েছে, আসলে সমস্ত উম্মতকে এর অন্তর্ভুক্ত ধরে নিতে হবে। যেমন তুমি যদি কোন ব্যবসায়ীকে বল, হে ব্যবসায়ী! সুদ থেকে বেঁচে থাক। এর অর্থ সুদ থেকে শুধু ব্যবসায়ীরাই বেঁচে থাকবে না, বরং সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ ধমকের সুরে বলেন, তোমরা যা করেছো আমি তা জানি। কুরতুবী বলেন, এ সর্ম্পকে আল্লাহ নবী-রাসূলকে পর্যন্ত ধমক দিয়েছেন, তাহলে অন্যদের বেলায় কি হবে, তা অনুমান করা উচিত। (পৃষ্ঠা ৬০. নবম খণ্ড)

মুফতী শফী (র) লিখেছেন

'طيبات' এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই طيبات দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে নবীগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করা, দুই. সৎকর্ম করা। উম্মতগণও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

আলিমগণ বলেন, এদু'টি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের

www.pathagar.com

তওফীক আপনা আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়।

এ থেকে বোঝা গেল-ইবাদতও দোয়া কবূল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবূল হওয়ার যোগ্য হয় না। (মা' আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৩৮৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

আর্থ সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতের (সূরা মু'মিনুন ঃ ৫১)তাফসীর পর্যালোচনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত ও নির্দেশ পাওয়া যায়। দুনিয়ার যিন্দেগীর জন্য প্রতিটি মানুষকেই রিযিক গ্রহণ করতে হয়। আল্লাহ্র প্রেরিত নবী রাসূল (আ.) গণও এর ব্যতিক্রম কিছু নয় অর্থাৎ আহার-বিহারহীন বৈরাগ্যবাদী জীবন যে কোন মানুষের জন্যই অবাস্তব এবং তা অবলম্বন করা কারও জন্য বিধেয় নয়। নবী রাসূলগণের (আ.) জন্যও নয়। জীবন ধারণের বিধি-বিধান সাধারণ মানুষ হতে শুরু করে নবী রাসূলগণ (আ). পর্যন্ত একই রূপ। অন্য দিকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে জীবন বিধান দিয়েছেন, তা নবী রাসূলদের (আ.) মাধ্যমেই অবতীর্ণ করেন এবং নবী রাসূলদের (আ.) ব্যক্তি জীবনেই তা প্রথম বাস্তবায়িত হয়। তাই নবী রাসূলদের (আ.) উদ্দেশ্য করে আল্লাহ যে নির্দেশ দেন, তা শুধু নবী রাসূলদের (আ.) জন্যই নয়, তা সকল মানুষের জন্য। সকল মানুষের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতে রাসূলগণ (আ.) বলে সম্বোধন করার অর্থ হল, যদিও এ নির্দেশটি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি নাযিল হয়েছে, তবুও পূর্ববতী নবী রাসূলগণের প্রতিও এ বিষয়ে একই নির্দেশ ছিল।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী রাসূলগণকে পবিত্র বস্তু থেকে আহার করতে বলেছেন এবং সৎকাজ করতে বলেছেন। ইসলামী বিধানে খাদ্য হিসেবে যে বস্তুসমূহ হালাল তা সবই উত্তম ও পবিত্র। এই উত্তম ও পবিত্র দুই দিক থেকে হতে পারে। প্রথমত, আহার্য বস্তুটি দ্রব্য-গুণের দিক থেকে উত্তম ও পবিত্র। দ্বিতীয়ত, বৈধ উপায়ে অর্জন করার কারণে তা উত্তম ও পবিত্র। অন্যদিকে খাদ্য হিসেবে যে বস্তু অপবিত্র ও খারাপ, তা তার নিজস্ব গুণের দিক থেকেই অপবিত্র ও নিকৃষ্ট হতে পারে। যেমন মাদক দ্রব্য। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে এ বস্তু পানীয় হিসেবেই অত্যন্ত খারাপ ও ক্ষতিকর। আবার ,উপার্জন করার পদ্ধতির কারণে কোনও

www.pathagar.com

খাদ্য বস্তু ভাল অথবা মন্দ হতে পারে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত খাদ্যও অপবিত্র, যদিও দ্রব্য-গুণের দিক থেকে তা ভাল হতে পারে।

গুণ ও মানের দিক থেকে অপবিত্র ও মাদক বস্তু ভক্ষণ করলে ভক্ষণকারী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা রোগাক্রান্ত হয়ে যেতে পারে এবং সেই ক্ষতিগ্রস্ত ও রুগ্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে সমগ্র সমাজ বা সমাজের একটা বিরাট অংশ ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের ঘটনার উদাহরণ বর্তমান বিশ্ব সমাজে বিরল নয়। এভাবে মানব সমাজের যে ক্ষতি সাধিত হয় তার অর্থনৈতিক ক্ষতি কম নয়। সমাজের এক বিরাট সংখ্যক লোক যখন রগ্ন ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, তখন তারা উৎপাদন ও বন্টন (Production &Distribution)কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সমাজের উপর একটা দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দেয়। এ ব্যধি যদি বিস্তার লাভ করতে থাকে, তাহলে তা সমাজকে পরিণামে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, দ্রব্যগুণের দিকে উত্তম পবিত্র বস্তু যা আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন, তা ভক্ষণ করলে দেহ ও মন সুস্থ থাকে, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এরূপ সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী ব্যক্তি সমষ্টিই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের গতিধারাকে বেগবান ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে! ফলে সমাজ ক্রমে সার্বিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে।

হালাল এবং হারাম পন্থায় অর্জিত রিযিকের প্রভাব সমাজের উপর আরও ব্যাপক। হারাম পন্থায় অর্জনের যেসব দিক রয়েছে তার কোনটাই কোনও কালে সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হয়নি। সূদ-ঘুষ, রাহাজানি, চুরি, লুট, কালোবাজারী, চোরাকারবারী মুনাফাখোরী ইত্যাদী অবৈধ পন্থা সব সময়ই সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারীর সম্পদের পাহাড় বানানো এবং সীমাহীন বিলাস ব্যসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে সমাজের বিরাট অংশ রয়েছে শোষিত ও নির্যাতিত। পরিণামে দেখা দিয়েছে চরম আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা ও অস্থিরতা। এরূপ সমাজ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না, ইতিহাস তার সাক্ষী।

পক্ষান্তরে হালাল পন্থায় রিযিক উপার্জন করায় কোনরূপ খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে না। এ পন্থায় সূদ-ঘুষ আদান প্রদানের অবকাশ না থাকায় দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কালোবাজারীও মুনাফাখোরীর অস্থিত্ব না থাকায় চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক নিয়মে বাজারে অর্থাৎ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে। মানুষ সেখানে হয়ত নিজে সঠিকভাবে কাজ করে উপার্জন করার প্রচেষ্টা চালাবে অথবা শিল্প কলকারখানা

www.pathagar.com

ইত্যাদিতে উপযুক্ত মজুরী দিয়ে শ্রমিক-মজুর নিয়োগ করে উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবস্থা করবে। এরূপ পরিস্থিতি কোনরূপ সামাজিক অস্থিরতা ও সংঘর্ষের অবকাশ থাকবে না।

আলোচ্য আয়াতে একটি বিষয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তা হচ্ছে পবিত্র ও উত্তম খাদ্য আহরণের সাথে সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসলে এ দুটি বিষয় একটির সাথে অপরটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যে ব্যক্তির পবিত্র ও উত্তম খাদ্য অর্থাৎ হালাল খাদ্য গ্রহণের মন মানসিকতা থাকে, সে-ই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সৎ কাজ করতে পারে। আবার সৎ কাজের মাধ্যমেই হালাল রিযিক উপার্জন করা যেতে পারে। আর এ দু'য়ের সম্মিলনেই সমাজে এক অনাবিল শান্তি ও শৃঙ্খলার ফল্গুধারা প্রবাহিত থাকতে পারে। আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেহেতু বিশ্ব সামাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান, সেহেতু তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানব সমাজকে হালাল রুজী গ্রহণ ও সৎকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

- মুহম্মদ শামসুল আলম খান

এবং

নূর মোহাম্মদ আকন

www.pathagar.com

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ط بَلْ لَّاَيَشْعُرُوْنَ.

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি, তাতে করে তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি ? বরং তারা অনুধাবন করতে পারছে না। – সূরা মু'মিনুন ঃ ৫৫-৫৬

শব্দগত ব্যাখ্যা

'نمد' বিস্তৃত করা, বাড়িয়ে দেওয়া।

'سارع' ত্বরান্বিত করা, দৃঢ়ভাবে কিছু করা।

'خيرات' যাবতীয় 'কল্যাণ' পার্থিব-অপার্থিব মঙ্গল, উত্তম, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি।

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

তাফহীমুল কুরআন ঃ এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষের প্রচলিত ভুল ধারণা ও সংকীর্ণ মনোভাব দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। কল্যাণ, সাফল্য, মঙ্গল ও স্বাচ্ছন্দ্য সচ্ছলতা সম্পর্কে তাদের ধারণা হল সংকীর্ণ ও বস্তুগত। যে লোক ভাল খাওয়া পরা পেল, সুন্দর ঘর-বাড়ি বানাতে পারল, ধন ও জনবলে মহিমান্বিত হল, সমাজে যার খুব নাম ডাক ও প্রভাব প্রতিপত্তি হল, তাদের দৃষ্টিতে সে লোকেই সফলতা ও কল্যাণ লাভ করল। আর যে ব্যক্তি এ সব থেকে বঞ্চিত থাকল, সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত রয়ে গেল। এ মৌলিক ভুল ধারণার কারণে আরো একটি মারাত্মক ভুল ধারণায় পড়ে গেল। সেটি হল এই যে, এ অর্থের দৃষ্টিতে যে লোক কল্যাণ ও সাফল্য পেল, সে অবশ্যই সঠিক পথে আছে বরং সেই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা। অন্যথায় এ সাফল্য লাভ করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে। আর এর বিপরীতে যে লোক এ সাফল্য ও কল্যাণ হতে বঞ্চিত আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে নিশ্চয়ই আকীদা ও আমল (কর্ম) উভয় দিক দিয়ে গোমরাহ এবং আল্লাহ্‌র গযবের মধ্যে পড়ে গেছে। এ ভুল ধারণা মূলত বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন লোকদের গোমরাহীর অনেক কারণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কুরআনে

www.pathagar.com

এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে নানা যায়গায় নানা ভাবে। তন্মধ্যে সূরা বাকারার ১২৬-১২৯, ২১১-২১২ নং আয়াত, সূরা আ'রাফের ৩২ নং আয়াত, সূরা তাওবার ৫৫, ৬৯ ও ৮৫ নং আয়াত, সূরা ইউনুসের ১৭-১৯ নং আয়াত, সূরা হূদের ৩, ২০, ২৮, ৩৯ ও ৪০ নং প্রভৃতি আয়াত উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে এমন কতগুলো নিগূঢ় তত্ত্বকথা রয়েছে, যা খুব গভীরভাবে না বুঝতে পারলে কুরআন পাঠকের মন ও ধারণা পরিষ্কার হতে পারে না।

নিম্নে কয়েকটি তত্ত্ব সংক্ষেপে দেওয়া হল ঃ

(ক) 'মানুষের কল্যাণ' কথাটিকে কোন ব্যক্তির, দলের শ্রেণীর বা জাতির নিছক বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য ও সাময়িক সাফল্য অর্থে গ্রহণ করা যায় না। এটা এ অর্থের অনেক উর্ধ্বে এবং অনেক ব্যাপক।

(খ) কল্যাণকে উক্তরূপ সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করার পর একেই হক ও বাতিল এবং ভালো ও মন্দের মানদণ্ড হিসেবে নির্দিষ্ট করা হলে তা হবে এমনি এক মৌলিক ভুল, যা থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত কারো আকীদা ও চিন্তা বিশ্বাস এবং স্বভাব-চরিত্র কিছুতেই ঠিক হতে পারে না।

(গ) এ দুনিয়া মূলতই কর্মফল দানের ক্ষেত্র নয়, প্রকৃত পক্ষে এটা পরীক্ষাক্ষেত্র। এখানে নৈতিক কাজের পুরস্কার বা শাস্তি যদি কখনো দেওয়া হয়, তবু তা খুবই সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। আর এতে পরীক্ষার দিকটি প্রকট থাকে। এ সত্য ভুলে গিয়ে যদি মনে করা হয় যে, এখানে যে লোক যে নিয়ামতই পাচ্ছে, তা পুরস্কার হিসেবেই পাচ্ছে এবং এ পাওয়াই তার হক পন্থী, নেক চরিত্র ও খোদার প্রিয় ব্যক্তি হবার প্রমাণ, আর যার উপর যে বিপদই আসছে, তা তার শাস্তি এবং তার বাতিলপন্থী, অসৎ ও খোদার অভিশপ্ত হবার বাস্তব প্রমাণ। তা হলে এটা হবে মারাত্মক ভুল ধারণা। একজন সত্য সন্ধানী মানুষকে প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে, এ জগত আসলে এক পরীক্ষার ক্ষেত্র। এখানে বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্তির, জাতির এবং সমস্ত মানুষের পরীক্ষা হচ্ছে। পরীক্ষা চলাকালে লোকদের যে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তা শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে শেষ ফায়সালা নয়। অতএব, একেই মতাদর্শ পবিত্র ও কাজের ভালো বা মন্দ হবার মানদণ্ডও মনে করা যেতে পারে না। আর একেই খোদার প্রিয় বা অপ্রিয় হবার নিদর্শন এবং প্রধান মনে করাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। (তাফহীমুল কুরআন, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১, ৪২ ও ৪৩)।

ইবন কাসীর

১. (পূর্ব প্রসঙ্গসহ) মানুষ তার স্বীয় মতামত নিয়ে খুবই আনন্দিত, যদিও তা ভ্রান্ত হয়ে থাকে আর তাই আল্লাহ ধমকের সুরে বলছেন, তাদের ভ্রান্তির মাঝে থাকতে

www.pathagar.com

দিন। ধ্বংসের সময় আসুক, তখন বুঝতে পারবে। তারা কি অহংকার বশে ধারণা করছে যে, আমি যেসব ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি তাদের দিয়ে যাচ্ছি, তা কি তাদের সৎকর্ম ও কল্যাণের জন্য ? কখনই নয়। বরং এগুলো তাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। তারা তো ধারণা করে বসেছে যে, পার্থিব জীবনে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছে, পরকালেও ঠিক তেমনি সুখে থাকবে। এটা তাদের ভুল ধারণা। দুনিয়াতে আমি তাদের যা দিচ্ছি, তা কেবল একটা অবকাশ, একটা সুযোগ, এর সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে এরা জ্ঞাত নয়। যেমন আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেন ঃ

فَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلاَاَوْلاَدُهُمْ.

তাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি আপনাকে যেন অভিভূত না করে। অপর একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلاَاَوْلاَدُكُمْ بِا الَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَا زُلْفَى اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا.

তোমাদের সম্পদ ও জনবল আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না বরং যে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। – সূরা সাবা ঃ ৩৭

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত বিদ্যমান। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, তিনি সাফল্যের মানদণ্ড ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতির আধিক্যের মধ্যে নিরূপণ করেন নি। সুতরাং ধনবল ও জনবল দিয়ে মানুষকে মেপো না। বরং মানুষ মাপার মাপকাঠি হল ঈমান ও সৎকর্ম। আর সে-ই সফল, যার এ দুটো সম্পদ আছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

সে-ই মর্যাদাবান, যে তোমাদের মাঝে বেশী আল্লাহ্-ভীরু।

রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহ্ দুনিয়াটা তাকেও দেন যাকে ভালবাসেন আর যাকে ভালবাসেন না তাকেও দিয়ে থাকেন। তবে দীন শুধু তাকেই প্রদান করেন যাকে ভালোবাসেন।* অতএব আল্লাহ্ যাকে দীন প্রদান করেন বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন। আর আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন, সে-ই সফল ও কল্যাণ প্রাপ্ত। (তফসীরে ইব্ন কাসীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)

* মাসনাদে আহ্মাদ।

www.pathagar.com

সাফওয়াতুত তফসীর

অবিশ্বাসীরা কি ধারণা করে যে, আমি তাদের যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দিচ্ছি এগুলো তাদের উপর অনুগ্রহ ত্বরান্বিত করছি ? কিন্তু ব্যাপার তাদের ধারণার অনুকূল নয় বরং এটা তাদের জন্য অবকাশ, যাতে এ সুযোগে কি করে তা অবলোকন করা। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না। বরং তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের ন্যায় আসল তত্ত্ব সম্পর্কে চেতনাহীন। উক্ত আয়াত অবিশ্বাসীদের ধারণার প্রতিবাদ। তারা তো ধারণা করে যে, তাদের প্রাচুর্য ও জনবল প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ.

তারা বলে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের প্রাচুর্য। অতএব আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে না। (সাফওয়াতুত তফসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১)

তাফসীরকারদের আলোচনার প্রেক্ষিতে সাধারণ আলোচনা

হক ও বাতিলের মানদণ্ড নির্ণয়ে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে সামাজিকভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত লোকদেরকে জনসাধারণ সদল বলে গণ্য করে থাকে। নৈতিক দিক দিয়ে এ সব লোকজন যতই পাপাচারে লিপ্ত থাক না কেন, কুফরী, কুসংস্কার, শঠতা ইত্যাদি যত ধরনের অন্যায় ও অপরাধে তারা লিপ্ত থাক না কেন, সাধারণভাবে জাহিলী সমাজে তারা নন্দিত ও গৃহীত। অন্যদিকে যারা সৎকর্মশীল, খোদাপরস্ত, দৃঢ়চারিত্রিক এবং উন্নত নৈতিক মানের অধিকারী। ঘটনাক্রমে আর্থিক দৈন্য থাকার কারণে জাহিলী পরিবেশে তারা ব্যর্থ বলে নিন্দিত। কুরআনুল করীমের এ আয়াতে ব্যর্থতা ও সাফল্যের মানদণ্ড হিসেবে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে প্রত্যায়ন করছে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সন্তান-সন্ততির প্রকাশ (যদি তারা সত্যাশ্রয়ী না হয়) এবং অর্থ সম্পদের আধিক্য (যদি এ আধিক্যের সাথে ঈমান যুক্ত না হয়) তাদের জন্য। কোন মঙ্গল আনতে সক্ষম হবে না বরং অল্প কয়েক দিনের পার্থিব জীবনাবসানে কবরে পৌছা মাত্রই তারা বুঝতে পারবে তাদের দুনিয়াবী সাফল্যের মূল্য কোথায় ? অথচ আজকে জীবিত অবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তারা বুঝতে চাচ্ছে না। মূলত আয়াতটিতে ঈমান, তাক্ওয়া ও পরহিযগারীকে পার্থিব অর্থনৈতিক সাফল্যের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাহা পরহিযগারী বা তাক্ওয়ার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাংঘর্ষিক নয়। তাক্ওয়ার মূল শর্ত হল হালাল পন্থায় বৈধ-সীমার মধ্যে সকল কর্ম সমাধা করা। এ সূরার ৫১ নং আয়াতে সকল পাক-পবিত্র ও বৈধ বস্তু সামগ্রী ভোগ করার জন্য উৎসাহিত করা

www.pathagar.com

হয়েছে। কাজেই এ সব পরিহার করে নিজের দেহ ও আত্মাকে বৈধ ভোগ ব্যাবহার থেকে বঞ্চিত রাখা তাক্ওয়ার নাম নয়। ইসলামের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে আমরা অনেক ইমাম, শায়খ ও পণ্ডিত দেখতে পাই, যাঁরা তাঁদের জ্ঞান গবেষণার সঙ্গে অর্থনৈতিক দিক থেকেও সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম বাধা হচ্ছে অপচয়। এই অপচয় যেমন ব্যক্তিগত পর্যায়ে হতে পারে, তেমনি জাতীয় পর্যায়ে ও জাতীয় সম্পদের অপব্যবহারের মাধ্যমে হতে পারে। সম্পদের এই অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করা গেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পদের আরও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হবে। আর পরহিযগারীর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদ ভোগ ব্যবহারে কোন রকম অপচয় হবে না। কাজেই তাক্ওয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে একটি ধনাত্মক সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক।

আয়াতটিতে যেহেতু সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি জীবনের প্রকৃত সাফল্য ও মূল্যায়নের জন্য জরুরী নয় এবং এ সব সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এর ফলে বিত্তশালী ঈমানদার মুসলমানরা আল্লাহ্র পথে খরচ করার জন্য উৎসাহিত হবে---সম্পদ বন্টনে যার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

এ আয়াতটি অর্থনৈতিক আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। অর্থনৈতিক সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ণয়ে এ আয়াতটি যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

- মুহাঃ জহুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

الَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا.

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথা-যথ অনুপাতে।

– সূরা ফুরকান ঃ ২

শব্দের তাৎপর্য

ملك সার্বভৌমত্ব, শাসন ক্ষমতার মহত্ত্ব, আইন বিধান তৈরীর অধিকার, বাদশাহী, সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

তাফসীর

তাফসীরে এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন।

(মা'আরেফুল কোরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর হতে)

তাফসীরকারদের আলোচনা

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেন ঃ

"তিনি (আল্লাহ্)কাহাকেও পালক পুত্র বানান নাই। বিশ্বলোকে এমন কেহ নাই, আল্লাহ্র সঙ্গে যাহার বংশীয় কিংবা পালক পুত্র হওয়ার সম্পর্কের কারণে তাহার মাবুদ হওয়ার অধিকার অর্জিত হবে। তাঁহার সত্তা এক ও একক মাত্র। কেহ তাঁহার সমজাতীয় বা সমপ্রজাতীয়ও নাই। খোদায়ী বংশ বলে কিছু নাই, আল্লাহ্র কোন বংশের ধারাও চালু হয় নাই। বহু সংখ্যক খোদাও সেই বংশ হতে বের হয় নাই। অতএব যে সব মুশরিক ফেরেশতা, জ্বিন কিংবা কোন মানুষকে আল্লাহ্র বংশধর বা সন্তান মনে করে নিয়েছে আর এই কারণে তাদেরকে দেবতা ও মাবুদরূপে গ্রহণ করেছে, তারা সকলেই পুরাপুরি জাহিল-পথভ্রষ্ট। অনুরূপভাবে তারাও সুস্পষ্ট মূর্খতা ও

www.pathagar.com

গোমরাহীতে নিমজ্জিত, যারা বংশীয় সম্পদের কারণে না হলেও কোন বিশেষ ধরনের বিশেষত্বের ভিত্তিতে মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে নিজের পুত্র বানিয়েছেন।" (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফুরকানের ৬ নং টীকা)

মুল্‌ক্‌' শব্দটি আরবী ভাষায় বাদশাহী, সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা বোঝাবার জন্যে ব্যবহার হয়। তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সমগ্র বিশ্ব-লোকের অধিকারী; প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকার– তথা ক্ষমতা ইখতিয়ারে অপর কারো একবিন্দু পরিমাণ অংশও নেই।

(তাফহীমূল কুরআন, সূরা আল-ফুরকান)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতের কোন সরাসরি অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে বলা যায় না। কিন্তু এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মানবজাতির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ম নীতি নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। কেননা তিনিই একমাত্র সার্বভৌম শক্তি। সার্বভৌম শক্তিরই এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি মানব জাতির জন্য মৌলিক নীতি, আদর্শ আইন দেবেন। বাস্তবেও আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো পক্ষে সার্বভৌম শক্তি হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ বা আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব শক্তিরই নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের পক্ষে চিরন্তন ও সবার জন্য কল্যাণকর নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ জন্য ইসলামে মূল আইন আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে এ মূল আইন ও নীতিমালাকে কার্যকর করা। অবশ্য মানুষ ইতিহাসের মাধ্যমে পরিবর্তিত সময়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মূল আইনের অতিরিক্ত আইন ও মূল আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারে। সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ক নীতি নির্ধারণে আয়াতটি থেকে ইরশাদ গ্রহণীয়।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নূর

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ط اِنْ
يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ
ط وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ
عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا- وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اٰتٰكُمْ ط
وَلَاتُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا
عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ
اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের সম্পদশালী করে দেবেন, আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে সম্পদ শালী না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মাঝে কল্যাণের সন্ধান পাও। আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদের দান করবে। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাদের ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না, আর যে তাদের বাধ্য করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর জবরদস্তির পরে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

- সূরা আন-নূর ঃ ৩২-৩৩

www.pathagar.com

বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা

ايامى। এক বচনে ايم। অর্থ জুড়িহীন, (লিসানুল আরাব) নারী পুরুষ উভয়ের বেলায় ব্যবহৃত। وليستعفف মূল ধাতু عفة পবিত্রতা, অনাবিলতা, নিষ্কলুষতা। উক্ত শব্দের অর্থ পবিত্রতা অর্জন করার প্রচেষ্টা।

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী মুহম্মদ শফী (র.) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ وانكحوا الايمى منكم অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী যার বিয়ে বর্তমান নেই। আসলেই বিয়ে না করার কারণে হোক কিংবা বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিয়ে সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদের আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিয়ে নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরির্বতে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিয়ের মাসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিয়ে তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে -এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাবার ও সমূহ আশংকা থাকে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিয়ে নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। তবে ইমাম আযমের মতে এরূপ বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্মকর্মের হিফাযতের জন্য বিয়ে করতে ইচ্ছুক কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই, আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হিফাযত ও সুন্নতে রাসূলের ইতাআত করার সদুদ্দেশ্যে বিয়ে করবে, তখন আল্লাহ তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন।

(মা'আরেফুল কোরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, উক্ত আয়াতদ্বয়ের তাফসীর)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাফহিমুল কুরআনে লিখেছেন

يامى বহু বচন একবচনে ايم। এর অর্থ জুড়িহীন। সাধারণত ايم। বলতে বিধবাকে বোঝানো হয়ে থাকে। বস্তুত এর অর্থ স্বামী বা স্ত্রীহীন পুরুষ।

– সূরা নূরের ৫০ নং টীকা

اَنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ-

www.pathagar.com

এর প্রকৃত অর্থ এ নয় যে, যারই বিয়ে সম্পন্ন হবে তাকেই আল্লাহ্ অনেক ধন সম্পদ দান করবেন। বরং এর বক্তব্য এ যে, এ ব্যাপারে লোকেরা যেন খুব বড় হিসেবী হয়ে না দাঁড়ায়। এতে কন্যা পক্ষের প্রতি হিদায়ত হল কোন ভাল স্বভাবচরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি যদি তাদের ঘরে বিয়ের পয়গাম পাঠায় তবে কেবল তার দরিদ্র অবস্থা দেখেই যেন প্রত্যাখ্যান না করে। আর ছেলেমেয়ের প্রতি হিদায়ত হল ছেলে এখনো খুব বেশী কামাই রোজগার করছে না বলে তাকে যেন অবিবাহিত না রাখা হয়। মোট কথা হল অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের আশায় বিয়ে শাদীর ব্যাপারটাকে মূলতবী রাখা উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায়, শুধু বিয়ের কারণেই মানুষের আর্থিক অবস্থা ভাল হয়ে থাকে। দায়িত্ব মাথার উপর এসে গেলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অধিক পরিশ্রম করতে এবং আয় বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হয়। রুজি রোজগারের ব্যাপারে স্ত্রীও সহযোগিতা করতে পারে এবং ব্যয় কাজটা তার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সময় ভাল অবস্থাও খারাপ হতে পারে। খারাপ অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে ভাল হতে পারে।

(সূরা নূরের ৫৩ নং টীকা)

ইব্‌ন মাসউদ থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম (স.) বলেন, "হে যুব সমাজ। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করতে পারে, তার তা অবশ্যই করা উচিত। কেননা বিয়ে খারাপ দৃষ্টি থেকে আত্মাকে রক্ষা করার এবং পবিত্রতা রক্ষার বড় উপায়। আর যে তার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌন প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে।" (সূরা নূরের ৫৪ নং টীকা)

বিয়েতে অভিভাবকত্ব

উপরিউক্ত ৩৪ নং আয়াতে দেখা যায় যে, অভিভাবকদের মাধ্যমে বিয়ে সম্পাদন করাই যথার্থ ইসলামী পন্থা। এ সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যাপারে সব ইমামই একমত যে, বিয়েতে বয়স্ক নারীর মতামত থাকতে হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"পূর্বে বিবাহিত এমন জুড়িহীন ছেলেমেয়ের বিবাহ হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে এবং পূর্বে অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ে হতে পারে না যতক্ষণ না তাদের স্পষ্ট অনুমতি পাওয়া যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

তবে বিয়েতে অভিভাবকদের সম্মতি বাধ্যতামূলক কিনা -এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদের মত হচ্ছে যে কেবল মেয়ের অনুমতিতেই বিয়ে হতে পারে না, অভিভাবকদের অনুমতি লাগবে। ইমাম আবু হানীফা (র.), যুফার, শাবী ও জুহরীর মত হচ্ছে যদি একজন নারী তার অলী ছাড়াই

www.pathagar.com

বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলে এবং তা কুফু (বিয়েতে পাত্র ও পাত্রীর ক্ষমতা) অনুযায়ী সম্পন্ন হয় তবে তা জায়েয হবে। (ইবনে রুশদ, বাদিয়াতুল মুজতাহিদ, দ্বিতীয় খণ্ড)

এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম মতবিরোধের মীমাংসা পর্যায়ে লিখেছেন, "ওলীর মতে ও ছেলেমেয়েদের মতে বিয়ের ব্যাপারে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তখন ওলীর মতের উপর ছেলেমেয়ের মতেরই প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত যদি তা ভাল পাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে হতে দেখা যায়। কেননা বিয়ে হচ্ছে তার, ওলীর নয়। আর বিয়ের বন্ধনজনিত যাবতীয় দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়, ওলীকে নয়। সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াত থেকেও তা প্রমাণিত হয় ঃ

"তাদের ইদ্দত পূর্ণ হলে পরে তাদের নিজেদের সম্পর্কে শরীয়ত মুতাবিক ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যে সিদ্ধান্তই তারা গ্রহণ করুক তাতে তোমাদের (অলীদের) কোন দায়িত্ব নাই।"*

—মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ঃ পরিবার ও পারিবারিক জীবন

এখানে কুরআনের অন্য অনেক আয়াতের মতো যারা অসহায় বা অসুবিধায় আছে তাদের সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে— যারা মুক্তির প্রয়াসী তাদের আর্থিক সাহায্য কর। এ নীতি সব স্থানেই ও সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।

পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করার মধ্যে এ তাৎপর্য রয়েছে যে ইসলাম সব পেশাকে বৈধ মনে করে না। মানবতার জন্য অকল্যাণকর কোন পেশাই ইসলামের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজে বর্তমানের কিছু কিছু পেশা হয়তো থাকবে না। অবশ্য তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট যুগের ইসলামী পণ্ডিতদের পরামর্শের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের উপর।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

---

* এ আয়াতের ইশারা যদিও বিবাহিতা নারীদের ব্যাপারে, তথাপি একই নীতি অবিবাহিতা নারী ও পাত্রের জন্য প্রযোজ্য হতে কোন বাধা নেই। (প্রবন্ধকার)

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফুরকান

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ط
لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا. اَوْيُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ
تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا ط وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا
رَجُلًا مَّسْحُوْرًا. اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا. تَبٰرَكَ الَّذِىْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ
جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُلا وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا.

তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করে; তার কাছে কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হল না, যে তার সাথে থাকত সতর্ককারীরূপে; তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে ? সীমালংঘনকারীরা আরো বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সঠিক পথ পাবে না। কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এর চাইতে উৎকৃষ্টতর বস্তু, উদ্যানসমূহ, যার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

– সূরা ফুরকান ঃ ৭-১০

www.pathagar.com

কয়েকটি শব্দের টীকা

مـا لهذ الرسـول এখানে বিস্ময়কর প্রশ্নে এর উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কেমন রাসূল ?

كنز বহুবচনে كـنـوز সঞ্চিত ভাণ্ডার, সোনা-রূপার ভাণ্ডার।

قصور এক বচনে قصـر প্রাসাদসমূহ।

مسحور মূল শব্দ سـحـر যাদু-ইন্দ্রজাল। যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে مـسـحـور বলা হয়। (মিসকাহুল্লুগাত)

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মুফতী মুহম্মদ শফী (র.) লিখছেন ঃ ৭ নং আয়াত ও এর পূর্ববর্তী ৩ থেকে ৬ নং আয়াত পর্যন্ত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়ত ও কুরআনের বিরুদ্ধে কাফিরদের সন্দেহমূলক আপত্তি বিবৃত হয়েছে।

(ক) কুরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে তারা স্বীকার করত না, তারা আপত্তি তুলল এবং বলল যে, মুহাম্মদ (স.) নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরানো উপকথা-রূপকথা লিখিয়ে নিয়েছেন। এদের ভিত্তিহীন আপত্তির উত্তরে আল্লাহ কুরআনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রদান করে বলেছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ.

আমরা বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে এসো এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা তা আনয়ন না কর এবং কখনই করতে পারবে না, তবে সে আগুনকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।

– সূরা বাকারা ঃ ২৩-২৪

অতঃপর তারা কুরআনের অনুরূপ একটি ছোট সূরা লিখে আনার মত সাহস করেনি। এটাই এ বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ যে, কুরআন কোন মানব রচিত কালাম নয়।

www.pathagar.com

(খ) তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তাহলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না; বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এত ধনভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোন চিন্তা করতে হত না, হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে হত না। এ ছাড়া তিনি যে আল্লাহ্‌র রাসূল-একথা আমরা কিরূপে মানতে পারি? প্রথমত, তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়ত, কোন ফেরেশতাও তাঁর সাথে থাকে না, যে তাঁর সাথে কোন কালামের সত্যায়ন করবে। তাই মনে হয়, তিনি যাদুগ্রস্ত। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। এদের জবাব দিয়ে আল্লার বলেন ঃ

أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا –

দেখুন, এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তাদের পথ পাবার কোন উপায় নেই।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ اِنْ شَاءَ ——— قُصُوْرًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এর বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। মানুষ মুর্খতা ও সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে একথা বলছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধনভাণ্ডার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্টের অধিপতি করি; যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে অগাধ ধন-দৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি-সামর্থ্য ও প্রকাশ করেছি। কিন্তু সর্ব-সাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের আলোকে পয়গম্বরদেরকে প্রাচুর্য ও পার্থিব ধন-দৌলত থেকে দূরেই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (স.) দরিদ্রদের কাতারে থাকাই পছন্দ করেছেন। আবূ উসামা থেকে মসনদে আহমাদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (স.) বলেন, আমার প্রভু আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্য সমগ্র মক্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দিই। আমি বললাম, না, হে প্রভু! আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবর করব-এ অবস্থাই আমি

www.pathagar.com

পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। আল্লাহ সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই আমাকে দরিদ্র হিসেবে রেখেছেন। কাফিরদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের মত পানাহার করতেন না ও জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফিরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্‌র রাসূল মানব হতে পারে না। ফেরেশতাই রাসূল হবার যোগ্য। আল্লাহ তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اِنَّهُمْ لَيَاْ كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ-

আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। - সূরা ফুরকান ঃ ২০

যাদের তারা রাসূল বলে স্বীকার করে, তারাও মানুষ ছিলেন। পানাহার করতেন, হাটে-বাজারে যেতেন। মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল। মহান আল্লাহ সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন; কিন্তু এর কারণে বিশ্ব ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই আল্লাহ কাউকে ধনীও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন। এ বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতা এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। এ জন্যই ইসলামের সুমহান আদর্শ হল- তোমার দৃষ্টি যখন এমন ব্যক্তির উপর পতিত হয়, যে টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমার চাইতে বেশী, তখন কাল বিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা তোমার চাইতে নিম্নস্তরের, যাতে তুমি হিংসার গোনাহ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে পার। (পৃষ্ঠা ৫৭২-৭৩-৭৪-৭৫, মা'আরেফুল কোরআন, ৫ম খণ্ড)

সাইয়েদ কুতুব লিখেছেন, অভিযোগকারীদের বিস্ময়, তিনি যদি নবী হবেন, তাহলে তিনি মানুষের মতই হাটে-বাজারে চলাফেলা করেন কেন? পানাহার করেন কেন? এ ধরনের অনভিপ্রেত অভিযোগ প্রতিটি নবীর বেলায় উত্থাপিত হয়েছে। মানবিক আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি তো অমুকের ছেলে অমুক, সবার কাছেই পরিচিত, নিত্যদিনের চালচলনে সর্বজনবিদিত। মানুষের মতই পানাহার করেন, চলাফেলা করেন। অথচ তিনিই হবেন এমন দায়িত্বপূর্ণ রাসূল, এটা

www.pathagar.com

কি করে সম্ভব? তার কাছে নাকি ওহীও আসে। যে এ পার্থিব জগতের অনেক কিছুই জানে না, সে কিভাবে অদৃশ্য জগত সম্পর্কে জ্ঞাত হবে? এ ধরনের অমূলক সন্দেহ পোষণ করে তারা নবীদেরকে তাদেরই মত রক্ত-মাংসের মানুষ ধারণা করত। তারা বলত, আমরাও তো মানুষ, আমাদের কাছে তো ওহী আসছে না, অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে আমরা তো কিছুই জানতে পারছি না।

তাদের অভিযোগ অস্বাভাবিক নয়। কেননা এদের ভেতরে আত্মা প্রবেশ করানোর কারণে সাধারণ একটি জীব হওয়া সত্ত্বেও তারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সেরা সৃষ্টি মানুষে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বে সবার উপরে প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব দিচ্ছে। অথচ তার জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ অভিজ্ঞতা সীমিত আর জানার মাধ্যমগুলো অত্যন্ত দুর্বল। সুতরাং এ মানব জাতিকে আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য ছাড়া প্রতিনিধিত্বের কাজে ছেড়ে দিতে পারেন না। আলোকময় সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা না দিয়েও ছাড়তে পারে না। আর এ দুর্লভ মর্যাদা, অনবদ্য যোগ্যতা এবং দায়িত্ববোধের দৃঢ়তার জন্য দরকার ওহীভিত্তিক ঐশী নির্দেশের। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এ জাতির মধ্য থেকে কোন একজনকে সে দায়িত্বের জন্য বাছাই করা হবে। সে সুযোগ্য ব্যক্তিই আত্মোন্নতির মাধ্যমে সে দায়িত্ব পাবেন। অতঃপর তাঁর কাছে এমন পদ্ধতিতে ওহী আসবে, যা অন্যদের জন্য অভাবিত ও অজ্ঞাত ও তমসাবৃত। আল্লাহ্ সেই বান্দাকেই রাসূল বানান, যখন দেখেন তার ভেতরেও গুরুদায়িত্ব বহন করার মত দৃঢ়তা আছে। অবিশ্বাসীদের আরো একটি অভিযোগ হল, তিনি রাসূল হলে অবশ্যই তাঁর কাছে ধনভাণ্ডার থাকত। তা থেকে নিজের প্রয়োজন মেটাতেন এবং অন্যরাও ভোগ করত। আল্লাহ্ এমন ইচ্ছে করেন না যে, নবীর কাছে ধনভাণ্ডারের প্রাচুর্য ও বাগান থাক। কেননা তাঁর ইচ্ছে হলো যে, নবী হবেন উম্মতের জন্য পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্ব দানকারী; কেউ যেন বলতে না পারে যে, তিনি তো জীবিকার পেছনে পড়ে আছেন, অন্যান্য মানুষের মতই ভোগ-বিলাসের তদবীরে ব্যস্ত। সম্পদের হিসেব-নিকেশ ও ঝামেলা তাকে অন্যান্য কাজ থেকে বিরত রাখছে। এছাড়া মানুষ যেন বলতে না পারে যে, তিনি তো সম্পদের লোভ দেখিয়েই তার দলে লোক ভিড়াচ্ছেন। সুতরাং দীনের মহান আদর্শ ও সঠিক নেতৃত্ব বিকাশের জন্যই নবীদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেন না।

(ফী-যিলালিল কুরআন ঃ পৃষ্ঠা ২৫৫৩, ৫ম খণ্ড)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা ফুরকানের ৭-১০ আয়াতের তাফসীরের বিস্তারিত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দৈনন্দিন জীবন ও তাঁর আচার-আচরণে অতিমানবতার বিশেষ কোনও নিদর্শন না থাকায় তাঁকে তারা নবী বলেই মানতে চাইছে না। মূর্খ

www.pathagar.com

কাফিররা বলছে, নবীও একজন সাধারণ মানুষের মত হাটে-বাজারে চলাফেরা করছে, খাওয়া-দাওয়া করছে, তার জন্য কোন বিশেষ ধনভাণ্ডার বা বিশেষ ধরনের বাগানের ব্যবস্থা নেই, নিরাপত্তার জন্য নেই কোন রক্ষী ফেরেশতা। সুতরাং তিনি কোনও বিশেষ মর্যাদাবান নবী বা রাসূল অর্থাৎ মানব সমাজের পথ প্রদর্শক নেতা হতে পারেন না। আলোচ্য আয়াত কটিতে কাফিরদের এ ধরনের অভিযোগের সঠিক জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বিপুল ধন ভাণ্ডার, বিশাল শস্যক্ষেত্র, বাগ-বাগিচা, অতি উৎকৃষ্ট কোন বস্তু, সুশীতল পানি ভরা নদী-নালা ইত্যাদি অনায়াসেই দিতে পারতেন, যেমন বিপুল সম্পদ, ধনভাণ্ডার, বাদশাহী দেওয়া হয়েছিল হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-কে। হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রেরিত হয়েছেন নবুয়ত ও রাসূল অবতীর্ণ হওয়ার সর্বশেষ পর্যায়ে। মানব সভ্যতাও তখন ক্রমবিকাশের প্রায় সর্বশেষ স্তরে এসে পৌঁছেছে। এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা অনুযায়ী মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হচ্ছে তার তাকওয়া ও পরহিযগারী দ্বারা-বংশ, গোত্র বা বর্ণ দ্বারা নয় অথবা কোনও বিশেষ অবস্থা দ্বারাও নয় (ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহে আতকাকুম)। তাই সূরা তাওবার শেষের দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ আমি রাসূল (স.)-কে উঠিয়েছি তোমাদের (সাধারণ মানুষের) মধ্য হতেই। তিনি তোমাদের বন্ধু........

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ ——————— الخ।

রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেও বলেছেন আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ "আনা বাশারুম মিসলুকুম ....

উপরের আলোচনা হতে স্পটই বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স.)-কে সাধারণ মানুষের মধ্য হতেই উঠিয়েছেন। তাই তাঁর চাল-চলন, আচার-আচরণ, খাওয়া-পরা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মতই হবে। এতে যেমন আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই, তেমনি নেই অবাক হওয়ার কোনও কিছু তাঁর নবূয়তপ্রাপ্তিতে অথবা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল রূপে প্রেরিত হওয়াতে। সাধারণ মানুষের মধ্যে গুণের পার্থক্য সর্বত্রই দেখা যায়। কাউকে আল্লাহ্ অন্যের চেয়ে বেশী গুণান্বিত করেন। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রেরিত রাসূলকে জ্ঞানে-গুণে, বুদ্ধি-বিবেচনায়, তাকওয়া- পরহিযগারীতে অন্য সব মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করতে পারেন, এটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণই থাকতে পারেনা। আর তার জন্য বিশেষ কোনও ধনভাণ্ডার বা ফেরেশতা পাহারাদার নিযুক্ত করারও প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না। বরং একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় জীবন যাপন করে। সাধারণ মানুষের

www.pathagar.com

সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশা করে, তাঁদের জীবনের দুঃখ-দৈন্যের অংশীদার হয়েই তাদেরকে আল্লাহ্ নির্ধারিত পথে পরিচালিত করেছেন। হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে, রণক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাদের সাথী। এই-ই হল সত্যিকারের মানুষের নেতার কাজ এবং সঠিক আচার-আচরণের একটা আদর্শ।

বায়তুলমালে এবং গনীমতের সম্পদের উপর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল কিন্তু তিনি তা নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য কখনও ব্যবহার করেন নি। তা বিলিয়ে দিতেন সর্বসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করে, দরিদ্র লোকদের মধ্যে। মোট কথা রাসূলুল্লাহ (স.) স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তখন সমাজের এক বিরাট অংশের লোকই দরিদ্র অথবা নিম্নবিত্তের লোক ছিল। মোট কথা রাসূলুল্লাহ (স.) সাধারণ অবস্থা, চাল-চলন ও আচার-আচরণ নিয়ে জ্ঞানে-গুণে, তাকওয়া পরহিযগারীতে ছিলেন অসাধারণ। এতে অবাক হওয়ার যেমন কিছু নেই, তেমনি তাঁকে যাদুগ্রস্ত হওয়া মনে করারও কোন কারণ নেই। এরূপ ধারণা নিতান্তই মুর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পরে তাঁর উম্মতদের এই আদর্শই অনুসরণ করতে হবে; বিশেষ করে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য আকাঙ্ক্ষিত না হয়ে সৎভাবে সমাজের উপকারের জন্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য রাসূলুল্লাহ (স.)-কে ত্যাগের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদা সে আদর্শই অনুসরণ করেছেন, মুসলমান সমাজের নেতাদের সর্বযুগে ঐ একই আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাজার হচ্ছে জীবনোপকরণ আদান-প্রদানের জায়গা। জীবনোপকরণ, বিশেষ করে খাদ্য-বস্ত্র ছাড়া মানুষ দুনিয়ায় বাস করতে পারে না। এসব জিনিসের বেচা-কেনা বা আদান-প্রদান এমন ভাবে হতে হবে, যাতে কেউ শোষিত বা প্রতারিত না হয় এবং এরূপ আদান-প্রদান যেন পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) মানবিক প্রয়োজনে নিজে কেনা-বেচার জন্য বাজারে যেতেন। পৃথিবীতে এরূপ আদান-প্রদানের কাজ সবাইকেই করতে হয়। আল্লাহ্র নবী এর ব্যতিক্রম কিছু করতে চান নি। পরবর্তী কালে তিনি বাজারের লেনদেনের অবস্থা পরিদর্শন (Supervision)-এর জন্য বাজারে যেতেন। বাজারে যাতে এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর লোককে ঠকাতে বা প্রতারিত করতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতেন। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীসের মাধ্যমে তিনি বিশেষ কিছু নির্দেশনাও দিয়েছেন।

- মোঃ শামসুল আলম খান

www.pathagar.com

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا.

তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। সূরা ফুরকান ঃ ৫৩

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) মা'আরেফুল কোরআনে লিখেছেন ঃ مرج শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণে চারণভূমিকে مرج বলা হয়। সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়।

عذب মিঠা পানিকে বলা হয়। فرات এর অর্থ সুপেয়।

ملح এর অর্থ ঘোলা এবং اجاج। এর অর্থ তিক্ত, বিস্বাদ। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। এক সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূ-পৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় ১/৪ অংশ এই জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগ আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণা নিবারণে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন যা আল্লাহ্ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্নভাবে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশী সামুদ্রিক মাছ ও জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পঁচে এবং সেখানেই শেষ হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হত তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পঁচে যেত। এই পানি খেলে তার দুর্গন্ধে ভূ-পৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যে সারা বিশ্বের আবর্জনা

www.pathagar.com

তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্ট জীব মরে যায়, সেখানে ওগুলো পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায় সেখানেও দেখা যায় যে উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়; কিন্তু পরস্পর মিলিত হয় না অথচ মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

(মা'আরেফুল কোরআন, ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৬০১)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

উপরোক্ত তাফসীর থেকে দেখা যায় মানুষের স্থায়িত্ব এবং ক্রমাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় রিযিক সরবরাহের যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করেছেন সংশ্লিষ্ট আয়াতটিও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রথমত, মানুষের জীবন ধারণ, শস্য উৎপাদনও অন্যান্য জাগতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য মিষ্ট ও সুপেয় পানি প্রয়োজন। স্থলভাগের নদ-নদী, ঝরনাধারা, হ্রদ প্রভৃতির মাধ্যমে তা সরবরাহ করা হয়। অন্যদিকে সমুদ্রে বা মহাসমুদ্রে এই মিষ্ট পানির ধারার সংগে লোনা পানির ধারাও প্রবাহিত হয়। এ সামুদ্রিক জন্তুর জীবন ধারণের জন্য যেমন মিষ্ট পানি দরকার, তেমনি এ সমস্ত প্রাণীর মৃত্যু হলে লোনা পানি, মৃত দেহগুলোকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুষে নেয়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একদিকে যেমন নানাবিধ সামুদ্রিক খনিজ সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তেমনি মৃত জীব-জানোয়ারের হাড়গোড় ইত্যাদি থেকে কালক্রমে নানা ধরনের সামুদ্রিক মণিমুক্তা সৃষ্টি হয়। আর এ সবকিছুই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন পূরণে এবং মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নে প্রচুর মাল-মসলা সরবরাহ করে।

তাই দেখা যায় মানুষের রিযিকের উৎপাদন প্রক্রিয়ার যেমন শেষ নেই, তেমনি তার সঠিক ব্যবহার মানব সভ্যতার অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশে অপরিমেয় অবদান রাখতে পারে।

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় আছে। - সূরা ফুরকান ঃ ৬৭

কয়েকটি শব্দের টীকা

نفاق ব্যয় করা, প্রয়োজনীয় ব্যয়কে نفقه বলা হয়, আল্লাহ্র পথে দান করাও এর শামিল। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভরণ-পোষণকেও নফকা বলা হয়।

اسراف প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করা, অপব্যয় অপচয় করা, সীমালংঘন করা, বাড়াবাড়ি করা। (বিসবাহুল্লুগাত) ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি কাজকে ইসরাফ বলা হয়। এক. নাজায়েয কাজে অর্থ ব্যয় করা, তা এক পয়সাই হোক না কেন। দুই. জায়েয কাজে অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে সীমালংঘন করা। নিজের সামর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করেই হোক কিংবা বেশী ধন-দৌলত আছে বলে নিজের ঠাট ও আয়েশ-আরামের জন্য অতিরিক্ত খরচ করা। তিন. নেক কাজে অর্থ ব্যয় করা; কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে। (তাফহীমুল কুরআন, ৮৩ টীকা, পৃষ্ঠা ৫৮)

হযরত ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখের মতে আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اسراف বা اتبذهر। এটা শয়তানের কাজ, সুতরাং হারাম।

'قتر' ব্যয় সংকোচ করা, কৃপণতা, বখীলী, হাড়কিপটে হওয়া (মিস্বাহুল্লুগাত) বখীলি বলতে দু'টো জিনিসকে বোঝায়। নিজের সামর্থ্যানুসারে সন্তান-সন্ততির জন্য প্রয়োজন মত খরচ না করা। দুই. নেকী ও ভাল কাজে হাত গলিয়ে পয়সা বের না করা। অর্থাৎ যেসব কাজে আল্লাহ ও রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা (মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৬২৪, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

'قواما' মধ্যম পন্থা, قوام الانسان মধ্যাকৃতির মানুষ (মিসবাহুল্লুগাত) ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করাকে قواما বলা হয়।

www.pathagar.com

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

১. তাফহীমুল কুরআনে মাওলানা মওদূদী লিখেছেন, ইসরাফ বা বেহুদা খরচ এবং কৃপণতা ও বখীলী এ দু'টি প্রান্তসীমার মাঝখানে মধ্যম নীতিই হলো ইসলামের নীতি ও আদর্শ। এ সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেন, من فقه الرجل قصده فى معيشته নিজের অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে মধ্যম নীতি অবলম্বন করা থেকে ব্যক্তির বুদ্ধি-বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। (আবুদ দারদা থেকে তিবরানী ও আহমদে বর্ণিত) যারা আয়েশ-আরাম জুয়াখেলা, মদ্যপান, বন্ধু সমাবেশ মেলা-মীনাবাজার ও বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানে দু'হাতে অর্থ ব্যয় করবে এবং নিজেদের বাহাদুরী দেখাবার জন্য নিজেদের প্রকৃত অর্থ ক্ষমতার অতিরিক্ত মানের খাবার ঘরবাড়ি, পোশাক ও জাঁকজমকপূর্ণ সাজ-সয্যার ব্যবস্থায় টাকা খরচ করবে, এ রূপ স্বভাব ঈমানদারদের নয়। অনুরূপভাবে অর্থ পূজারীদের মত পাই পাই করে অর্থসংগ্রহে লিপ্ত হবে-না নিজে খাবে, না ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজন সামর্থ্যানুযায়ী পূরণ করবে, না কোন কল্যাণময় কাজে আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করবে, এ রূপ অবস্থাও তাদের নয়। আরবদেশে তখন এ দু'ধরনের চরিত্রের লোকই ছিল। একদিকে ছিল এমন লোক, যারা দু'হাতে উন্মুক্তভাবে অর্থ ব্যয় করত, কিন্তু তাদের এই ব্যয় হতে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও ভোগ সম্ভোগের জন্য কিংবা সমাজ ও সোসাইটিতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এবং নিজেদের দানশীলতা ও ঔশ্বর্যশালী হবার ঢাক-ঢোল পিটাবার জন্য। অপর দিকে ছিল এমন সব বখীল ও কৃপণ লোক, যাদের কার্পণ্য ছিল সর্বজনবিদিত। মধ্যম নীতি অবলম্বনের চিহ্ন খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যেত। নবী করীম (স.) ও তাঁর সাহাবীদের মাঝে কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে এ আদর্শ প্রতীয়মান হত। (টীকা নং ৮৩, আয়াত নং ৬৭)

ফী-যিলালিল কোরআনে সাইয়েদ কুতুব লিখেছেন ঃ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম যে শান্তিময় দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, এটা তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য এ পদ্ধতির বিকল্প নেই। শান্তিময় জীবনের মূল ভিত্তিটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান ব্যক্তি মাত্রই ইসলামী আদর্শ পালন করার সাথে সাথে ব্যক্তি মালিকানাকে শর্তযুক্তভাবে স্বীকার করে। তবে এ সুবাদে স্বেচ্ছাচারিতার স্থান ইসলামে নেই। সুতরাং নিজস্ব সম্পদ ও অর্থ স্বাধীন লাগামহীন ভাবে ব্যয় করার অধিকার নেই। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সে চিত্রই ফুটে ওঠে। যে জাতির মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান চালু নেই, তার জীবন বল্গাহীন ঘোড়ার ন্যায় সবখানেই বিস্তৃত। তার জীবন

www.pathagar.com

অপচয় ও কৃপণতার রজ্জুতে আবদ্ধ। অপচয় তো ব্যক্তির সম্পদ ও সামাজিক মূল্যবোধের ধ্বংস সাধন ও অবক্ষয় ছাড়া কিছুই উপহার দেয় না। আর কৃপণতা সম্পদকে কুক্ষিগত করে সমাজের বিভিন্ন মানুষের উপকার থেকে বিরত রাখে এবং ব্যক্তিকে অর্থগৃধনুতে পরিণত করে। (৫ম খণ্ড, ৬৭ নং আয়াতের টীকা)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

বর্তমান বিশ্বে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা যে বাস্তব চিত্রটি অবলোকন করি, তা হল একদিকে আকাশচুম্বী ধনসম্পদ, পুঁজিবাদী সমাজের ঐশ্বর্য-বিত্ত-বৈভব ও জাঁকজমকপূর্ণ বিলাস সর্বস্ব জীবন যাপন। তারা বিভিন্ন ফাঁদে ও পাঁয়তারায় অর্থ উপার্জন করছে, রাতারাতি সম্পদের পাহাড় গড়ছে, শোষণের যত প্রক্রিয়া আছে, বৈধ অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করে সম্পদের মালিক হচ্ছে। আর বিনা প্রয়োজনে লোক দেখানোর মানসে বিলাসিতায় ও আড়ম্ভরপূর্ণ জীবন যাপনে তা দেদার অপচয় করছে। অপরদিকে এ মানুষ নামক সেরা জীবের একাংশ পশুর মত জীবন যাপন করছে। অপচয় ও অপব্যয়কারীদের সম্পদের বিরাট একটা অংশ চলে যাচ্ছে তাদের লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের এসব সম্পদ বিনা পরিশ্রমে হস্তগত হচ্ছে। উপরন্তু এ সম্পদে যাদের অধিকার বিদ্যমান তাদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। তা না হলে এভাবে অপব্যয় করতে পারত না। যার অনিবার্য ফল এই যে, এ সব সম্পদ বৈধ উপায়ে উপার্জিত নয় বলে বেশীর ভাগ লোক হচ্ছে শোষিত আর বেড়ে যাচ্ছে নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা। সমাজ অশান্তির দিকে দ্রুত ধাবিত হতে বাধ্য হচ্ছে। অপচয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে ঃ যেমন (১) নাজায়েয কাজে অর্থ ব্যয় করা। অশ্লীল গান, নৃত্য, মদপান, ধুমপান, জুয়া-হাউজি ইত্যাদি বহু ধরনের অবৈধ কাজে ব্যয় করা। (২) জায়েয কাজে অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে সীমালংঘন করা। বিয়ে শাদী, জন্মোৎসব, মৃত্যুবার্ষিকী,বিবাহ-বার্ষিকী ও অপ্রয়োজনীয় জাঁকজমকপূর্ণ তোরণ নির্মাণ ইত্যাদি। (৩) এ ছাড়া অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে প্রকল্প গ্রহণ করা ও জাতির নৈতিকতা ধ্বংস সাধনের জন্য সামগ্রী তৈরীর প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করা অপচয়ের সামিল।

ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজ তথা জাতির জন্য অপচয় একটা মারাত্মক অর্থ ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ, যার ফলে অর্থনৈতিক দেওলিয়াপনার সাথে সাথে মানবিক প্রতিভা ও সুশীল বৃত্তিগুলোর অপমৃত্যু ঘটে। ব্যক্তির ভবিষ্যত ও সমাজের বিভিন্ন মানুষের অধিকার ও সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন থাকার ফলেই অপচয়ের মত জঘন্য কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হল মানুষ।

www.pathagar.com

সুতরাং তদ্বারা এরূপ করা শোভা পায় না। মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করছে সৃষ্টির সেবায়, মানবের কল্যাণে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের বিশেষ করে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের উচিত তার উপার্জিত সম্পদ থেকে সমাজের চাহিদা পূরণে অংশ গ্রহণ করা। এটা না করে যারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কিংবা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার জন্য অপচয় করে থাকে, তারা মূল মর্যাদার মাপকাঠি প্রতিনিধিত্ব বা খলীফার সম্মান হারিয়ে ফেলে। তারা বরং শয়তানের অনুসারী হয়ে যায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا- اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ -

তুমি কিছুতেই অপব্যয় করো না, যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।

- সূরা বনী ইসলাইল ঃ ২৬-২৭

অপচয়কারিগণ বাহ্যিক ঠাঁট যতই প্রদর্শন করুক না কেন তারা মানসিক শান্তি থেকে দূরে চলে যায়। কেননা তারা আল্লাহ্‌র অপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَاتُسْرِفُوْا- اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ -

আর তোমরা অপচয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা আন'আম ঃ ১৪১

ঈমানদার ব্যক্তির জীবন আবর্তিত হয় একটি নির্দিষ্ট গতিতে ও নির্ধারিত পরিমণ্ডলে। তার জীবনের প্রতিটি অংগনের চালিকা শক্তি হল আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধান। তার উপার্জন, সঞ্চয় ও ব্যয় সবকিছুই হয়ে যায় ইসলামী গণ্ডীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কাজেই কোন কোন পথে উপার্জন করা যাবে এবং কোন্ কোন খাতে ব্যয় করা যাবে, সঞ্চিত ধন কোন্ ব্যাপারে ইনভেষ্ট করা যাবে সব বিধানই সে মেনে চলে। কেননা এ সম্পর্কে একটি হাদীসের মর্মার্থ হল, পরকালে প্রতিটি বান্দাকে নিম্নের প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব না দিয়ে স্বীয় স্থান থেকে এক চুল নড়তে দেওয়া হবে না। (১) তার যৌবন কিভাবে কাটিয়েছে? (২) সে কিভাবে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে? (৩) কোন্ কোন্ খাতে সে সম্পদ ব্যয় করেছে? ... ...।

সুতরাং প্রতিটি বিশ্বাসীর অর্থনীতি হবে ইসলামের আলোকে পরিচালিত। অপচয়ের মত ঘৃণিত পথে ব্যয় করার অবকাশই তার থাকবে না। যেহেতু তার উপার্জন হবে হালাল ও বৈধ পথে সীমিত এবং সে আল্লাহ্‌র এ বাণী অনুযায়ী প্রত্যেকের অধিকার প্রদান করবে।

www.pathagar.com

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

তাদের সম্পদে যাচঞাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।

-সূরা আয-যারিয়াত ঃ ১৯

ফলে তার জীবনটা একটা ভারসাম্যপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -

আর এরূপেই তোমাদের একটি মধ্যবর্তী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্য হতে পার। - সূরা বাকারা ঃ ১৪৩

সুতরাং মুসলিম জীবনধারার মধ্যে এমন একটি মধ্যম পন্থার বাস্তব প্রতিফলন বিদ্যমান, যা সকলকে অনাবিল শান্তির সন্ধান দেয়। এরই আলোকে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেহুদা ব্যয়ের সমস্ত খাতগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এমন সব প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন, যেগুলো অপচয় থেকে মুক্ত থাকবে। অপরিণামদর্শী প্রকল্প গ্রহণ ও তাতে জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট হবার যাবতীয় পথ রুদ্ধ করতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি সেসব দিক চিহ্নিত করে সমাজকে শান্তি ও সুখের পথ দেখায় ও বৃহত্তর সমাজে কল্যাণের পথ সুগম করে। অপচয়ের ঠিক বিপরীতে অবস্থান করেও কৃপণতা অর্থনীতিতে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে থাকে। কেননা কৃপণতা সম্পদকে করে এক ব্যক্তি হাতে সংকুচিত। মানুষ লোভী ও অর্থগৃধনুতে পরিণত হয়। কৃপণ ব্যক্তি সকল প্রকার মানবকল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকে। বখীলীর দ্বিতীয় প্রধান ক্ষতিকর দিক হল যে, এর কারণে সম্পদ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এক ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হবার ফলে তা বৃদ্ধি পাবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। স্রোতবিহীন নদী যেমন মারা যায় ঠিক তেমনি সঞ্চালনহীন ধন-সম্পদও হ্রাস পেতে থাকে। সম্পদ সঞ্চালনের মাধ্যমে হাত পরম্পরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অসংখ্য ব্যক্তি ও সমাজ তা থেকে উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে সম্পদ বিনিয়োগ বিহীনভাবে এক ব্যক্তির হাতে আটকে থাকলে তা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, যা অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে পরিত্যাজ্য। মুসলিম ব্যক্তির জন্য এটা ধ্বংসের শামিল। কেননা সে যাকাত দিতে বাধ্য। আটকে থাকা নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে যাকাত দিতে দিতে একদিন তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এতে সে নিজেও নিঃস্ব হবে অপরকেও মাহরুম করবে। নিজের কাছে, পরিবারে এবং সমাজে সর্বত্রই সে ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত কৃপণতাও যেমন অপরের উপকার করে না, ঠিক তেমনি গোষ্ঠীগত

www.pathagar.com

বা জাতিগত কৃপণতাও মানব হিতৈষণার বিপরীত। কৃপণ ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে ভোগ করে না, সুযোগ ও পায় না। গোষ্ঠীভিত্তিক কৃপণরাও বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে বা প্রয়োজনে ব্যয় না করে সম্পদ নিজেদের মাঝে আটকে রাখে। অতঃপর তা বিনষ্ট হয় কিংবা গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপের উপযুক্ত হয়। কৃপণ পুঁজিপতি সমাজের এসব অমানবিক আচরণ দর্শনে বঞ্চিত মানুষের মাঝে শুরু হয় হতাশা এবং নৈতিকতা বিরোধী অপকর্মের মহড়া। এর ফরে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার উন্মেষ ঘটে। অধুনা বিশ্বের দুটি অর্থনৈতিক শ্রেণী এরই জ্বলন্ত উদাহরণ।

কৃপণ ব্যক্তি প্রয়োজন মাফিক সম্পদ ব্যয় করে না, ফলে তা জমিয়ে রাখে যক্ষের ধনের মতো। অথবা এমনভাবে বিনিয়োগ করে, যাতে অধিক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত করে। এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে, যেখানে খরচ কম অথচ লাভ বেশী। বর্তমানে অনেক প্রকল্প এমনভাবে গ্রহণ করছে পুঁজিবাদী কৃপণরা, যাতে সম্পদ জনগণের মাঝে সম্প্রসারিত না হয়। অথচ তারা লাভবান বেশী হয়।

কৃপণদের তিরস্কারে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَانَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ –

তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, সে নিজের কাছেই কৃপণতা করছে।

- সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৮

কৃপণদের জন্য আল্লাহ্র আযাব অবধারিত। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِالَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ –

তার জন্যও ওয়ায়েল বা ধ্বংস, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দা করে আর যে সম্পদ জমিয়ে রাখে এবং তা বারবার গণনা করে। - সূরা হুমাযা ঃ ১-২

সঞ্চয়কারী কৃপণদের কঠোর শাস্তির সংবাদ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ –

যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে আর আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করে না তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। - সূরা তাওবা ঃ ৩৪

সুতরাং কৃপণতার মত জঘন্য ও অমানবিক আচরণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে প্রতিটি বিশ্বাসীকে। আল্লাহ্ কৃপণতা করতে নিষেধ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَمَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا-

তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করে দিও না, তা হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।

– সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯

অপচয়কারী নিঃস্ব হবার সমূহ সম্ভাবনায়ময় আবদ্ধ আর কৃপণ ব্যক্তি নিন্দিত ও ঘৃণিত। কাজেই এতদূভয়ের মাঝে হল মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ। আয় বুঝে ব্যয় করা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিকের যথাযথ ব্যবহার করা মধ্যম পন্থার দাবী। একদা জনৈক ব্যক্তি উস্কু খুস্কু চুল, ময়লাযুক্ত জামা-কাপড় নিয়ে রাসূলের সামনে এলে রাসূল (স.) জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি অভাবী ?" লোকটি বলল, "না হুযুর। আমার ধন-সম্পদের অভাব নেই।" রাসূল (স.) বললেন, " আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের ব্যবহার দেখতে ভালবাসেন।" (মিশকাত) রাসূল (স.) আরো বলেন ঃ

ما عال من اقتصد -

যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে সে কখনো অভাবগ্রস্ত হয় না। – আহমদ, ইবন কাসীর, ইবন মাসউদ

ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী বৈধ পথে উপার্জন, অধিকার প্রদান ও অকৃপণ হাতে প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্বৃত্ত সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগ অবশ্যই এমন প্রকল্প ও জনকল্যাণ খাতে করতে হবে, যার উৎপাদন সামগ্রী সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেবে না। সম্পদ যেমন অবৈধ পথে উপার্জন ও ব্যয় করা বৈধ নয়, ঠিক তেমনি সম্পদ হাতে আটক রেখে বিনিয়োগ না করে প্রবাহহীন করাও বৈধ নয়। বস্তুত ব্যক্তি বা সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যদি এরই আলোকে আবর্তিত হয় তাহলে বহু কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হবে নিঃসন্দেহে।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা শু'আরা

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمْ وَلَاتَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

মাপে পূর্ণমাত্রায় দেবে; আর যারা মাপে কম দেয় তাদের মতো হবে না, এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়। আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। -সূরা শু'আরা ঃ ১৮১-৮৩

তাফসীরকারদের আলোচনা

হযরত শোয়ায়েব (আ.) তাঁর জাতির সামনে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব বাণী ও নির্দেশ পেশ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো তাদেরকে ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি আহবান জানানো। বস্তুত তৎকালীন জনগণের মাঝে ওজনে কম দেওয়া ব্যবসায়ে ফাঁকি দেওয়া এবং ব্যবসায়ীদের মালামাল লুট করার প্রবণতা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেজন্য আল্লাহ্ পাক সুনির্দিষ্টভাবে এসব থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতে উল্লিখিত বিপর্যয় ঘটানো মানে লুটতরাজ ও ডাকাতি করা। সূরা আ'রাফের ৮৬ নং আয়াতেও এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ –

লোকদেরকে ভয় দেখাবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় বসে থেকো না।

এখানে রাস্তা মানে বাণিজ্যিক পথ।

www.pathagar.com

(সংক্ষিপ্ত ইবন কাসীর, সাফওয়াতুল বয়ান লিমাআনীল কুরআন, মা'আরেফুল কোরআন ও তাফহীমুল কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর অবলম্বনে)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য। সাথে সাথে ইসলাম সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত বলেও মনে করে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এখানে ওজন, দাঁড়ি-পাল্লা ও ফাসাদ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সব রকম ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেন-দেন এর আওতায় আসবে।

সরাসরি ওজনে কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকানো যেমন অন্যায়, তেমনি ওভার ইনভয়েসিং, আণ্ডার ইনভয়েসিং, অযৌক্তিক বাণিজ্যিক শর্তাদি (টার্মস অব ট্রেড) নির্ধারণ, কাঁচামাল কম দামে আমদানী করে তা থেকে উৎপাদিত পণ্য অযৌক্তিক চড়া দামে বিক্রি, বৈদেশিক ঋণের সাথে ঋণগ্রহীতা দেশের উপর অন্যায় ও স্বার্থ বিরোধী শর্ত জুড়ে দেওয়া-ইত্যাদিও একই যুক্তিতে অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। কেননা সব ক্ষেত্রেই শোষণ ও ধোঁকা রয়েছে। এ বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে পবিত্র কুরআনের আরো কয়েকটি আয়াতে এ ব্যাপারে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। সূরা রহমানের ৭-৯ নং আয়াত এবং সূরা মুতাফ্‌ফিফিনের ১-৩ নং আয়াতগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

আর শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বিষয়টিও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ব্যতীত যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলানো সম্ভব নয় তা সর্বজনবিদিত।

- হাফেজ মোঃ জাফর

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নামল

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ
ط ءَالٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

কে তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং পরবর্তীতে তার পুনরাবৃত্তি ঘটান ? আর কে তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দান করেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ কি (এ সব কাজে অংশীদার) আছেন ? বল, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তবে তোমাদের দলীল উপস্থিত কর। **- সূরা নামল ঃ ৬৪**

শব্দগত ব্যাখ্যা

اله (ইলাহ্) ও الله (আল্লাহ) প্রায় সমার্থক। এর অর্থ ইবাদত ও উপসনার একমাত্র অধিকারী, (ইসলামী বিশ্বকোষ, 'ইলাহ' শব্দের ব্যাখ্যা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৮) قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

অর্থাৎ এ সব কাজে বাস্তবিকই অন্য কেউ শরীক রয়েছে, হয় একথা প্রমাণ করার জন্য অকাট্য দলীল পেশ কর অথবা কোন নির্ভুল প্রমাণ দ্বারা একথা প্রতিষ্ঠিত কর যে এসব কাজ তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা করবেন কিন্তু ইবাদত বন্দেগী লাভ করবেন অন্য কেউ কিংবা এ ক্ষেত্রে অন্য কেউ তার সাথে শরীক হবে। বস্তুত এটা পবিত্র কুরআনের একটা চ্যালেঞ্জ, যা কেউ কোন দিন গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি, ভবিষ্যতেও আসবে না। অত্যন্ত জোরালোভাবে আল্লাহ্‌র একত্ব প্রমাণ করাই এ ধরনের প্রকাশভঙ্গির মূল লক্ষ্য।

সংক্ষিপ্ত ইবন কাসীর-সাফওয়াতুল বয়ান, ৭৩ সংস্করণ, পৃ. ৬৮০, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪৮৬

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতে মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তু ও বস্তুর সৃষ্টি ও লালন-পালন সংক্রান্ত একটি মহাসত্য অতি পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। প্রশ্নাকারে উত্থাপিত এ আয়াতের সহজ সরল অর্থ হলো ঃ সৃষ্টির সূচনা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা আল্লাহ নিজেই করেন এবং এসব কাজে তার কোনও শরীক নেই।

সৃষ্টি করার পর পরই আল্লাহ্ নিজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন নি। বরং ক্রমাগতভাবে এ সৃষ্টির সংরক্ষণ ও লালন পালনের ব্যবস্থাও তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে করেছেন। আসমান ও জমিনে নানা রকম সম্পদ সৃষ্টি এবং সেগুলোর ভোগ ও বন্টনের একটা সুষম প্রাকৃতিক পদ্ধতি তিনি গড়ে তুলেছেন। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে এবং শস্যক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহ্র দেয়া এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে সম্পদের অপ্রতুলতার সমস্যা কখনো দেখা দেবে না। কেননা আল্লাহ্ পাক সৃষ্টির সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য জগতে পর্যাপ্ত রিযিক-এর ব্যবস্থা করেছেন। যদি কখনো এমন সমস্যা দেখা দেয় তবে বোঝা যাবে যে মানুষ কোথাও এমন কিছু করেছে যার কারণে এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

বস্তুত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে জগতে সৃষ্টির চাহিদার তুলনায় খাদ্য বা অন্য দ্রব্যের প্রাকৃতিক ঘাটতি কখনো দেখা দেয়নি। আল্লাহ তো জগতের যাবতীয় সম্পদ সমগ্র মানব জাতি ও অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য সৃষ্টি করেছেন। যদি বিভিন্ন প্রকার সীমারেখা বাধা ও বিধি-নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রব্যাদির অবাধ চলাচলের সৃষ্টি না করা হয় তাহলে কখনো কোন মানুষকে বা জীব-জন্তুকে কোন দ্রব্যের ঘাটতির মুকাবিলা করতে হবে না এবং পৃথিবীতে সম্পদের অপর্যাপ্ততার সমস্যা দেখা দেবে না।

সত্য কথা হলো, সম্পদের ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পদ্ধতি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির মাধ্যমে সুষম ভারসাম্য রক্ষা না করা হলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটা খুবই স্বাভাবিক আর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) যে বিধান নিয়ে এসেছেন তার যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই এ ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।

- হাফেজ মোঃ জাফর

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কাসাস

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ج وَمَا
عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ط أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

আর তোমাদের যা কিছু প্রদান করা হয়েছে, সেটা তো পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী এবং এর সৌন্দর্যের উপকরণ মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে তা সর্বোত্তম অধিক স্থায়ী। তোমরা কি (এ সত্য) উপলব্ধি করতে পার না? -সূরা কাসাসঃ ৬০

এ আয়াতের ব্যাখ্যা এবং এর আর্থ-সামাজিক মর্যাদা সূরা কাহাফের ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতদ্বয়ের মতই। অবশ্য এখানে সন্তানের উল্লেখ নেই। তদুপরি সূরা কাহাফে ধন-সম্পদকে শুধু মাত্র শোভা বা সৌন্দর্যের উপকরণ বলা হয়েছে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ভোগের সামগ্রী তথা জীবিকার উপকরণরূপেও ধন-সম্পদকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে মূল ভাব উভয় ক্ষেত্রে একটিই। সেটা হলো পার্থিব জগতের তুলনায় অপার্থিব জগতে তথা আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্বও স্থায়িত্বের তুলনামূলক অবস্থা বিশ্লেষণ করা।

- হাফেজ মো ঃ জাফর

www.pathagar.com

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ- وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِمَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْاْ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ- اِذْقَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَاتَفْرَحْ اِنَّ لِلّٰهَ لَايُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ. وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ط اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَايُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ.

কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু পরে সে তাদের প্রতি জুলুম করেছিল। আর আমরা তাকে দান করেছিলাম এত বেশী ধনভাণ্ডার, যার চাবিগুলো একদল বলবান লোকের পক্ষে বহন করা কষ্টকর ছিল। একবার যখন তার জ্ঞাতি-ভাইগণ তাকে বলল যে তুমি আনন্দে আত্মহারা হয়ো না, কেননা আল্লাহ্ এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না যারা আনন্দে আত্মহারা হয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। অবশ্য দুনিয়াতে তোমার যে বৈধ অংশ রয়েছে তাও ভুলো না এবং সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে তৎপর হয়ো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। তখন উত্তরে সে বলল, এ সব তো আমার ইলমের বদৌলতে আমাকে দান করা হয়েছে। সে কি জানত না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল ও সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশীল। বস্তুত অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। – সূরা কাসাস ঃ ৭৬-৭৭

www.pathagar.com

শব্দ টীকা

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى –

কারূন মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল অর্থাৎ তাঁর চাচাত ভাই ছিল। ফিরআউন কর্তৃক অত্যাচারিত বনী ইসরাইল বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও সে নিজ গোত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফিরআউনের দলে যোগ দিয়ে বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম ও অত্যাচারে তাকে সহায়তা করেছিল। নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে শাসকদের আনুকূল লাভ করেই সে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হবার সুযোগ লাভ করেছিল।

(ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদির ও সাফওয়াতুল বয়ান লিমাআনিল কোরআন)

مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ –

যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষে কষ্টকর ছিল।

এটা কারূনের অপরিমেয় ধন-দৌলতের পরিমাণ বর্ণনা করার জন্য পবিত্র কুরআনের অনন্য প্রকাশভংগী, অর্থাৎ যার সম্পদ ভাণ্ডারের চাবিই এতগুলো, তার আসল সম্পদের পরিমাণ যে কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়। কোন কোন বর্ণনা মতে কারূনের ধনাগারের চাবি বহন করার জন্য তিনশত খচ্চরের প্রয়োজন হত।

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ –

এটার দু'টো অর্থ হ'তে পারে; (১) আমি যা কিছু পেয়েছি তা আমারই যোগ্যতা, বিদ্যা ও বুদ্ধির দরুনই পেয়েছি, কারো অনুগ্রহে নয়। (২) আমার মতে তো খোদা আমার গুণাবলী জানতে পেরেই আমাকে এসব দান করেছেন। আমি যদি তাঁর পছন্দনীয় না হতাম তাহলে তিনি কখনো আমাকে এসব দান করতেন না।

اَوَ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ .... وَاَكْثَرُ جَمْعًا –

যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও কলা-কৌশলই যদি বৈষয়িক উন্নতির নিয়ামক হতো তাহলে তারা যখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তখন তাদের সেসব গুণ কোথায় ছিল? অন্য দিকে কারো বৈষয়িক উন্নতি লাভ থেকেই যদি প্রমাণিত হতো যে, সে আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় তা'হলে তার ভাগ্যে এ ধ্বংস কেন নেমে এলো?

وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ –

www.pathagar.com

অপরাধীরা তো দাবী করে যে তারা খুব ভাল, সুতরাং শাস্তির যোগ্য নয়। কিন্তু যখন শাস্তি দেওয়া হবে তখন তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না তারা এর যোগ্য কি যোগ্য নয়। ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদির সাফওয়াতুল বয়ান লিমাআনিল কুরআন ৭৬ নং আয়াতে যেসব আর্থ-সামাজিক বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

(ক) মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি বংশগত নয় বরং গুণগত। কারূন হযরত মূসার চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও তার নিজ গোত্র বিরোধী ভূমিকা এবং হযরত মূসা কর্তৃক প্রচারিত আল্লাহ্‌র দীনের বিরোধীতার কারণে তাকে খোদাদ্রোহী ফিরাউন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনকাবুতের ৩৯ নং আয়াতে আরো পরিষ্কারভাবে কারূনকে ফিরাউন ও হামানের দলভুক্ত বলে দেখানো হয়েছে। সূরা হূদের ৪৬ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ –

সে কোন মতেই তোমার পরিবারভুক্ত নয়।

বস্তুত সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। অনেক সময় রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার অজুহাতে মানুষ অনেক অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, অত্যাচারী ও বাতিল পন্থী যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হোক না কেন, তাকে কখনো সমর্থন করা যাবে না। ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক ইসলাম বিরোধী ব্যক্তি আপন সন্তান হলেও সে পিতার সম্পদের উত্তরাধিকার হবে না।

(খ) ধন-সম্পদ অর্জন, ব্যয় ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা বৈধ নয়, যা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এমন কি সাধারণ ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা আপত্তিকর না হওয়া সত্ত্বেও চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, মজুতদারী ইত্যাদি বাজার ভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর নয়। কেননা বাহ্যিকভাবে এ সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মতোই লেন-দেন সম্পন্ন হয়ে থাকে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ সব কার্যকলাপ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বলে সেগুলো বৃহত্তর ইসলামের বিধান মতে হারাম। কারূন শাসক গোষ্ঠীর সহায়তা নিয়ে স্বাভাবিক ব্যবসায়ী নীতি অবলম্বন করেই সম্পদ অর্জন করেছিল। কিন্তু সম্পদ অর্জন

এবং তা নিয়ে আত্মম্ভরিতা করতে গিয়ে সে যেভাবে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে, তাতে তার যাবতীয় ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে এবং পরিণামে তার জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছে। এ সত্য হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ন্যায় বর্তমানেও সমানভাবে সত্য। যে ব্যক্তি জাতীয় স্বার্থ এবং যে জাতি বিশ্বমানবতার স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ধন-সম্পদ অর্জন বা ব্যয় করার ক্ষেত্রে নীতিহীনতা ও অবৈধ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করবে তাদের পরিণাম কারূনের মতোই হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বিশ্লেষণ করলে এ সত্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

৭৭ নং আয়াতে ধন-সম্পদ অর্জন, ব্যয় এবং সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মৌলিক ইসলামী দর্শন ব্যক্ত করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক লক্ষ্য হলো ঃ

(১) আখিরাতের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখে ইহকাল, পরকাল-উভয়ের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামে বৈরাগ্যবাদ ও বস্তুবাদ-দুটোই নিন্দনীয়।

(২) ধন-সম্পদকে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত মনে করে এর দ্বারা সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সেবা করা। ইসলামে সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত হলেও তার ব্যবহার ও ভোগের বেলায় একই সাথে সমাজের বঞ্চিত ও দরিদ্র লোকদের অধিকারও স্বীকৃত। সম্পদে সামাজিক অধিকারের বেলায় পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ –

তাদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।

এখানে ধন মানের জন্য বলে এ অধিকারের কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা এর অর্থ হলো ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সামাজিক চাহিদা পূরণ করা হবে।

(গ) যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য হবে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সাম্য বজায় রাখা। ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় সংক্রান্ত কাজে এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা যাবে না, যাতে সামাজিক শান্তি -শৃঙ্খলা ও সাম্য বিনষ্ট হয়। এটা সরাসরি উৎপাদন বন্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন, তেমনি অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেসব অর্থনৈতিক দর্শন, নীতিমালা ও প্রকল্প সমাজে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্যের সৃষ্টি করে সেসবই ইসলামের দৃষ্টিতে অকল্যাণকর। আজকাল

www.pathagar.com

যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এ দিকগুলোর প্রতি মোটামুটি লক্ষ্য রাখা হয়। Economic cost-এর সাথে সাথে Social cost-এর concept-ও আজকাল cost benefit বিশ্লেষণের অন্যতম ভিত্তিরূপে বিবেচিত।

৭৮ নং আয়াতের মর্মার্থ হলো, ধনসম্পদ অর্জনের বিষয়টি একটি বহু-মুখী প্রক্রিয়া। মালিক বা অধিকারীর একক প্রচেষ্টায় কখনো সম্পদ অর্জন করা সম্ভব নয়। এতে বিভিন্ন উপাদানের সরাসরি ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেকগুলো উপাদানের অপ্রত্যক্ষ ভূমিকা। পুঁজি-শ্রম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখ্য হলেও অনুকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতা ইত্যাদির গুরুত্বও এ পর্যায়ে অস্বীকার করা যায় না। এই সম্পদ অর্জন বিভিন্ন উপাদানের যুক্ত ফসল হিসেবে বিবেচিত। তা না হলে পুঁজি-শ্রম, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও অনেকেই সম্পদের মালিক হতে সক্ষম হয় না কেন? অন্য দিকে সম্পদের প্রাচুর্য কোন মতেই এর মালিকের প্রতি আল্লাহ্ পাকের কৃপা সৃষ্টির স্বাক্ষর নয়। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশগুলোর উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থাকে উক্ত দেশগুলোর প্রতি আল্লাহ্র রহমত বিবেচনা করে হতাশা ও বিভ্রান্তির শিকার হবার কোন অবকাশ নেই। বস্তুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের যে সব প্রয়োজনীয় ও মূল উপাদান রয়েছে সেগুলোর আলোকে সুষ্ঠু প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে স্বাভাবিকভাবেই তা অর্জিত হবে। অবশ্য প্রাকৃতিক ও সৃষ্টি পরিকল্পনার বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ধন-সম্পদ নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিয়ামত করুণা। সে ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনে এটাকে فضل الله বা আল্লাহ্র করুণা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে সাথে সাথে একথাও সত্য যে, ধন-সম্পদ ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ক্রমেই মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের একমাত্র নিয়ামক নয়। যেমন শরীরের গৌর বর্ণ কোন ব্যক্তির শারীরিক সৌন্দর্য নির্ণয়ের অন্যতম উপাদান হলেও মূল ভিত্তি নয়। কারণ সৌন্দর্য একটি সামগ্রিক (Comprehensive) বৈশিষ্ট্যের বিষয়। শুধুমাত্র বর্ণের নয়। বস্তুত কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রকৃত মর্যাদা তার ব্যবহারিক আধ্যাত্মিক সামগ্রিক আচার-আচরণ ও আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে, সম্পদের পরিমাণ দ্বারা নয়।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে এ সত্য বিবৃত হয়েছে যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে খোদায়ী অনুশাসনের বিরোধিতার কারণে পরিণামে বিভিন্ন রূপে ও মাত্রায় শাস্তি নেমে আসবে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হবে। অপরাধ বা পাপীদেরকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। সুতরাং অনেক সময় দেখা যাবে যে ব্যক্তি বা জাতি মনে করছে যে তাদের কার্যকলাপ শাস্তিযোগ্য অপরাধের পর্যায়ে

www.pathagar.com

পড়ছে না। অতএব, তাদেরকে কোন অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে না। অথচ যেহেতু প্রকৃত অর্থে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধই করেছে তাই তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই একথা বিনাদ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হবে তাদের কর্মের গুণাগুণের ভিত্তিতে। তারা নিজস্ব কর্মের মূল্যায়ন কিভাবে করল সে ভিত্তিতে নয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণে এটা একটা অমূল্য মাপকাঠি হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, পাপের পরিণামে দুনিয়াতে যে শাস্তি ভোগ করতে হয়, সে ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। অন্যথায় শেষ বিচারের দিন প্রত্যেককে তার আমলনামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তার শাস্তির ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে।

- হাফেজ মোঃ জাফর

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আনকাবুত

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط اِنَّ الَّذِيْنَ
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ
الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ ط اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

তোমরা তো আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেবল মূর্তিপূজা করছ, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছেই জীবনোপকরণ কামনা কর এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তো তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

- সূরা আনকাবুত ঃ ১৭

শব্দের টীকা

اوثان এর একবচন وثن অর্থ কাঠের তৈরী মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদি। افك। মিথ্যা, দুর্নীতি, বাস্তবের বিপরীত। (আরবী ইংরেজী অভিধান)

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

১. মাওলানা মওদূদী লিখেছেন "পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা এবং তাঁর নাফরমানী করাকে ভয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর মূর্তি তৈরী ও পূজার জঘন্য পাপ সম্পর্কে বলেন, তোমরা কেবল মূর্তি বানাও না, আসলে একটি স্পষ্ট মিথ্যাকে রচনা কর। এই মূর্তিগুলোর অস্তিত্বই একটা ডাহা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। আর এগুলোকে দেবী ও দেবতা কিংবা আল্লাহ্‌র আজ্ঞার বা তাঁর সন্তান কিংবা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী প্রিয় আর রোগ নিরাময়কারী কেউ সন্তানদানকারী

www.pathagar.com

বলে যে তোমরা মনে করছ অথবা তাদের কেউ শাফা'আতকারী কিংবা রুযী দানকারী বলে যে ধারণা পোষণ করছ-এ সবই সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা। এ ধারণা অমূলক। আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতেই তোমরা তা রচনা করে নিয়েছ। এর মূলে সত্যতার কোন অস্তিত্ব নেই। সত্য শুধু এতটুকু যে, এগুলো মূর্তি মাত্র, নিষ্প্রাণ, নির্জীব, ক্ষমতাহীন, প্রভাবহীন। এরা লালন-পালন করতে পারে না, রুযীর ব্যবস্থা করতে পারে না, সুতরাং মুর্তিপূজা বা শিরক করা জঘন্য পাপ। একমাত্র আল্লাহ্ই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। যেহেতু তিনিই সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন কর্তা, রিযিকদাতা ও মা'বুদ, তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।" (তাফহীমুল কুরআন,সূরা আনকাবুতের ২৮ ও ২৯ নং টীকা)

সাইয়েদ কুতুব লিখেছেন, "পৌত্তলিকগণ আল্লাহ্র ইবাদতের পরিবর্তে প্রতিমা পূজা করত। এর পেছনে কোন যুক্তিভিত্তিক দলীল ছিল না। নিছক মনগড়া ভাবে তা তৈরি করত, প্রতিমার জন্য কোন পুরনো মডেল বা নমুনা ছিল না। নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে তার পূজা করা শুরু করতো। প্রতিমাগুলো তাদের না কোন উপকার করত, না রিযিক দিত। অথচ তারা রিযিকের জন্য আল্লাহ্র কাছেই চাইত। সুতরাং রিযিক প্রদানকারীর ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন ছাড়া উপায় নেই।"

(ফী-যিলালিল কুরআন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২৮)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সমুদয় সৃষ্টির লালন-পালন ও টিকিয়ে রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা মহান আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতে সুনিপুণভাবে করে রেখেছেন। তাঁর রিযিক ও নিয়ামত ভোগ করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করার মধ্যেই রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টি। তাঁর ইবাদত বাদ দিয়ে যারা প্রতিমা পূজা করে আর রিযিক পাবার আশায় মনগড়া প্রতিমা তৈরী করে কিংবা মানুষের উদ্ভাবিত মতবাদের উপর নির্ভর করে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত মিথ্যার জালে আবদ্ধ হয়। প্রতিমা কাঠ নির্মিত হোক বা মানব নামক দেবতা হোক কিংবা আল্লাহ্র নির্দেশ-বহির্ভূত মতবাদ প্রদানকারী ব্যক্তি বা দল হোক সবই এর আওতাধীন। মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুই রিযিক দেবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা রাখে না-এ মৌলিক বিশ্বাস ইসলামী অর্থনীতিকে পরিচালিত করে। ফলে কোন মুসলিম আল্লাহ্র বিধান ছাড়া অন্য কোন অর্থনৈতিক মতবাদকেই গ্রহণ করতে পারে না। আর সেটা গ্রহণ করা হবে ইয়াতীমকে গ্রহণ করা। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানব বর্ণিত অর্থনৈতিক মতবাদ মানুষকে মুক্তি দিতে

www.pathagar.com

পারে নি। কেননা এ সব মতবাদ ভারসাম্যপূর্ণ নয়। এ সব মতবাদে যদি অভাব দূরও হয় তবুও তাতে মানবতার নৈতিকতা ও মানবতা ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়। এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য।

আমাদের দেশে কিছু কিছু দরগাহ্ দেখা যায়, যা অর্থ উপার্জনের জাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্ধভক্তজনেরা আল্লাহ্র ইবাদত বাদ দিয়ে দরগাহ পুজায় ডুবে যায়। মুলত শাশ্বত সে সত্যকে ভুলে যায় যে, এ দরগাহে যিনি শুয়ে আছেন তিনি রিযিক দেবার মালিক নন, বরং তাঁকেও আল্লাহ্র রিযিকের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়েছে। আল্লাহ্র উপর পূর্ণ-ভরসা সৃষ্টি হলে কোন ধরনের প্রতিমাই অর্থ উপার্জনের ও জীবন বাঁচানোর মাধ্যম হতে পারে বলে বিশ্বাস থাকতে পারে না। আল্লাহ্র সত্তার সাথে যেমন কাউকে শরীক করা যাবে না, ঠিক তেমনি রিযিক বা অর্থ-উপার্জন মানসে তাঁর মতবাদের সাথে অন্য কোন মত গ্রহণ করা যাবে না।

- মুহাম্মদ শামসুল আলম খান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা রূম

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ. فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا
يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ. اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَاۤئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং পরিমিত করেন, নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিদ্যমান। আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আর তারাই সফলকাম। মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সূদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। অথচ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যে যাকাত দিয়ে থাকে, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। আল্লাহ্ই তোমাদের

www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, আবার জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যা কিছু শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র ও মহান। – সূরা রূম ঃ ৩৭-৪০

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

১. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন, রিযিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। এরই আলোকে প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হৃষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। এক. আত্মীয়-স্বজন, দুই. মিসকীন, তিন. মুসাফির। আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। সাথে সাথে আরো বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ্ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই তাদের দান করা অনুগ্রহ নয় বরং প্রাপ্য পরিশোধ করা।

ذوى القربى বলতে সাধারণ আত্মীয়-স্বজনকে বোঝানো হয়। যেমন–পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়।

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ এ আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে। সাধারণত একে অপরকে উপহার দেওয়ার প্রথা চালু আছে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এ দিকে লক্ষ্য করেই উপহার উপঢৌকন দেওয়া হয়, যাতে তার ধন-সম্পদ আত্মীয়ের ধন-সম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশী নিয়ে ফিরে আসে। আল্লাহ্র কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কুরআন পাকে এ ধরনের বেশী পাবার প্রথাকে ربو। (সূদ)শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সূদের মতই ব্যাপার। (মা'আরেফুল কোরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২৮-৯২৯)

মাওলানা মওদূদী বলেন, বস্তুত যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকেই একমাত্র রিযিকের ভাণ্ডারের মালিক বলে বিশ্বাস করে, সে

www.pathagar.com

কখনই এতখানি হীনতা-নীচতা ও সংকীর্ণতায় নিমজ্জিত হতে পারে না, যার দরুন মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে যেতে পারে। সে যদি বিপুল সম্পদের অধিকারী হয় তা হলে সে গৌরবে ফুলে উঠবে না বরং সে শুকর আদায় করবে! সৃষ্টির সাথে বিনয়-নম্রতা ও বদান্যতার ব্যবহার করবে। আল্লাহ্‌র পথে সে সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবে না। আর সংকীর্ণতার রিযিক পেলেও সে সবর করবে। আমানতদারী ও আত্মমর্যাদার কথা ভুলবে না। এরূপ নৈতিক মান কোন নাস্তিকের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরকে খয়রাত দিতে বলা হয়নি, বরং তাদের হক দিতে বলা হয়েছে। তাদের হক দেওয়া যে তাদের প্রতি অনুগ্রহ নয়—এটা স্মরণ রাখতে হবে। অধিক সম্পদ প্রদানকারী আল্লাহ্, সুতরাং তিনি এ সম্পদে অন্যদের হক নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্‌র এ কথার মৌল ভাবধারার সম্পর্কে যারাই চিন্তা-ভাবনা করবে, তারা নিঃসন্দেহে অনুভব করতে পারবে যে কুরআন মানুষের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি এবং ক্রমবিকাশের জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার কার্যকারিতার জন্য একটি স্বাধীন সমাজ ও স্বাধীন অর্থ ব্যবস্থার (Free economy) বিরাজমানতা একান্ত অপরিহার্য। কোন সামগ্রিক সর্বাত্মক পরিবেশে যেখানে লোকদের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রত্যাহার করা হয়, রাষ্ট্রই সবকিছুর উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্বশীল হয়ে দাঁড়ায় এবং জনগণের মাঝে ধন বন্টনের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা হয় সরকারী মেশিনারীর দ্বারা, না ব্যক্তি নিজের উপর অপরের হক বুঝে আদায় করতে পারে, না অপর কেউ কারো নিকট হতে কিছু গ্রহণ করতে পারে। এরূপ অর্থ ব্যবস্থা কুরআনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কুরআনের ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা কার্যকর এবং বাস্তবায়িত হতে পারে সেখানে, যেখানে ব্যক্তি নাগরিক কিছু না কিছু ধন সম্পদ ও উপায় উপাদানের মালিক হবে। তা ব্যয়-ব্যবহার করার আযাদী এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের হক আদায় করতে পারবে। লোকের নিজেদের মনের পবিত্রতা, সদিচ্ছা ও নেক বাসনার দ্বারাই যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারবে। যারা প্রত্যেকের হক আদায় করে এবং হক সম্পর্কে সচেতন, তারাই কল্যাণ লাভ করবে।

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا সূদের প্রতিবাদে কুরআন মজীদে এটাই প্রথম আয়াত। এতে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তোমরা তো সূদ দাও এরূপ মনে করে যে, যাকে তোমরা অতিরিক্ত অর্থ দিচ্ছ তাতে তার ধনমাল বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূদী কারবারে আল্লাহ্‌র নিকট ধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। কেবল যাকাতের সাহায্যেই তা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰى وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ -

আল্লাহ্ সূদকে নির্মূল করেন এবং সদকা যাকাতকে বাড়িয়ে দেন। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে ربوا বলতে সূদকে বোঝানো হয়নি, যা শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম। বরং তা হল সেই দান, উপহার-উপঢৌকন যা এ মনোভাব নিয়ে দেওয়া হয় যে, দাতা গ্রহীতার নিকট হতে পরে তার অপেক্ষা বেশী আদায় করে নেবে।

ইবন আব্বাস, দাহ্হাক, মুজাহিদ প্রমুখ এরূপ তাফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী, আল্লামা আলূসী প্রমুখ বলেন যে, এ আয়াতে ربوا বলতে সূদকে বোঝানো হয়েছে। কেননা ربو শব্দের প্রচলিত অর্থ হল সুদ।

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنَ الزَّكٰوةِ যাকাত বা সদকার প্রতিদানে কি পরিমাণ মাল বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে, তার কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। নিয়ত যত খালেস হবে এবং ত্যাগ যত গভীর হবে আল্লাহ্ ততখানিই তার মাল-সম্পদ বৃদ্ধি করে-দেবেন। সহীহ্ হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র পথে একটি খেজুরও দান করে তা হলে আল্লাহ্ তা বৃদ্ধি করে উহুদ পাহাড়ের মত করে দেবেন। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা রূমের টীকা নং ৫৬-৬০ অবলম্বনে)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি বিশেষের ধন-সম্পদ কম বেশী হবার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি-নির্ভর–একথা অন্য আরো কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি গরীব আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের নির্ধন ব্যক্তিদের সাহায্য করার প্রতিও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিটি কাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য যেমন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন অনুরূপভাবে প্রত্যেক কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত সফলতা, ব্যর্থতা অর্জনও তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবান্বিত। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করতে মানুষ উৎসাহিত বোধ করার সাথে সাথে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হবার দরুন নিরুৎসাহিত হয়ে কাজ-কর্ম বন্ধ করার প্রবণতা থেকে নিজেকে দুরে রাখবে। কেননা ব্যর্থতা ও সফলতা উভয় ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লক্ষ্য একটিই–তিনি হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং ধন-সম্পদ কম হোক বা বেশী হোক–মানুষ ধনী হোক বা দরিদ্র হোক–প্রত্যেকেই নিজের করণীয় কাজ থেকে পিছপা হবে না। ধনী যেমন ধনকে নিজের অর্জিত সম্পদ মনে করে তার যথেচ্ছ ব্যবহারে নিয়োজিত হবে না,, অপরদিকে গরীব ব্যক্তিও নিজের দূরাবস্থার

www.pathagar.com

জন্য অহেতুক হা-হুতাশ করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। অবশ্য তার ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ অন্যায় বলে চিহ্নিত করার মতো কোন কিছু কোন আয়াতে নেই।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে ربا বা সূদ এবং যাকাতের একটি তুলনামূলক চিত্র পরোক্ষভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যার মূল কথা হলো সুদের মাধ্যমে কখনো সম্পদের বৃদ্ধি অর্জিত হয় না বরং তা হয় যাকাতের মাধ্যমে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটি বাস্তবের বিপরীত বলে মনে হয়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারার সুদ সংক্রান্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

অবশ্য কোন কোন মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে ربا মানে সূদ নয় বরং একটি সামাজিক কুপ্রথা। এ প্রসঙ্গে সূদ ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যায় অর্থাৎ যে কোন অন্যায় ও গর্হিত লেন-দেনই সূদ বলে বিবেচিত।

- হাফেজ মোঃ আবু জাফর

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আহ্যাব

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বল ঃ তোমরা যদি দুনিয়া ও এর চাকচিক্যই পেতে চাও তবে আস, আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালকে পেতে চাও, তবে জেনে রেখ যে তোমাদের মধ্যে যারা নেককার, তাদের জন্য আল্লাহ্ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। – সূরা আহ্যাব ঃ ২৮-২৯

শব্দের ব্যাখ্যা

امتعكن يعنى اعطكى متعة الطلاق –

তালাক দেওয়ার পর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে যে অর্থ-সম্পদ প্রদান করতে হয়, এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছে। সূরা বাকারার ২৩৬ নং আয়াতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

واسرحكن سراحا جميلا –

তোমাদেরকে তালাক দিয়ে ভদ্রভাবে এমন পথে বিদায় দিই যেন তোমাদের কোন ক্ষতি না হয়। অন্য এক আয়াতে جميلا না বলে باحسان বলে এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। – সূরা বাকারা ঃ ২২৯

www.pathagar.com

حفرة البنيان لمعالى القران

– সাফওয়াতুল বয়ান লিমাআনীর কোরআন, পৃষ্ঠা ৫৩০, সংস্করণ ৩য় কুয়েতে মুদ্রিত

তাফসীর

মহানবী (স.) কখনো সচ্ছল জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করেন নি। সারাক্ষণ আল্লাহ্র দীন প্রচারের মহান দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতেন বলে ধন-সম্পদ অর্জনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগই পেতেন না তিনি। মাঝে মাঝে তাঁর আর্থিক অনটনের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যেত। তিনি সবরের সাথে এ পরিস্থিতির মুকাবিলা করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীদের পক্ষে তাঁর মতো ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব ছিল না। অতএব তাঁরা প্রয়োজনীয় আর্থিক সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর কাছে দাবী জানাতেন। আল্লাহ্ পাক মহানবী (স.)-কে উক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে দুনিয়ার সাচ্ছন্দ্য ও চাকচিক্য অথবা আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার জন্য ইঙ্গিত দেন। বলা বাহুল্য, এরূপ বেছে নেয়ার পর স্ত্রীদের প্রত্যেকেই দ্বিতীয়টিই বেছে নিয়েছিলেন। প্রতিদানে আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রত্যেককে উম্মুল মু'মিনীন-এর বিশেষ মর্যাদা প্রদান করায় এবং তাদের সংখ্যা না বাড়াবার জন্য মহানবী (স.)-কে নির্দেশ দেন। সূরা আহযাব ঃ ৫২

সংক্ষিপ্ত ইবন কাসীর, পৃষ্ঠা ৯২, ৩য় খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, সাফওয়াতুল বয়ান

- লিমাআনীল কোরআন, পৃষ্ঠা ৫৩০, সংস্করণ ৩য়

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ দু'টি আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইসলামী জীবন দর্শন অনুযায়ী ধন-সম্পদ ও পার্থিব সাচ্ছন্দ্য প্রয়োজনীয় হলেও চরম লক্ষ্য নয়, বরং পাথেয় মাত্র। মানব জীবনের প্রকৃত কাম্য আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের নাজাত প্রাপ্তি। মহানবী (স.)-এর সহধর্মিণীদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) একই সঙ্গে নবী ও স্বামী ছিলেন। সে জন্য তাঁদের ক্ষেত্রে স্বামীর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও নবীর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে এ আয়াতগুলো নাযিল করা হয়েছে। তবে আয়াতদ্বয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। আর সেটি হলো ধন-সম্পদ অর্জন ও ভোগ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ালে তা' ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

অন্য যে বিষয়টি এ দুটি আয়াতের মর্মার্থ থেকে বেরিয়ে আসে, তা হলো আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দিক দিয়ে যার অবস্থা যত উপরে হবে দীনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর ত্যাগের মাত্রাও তত বেশী হতে হবে। এ কারণেই উম্মাহাতিল মু'মিনদেরকে এমনভাবে বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় স্বামীর নিকট প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক চাহিদার দাবী জানানো মোটেই অশোভনীয় ব্যাপার নয়।

আরো একটি ব্যাপার এখানে রয়েছে যে, স্বামীর যে কোন মিশনের সফলতা অথবা ব্যর্থতা অনেকাংশে স্ত্রী/স্ত্রীদের সহমর্মিতা ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। উম্মাহাতিল মু'মিনদেরকে মহানবী (স.)-এর মতো ত্যাগ-তিতিক্ষার অধিকারিণী করে তোলার জন্যই এমন কঠোর শর্ত আরোপ ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল।

অবশ্য অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের জন্য যে বিশেষ মর্যাদার আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে, সে প্রেক্ষিতেও এ আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করা যায়, কেননা বিশেষ মর্যাদা ও বিশেষ দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এখানে একটি আয়াতাংশ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তা হচ্ছে ২৮ নং আয়াতের اِنْ كُنْتُمْ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا। যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ বা চাকচিক্য কামনা কর।" ভূষণ বা চাকচিক্য বলতে ভোগ-বিলাস ও তার প্রদর্শনীকে বোঝানো হয়েছে। দুনিয়ায় স্বাভাবিক জীবন যাপন ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ বা জীবনোপকরণের প্রয়োজনীয় ভোগ-ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং হালাল রুজী বা জীবনোপকরণ উপায়-উপার্জনের জন্য আদেশ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এর নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু বিলাসিতা বা চাকচিক্য, যার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রদর্শনী- নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ সম্পদ ও বিলাসের প্রদর্শনীর স্পৃহা মানুষকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ পথে সম্পদ আহরণে পরিচালিত করে, যার পরিণতিতে আসে শোষণ ও জুলুম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাই উম্মাহাতুল মু'মিনদের হিদায়ত দানের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে বিশেষ করে মুসলিম নারী-পুরুষদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

ফিকহ্-এর মাস'আলা

ইসলামী ফিকহ্র দৃষ্টিতে স্ত্রীকে এভাবে বাছাই-এর ক্ষমতা প্রদানকে তালাকে তাকবীজ বলা হয় অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে এ স্বাধীনতা প্রদান করে যে, ইচ্ছা হলে তিনি তার স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তিনি আলাদা হয়ে যেতে পারেন। এ বিষয়ে ফকীহ্গণ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যেসব হুকুম আহকাম বের করেছেন তার সারাংশ হলো ঃ

www.pathagar.com

এক. একবার এ ক্ষমতা অর্পিত হলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। অবশ্য এর প্রয়োগও স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

দুই. এ ক্ষমতা অর্পণের ভাষা স্পষ্ট হতে হবে। আর যদি ভাষা স্পষ্ট না হয় তাহলে স্বামীর নিয়তের উপর বিষয়টি নির্ভর করবে। তালাকের নিয়ত থাকলে ক্ষমতা অর্পিত হবে, অন্যথায় নয়। তদুপরি স্ত্রীকে নিজে অথবা বিশ্বস্ত কারো মারফত জানাতে হবে যে তাকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

তিন. যদি স্বামী এ ক্ষমতা অর্পণকালে কোন মেয়াদ নির্ধারণ না করেন তাহলে কোন কোন ফকীহ্-এর মতে যে বৈঠকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে বৈঠক কাল পর্যন্তই এর মেয়াদ। আর এক দল ফকীহ্-এর মতে তা বৈঠককালের পরও বলবত থাকবে।

চার. ক্ষমতা প্রাপ্তির পর স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় তবে তাকে সেটা স্পষ্ট করে বলতে হবে। অস্পষ্ট কিছু বললে তা কার্যকর হবে না।

পাঁচ. এ ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগের তারতম্যের কারণে তালাকের প্রকৃতিও বিভিন্ন রকম হবে।

ছয়. যদি স্ত্রী অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ না করে স্বামীর সাথে থেকে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে কোন তালাক হবে না।

তাফহীমুল কুরআন অবলম্বনে, পৃষ্ঠা ৫০-৫২, দ্বাদশ খণ্ড

- হাফেজ মোঃ আবু জাফর

www.pathagar.com

وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا لا اِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُوْنَ. وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًا لا وَّمَا
نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ. قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ. وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِيْ
تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ لَهُمْ
جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ. وَالَّذِيْنَ
يَسْعَوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ. قُلْ
اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَا
اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না। তারা আরো বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। বলুন, আমার রব যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝে না। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহু গুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আযাবে উপস্থিত করা হবে। বলুন, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং

www.pathagar.com

পরিমিত দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিকদাতা। – সূরা সাবা ঃ ৩৪ -৩৯

শব্দার্থ

مترف শব্দটি ترف শব্দ থেকে উদ্ভূত। অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য مترفين বলতে বিত্ত-সম্পদশালী সর্দারদের বোঝানো হয়।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

হে নবী! আপনি কাফিরদের মূর্খজনোচিত কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হবেন না। কেননা এ আচরণ আপনার সাথেই নতুন নয়, বরং কোন জনপদেই আমি এমন কোন নবী পাঠাইনি, যেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা (সমকালীন কাফিরদের মত) একথা বলতে শুরু করেনি যে, যেসব বিধানসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা সেগুলো মানি না। তারা আরো বলেছে, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তাদের এহেন উক্তি সূরা কাহাফে এভাবে বলা হয়েছে ঃ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا কাজেই আমরা যে আল্লাহ্‌র প্রিয় ও সম্মানিত এটাই তার দলীল। – মা'আরেফুল কোরআন

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেছেন, পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল মনে করা নিছক ধোঁকা। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় মত্ত লোকেরা সর্বদাই সত্যের বিরোধিতা এবং নবী-রাসূল ও সৎ লোকেদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্য পন্থীদের মুকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকার এই দলীলও উপস্থাপিত করছে যে, আল্লাহ যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস-আচরণ পছন্দ না করবেন, তাহলে আমাদের পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসনক্ষমতায় সমৃদ্ধ করলেন কেন? এমনি একটি ঘটনার আলোকে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। হাদীসে আছে–জাহিলী যুগে দু'ব্যক্তি এক শরিকী ব্যবসা করত। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সে স্থান পরিত্যাগ করে কোন সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় চলে যায়। যখন রাসূল (স.) নবূয়ত প্রাপ্ত হলেন এবং জানাজানি হল, তখন সমুদ্রোপকূলবর্তী সঙ্গী মক্কার সঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে নবূয়ত দাবীর ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। উত্তরে মক্কার সঙ্গী লিখল, কুরায়শ গোত্রের কেউ তাঁর অনুসরণ করে না। কেবল নিঃস্ব, দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকজনই তার সাথে রয়েছে। উপকূলবর্তী সঙ্গী তার

ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে মক্কায় আগমন করল এবং সঙ্গীকে রাসূলের (স.) ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে ছিল তওরাত ইঞ্জিলের বিজ্ঞ পাঠক। রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে সে জানতে চাইল, আপনি কিসের দাওয়াত দেন? তিনি দাওয়াতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বললেন। সেসব শোনামাত্রই লোকটি বলে উঠল, اشهد انك رسول الله। রাসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার দাওয়াতের সত্যতা কিরূপে জানতে পারলে? সে বলল, পূর্বে যত নবী এসেছেন, শুরুতে তাদের অনুসারী দরিদ্র, নিঃস্ব ও নিম্নস্তরের লোকই ছিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। ধনৈশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা শুধু সে দাওয়াত গ্রহণ না করেই বসে থাকেনি, বরং সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। তারা আরো বলেছে ঃ

نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ.

আমরা ধনে-জনে সবদিক দিয়েই তোমাদের চাইতে সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আযাবে পতিত হব না।

আর তারা এও বলত যে, আমরা যদি শাস্তির যোগ্যই হতাম তাহলে আমাদের এত ধন-সম্পদ দেওয়া হচ্ছে কেন? তাদের এসব অসার যুক্তির উত্তরে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَا اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى

দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্র কাছে প্রিয় অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন।

ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহ্র প্রিয় হবার এবং আযাবের উপযুক্ত না হবার দলীল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহ্র প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র করতে পারে না। যেমন অপর এক আয়াতে আছে ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ مِّنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَّيَشْعُرُوْنَ.

তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্য পরিণাম ও পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক। বরং তারা অনুধাবন করতে পারছে না।

www.pathagar.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের রূপ ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন। (আহমদ ইবনে কাসীর) সুতরাং ঈমান ও সৎকর্মশীলরাই আল্লাহ্র প্রিয়। দুনিয়াতে তাদের মূল্য কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। আর কাফিরগণ আযাবের সম্মুখীন হবেই হবে।

– মা'আরেফুল কোরআন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২০-৩২২

মওলানা মওদূদী লিখেছেন ঃ সমাজে যেসব লোক ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিল, তারাই সব সময় নবী-রাসূলগণের দীনি দাওয়াতের সর্বপ্রথম মুকাবিলা করেছে, বিরোধিতা করেছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে! যেমন–সূরা আন'আম-১২৩; আ'রাফ-৬০, ৬৬, ৭৫, ৮৮ও ৯০; হূদ-২৭; বনী ইসরাইল ৯৬; আল-মু'মিনুন–২৪, ৩৩, ৩৮, ৪৬, ও ৪৭ এবং সূরা যুখরুফ ২৩ আয়াত। বিত্তশালীরা শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হত না, এই বলে তারা যুক্তিও পেশ করত যে, আমরা তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্র অনেক বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয় লোক। এই কারণেই তিনি আমাদের এসব নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। আর তোমাদের রেখেছেন বঞ্চিত। অন্ততঃ আমাদের থেকে অনেক নীচে ও পেছনে। আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি রাযী-খুশী না হতেন, তাহলে এ বিপুল সাজ-সরঞ্জাম ও ধন-সম্পদ তিনি আমাদেরকেই দেবেন কেন? এ ছাড়া পরকালেও আযাব আমাদের দেবেন না। আযাব যদি দেওয়াই হয়, তাহলে সেই লোকদেরকে দেওয়া হবে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র নিয়ামত হতে বঞ্চিত। দুনিয়া পুজারীদের এ ভুল ধারণা বিশ্বাসের কথা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা বাকারা ঃ ১২৬, ২১২; সূরা তাওবা ৫৫, ৬৯; হূদ–৩, ২৭; রা'আদ ২৬; কাহাফ–৩৪-৪৩; মারিয়ম ৭৩-৭৭ আয়াতগুলো উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া রিযিক বন্টনের ব্যাপারেও তারা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত। তারা মনে করে আল্লাহ্ যাকে বিপুল রিযিক দিয়েছেন, সে-ই তার খুব প্রিয়পাত্র আর যাকে অল্প ও সামান্য পরিমাণ দিয়েছেন, তার প্রতি আল্লাহ্র গযব। অথচ চক্ষু খুলে গভীরভাবে দেখলে অবশ্যই দেখতে পারত যে, এখানে খারাপও জঘন্য চরিত্রের লোকেরাও খুব সচ্ছল, আর বহু সৎচরিত্রের ভদ্র ব্যক্তি গরীবী অবস্থায় পড়ে আছে। এ পবিত্র চরিত্রের লোকদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না। শুধু ভালবাসেন যতসব জঘন্য লোকদেরকে, এটা কি বুদ্ধিমানের দাবী হতে পারে। সুতরাং বুঝতে হবে যে, ধন-মাল ও সন্তান-জনশক্তি মানুষকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দিতে পারে না। পারে শুধু নেক আমলসহ ঈমান। তবে সন্তান ও ধন-সম্পদ আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে দিতে পারবে যদি

www.pathagar.com

সে ধন আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে এবং সন্তানদের উত্তম শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্র অনুগত ও নেক চরিত্রের বানাতে পারে।

(তাফহীমুল কুরআন, টীকা নং ৫৪, ৫৫,৫৬, ৫৭, সূরা সাবা)

আর্থ-সামজিক তাৎপর্য

সূরা সাবার এ আয়াত (আয়াতে করীমা) কয়টির তাফসীরের আলোচনা হতে একথা পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, হক ও বাতিল তথা ন্যায় ও অন্যায়ের চিরন্তন দ্বন্দ্বে সমাজের বিত্তশালী উচুঁস্তরের লোকেরা হক ও ন্যায়ের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠায় খুব কমই সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছে। বরং তারা সত্য ও ন্যায়ের পথে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তারা সত্য ও ন্যায় প্রচারকারীদেরকে বিদ্রুপ করেছে, তাদের উপর চরম অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়েছে; সত্য-প্রচারকারী নবী-রাসূল (স.) ও তাঁদের অনুগামী ও সহযোগীদেরকে এমন কি হত্যা করতেও দ্বিধা করে নি। এদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কঠোর ভাবে ভর্ৎসনা করেছেন। এ সম্পর্কে সূরা আলে- ইমরানের ১৮১ আয়াত উল্লেখ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ

مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আর যারা আল্লাহকে দরিদ্র এবং নিজেকে ধনী মনে করে থাকে, আল্লাহ্ তাদের এই (প্রলাপ) বাক্য শুনে থাকেন এবং তাদের এসব কথা এবং নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় অন্যায়কারীদের আমলনামায় লিখে রাখা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা (এখন) দহন যন্ত্রণা ভোগ কর। – সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮১

রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর পথে জিহাদ ও জনহিতকর কার্যে অর্থ ব্যয় করার উপদেশ দিতেন. তা' শুনে তদানীন্তন ইহুদীরা বিদ্রুপ করে বলতঃ তোমাদের আল্লাহ্ বোধ হয় গরীব, নচেৎ তিনি মানুষের নিকট সাহায্য চাইবেন কেন? শুধু ইহুদী কেন, সর্বকালের সব বিত্তশালী নাফরমান লোকদের ঐ একই কথা ছিল। আজও তা-ই আছে। তারা সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চায় ন। তাই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জিহাদ বা প্রচেষ্টায় তারা শরীকও হতে পারে না। বিত্তশালীদের অধিকাংশই বিপুল সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে অন্যায় বা অবৈধ পন্থায় এবং সেই সম্পদ বৈভব দ্বারা এ দুনিয়ায় যত সব গর্হিত বা অবৈধ ভোগ-বিলাসের সামগ্রীসমূহ উপভোগ করছে। আল্লাহ্র দেয়া হক ও ন্যায় জীবনবিধান গর্হিত বা অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

ঘোষণা করে। তাই অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জনকারী বিত্তশালী লোকরা পূর্বপুরুষের ধর্ম এবং পুরনো রসম- রেওয়াজের দোহাই দিয়ে প্রচলিত অন্যায় ও অপবিত্র আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করারই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। কোনও রূপ সংস্কারমূলক কাজকে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। কারণ, তারা মনে করে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাই তাদেরকে বিত্তশালী করে ভোগ-বিলাসের সর্বোচ্চ স্তরে উঠিয়ে দিয়েছে। সুতরাং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে বলেই তারা মনে করে। তারা চায় না যে, সমাজের নিম্নস্তরে বা নিম্নবিত্তের লোকদের কোনও রূপ উন্নতি হোক এবং তাদের (ধনীদের) ভোগ বিলাসের কোনও রূপ অংশীদার হোক। তারা চায় দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সব সময়ই তাদের খাদেম থেকে তাদের মদমত্ত শক্তির পদতলে নিষ্পেষিত হোক।

এই বিত্তশালীরা আরও মনে করে, এ পৃথিবীতেই যখন তারা এত সব সম্পদ-বৈভবের মালিক হতে পেরেছে, তখন আখিরাতেও তাদের এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করা হবে না। বিত্ত ও সম্পদের জোরে তারা আখিরাতের সুখ-শান্তিও জয় করে নিতে পারবে। সুতরাং এ ধরনের পম্পদ গৌরবে গর্বিত লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র সত্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সহায়তা কামনা করা নেহায়েতই বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা ইতিহাসের দিকে ফিরেও তাকায় না। যুগে যুগে এই বিত্তশালী লোকদের অনেকেই আল্লাহ্‌র রোষে পতিত হয়ে এ জগতেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আখিরাতেও রয়েছে এদের জন্য কঠোরতম আযাব। তবুও এরা হিদায়ত গ্রহণ করে না।

সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে শুধু মাত্র অবৈধ ও অন্যায় পন্থায় জুলুম ও নিষ্পেষণের মাধ্যমে। এরূপে অর্জিত সম্পদের অধিকারীরা পরিণামে গণরোষে পতিত হয়ে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়। ইতিহাস তার সাক্ষী। তবু বিত্তশালীদের সে দিকে কোনও খেয়ালই আসে না, এ লোকেরাই যদি সত্য-ন্যায়ের আহবান শুনে তাদের অন্যায় অবৈধ কাজকে সংশোধন করে সত্য ও ন্যায় পথে এগিয়ে আসে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য-সহযোগিতা করে, তবে তাতে তাদের অবৈধ ভোগ-বিলাস না থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বৈধ সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হবে না। আর আখিরাতের পরম শান্তি তো তাদের জন্য রয়েছেই। এরও প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে। তবু এদের অধিকাংশই স্বেচ্ছায় হিদায়ত গ্রহণ করে না। অবশ্য এমন কিছু কিছু বিত্তশালী লোক আছেন, যাঁরা আল্লাহ্-রাসূলের হিদায়ত সহজেই মেনে নেয়, তাদের আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া, আখিরাত–উভয় স্থানেই সুখ-শান্তি দান করেন। তাঁরা এ দুনিয়ায়ও কোনও গণরোষ বা আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হন না এবং আখিরাতেও অনন্ত সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত হন না।

www.pathagar.com

আলোচ্য ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বান্দাদের রিযিক বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন, যারা আল্লাহ্র দীন বিধান প্রতিষ্ঠার জিহাদে অর্থাৎ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অর্থ ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান দেবেন বলে পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্র এ ঘোষণার প্রতি সন্দেহ পোষণ করার কোনই কারণ নেই। আমাদের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্র বান্দারা যখনই আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জানও মাল কুরবানী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয়ী করেছেন এবং তারা দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি লাভ করেছে।

বিত্তশালী লোকেরা এ প্রচেষ্টায় শরীক না হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও, সমাজের নীচ ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাই তাদের স্বল্প শক্তি, স্বল্প পরিমান মাল সম্পদ নিয়ে এরূপ জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখন আল্লাহ্র রহমত তার সাথে যুক্ত হয়েছে এবং ফলে তাদের সামান্য সম্পদ ও নগণ্য শক্তি নিয়েই বিপুল সম্পদ ও শক্তির অধিকারী জালিম শক্তির উপর বিজয়ী রয়েছে।

উল্লেখ্য, ধন ও জনের অধিকারীরা তাদের সম্পদের সাথে সন্তান-সন্ততি নিয়েও গর্ব করত। এসব জিনিস পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বটে। তবে মানুষের সৎ কর্মই আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ। সূরা কাহ্ফের ৪৬'নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً.

ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসেবেও সর্বোৎকৃষ্ট।

উপসংহারে বলা যায়–ধনজনের মোহে পড়ে বিত্তশালী লোকেরা যদি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাতে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কোথাও মঙ্গল নেই। পক্ষান্তরে বিত্তশালী ও বিত্তহীন লোকেরা সবাই যদি আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধান কায়েমের জন্য জান-মালের কুরবানী দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে এ দুনিয়ায়ও একটা সার্বিক কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হবে, যেখানে উচ্চ মধ্য ও নিম্নবিত্ত লোকদের কারও উপরই কোনও রূপ জুলুম ও শোষণ-নিষ্পেষণের অবকাশ থাকবে না। সর্বত্র এক অনাবিল শান্তির অবস্থা বিরাজ করবে এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনেও থাকবে চিরশান্তি ও সুখ।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফাতির

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ صلى فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ.

হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হইতেছ? – সূরা ফাতির ঃ ৩

শব্দার্থ

فانى تؤفكون এর দুটো অর্থঃ (১) তেমরা কোথায়–দূরে সরে যাচ্ছ (২)কেমন করে তোমরা সত্যকে অস্বীকার করছ।

–সাফওয়াতুল বয়ান, পৃষ্ঠা ৫৪৯

তাফসীরতিত্তিক আলোচনা

সূরা ফাতির মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরাতে মূলত তওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতের তাফসীরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেন ঃ "অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হইও না, অনুগ্রহ ভুলিয়া যাইও না, নেমকহারামী করিও না। তোমরা যাহা কিছু পাইয়াছ তাহা আল্লাহ্‌রই দেয়া, এ সত্যকে তোমরা ভুলিয়া যাইও না। অন্য কথায় এই বাক্যটি সাবধান করিয়া দেয় এই বলিয়া যে, যে লোকই

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহারো বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা-করে, কোন নেয়ামত পাইয়া আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহারো শোকর আদায় করে, কোন নেয়ামত চাওয়ার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো নিকট দোয়া করে–ইহার যে কোন একটি কাজই যে করিবে, সে অতিবড় অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি।"

– সুরা ফাতিরের ৫নং টীকা, তাফহীমুল কুরআন, দ্বাদশ খণ্ড

আয়াতে এ কথাও প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কি কোন সৃষ্টিকর্তা আছে, আছে কোন রিযিকদাতা? আল্লাহ্ নিজেই জবাব দিচ্ছেন ঃ না, তা নেই কারণ প্রকৃত ইলাহ হচ্ছেন কেবল আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং এ ব্যাপারে মানুষের ধোঁকা খাওয়ার কোন সংগত কারণ নেই।

এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করছেন এবং তাঁর একত্ব ও ইবাদতের তিনিই যে একমাত্র অধিকারী এ বিষয়ে দলীল পেশ করছেন। সৃষ্টি ও রিযিক প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন তিনি একক. তেমনি ইবাদত পাবার বেলায়ও। সুতরাং অন্য কেউ তাঁর শরীক হতে পারে না। অতঃপর বলা হয়েছে, এ প্রমাণ পেশ করার পরও কি তোমরা অন্য কারো সামনে মাথা নত করবে? এবং আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে?

– আল্লামা আযমী কৃত সংক্ষিত ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ১৩৯, তৃতীয় খণ্ড, ৭ম খণ্ড

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেই রিযিক দেয় না। রিযিক কেবল আল্লাহ্ই দেন। ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভংগী-যা নিরেট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত–তা হচ্ছে দুনিয়ার সব সম্পদ আল্লাহ্র সৃষ্টি করা। এ সম্পদ হতেই মানুষ সব প্রয়োজন পূরণ করে। এ জন্য মানুষকে সব সময় আল্লাহ্কে মেনে চলা উচিত। আল্লাহ্ই হচ্ছেন ইলাহ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, যাকে মানা সবার কর্তব্য। তাঁর বিধানই সঠিক। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কিছু মানা হলে তা কেবল অকৃতজ্ঞতা ও না-শোকরীই হবে না, তা হবে বিভ্রান্তি। আল্লাহ্কে না মানা হলে তা হবে বিপথে চালিত হওয়া। ধোঁকা খাওয়া যেমনটি এখানে বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ই সর্বযুগের সব মানুষের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিতে পারে।

www.pathagar.com

অন্য কোন শক্তির পক্ষেই তা দেওয়া সম্ভব নয়। তারাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং তাদের শক্তি সীমিত।

মানব সমাজকে এজন্য আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে বিভ্রান্তি হতে মুক্ত হতে পারে। এ পথ অবশ্য কঠিন। কেননা সত্যের প্রতিবন্ধক হচ্ছে মানুষের নিজের নফ্‌স ও স্বার্থের দাসানুদাস বিভিন্ন শক্তি।

বস্তুত এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এ যে আল্লাহ্ পাক যেমন মানুষের জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ব্যবস্থা করেছেন তার নৈতিক ও আত্মিক প্রয়োজন মেটাবার। প্রথমটার ক্ষেত্রে যেমন তিনি একক ও অনন্য তেমনি দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রেও। সামান্য একটু চিন্তা করলেই এ সত্য সবার সামনে সহজে পরিষ্কার হয়ে উঠে। এতে বিভ্রান্তির সামান্যতম অবকাশও নেই।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ . لِيُوَفِّيَهُمْ
اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ .

যারা আল্লাহ্‌র কিতার পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের সওয়াব পুরাপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। **– সূরা ফাতির ঃ ২৯-৩০**

শব্দের ব্যাখ্যা

كتب ঃ কিতাব–পুস্তক, বই। এখানে আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। সালাত–দোয়া,প্রার্থনা, পরিভাষায় রুকু ও সিজদা সহ যে ইবাদত দিনে ৫ (পাঁচ)বার আদায় করা হয়। রিযিক–আয়, জীবনোপকরণ, দান, একজন অন্যজন থেকে যে সুবিধা পায়, ভরণ-পোষণ। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পুর্বে বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে।

তিজারত-ব্যবসা, বাণিজ্য-যাবতীয় আর্থিক লেন-দেন।

তাবুরা-শব্দটি بور থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ বিনষ্ট হওয়া।

তাফসীরকারদের ব্যাখ্যা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

“‘ প্রথম গুণ হচ্ছে তিলাওয়াতে কুরআন। আয়াতে এমন লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করে ঃ

الذين يتلون كتاب الله

www.pathagar.com

দ্বিতীয় গুণ নামায কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে গোপনে ও প্রকাশ্যে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ ইবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে কখনো কখনো প্রকাশ্যে করাও জরুরী।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ . تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ -

এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে ব্যাপক অর্থে ও উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সৎকর্মের তুলনা ব্যবসার সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে।

কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশংকা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যাবসায়ের সাথে لن تبور শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, সর্বকালের এই ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকা নেই। ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না উপরন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরাপুরি দেওয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত আরো বেশী দেবেন।

–মা'আরেফুল কোরআন, সূরা ফাতিরের উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের তাফসীর অংশ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেনঃ ঈমানদার লোকদের এই কাজকে (আল্লাহ) ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ব্যবসায়ে মানুষ নিজের মূলধন, শ্রম ও যোগ্যতা ব্যয় করে এই আশায় যে, কেবল মূলধনই ফেরত পাওয়া যাইবে না, কেবল শ্রম, সময় ও ব্যয়ের মজুরীই পাওয়া যাইবে না, অতিরিক্ত মুনাফাও কিছু পাওয়া যাইবে। একজন মু'মিন ব্যক্তির এই কাজও ঠিক তেমনি। সে খোদার হুকুম পালন, বন্দেগী ও ইবাদতে এবং তাদের দীনের জন্য চেষ্টা সাধনা-সংগ্রামে নিজের ধন–মাল, সময় ও মেহনত, যোগ্যতা এই আশায় বিনিয়োগ করেন যে, এই সব কিছুর পুরাপুরি মজুরীই শুধু পাওয়া যাইবে না, আল্লাহ্ তা'আলা আরো অধিক দান করিয়া তাহাকে ধন্য করিবেন। তবে এই দুই প্রকারের ব্যবসায়ে অতি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। সেই পার্থক্য এই দিক দিয়া যে, দুনিয়ার ব্যবসায়ে মুনাফার আশাই কেবল থাকে না,

www.pathagar.com

লোকসান ও দেউলিয়া হইয়া যাওয়ারও আশংকা থাকে। কিন্তু নিষ্ঠাবান বান্দা আল্লাহ্‌র সহিত যে কারবার করে তা'হতে ক্ষতি-লোকসানের ভয় থাকে না।"

– তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফাতিরের ৫১নং টীকা

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ আয়াতদ্বয়ে কুরআন তিলাওয়াত নামায কায়েম করা ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার মতো ইবাদতের কাজকে ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এতে ইসলামে কেবল ব্যবসার বৈধতাই প্রমাণ করে না, ব্যবসার মর্যাদাও প্রমাণ করে। এই আয়াতকে ব্যবসায় লাভ-লোকসানের একটি মানদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের লাভ-লোকসানের হিসেব কেবল দুনিয়ার লাভ-লোকসানের ভিত্তিতেই করা সংগত নয়। লাভ-লোকসানের পূর্ণ হিসেব পাওয়া যাবে যদি আখিরাতের লাভ-লোকসানকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বরং সত্য কথা হচ্ছে–আখিরাতের লাভ-লোকসানই সত্যিকার লাভ-লোকসান। আখিরাতে যদি ক্ষতি হয়, তাহলে দুনিয়ার লাভ কোন লাভ বলে গণ্য হতে পারে না।

এ জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যথার্থ অর্থ ব্যবস্থার জন্য কেবল আইন-কানুনের উপরই নির্ভর করা হয় না; সেখানে ঈমানদার মানুষ তৈরী করার পূর্ণ ব্যবস্থা থাকে। যারা তাদের কাজের ভিত্তিতে পায় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, তাদের দোয়া হচ্ছে ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

হে আমাদের প্রভূ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো। – সুরা বাকারা ঃ ২০১

এ জন্য ইসলামী অর্থনীতিতে মূল্যবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। এ আয়াতে ব্যয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যয়কে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ ও সালাত কায়েমের পাশাপাশি উল্লেখ করায় এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অবশ্য কি ধরনের ব্যয় করতে হবে সে বিষয়ে এখানে কোন উল্লেখ নেই। তবে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করার কথা বলে একে শুধুমাত্র দানের মধ্যে সীমিত রাখা হয়নি। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষার আলোকে বলা যায় যে, অসহায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য ব্যয় যেমন এর অন্তর্ভুক্ত (যা প্রধানত গোপনে করা হয়), তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়–এমন সব ধরনের ব্যয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে আনফাকু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা অর্থ জমা করে রাখার (hoarding) বিপরীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরিবার-

www.pathagar.com

পরিজনের জন্য ব্যয়, বিনিয়োগ, ধার, যাকাত, সদকা, ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ব্যয়ের উপর কুরআনের অন্যত্রও গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। যে কোন ব্যয়-তা দানই হোক অথবা বিনিয়োগই হোক-কার্যকর চাহিদাকে বৃদ্ধি করবে। বিনিয়োগের জন্য ব্যয় কার্যকর যোগানকেও বৃদ্ধি করবে। আর দানের রয়েছে সামাজিক তাৎপর্য। তা' এক ধরনের Transfer payment হলেও আয় বন্টনে অসমতা (inequity) কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া, জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভোগ ব্যয়ের গুণক প্রভাব (multiplier effect) বিদ্যমান। সুতরাং সামগ্রিক অর্থনীতির স্বার্থে সুষ্ঠু ব্যয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ অপরিহার্য।

কুরআনে তাই এ বিষয়ে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃপণতাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে; সেই সাথে ব্যয়ের নামে অপব্যয়কেও ইসলাম গ্রহণ করেনি। ব্যয় হতে হবে যথার্থ। ইতিপূর্বে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইয়াসীন

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَاْكُلُوْنَ. وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا
مِنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا
يَشْكُرُوْنَ.

তাদের জন্য একটি নিদর্শন– মৃত পৃথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য–তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তা থেকে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরিণী। যাতে তারা ফল খায়। তাদের হাত ইহা সৃষ্টি করে না। এরপরও তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন ? – সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩-৩৫

তাফসীর

সারসংক্ষেপঃ (তওহীদের নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে) তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী। (এতে নিদর্শনের বিষয় এই যে) আমি একে (বৃষ্টি দ্বারা) সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে বিভিন্ন শস্য উৎপন্ন করি। তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তা থেকে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং (বাগানে পানি সেচের জন্য) তাতে প্রবাহিত করি নির্ঝরিণী। তাদের হাত এ সব ফলমূল সৃষ্টি করে না বাহ্যত তা মনে হলেও। বীজ বপন, পানি সেচ ও নিড়ানি তাদের হাতে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের হাত এগুলো সৃষ্টি করে না। – মা'আরেফুল কোরআন

www.pathagar.com

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্তু হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ্ ত'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ করা এবং হাশর-নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকা পোক্ত করা। উল্লিখিত আয়াত-সমুহে কুদরতের এমনি ধরনের নিদর্শনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি তাঁর বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী। প্রথম আয়াতে পৃথিবীর শুষ্ক মৃত্তিকার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

শুষ্ক পৃথিবীতে বৃষ্টির পানি পতিত হয়। তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফলমূল প্রকাশ পায়। অতঃপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখবার জন্য ভূগর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠে প্রস্রবণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের হাত নেই। বলা হয়েছেঃ

وَمَا عَامِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ

অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন— তাদের হাত এসব ফল তৈরী করেনি। এ বাক্যটি অনুধাবন মানুষকে জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা কর। এই শস্য-শ্যামল ভু-ভাগে এ ছাড়া তোমার কাজ কি যে তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ নরম করেছ যাতে অংকুর উদ্গমের অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষকে পত্র পল্লকে সুসজ্জিত করা এবং তাকে ফলেও ফুলে সমৃদ্ধ করা–এ সব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। তাই এ সব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করার সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য।

সূরা ওয়াকিয়ার একটি আয়াত এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক ঃ

اَفَرَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ.

তোমরা যা বপন কর তাকে সমৃদ্ধ বৃক্ষে রূপান্তরের কাজটা তোমরা কর, না আমি করি? – সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৬৩-৬৪-৬৫

সারকথা এই যে, এ সব ফলমূল তৈরীতে মানুষের কোন হাত না থাকলেও এগুলো আমি সৃষ্টি করে মানুষকে মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তৎসঙ্গে এগুলো ভক্ষণ করার ও কাজে লাগানোর প্রণালীও শিক্ষা দিয়েছি।

www.pathagar.com

তাফহীমুল কুরআন এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায়

মওলানা মওদূদী লিখেছেনঃ এই বাক্যের আরও একটি তরজমা হইতে পারে, যেন ইহারা উহার ফল এবং তাহাদের হাত যাহা কিছু বানায় তাহা খাইতে পারে।” অথাৎ প্রকৃতিজাত দ্রব্যাদির দ্বারা যেসব কৃত্রিম খাদ্য ইহারা বানায়–যেমন রুটি, ভাত, তরকারী, মোরব্বা, আচার, চাটনী ইত্যাদি অসংখ্য রকমের খাদ্যবস্তু। এ আয়াতসমুহে যমীনের উর্বরতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হইয়াছে। মানুষ দিনরাত এই যমীনের উৎপাদন ও ফসল খাইতেছে। আর ইহাকে তাহারা একটি সাধারণ ও গুরুত্বহীন ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছে। কিন্তু তাহারা যদি গাফলতির পর্দা ছিন্ন করিয়া চিন্তা ও বিবেচনার দৃষ্টিতে দেখিত, তাহা হইলে তাহারা জানিতে পারিত যে, এই মাটির শয্যার উপর সঞ্চরমান ক্ষেত-খামার ও সবুজ বাগিচার উদগম হওয়া এবং উহাতে ঝর্ণাধারা ও খালস্রোত প্রবাহিত হওয়াটা কোন খেলার ব্যাপার নয়; নয় কোন সহজসাধ্য কাজ। ইহা আপনা-আপনিই হইয়া যাইতেছে না। উহার পশ্চাতে এক বিরাট সৃষ্টি কুশলতা, কল্যাণ ব্যবস্থা ও লালন-পালনের এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক বিধান সতত কার্যকর রহিয়াছে। যমীনের অবস্থাটাই চিন্তা করিয়া দেখ। ইহা যেসব রাসায়নিক উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে নিজস্বভাবে উৎপাদনের কোন শক্তি বা যোগ্যতাই নাই। এই সব বস্তু আলাদা আলাদা এবং এককভাবে ও পরস্পর সংমিশ্রণ সংযোজনের পরও উর্বরা শক্তিহীন। এই কারণে উহাতে জীবনের নাম মাত্রও নাই। তাহা হইলে এই নিষ্প্রাণ যমীনের মধ্যে উদ্ভিদ জীবনের প্রকাশ ঘটে কি করিয়া? কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল তাহাই প্রশ্ন। এই বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, কয়েকটি বড় বড় কার্যকারণ পুর্ব হইতেই উহাতে বর্তমান না থাকিলে এই জীবন আদপেই বাস্তবায়িত হইতে পারিত না।

এই বিস্ময়কর সৃষ্টি ব্যবস্থা সম্পর্কে যে লোকই চিন্তা-ভাবনা করিবে, সে বিদ্বেষ ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত না হইলে তাহার দিল অকুণ্ঠিতভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, এই সবকিছু আপনা-আপনি সম্ভব হইতেছে না। এই সব ব্যাপারে সুস্পষ্টরূপে এক মহা-জ্ঞানবানের সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনা নিরন্তর কাজ করিয়া যাইতেছে। উহার দরুনই যমীন, পানি, বাতাস ও মৌসুমের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা হইয়াছে উদ্ভিদের জন্য, আর উদ্ভিদজগতে সামঞ্জস্য স্থাপন করা হইয়াছে জীবজন্তু ও মানুষের প্রয়োজনসমূহের অতীব সূক্ষ্ম ও নাজুক অবস্থার সহিত। এই সর্বাত্মক ও সর্ব পর্যায়ের সামঞ্জস্যসমূহ কখনই এবং কিছুতেই একটি দুর্ঘটনা বা আকস্মিক ঘটনা হিসেবে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। কোন বুদ্ধিমান মানুষই ইহা সম্ভব বলিয়া ধারণা করিতে

www.pathagar.com

পারে না। এই ব্যবস্থাপনা হইতে এই কথাও বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা বহু সংখ্যক খোদার ঐক্যবদ্ধভাবে করা কোন কীর্তি নয়। ইহা সবই এমন এক খোদার ব্যবস্থাপনা, যিনি যমীন, বাতাস, পানি, সূর্য, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানবজাতি–সবকিছুরই একই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী। ইহার প্রত্যকটির জন্য আলাদা আলাদা খোদা হইলে এইরূপ ব্যাপক, সর্বাত্মক ও সুগভীর সূক্ষ্ম বিজ্ঞানসম্মত সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা রচিত হওয়ার কথা কিরূপে ধারণা করা যাইতে পারিত এবং লক্ষ কোটি বৎসর ধরিয়া এমন নিয়মিতভাবে কার্যকর হইতে থাকা কিরূপে সম্ভব হইত أفلا يشكرون। দ্বারা আল্লাহ্ প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, মানুষ কি এতই নিমকহারাম ও অকৃতজ্ঞ যে, তাহাদের জীবন ও স্থিতির জন্য যে আল্লাহ্ এতসব সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহারা তাহার শোকর আদায় করে না। আল্লাহ্র সামনে নত হয় না বরং সিজদা করে এমন সব শক্তির উদ্দেশ্যে, যেগুলি একটি তৃণখণ্ডও তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই।"

– তাফহীমুল কুরআন, টীকা নং ২৮-২৯, পৃ. ১৮-১৯; ১৩শ খণ্ড

আর সাইয়েদ কুতুব লিখেছেনঃ তারা তো রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে অথচ তাদের পরিণাম সম্পর্কে অনুধাবন করছে না। রাসূলগণ তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করছেন। তাদের চারপাশে সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহ্র সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে। তন্মধ্যে তাদের সবচাইতে নিকটতম সাক্ষী হল মাটি। মাটি তো এমন একটি মৃত পদার্থ, যার ভেতরে জীবন নেই, আর পানিও নেই যে, জীবন সৃষ্টি করতে পারে, অতঃপর সে মাটি সজীব হয়ে উঠে এবং বীজ উৎপাদন করে এবং খেজুর আর আঙুরের বাগ-বাগিচা সুশোভিত করে। অতঃপর তাতে ঝর্ণাসমূহ সজীবতা ও পেলবতা নিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

আর জীবনপঞ্জী সঞ্চালন এমন একটি অলৌকিক বিষয়, যা প্রথিবীর ব্যাপারে মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই। আল্লাহ্র হাতেই এ অলৌকিক বিষয়টি আবর্তিত হয়। জীবনের আত্মা মৃতের মাঝে সঞ্চারিত হয়। এ বাড়ন্ত ফসল, সজীব বাগান, সুশোভিত ঝুলন্ত ফল অবশ্যই আল্লাহ্র ক্ষমতার দিকে চক্ষু ও হৃদয়কে খুলে দেয়। উন্মুক্ত করে দেয় বদ্ধ অন্তরের সকল দ্বার। আল্লাহ্র ক্ষমতাতেই এসব কিছু মানুষের আয়ত্তে আসে। মানুষ ভোগ করে। সুতরাং, কৃতজ্ঞতা পোষণ করা তাদের উচিত।

–ফী-যিলালিল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, পৃষ্ঠা ২৯৬৬-২৯৬৭,৫ম খণ্ড

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ

আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

www.pathagar.com

১ম, আয়াতে উল্লিখিত ما শব্দটি نافية না-বোধক। অর্থাৎ পানি প্রবাহ ও অন্যান্য কাজ তাদের হাতে করেনি বরং আল্লাহ্ই এ সবকিছু করেছেন।

২য়, আয়াতে উল্লিখিত ما শব্দটি موصول অর্থাৎ সম্বন্ধসূচক। অর্থাৎ তাদের হাত যা কিছু করেছে যেমন রোপণ, বপন, আল্লাহ্র দেয়া পানি থেকে সিঞ্চন, ইত্যাদি কাজ অর্থাৎ কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে মানুষ যা কিছু উপার্জন ও উৎপাদন করে–যেমন খেজুর-আঙুর ইত্যাদির জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

– তফসীরে কবীর, পৃষ্ঠা ৬৮, ২৫-২৬ খণ্ড

উক্ত আয়াতের (وما عملته ايديهم) ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী লিখেন ঃ

"Man may till the soil and sow the seed; but the productive forces of nature were not made by man's hands. They are the handiwork and artistry of God and are evidence of God's providence for His Creature. - Glorious Quran

কিন্তু কুরআন করীমের এ আয়াতগুলো থেকে উৎপাদনের উপকরণাদির সাধারণভাবে গৃহীত ধারণা থেকে একটু পৃথক মনে হয়। যদিও মানুষ উপকরণগুলোকে Convert করে রিযিক তৈরী করছে কিন্তু এই Conversion process এ আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ সততই ক্রিয়াশীল। আধুনিক অর্থনৈতিক ধারণায় এ বিষয়টি অনুপস্থিত। যদিও অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় Risk এবং uncertainty-এর বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। এই uncertainty factor- টিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্ সুবহানু তা'আলার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায় এবং এতে উৎপাদনের এবং বিতরণের তাত্ত্বিক আলোচনার যৌগিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থনীতিতে আল্লাহ্ সুবহানু তা'আলার মদদকে providence factor হিসেবে গণ্য করা কুরআনের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে বলে মনে হয়। আর এ বিষয়টি আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী উল্লেখ করেছেন বিশেষভাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ কুরআন করীমে রিযিক সরবরাহের যে প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে তা উৎপাদনের primitive প্রকৃতি বা কৃষি উৎপাদনের দিকেই দিক নির্দেশ করে। এ ক্ষেত্রে level of Technology-র বিষয়টি বিবেচ্য। তবে Technology যতই আধুনিক হোক না কেন Uncertainty factor কিন্তু থেকেই যায়। তাই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় providence factor-এর কার্যকারিতা সব সময়ই প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা মানুষের রিযিক সৃষ্টির যে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন এ আয়াতে তাকে আল্লাহ্‌র নিজস্ব ব্যবস্থাপনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে বলা হয়েছে তাদের হাত এগুলো সৃষ্টি করে না, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হাতই এসব কিছু সৃষ্টি করে।

মানুষ মূলত কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ যা করতে পারে, তা হলো বস্তুর রূপ পরিবর্তন করে নিজের প্রয়োজন অনুসারে তৈরী করার ব্যবস্থা করতে পারে। এ জন্য অর্থনীতিতে উৎপাদনের একটি বিশেষ সংজ্ঞা আছে। তাহল Creation of utility. "If consuming means extracting, producing means putting into utility (Fraser) অর্থাৎ Production, Therefore, should be defined as a creation of utility. আধুনিক অর্থনীতিতে Creation of utility-এর পরিবর্তে addition of value শব্দগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে উৎপাদনের সংজ্ঞা দাঁড়ায় ঃ Production is defined not as creation of utility but as a creation of or addition of value, কারণ পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের কোন মূল্য না থাকলে তাকে উৎপাদন বলা যাবে না। এ ধরনের উৎপাদন ধারণায় বিভিন্ন প্রকার মূলধনে ও ব্যবহার্য বস্তু উৎপাদন করতে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয়, তাও এক ধরনের প্রাথমিক বা রূপান্তরিত বস্তু। এসব উপকরণ রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহার্য বস্তু বা রিযিক উৎপন্ন হয়।

- জহুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ.

তিনি যিনি তোমাদের জন্য শ্যামল সবুজ গাছ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন, অতএব, তোমরা তা থেকে আগুন জালাও। – সূরা ইয়াসীন ঃ ৮০

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

তাফহীমুল কুরআনে মওলানা মওদূদী (র.) লিখেছেন ঃ এর অর্থ হল আল্লাহ্ শ্যামল সবুজ কাঁচা গাছের মধ্যে এমন দাহ্য বস্তু রেখে দিয়েছেন যে, মানুষ কাঠকে ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করে তা দ্বারা আগুন জ্বালাতে পারছে। অথবা এর দ্বারা মারখ ও আফার নামক দু'টি গাছের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবরা এই গাছ দুটির কাঁচা ডাল একটির উপর অপরটি মারত, তখন তা হতে আগুন জ্বলে উঠত। প্রাচীনকালে আরব বেদুইনরা আগুন জ্বালাবার জন্য এই চকমকিই ব্যবহার করত। সম্ভবত আজও অনেক মানুষ তাই করে।

– সূরা ইয়াসীনের তাফসীর, টীকা নং ৬৮

মা'আরেফুল কোরআনে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেছেন ঃ আরবে 'মারখ' ও 'আফার' নামক দু'টি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ ছিল। আরবরা এ বৃক্ষদ্বয়ের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে নিত। অতঃপর সম্পূর্ণ তাজা ও রসভর্তি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গত করা হয়েছে। (কুরতুবী)

এছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ ও সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই ঃ

اَفَرَاَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ - ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ.

তোমরা যে আগুনই প্রজ্বলিত কর সে সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর, যে বৃক্ষ এ আগুনের স্ফুলিংগ হয়, তাকে তোমরা সৃষ্টি করছ না আমি? আলোচ্য আয়াতে شجر শব্দের اخضر। বিশেষণ উল্লেখ থাকায় বাহ্যিক অর্থ সেই বিশেষ বৃক্ষই হবে, যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়।

– পৃষ্ঠা ৪৪৪-৪৪৫, ৭ম খণ্ড

তফসীরে কবীরে ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন ঃ মানুষ তো দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। দেহের আছে অনুভূতি। তাতে তাপ ও আত্মার উপলব্ধি করা যায়। ঠিক তেমনি সবুজ বৃক্ষের সাথে পানির রস ফোটায় ফোটায় বিদ্যমান অথচ কত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তাকে তোমরা জ্বালানি হিসেবে পাচ্ছ। সুতরাং বৃক্ষ সৃষ্টির ব্যাপারে যদি কঠিন ও অসম্ভব মনে কর, তাহলে আসমান যমীন সৃষ্টি তো.তোমাদের সৃষ্টির চাইতে অধিকতর কঠিন কাজ অথচ তা অসম্ভব মনে কর না।

– পৃষ্ঠা ১১০, ২৫-২৬ খণ্ড

সাধারণ আলোচনা

আয়াতটির সাধারণ তাৎপর্য উপরে উল্লিখিত তাফসীরগুলো থেকে ধারণা করা যায়। কুরআন বলছে মানুষের জন্য আল্লাহ্ পাক এর সমগ্র প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। সেটা যেমন তার রিযিকের জন্য তেমনি তা অন্যান্য প্রাথমিক বা মাধ্যমিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও। রিযিকের জন্য আগুন একটি প্রয়োজনীয় শক্তি। আল্লাহ্ সবুজ বৃক্ষে তা সংরক্ষণ করেছেন।

আল্লাহ্র একত্বের প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন বিষয়ের উদাহরণ আল্লাহ্ পেশ করেছেন কুরআনুল করীমে। এখানেও তার অসংখ্য নিয়ামতের একটি বর্ণনা করেছেন যার জন্য উচিত আল্লাহ্র অনুগত এবং শোকরগুযার হওয়া।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র এ নিয়ামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। শক্তি (energy) হচ্ছে বর্তমান অর্থনীতি তথা সভ্যতার চালিকা শক্তি। আলোচ্য আয়াতে এই শক্তি (energy)-এর একটি উৎসের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। আয়াতে যদিও অত্যন্ত সাধারণভাবে মানুষকে বোঝানো হয়েছে তথাপি বর্তমান বৃক্ষ থেকে শক্তি পাওয়ার একটি ভিন্ন রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। তাহলো গ্যাস ও

www.pathagar.com

তৈল, যা প্রোথিত বৃক্ষলতা যা দীর্ঘদিন ভূগর্ভে পচন ক্রিয়ার নিয়ম স্বরূপ পাওয়া যাচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের ধারণামতে বস্তুর ক্ষয় নেই। তা রূপ বদলায় মাত্র। আর, এ রূপ বদলানোর ব্যবস্থা আল্লাহ্ পাকই করেছেন মানুষের প্রয়োজনে। এর প্রক্রিয়া জানা নির্ভর করে মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার বিস্তৃতি ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই শক্তির সংকটের সম্ভাবনাও ক্ষীণ। অবশ্য সবকিছু নির্ভর করবে মানুষের প্রয়োজনের উপর এবং সে প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষের ক্রমাগত প্রচেষ্টার মানের উপর।

- শামসুল আলম খান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মু'মিন

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

আল্লাহ্ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসস্থান, আসমানকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, আর তোমাদের আকৃতি কতই না সুন্দর করেছেন এবং তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিযিক দান করেছেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ বরকতময়। – সূরা মু'মিন ঃ ৬৪

শব্দার্থ

قرار স্থিতিশীল, অটল, অনড়, বসবাসের উপযোগী। (আল-মুন্‌জিদ)

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

এই যমীন ও পৃথিবীর অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টির জন্য বসতির জায়গা হওয়া কোন সহজ কথা নয়। মাটির এই গোলককে যেসব বিজ্ঞানসম্মত সামঞ্জস্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা যদি কেউ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখে, তাহলে সে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাবে। সে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারবে যে, একজন মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ ও নিরংকুশ ক্ষমতাশালী সত্তার প্রত্যক্ষ কার্যকর ব্যবস্থাপনা ছাড়া এটা কায়েম হতে পারে না। এ ভূমণ্ডলটি মহাশূন্যলোকে ঝুলানো অবস্থায় রয়েছে। কোন কিছুর সাথে ঠেস লাগানো নয়। অথচ তাতে কোনরূপ কম্পন ও অস্থিরতা নেই।

www.pathagar.com

এই ভূলোক নিয়মিতভাবে সূর্যের সামনে আসে ও সরে যায়। এভাবে রাত-দিনের আবর্তন হচ্ছে। যদি সর্বদা সূর্যের আড়ালে থাকত তাহলে কোন প্রাণীর বসবাসই অসম্ভব হয়ে যেত। কেননা এর ফলে এর একদিকে শৈত্য ও অন্ধকারের দরুন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উদ্ভব ও সৃষ্টি সম্ভব হতে পারত না। আর অপর অংশের উপর তাপমাত্রা এত তীব্র হত, যার ফলে তা পানিশূন্য, জীবনহীন ও বসতিহীন হয়ে পড়ত। এ ভূলোকের উপর পাঁচশত মাইল উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুর এক সূক্ষ্ম গাঢ় স্তর স্থির হয়ে রয়েছে। এটা মারাত্মক উল্কা পতনের আঘাত হতে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখছে। অন্যথায় দৈনিক যে দু'কোটি উল্কা প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল গতিতে পৃথিবীর উপর নিপতিত হচ্ছে, তা এখানে এমন এক সর্বনাশা ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করত, যার ফলে এখানে কোন মানুষ, জীবজন্তু বা বৃক্ষলতা জীবন্ত থাকতে পারত না। এ বায়ুস্তরই তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমুদ্র হতে বাষ্প উঠে মেঘমালা সৃষ্টির মূলেও এই বাতাস। বাতাসই সে মেঘমালাকে যমীনের বিভিন্ন দিকে ও অংশে চালিয়ে নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের কারণ ঘটায়। মানুষ, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় গ্যাস সংগ্রহ করে ও দেয় এই বাতাস। এ যদি না হত তাহলে এ যমীনে কোন জীবের বসতি হতে পারত না। এ ভূমণ্ডলের নিকটবর্তী স্তরে এমন সব খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ করে দেওয়া হয়েছে, যা উদ্ভিদ, জীব-জন্তু ও মানুষের জীবনের জন্য একান্তই অপরিহার্য। পৃথিবীর যে অংশেই এসব দ্রব্যের অভাব, সেখানকার যমীন কোন জীবের জীবন ধারণের জন্য যোগ্য হয় না। এ ভূলোকের উপর সমুদ্র নদ-নদী, খাল, ডোবা, ঝর্ণা ও ভূগর্ভস্থ ফল্গুধারায় পানির অজস্র প্রস্রবণ সঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। পর্বতচূড়ায় পানির জমানো সঞ্চয় এবং তা গলিয়ে চারদিকে প্রবাহিত করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা ছাড়া এখানে জীবের অংকুরিত হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এভাবে মানুষ বসবাসের জন্য সামঞ্জস্য বিধান করে দেওয়া হয়েছে। আকাশকে ছাদের ন্যায় সৃষ্টি করে যমীন থেকে পবিত্র খাদ্য সংগ্রহের কি সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

– মাওলানা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা নামল-এর ৭৪ নং টীকা অবলম্বনে

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)-এর তফসীরে একই ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে।

তিনি এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ মানুষের আকৃতিকে আল্লাহ্ তা'আলা সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্তু ও শিল্পসামগ্রী তৈরী করে নিজের সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। তার পানাহারও সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র। জন্তু-জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাতের

www.pathagar.com

সাহায্যে আহার করে। সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা খায়। কিন্তু মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু, ফলমূল, তরি-তরকারি মাংস ও মসলা দ্বারা মুখরোচক ও স্বাদযুক্ত করে খায়। এক এক ফল দ্বারা রকমারি খাদ্য-আচার, মুরব্বা ও চাটনী তৈরী করে খায়।

– মা'আরেফুল কোরআন, ৭ম খণ্ড, ৬৭৬ পৃষ্ঠা

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এ পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর বসবাসের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং নিরাপদ স্থানরূপে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত দিক ও এলাকায় আলো-বাতাস ও তাপের এমন সুষম ব্যবস্থাপনা করেছেন যে, তা মানুষ ও জীবজন্তুর জীবন ধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আলো-বাতাস ও তাপের অভাবে মানুষ ও প্রাণীকুলের জীবন ধারণ অসম্ভব না হয়ে পড়ে তার সার্বিক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার এ সৃষ্টি কৌশলের মধ্যে কোনরূপ গলদ বা ত্রুটি কোনরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়ও লক্ষিত হয়নি। আকাশকে ছাদ করার কথা বলা হয়েছে। একথাও ধ্রুব সত্য। এ ছাদ দৃশ্যমান না হলেও, ছাদের যে কাজ ছাদের নীচের স্থানকে উপরের রৌদ্র-বৃষ্টি তাপ ইত্যাদির মত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা, সে কাজ পৃথিবীর উপরে অদৃশ্য ছাদ খুব ভালভাবেই করছে। পৃথিবীকে তথা পৃথিবীর সব প্রাণীকে পৃথিবীর বাহির থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্তু, আলোক-রশ্মি ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার অতি সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে, সৌরমণ্ডলের ঐ অদৃশ্য ছাদ দ্বারা।

এরপরেই মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তাঁদেরকে যে আকৃতি দান করা হয়েছে, তা অতি সুন্দর আকৃতি। এ সুন্দর আকৃতির কথাটিও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু দেখতে সুন্দর আকৃতি বহু পশু-পাখীরও আছে। কিন্তু তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এমন কাজ করা যায় না, যা মানুষ তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা করতে পারে। মানুষের দেহে এমন শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের মন-মগজে এমন জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দেওয়া হয়েছে, যদ্বারা সে মনুষ্য সমাজ এবং প্রাণীকুলকে পরিচালিত করতে পারে। এজন্যই মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি করে পাঠান হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ যেসব কাজ পছন্দ করেন, মানুষকে সেই সব কাজই করা উচিত। এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে আল্লাহ্ পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর জীবকুলকে নৈসর্গিক সব বিপদ-আপদ

www.pathagar.com

ধ্বংসকারী শক্তির হাত ও কবল থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষকেও এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত এবং যে সমস্ত কাজ ও শক্তি মনুষ্য সমাজ ও জীবকুলের অনিষ্ট সাধন করতে পারে বা তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে সে ধরনের কাজ ও শক্তিকে বাধা প্রদান বা প্রতিহত করা মানুষের অন্যতম কর্তব্য কাজ। এজন্য সহায়-সম্বলহীন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে সাহায্য প্রদান করা সক্ষম মানুষেরই কাজ। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছিলেন, সহায়-সম্বলহীন ইয়াতীমদের অভিভাবক তিনি নিজে। খলীফা উমর (রা.) ঘোষণা করেছিলেন, "সদর ফোরাতের কিনারেও যদি একটা কুকুরও খাদ্য-পানীয়ের অভাবে কষ্ট পায়, তবে সেই দায়িত্ব তাঁর নিজের।" আসল কথা, বিশ্ব সমাজের প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য-পানীয় এবং জীবন ধারণের অন্যান্য সব উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা মানুষকেই করতে হবে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত যেসব রিযিক ও উপায়-উপকরণ আছে, বিশেষ করে প্রাণীকুলের জন্য তা কিছুতেই নষ্ট করা যাবে না।

আলোচ্য আয়াতে পরিচ্ছন্ন অর্থাৎ পবিত্র রিযিকের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে এর আগে অনুরূপ অন্যান্য আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে। গুণগত দিক থেকে মানুষের খাদ্য পবিত্র হতে হবে। পবিত্র খাদ্য মাত্রই উত্তম এবং তা মানুষের শরীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে উপার্জনের দিক থেকে রিযিক পবিত্র হতে হলে তা হালাল বা বৈধ পন্থায় উপার্জন করতে হবে– হারাম বা নিষিদ্ধ পন্থায় নয়। হালাল পন্থায় উপার্জিত রিযিক সব রকম শোষণ ও জুলুমমুক্ত এবং এরূপ উপার্জন সমাজে কোনও রূপ নির্যাতন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। উপসংহারে বলা যায়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁরই সৃষ্ট বিশ্ব ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য নৈসর্গিক ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে যে মানবীয় ব্যবস্থা করেছেন, তার যথাযথ অনুসরণই মনুষ্য সমাজ ও প্রাণীকুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা।

- নূর হোমাম্মদ আকন
এবং
শামসুল আলম খান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা শূরা

لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

আকাশসমূহ ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সেসবের কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। আর তিনি সমুন্নত ও মহান। **– সূরা শূরা ঃ ৪**

শব্দ টীকা

السموات বহুবচন سماء একবচন। সাধারণ অর্থ আকাশ। তবে প্রকৃতপক্ষে যা কিছু ঊর্ধ্বালোকে রয়েছে সে সবকে سماء বলা হয়।

তফসীরে কবীর মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর
ব্যাখ্যা থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৯২৫

তাফসীর

এ আয়াতে জগতের যাবতীয় বস্তুর উপর আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্ব ও মালিকানার উল্লেখ রয়েছে এবং তিনি যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তা বলা হয়েছে। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এ কথা প্রমাণ করা যে, কর্তৃত্ব মালিকানা, মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ নেই। সুতরাং ইবাদত ও আনুগত্যেও কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।

মাওলানা দরিয়াবাদীর ব্যাখ্যা ও মা'আরেফুল কোরআন অবলম্বনে
– পৃষ্ঠা ৯২৫ ও ৬৭০

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় এ ধরনের আয়াত রয়েছে। যেমন সূরা বাকারার

www.pathagar.com

২৮৪ নং আয়াতে রয়েছে ঃ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ সূরা হাদীদের প্রথম ও ২য় আয়াতে রয়েছে ঃ سَبَّحَ لِلّٰهِ .... وَالْاَرْضِ উক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এসব আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য একটিই এবং তা হ'ল ঃ জগতের যাবতীয় বিষয়-সম্পদের প্রকৃত মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র। মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না বলে সে সম্পদের একচ্ছত্র ও নিরংকুশ অধিপতি হতে পারে না। সুতরাং সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মানুষের ক্ষমতা সীমাহীন হতে পারে না। বরং এ ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মুতাবিক দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মানুষের আয়ত্তে আসা বিষয়-সম্পদের ভোগ-ব্যবহার আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা এবং আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ীই হতে হবে।

- হাফেজ মোঃ আবু জাফর

www.pathagar.com

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। তিনি সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। – সূরা শূরা ঃ ১২

তাফসীর

আল্লাহ্ই জগতের যাবতীয় ধন-সম্পদের মালিক। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কারো পক্ষে কোন কিছুর অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। তিনিই প্রত্যেকের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি কাউকে বেশী দান করেন এবং কাউকে কম দান করেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ বলে কার জন্যে কোন্টা এবং কতটা উপযোগী তা ভালভাবেই জানেন।

– আল্লামা ইউসুফ আলী ও সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ১৩০৮

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ ধরনের আয়াত পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায় রয়েছে। যেমন সূরা রাদের ২৬ নং এবং সূরা কাসাসের ৮২ নং আয়াত এবং সূরা যুমারের ৫২ নং আয়াত। এসব আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এই যে, ধন-সম্পদ অর্জন ও বন্টনের বিষয়টি একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় নিয়ন্ত্রিত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিধারা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মানুষকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা অতি সীমিত। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আল্লাহ্র হাতেই নিহিত। তাই ধন প্রাপ্তির কারণে গর্বিত এবং ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার দরুন হতাশ না হয়ে মানুষের কর্তব্য হলো তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাওয়া

www.pathagar.com

অর্থাৎ যে বেশী সম্পদের অধিকারী তার কর্তব্য হলো কম সম্পদ প্রাপ্তদেরকে তার সম্পদে নিহিত তাদের অংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা, কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ তাদের সম্পদে বঞ্চনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। আর বঞ্চিতদের উচিত তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচানো এবং উভয় পক্ষের মাঝে সুন্দর ও সুসম্পর্ক নিশ্চিত করার মতো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য।

- হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর

www.pathagar.com

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ.

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। – সূরা শুরা ঃ ১৯

শব্দ টীকা

لطيف এমন সদাশয় ও দয়ালু তিনি সবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং সেই মুতাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর মূল অর্থ সূক্ষ্ম! অর্থাৎ আল্লাহ্ সূক্ষ্মভাবে তার বান্দাদের প্রয়োজন পূরণ করেন।

তাফসীর

আল্লাহ্ পাকের দয়া ও করুণার দ্বার বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সব রকম বান্দার জন্য খোলা। এ কারণে তাঁর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং তাঁর সাথে শরীককারী সবাইকে তিনি জীবিকা দান করেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। যাকে যা ইচ্ছা তা দান করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম। তবে তাঁর দান একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা মুতাবিক হয়ে থাকে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি কাউকে কম সম্পদ দেন আবার কাউকে বেশী সম্পদ দান করেন। – আল্লামা ইউসুফ আলী ও সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ১৩১১

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আলোচ্য সূরায় ১২ নং আয়াতের অনুরূপ।

তবে দুটি আয়াতেই একটা মূল কথার উল্লেখ থাকা উচিত। তা হলো ঃ সম্পদশালী লোকেরা সাধারণত মনে করে তার সম্পদ সে-ই তার বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে অর্জন করেছে। তা আল্লাহ্র দান বা অনুগ্রহ নয়। সুতরাং তার সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের ইখতিয়ার তারই। একথা ঠিক নয়। আল্লাহ্ই অনুগ্রহ করে তাকে সম্পদ দিয়েছেন, সুতরাং সে সম্পদের ভোগ ব্যবহার আল্লাহ্র বিধান মুতাবিকই হওয়া উচিত।

২৮,২৯ নং আয়াতগুলোতে সরাসরি আর্থ-সামাজিক বিষয় সামান্য কিছু থাকলেও আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু অন্যান্য অনেক জায়গায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

- হাফেজ মোঃ আবু জাফর

www.pathagar.com

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا. اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছে তিনি কন্যা সন্তান আর যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা–উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছে করে দেন বন্ধ্যা। বস্তুত তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। – সূরা শূরা ঃ ৪৯-৫০

শব্দ টীকা

عقيما বন্ধ্যা, অনুর্বর, এমন বস্তু যা থেকে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না।

– সাফওয়াতুল বয়ান, পৃষ্ঠা ৬১৯

তাফসীর

এ আয়াতগুলোতে সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্ পাকের একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। জগতের সবকিছুর চূড়ান্ত অধিপতি রূপে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দান করেন আর যাকে যা ইচ্ছা তা থেকে বঞ্চিত করেন। সৃষ্টির এ সাধারণ ধারার আওতায় মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি সমভাবে ক্ষমতাবান। এখানে তিনি মানুষকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। কোন মানুষ বা পরিবার এমন রয়েছে, যাদেরকে শুধুমাত্র কন্যা সন্তান দান করা হয়, কোন কোন ব্যক্তি রয়েছে যাদেরকে শুধু পুত্র সন্তান দেওয়া হয়। আবার অন্য কাউকে পুত্র ও কন্যা–উভয় দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে কোন কোন ব্যক্তি বা পরিবারকে সন্তান থেকেই বঞ্চিত করেন। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা অন্য কারো কোন হাত নেই।

অবশ্য একদিকে তিনি যেমন ক্ষমতাবান অন্যদিকে তেমনি সর্বজ্ঞ। তাই এ সব কিছু তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা মুতাবিক করেন, বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ২৮২; আল্লামা ইউসুফ আলী, পৃষ্ঠা, ২৮৩, ১৩২০-২১ অবলম্বনে

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

একটি দেশে ও সমগ্র পৃথিবীতে জনসংখ্যার বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ নারী পুরুষের সংখ্যা সাম্য। জনসংখ্যার আকার এবং নারী পুরুষের আনুপাতিক হার দিয়ে একটি সমাজের শ্রমের যোগান ও চাহিদার প্রকৃতি নির্ণীত হয়। তদুপরি এর সাথে আরো অনেক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় জড়িত। জনসংখ্যা ও নারী-পুরুষের আনুপাতিক হারের ভারসাম্য বজায় না থাকলে সমাজে নানা রকম বিপর্যয় দেখা দেয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য আধুনিককালে অনেক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এসব মতবাদভিত্তিক গৃহীত পদক্ষেপ সাময়িকভাবে এক্ষেত্রে কিছুটা হেরফের ঘটাতে সক্ষম হলেও চূড়ান্তভাবে এ ভারসাম্য রক্ষিত হয় আল্লাহ্ পাকের অদৃশ্য পরিকল্পনা মুতাবিক। এ প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিপরীত কিছু করতে গেলে বিপর্যয় অনিবার্য।

অতীতকালে কন্যা সন্তান হলে সেটাকে অকল্যাণকর মনে করা হতো। এ প্রবণতা বর্তমানেও বিভিন্ন সমাজে দেখা যায়। কোথাও কোথাও ভ্রূণ হত্যার মাধ্যমে সন্তান ও বিশেষ করে কন্যা সন্তান হত্যার মতো অপরাধমূলক তৎপরতাও পরিলক্ষিত হয়। এসবই উক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থের আলোকে নিন্দনীয়। কেননা এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত ভারসাম্য পরিবর্তনের একটা অশুভ পদক্ষেপ বলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। বিভিন্ন দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করলে এ সত্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

- হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা যুখরুফ

اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ. وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ.

যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য করেছেন শয্যা এবং তাতে তোমাদের চলবার পথসমূহ তৈরী করেছেন যেন তোমরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পার। আর যিনি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে বারি বর্ষণ করেন এবং যা দিয়ে নির্জীব ভূখন্ডকে সঞ্জীবিত করি আমরা! এভাবেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। আর যিনি সমস্ত কিছু যুগলরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তৈরী করেছেন তোমাদের জন্য জলযান ও এমন সব জন্তু-জানোয়ার যার ওপর তোমরা সওয়ার হয়ে থাক। – সূরা যুখরুফ ঃ ১০-১২

শব্দের ব্যাখ্যা

مهدا বিছানা, শয্যা। سبلا চলার পথ, অথবা জীবিকা. অর্জনের পন্থাসমূহ-বহুবচন-একবচন ঃ سبيل ا بقدر পরিমিতভাবে, প্রয়োজন ও চাহিদা মুতাবিক।

فاحيين فنشرناب সঞ্জীবিত করা, জীবন দান করা, উর্বরা করা।

بلدة ميتيه মৃত ভূমি অর্থাৎ এমন ভূমি, যেখানে গাছপালা নেই।

–সাফওয়াতুল বয়ান, লিমাআনীল কুরআন, পৃষ্ঠা ৬২০-৬২১, তৃতীয় সংস্করণ

www.pathagar.com

তাফসীর

সূরা যুখরুফ মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ পাক অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবী-রাসূলদের সঙ্গে যে কিরূপ আচরণ করা হতো এবং পরিণামে তারা যে ধ্বংসের সম্মুখীন হতো তার বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর এক মহাসত্যের অবতারণা করে বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসিগণ আসমান, যমীন ও অন্যান্য বস্তুর স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্‌কে মেনে নেওয়ার পরও তাঁর সাথে শিরক করে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়। এ প্রসঙ্গে মানুষের জন্য আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যেসব নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তার কয়েকটি এ আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য মাটিকে শয্যাস্বরূপ বানিয়ে সেখানে মানুষের জন্য সহজ চলার পথ তৈরী করেছেন, যেন মানুষ নিজের গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারে। বস্তুর এ পৃথিবীকে স্থিতিশীল রেখে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখার জন্য আল্লাহ্ পাক নানা রকম প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রেখেছেন। আর তিনি প্রয়োজনমতো পরিমিতভাবে বৃষ্টি দিয়ে অনুর্বর ভূমিকে উর্বরা করে সেখানে শস্য ফলাবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করেন। বৃষ্টি একেবারে না হওয়া যেমন বিপজ্জনক তেমনি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতও বেশ ক্ষতিকর। সেজন্য আল্লাহ্ পাক পরিমিত বৃষ্টি দান করেন। আর এ বৃষ্টিই যাবতীয় উৎপাদনের ভিত্তি। আর আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক প্রাণী ও বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির ধারা বজায় রাখার জন্য। এসব সাধারণ নিয়ামত দ্বারা আল্লাহ্ পাক বিশেষ নিয়ামত রূপে জলযান ও বিভিন্ন যানবাহন তৈরীর কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টির আদিতে তাঁর ক্ষমতার আলোকে সৃষ্টির অনন্তেও তাঁর সমান ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন।

এ আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য হলো আল্লাহ্‌র ওয়াহ্‌দানিয়াত বা একত্ব যুক্তি দিয়ে বোঝানো অর্থাৎ যিনি এমন ক্ষমতাধর যে জগতে সৃষ্টি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তিনিই করছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ কেমন করে ইবাদতের যোগ্য হতে পারে। তদুপরি যিনি মানুষকে এত সব নিয়ামত দান করেছেন, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞতা।

–সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীর অবলম্বনে, পৃষ্ঠা ২৮৫, ৩য় খণ্ড, ৭ম সংস্করণ

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

কুরআন মজীদের বহু জায়গায় এ ধরনের আয়াত রয়েছে। এসব আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য যদিও শিরকের ভ্রান্তির বিপরীতে তওহীদের অকাট্যতা তুলে ধরা, তবুও এসব আয়াত থেকে একটি মৌলিক অর্থনৈতিক দর্শন বেরিয়ে আসে। আর সেটি হলো এ যে, মানুষ বস্তু, দ্রব্যরাজি ও সম্পদের স্রষ্টা নয় বলে সে এসবের একচ্ছত্র ও নিয়ন্ত্রণহীন ভোক্তা এবং ব্যবহারকারীও হতে পারে না। সম্পদের উৎপাদন তথা উপযোগ সৃষ্টি, উপার্জন, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে মানুষকে অবশ্যই স্রষ্টার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। যেসব নিয়ম-নীতি ও বিধিমালার মাধ্যমে এ নির্দেশ পালন করা সম্ভব, তাই ইসলাম তথা ইসলামী অর্থনীতি।

অন্যদিকে যেহেতু একমাত্র সম্পদের স্রষ্টাই বলতে পারেন কোন্ পথে এর ব্যয় কল্যাণকর হবে তাই তাঁর নির্দেশিত পথের বাইরে সম্পদের ব্যবহার সমাজ, জাতি ও জগতের জন্য ধ্বংস ও অকল্যাণ ডেকে আনবে।

তদুপরি সম্পদের প্রকৃত অধিকারী মানুষ নয় বলে এর বেশী বা কম হবার সাথে মানুষের মর্যাদা বাড়া বা কমার কোন সম্পর্কও থাকতে পারে না। সম্পদ বেশী হলে আল্লাহ্‌র নিয়ামত মনে করে শোকর আর কম হলে তার পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে সবর করাই মানুষের উচিত।

অবশ্য একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, ১০ নং আয়াতে মানুষের জীবনে মাটি ও ভূমির গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। বস্তুর ভূমি উৎপাদনের একটি অন্যতম মৌলিক উপাদান হওয়া ছাড়াও নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে مهدا অর্থাৎ শয্যা ও سبلا অর্থাৎ পথ-এর উল্লেখ করে বসবাস ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাটি ও ভূমির ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

আর ১১নং আয়াতে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বৃষ্টির উপকারিতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে بقدر বা পরিমিতভাবে কথাটি উল্লেখ করে অতিবৃষ্টির অপকারিতার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে "তোমাদেরকেও এভাবে পুনরুত্থিত করা হবে" ইসলামের দৃষ্টিতে যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মকাণ্ড যে একই সূত্রে গ্রথিত সে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১২ নং আয়াতে মানব জীবনে যানবাহনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আর এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে- যানবাহন দু'রকম হতে পারে- প্রাকৃতিক যেমন জন্তু-জানোয়ার এবং মানুষের হাতে গড়া যেমন নৌকা অথবা বর্তমান যুগের গাড়ী, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। অবশ্য একথা প্রণিধানযোগ্য- নৌকা ইত্যাদি মানুষের হাতে গড়া হলেও মূল উপাদান কাঠ যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত সেজন্য সেটাও প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সৃষ্টি। এভাবে যাবতীয় বস্তুই আল্লাহ্র সৃষ্টি- সেটার আকার ও প্রকার যে রকমই হোক না কেন।

- হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর

www.pathagar.com

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ. وَلَوْلَا
اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ. وَلِبُيُوْتِهِمْ
اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ وَزُخْرُفًا وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ.

এসব লোক কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি এবং একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; আর তারা যা জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। আর সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ একদলভুক্ত হয়ে পড়বে– এ আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহ্‌কে যারা অস্বীকার করে তাদের ঘরের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ দিতাম ও সিঁড়ি, যাতে তারা আরোহণ করে। আর দিতাম তাদের ঘরের জন্য রৌপ্য নির্মিত দরজা এবং বিশ্রামের জন্য খাট এবং স্বর্ণের নির্মিত, আর এ সবই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার আর মুত্তাকী লোকদের জন্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ।

– সূরা যুখরুফ ঃ ৩২-৩৫

শব্দ টিকা

رحمة অর্থ অনুগ্রহ – এটা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারে হতে পারে। এখানে আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ তথা নবুয়ত বোঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

তাফসীর

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে– অবিশ্বাসিগণ বলাবলি করত যে, এ নবূয়ত কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে দেওয়া হলে বেশী করে মানানসই হতো।

উত্তরে আল্লাহ্ পাক জানালেন যে, নবূয়তের বিষয়টি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমতের ব্যাপার। এর বন্টন অর্থাৎ কার উপর এ অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ বলতে পারে না। বস্তুত আধ্যাত্মিক করুণা বন্টনের ক্ষেত্রে মানুষের কোন হাতই নেই, আর পার্থিব জীবিকা বন্টনের ক্ষেত্রে মানুষের যে ক্ষমতা রয়েছে বলে সে মনে করে, তাও খুবই সীমিত। এখানেও আল্লাহ্র ইচ্ছাই চূড়ান্ত। সেজন্য দেখা যায় যে, তিনি একজনকে আরেকজনের উপর ক্ষমতাবান করে দেন, যেন সে তার অধীনস্থ ব্যক্তিদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর মানুষ যে অর্থ ও ক্ষমতার লোভে দিশেহারা হয়ে ছুটে, আল্লাহ্র নিকট তার মূল্য খুবই সামান্য।

আল্লাহ্র নিকট স্বর্ণ-রোপ্য ইত্যাদি পার্থিব ধনসম্পদের কোন গুরুত্ব নেই বলে তিনি এমন ব্যক্তিকেও এসবের মালিক বানান। যে তাঁকে অস্বীকার করে, সুতরাং ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার মানে কখনো নেক ও সৎ লোক হওয়া নয়। তবে আল্লাহ্ এমন কাউকে অঢেল সম্পদের অধিকারী করেন না বরং এক্ষেত্রে কিছু তারতম্য করেন। কেননা তা নাহলে লোকজন দীন-ধর্মের কথা মোটেই শুনতে চাইবে না বরং যাবতীয় আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ত্যাগ করে সম্পদের পেছনে দৌড়াতে থাকবে।

– সাফওয়াতুল বয়ান, পৃষ্ঠা ৬২৩-২৪,
– সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ২৮৯ ও আল্লামা ইউসুফ আলী
কৃত দি গ্লোরিয়াস কুরআন, পৃষ্ঠা ১৩৩০-৩১

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতসমূহ হতে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে পার্থিব জগতের ধনসম্পদ আল্লাহ্র নিকট একেবারে গুরুত্বহীন এর অধিকারী হওয়া যেমন মানসম্মান বা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হবার ইঙ্গিতবাহী নয়, তেমনি এসব থেকে বঞ্চিত হওয়াও আল্লাহ্র বিরাগভাজন এবং মর্যাদাহীনতার প্রতীক নয়। বরং ইসলামী সমাজে মান-মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া। পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, যিনি সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী। – সূলা হুজুরাত ঃ ১৩

www.pathagar.com

অবশ্য আখিরাতের সাথে তুলনামূলক বিচারে (Comparative Sense) পার্থিব সম্পদের কোন মূল্য না থাকলেও (absolute sense) এ জগতে বাঁচার অবলম্বন হিসেবে এর একটা মূল্য ইসলাম অবশ্যই স্বীকার করে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসেও এতটুকু প্রয়োজনীয়তা বিভিন্নভাবে স্বীকৃত। যেমন সূরা জুমাতে নামাযের পর জীবিকা অর্জনের জন্য ছড়িয়ে পড়তে যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে فضل الله। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলে জীবিকাকে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কথায় লক্ষ্য ও ভিত্তি হিসেবে সম্পদ মূল্যহীন কিন্তু উপকরণ হিসেবে মূল্যবান। আর ধনসম্পদ অর্জনের যেসব নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো যারা সঠিকভাবে অবলম্বন করবে, তারা এর অধিকারী হবে। সুতরাং মুসলমান হলে সম্পদ বেশী হবে এবং অমুসলমান হলে তা কম হবে– এ রকম গ্যারান্টি ইসলাম দেয় না।

তবে সম্পদ অর্জন ও বন্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এ ইনসাফ মানে কখনো এ নয় যে, প্রত্যেকেই সমান অংশ পাবে। কেননা absolute equality বা শতকরা একশত ভাগ সাম্য প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব নয়। বরং এর অর্থ সকলের সমান সুযোগ ও অধিকারের নিশ্চয়তা। 'সমান অধিকার' ও 'সমান অংশ' এক কথা নয়। সমান অধিকারের নিশ্চয়তার অর্থ হলো প্রত্যেক ব্যক্তি যেন মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ভোগ করতে পারে। এসব সুযোগ-সুবিধা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যেন কুক্ষিগত করতে না পারে। এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যে সম্পদ অর্জিত হবে, তার পরিমাণ সবার জন্য সমান নাও হতে পারে। আর এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। এর বিপরীত যেসব নিয়ম চালু করার চেষ্টা করা হয়েছিল, প্রকৃত ও স্বভাব-বিরুদ্ধ বলে তা অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। আলোচ্য সূরার ৩২ নং আয়াতে একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলে এ সত্যই তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রাধান্য ব্যক্তিগত গুণাবলী, তথা বুদ্ধি-জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে। এসব গুণের কারণে একজন মানুষ অন্য আর একজনের চেয়ে বেশী সম্পদ ইত্যাদি আহরণ করতে পারে। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যকে উৎসাহিত করে। বরং ইসলামী সমাজ কাঠামো এমনভাবে গঠিত যে, এখানে সীমাহীন বৈষম্য জন্মলাভ করার কোন অবকাশই থাকে না। কারণ, অর্জিত সম্পদের ভোগ-ব্যবহারে আল্লাহ্‌র বিধানে এমন সব আদেশ-নিষেধ রয়েছে, যাতে অর্জিত সম্পদের উপর অর্জনকারীর নিরঙ্কুশ ভোগ-দখলের অধিকার থাকে না।

- হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা দুখান

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ. مَا خَلَقْنٰهُمَا
اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ.

আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। – সূরা দুখান ঃ ৩৮-৩৯

সাধারণ আলোচনা

সূরা দুখান মক্কাতে নাযিল হয়। এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক পৃথিবীকে অকারণে সৃষ্টি করেননি। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী উদ্দেশ্যমূলকভাবে যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথাটি কুরআনে আরো বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ "তিনিই সত্যতা সহকারে (বিল হক) পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন।"

সূরা ইউসুফে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ এসব (সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি) নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।" – আয়াত ৫

সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ "আকাশ ও পৃথিবী ও উহার মধ্যবর্তী কোন কিছু আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।" – আয়াত ১৫

সূরা আল-মু'মিনুনে বলা হয়েছে ঃ "তোমারা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?" – আয়াত ১১৫

www.pathagar.com

সূরা রুম-এ বলা হয়েছে ঃ "তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছু সত্য ভিন্ন অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করেনি।" – আয়াত ৮

এ সমস্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় সৃষ্টির সব কিছু যথাযথ কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এটি ইসলামী চিন্তার একটি মৌলিক দিক এবং এটিই অতীব সত্য কথা।

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ "বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদঘাটন করে। উদাহরণত– এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ যে মহাশক্তি এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি নিশ্চয়ই এগুলিকে ধ্বংস করে পুনরায় অস্তিত্বে আনতে পারেন। এগুলির মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ পরকালের প্রতিদানের ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ড কারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এরপর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া। অন্যথায় সৎ ও অসৎ –উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহ্র মাহাত্ম্যের পরিপন্থী।"

– মা'আরেফুল কোরআন, সূরা দুখানের তাফসীর অংশ দ্রষ্টব্য

মাওলানা মওদূদী লিখেছেন, "ইহার তাৎপর্য এ যে, যে ব্যক্তিই মৃত্যুর পরের জীবন ও পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারের কথা অস্বীকার করে, সে আসলে এ বিশ্বলোককে একটি খেলনা ও ইহার সৃষ্টিকর্তাকে অবুঝ বালক মনে করে। এ কারণে সে এ মত দাঁড় করিয়েছে যে, মানুষ দুনিয়ার সব রকমের হুড়-হাঙ্গামা করে একদিন এমনি মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে। প্রকৃত ব্যাপার এ যে, এ দুনিয়া জাহান কোন খেলোয়াড়ের খেলার সৃষ্টি নহে বরং এক মহাবিজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার এক মহানির্মাণ। আর কোন বিজ্ঞানীই অর্থহীন নিষ্ফল কাজ করতে পারে– তা ধারণা করা যায় না।

– তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখানের ৩৪ নং টীকা

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াত দু'টি মানব জীবনের জন্য একটি মৌলিক দর্শন দান করেছে। এ দু'টি আয়াত যে মহাসত্যের কথা যোজন করছে, তা কেউ যথাযথভাবে বিশ্বাস করলে সে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। সে হয়ে উঠবে স্রষ্টা ও পরকালে

www.pathagar.com

গভীর বিশ্বাসী এবং যে স্রষ্টা ও পরকালে গভীর বিশ্বাসী হবে, তার আচরণ অন্যের মতো হবে না। সেসব কিছু করার সময় পরকালের কথা ও সৃষ্টির নিকট তার জবাবদিহির কথা মনে করবে। তার উপযোগের (utility) ধারণা কেবল এ দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পরকালের কল্যাণকেও সে উপযোগী (utility) বলে গণ্য করবে। সে দুনিয়াতে কম পেলেও বা কষ্ট স্বীকার করতে হলেও সত্যের খাতিরে তা মেনে নেবে। সুতরাং ইসলাম যে নৈতিকতা ভিত্তিক অর্থনীতির পরিকল্পনা করেছে, তার জন্য এ ধরনের ব্যক্তি হওয়া একান্ত অপরিহার্য– তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সামাজিক জীবনেও এ ব্যক্তি দায়িত্বশীল হবে এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে– তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আর-রহমান

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ. اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ. وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ.

তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য, যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর, আর তোমরা ন্যায্য ওজনের মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না। – সূরা আর-রহমান ঃ ৭-৯

শব্দের ব্যাখ্যা

الميزان। অর্থাৎ ন্যায়দণ্ড অথবা পাল্লা। القسط। ন্যায় ও সঠিক।

তাফসীরকারদের আলোচনা

মদীনায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের এ সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সূরার প্রথম দিকে মানব সৃষ্টি এবং মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন সৃষ্টিগত নিয়ামত যথা বাকশক্তি, শিক্ষা ইত্যাদি এবং আকাশ ও পৃথিবীর অন্যান্য নিয়ামত ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, জগতে সৃষ্টিগত দিক দিয়ে যেমন ভারসাম্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তেমনি সামাজিক দিক দিয়েও এখানে ভারসাম্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্তভাবে কাম্য। এ প্রসঙ্গে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে ওজন ও পরিমাপের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কথায় শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলেই চলবে না বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আয়াতগুলোতে উল্লিখিত 'মিযান' যে ব্যাপক অর্থের ইঙ্গিতবাহী– এ সত্য সূরা হাদীসের ২৫ নং আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ-

আমরা সুস্পষ্ট নির্দশনাবলীসহ অনেক রাসূল পাঠিয়েছি আর নাযিল করেছি তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়দণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এখানে 'কিতাব' ও 'মিযান' একত্রে উল্লিখিত হওয়ায় মিযানের অর্থ পাল্লার চেয়ে ন্যায়দণ্ড হিসেবেই অধিক প্রযোজ্য। অতএব আলোচ্য আয়াতসমূহেও এসব শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

–সাফওয়াতুল বয়ান ও সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীরের
সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর অবলম্বনে

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সাথে সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের উল্লেখ করাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যায় ও অবিচারের ফলে শুধু তাৎক্ষণিক ভোগান্তিই হয় না বরং এসবের পরিণামে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ী অশান্তিও নেমে আসে।

আয়াতগুলোতে উল্লিখিত অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা শু'আরার ১৮১-৮৩ এবং সূরা মুতাফ্ফিফিনের ১-৩ নং আয়াতসমূহের আলোচনায় পাওয়া যাবে।

- হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মূলক

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ. ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ. اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ.

তিনিই তো তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। আর তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন না, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে– নাকি তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে,আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল (আমার) সতর্কবাণী। সূরা মুলক ঃ ১৫-১৭

কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা

ذلولا আভিধানিক অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না, তাকে ذلول বলে। এখানে সুষম ও সুগম ভূপৃষ্ঠকে বোঝানো হয়েছে। مناكب শব্দটি منكب এর বহুবচন। অর্থ কাঁধ। আবুদ দারদা (রা.)-এর মতে, সুউচ্চ গিরিপথ ও পর্বতাঞ্চলকে কাঁধ করা হয়েছে। – ইবনে কাসীর

www.pathagar.com

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেছেন ঃ "আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য এমন বশীভূত করে দিয়েছি যে, তোমরা তার কাঁধে চড়ে অবাধে বিচরণ করতে পার। মহান আল্লাহ্ ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হতো না। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ দালানের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়। এরপর আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রফতানী আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক লাভের দরজা। اليه نشور। বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ্র আযাব আসতে পারে অর্থাৎ যদিও আল্লাহ্ ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদের গ্রাস করে নেবে। পরবর্তী আয়াতেও আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি বর্ষণের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা করা দরকার।

– মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৬১৬-৬১৭, অষ্টম খণ্ড

মাওলানা মওদূদী লিখেছেন, এই পৃথিবী আপনা-আপনিই তোমাদের অধীন হয়ে যায়নি। তোমরা যে রিযিক ভোগ ও ব্যবহার কর, তাও এখানে স্বতঃই তৈরী হয়ে যায়নি। এসবকিছুই মহান আল্লাহ্ স্বীয় কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতে এমনভাবে বানিয়েছেন যে, এর ফলেই এখানে তোমাদের জীবন চলতে পারছে এবং বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে। আল্লাহ্ এ বিরাট ভূলোক এমন শান্ত ও ধীরস্থির করে রচনা করেছেন যে, তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারছ। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে এই পৃথিবীকে তোমাদের জীবনের উপযোগী বানানোয় এবং এখানে রিযিকের অথৈ সম্ভার একত্রিতকরণের মূলে কত যে গভীর সূক্ষ্ম কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতা নিহিত রয়েছে তা তোমরা সহজেই জানতে ও উপলব্ধি করতে পার।

www.pathagar.com

এই পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থিতি-স্থিতি ও তোমাদের শান্তি নিরাপত্তা প্রতি মুহূর্তেই মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তোমরা এখানে যে স্বাদে, আনন্দে-স্ফূর্তিতে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করছ তা নিজেদের ক্ষমতা বলে নয়। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে প্রলয়ংকারী ভূকম্পনের সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে এ ভূতল তোমাদের জন্য মাতৃক্রোড় না হয়ে সমাধি গহবর হয়ে যেতে পারে।

–তাফহীমুল কুরআন, ২৩ ও ২৬ নং টীকা অবলম্বনে ; সূরা মুলক

আল্লামা ইবন কাসীর লিখছেন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহ দ্বারা মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে,অনেক কিছুর মধ্যে ভূপৃষ্ঠকেও তিনি মানুষের বশীভূত ও অধীনস্থ করে দিয়েছেন। একে এমন স্থির ও নিশ্চল করেছেন যে, তা অহরহ প্রকম্পিত হচ্ছে না। তাতে পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণা ও গিরিপথ সৃষ্টি করেছেন, ফলফুলে ও শস্যদানায় ভরপুর করেছেন। সুতরাং তাতে তোমরা ভ্রমণ করো, বিভিন্ন অঞ্চলে ও মেরুতে পর্যটন করো, উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপদেশে যাতায়াত করো। জেনে রেখো, তোমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। এ চেষ্টা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়। বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে রিযিক অন্বেষণে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا এর কাঁধে আরোহণ কর অর্থাৎ আবুদ-দারদার মতে পাহাড়-পর্বতে ভ্রমণ কর, রিযিক অন্বেষণ কর।

পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে ভূমিধ্বস ও পাথর বৃষ্টি বর্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ মানুষকে নিশ্চিন্ত বসে থাকতে নিষেধ করেছেন। এবং পরোক্ষভাবে জানিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ্র সৃষ্টিকুশলতা ও মানুষকে এসব আযাব দিয়ে যে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন, এ নিয়ে যেন তারা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে। আরও বলা হয়েছে যে, পরকাল সম্পর্কে যেন তারা উদাসীন না হয়ে পড়ে।

–তফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৭-৯৮ অবলম্বনে

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এখানে পৃথিবীর গঠনশৈলী, কেন তাকে এভাবে তৈরী করা হলো এবং মানুষের করণীয় কি ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এটি দৃশ্যমান সত্য যে, পৃথিবীর উপরিভাগ অর্থাৎ ভূ-ত্বক খুব কঠিন নয়, আবার অত্যন্ত কোমলও নয়। পৃথিবীর এই গঠনশৈলী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন যে, পৃথিবীকে মানুষের চলাচলের উপযোগী করার জন্যই তিনি একে এভাবে তৈরী করেছেন।

www.pathagar.com

পৃথিবীর উপরিভাগের এই বিশেষ গঠনের কারণে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতে পারছে। ভূপৃষ্ঠে উৎপন্ন হচ্ছে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী ও পণ্য, যা থেকে মানুষ তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে। আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে ভ্রমণের বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন এই আয়াতে। সুউচ্চ পর্বতাঞ্চল, গিরিপথ ইত্যাদিতে গমন, উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপদেশে যাতায়াত, পর্যটন– এসবই এর আওতায় পড়ে।

পৃথিবীতে উপরিউক্ত কার্যাবলীসমূহে জড়িত হওয়া এবং সেসবের মাধ্যমে রিযিক অনুসন্ধান আল্লাহ্র কাছে শুধু গ্রহণযোগ্যই নয়, বরং পছন্দনীয়ও। তবে এই আয়াতসমূহে ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী জীবনবিধানেরই একটি মৌলিক দিক আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সবকিছুতেই একটি সীমা আরোপিত রয়েছে, যার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাস। তাই আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত সীমার বাইরে কোন অর্থনৈতিক কার্যাবলীই গ্রহণযোগ্য নয়– ভ্রমণ, বাণিজ্য বা পর্যটনের সাথে তা যুক্ত হলেও সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ্ সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন পরকাল। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে পৃথিবীতেও তারা সম্মুখীন হতে পারে ভূমিকম্প ও অন্যবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত কঠিন শাস্তির।

মানুষের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আকারে নেমে আসা আল্লাহ্র গযবের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে উক্ত আয়াতগুলোতে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

- মোঃ আবুল হাসনাত দেওয়ান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কালাম

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ. وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ. فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ. اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ. فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ. اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ. وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ. فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَضَالُّوْنَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ.

আমি তাদের পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে। এতে তারা কোনরূপ ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা রাখেনি অর্থাৎ ‘ইনশাআল্লাহ্’ বলেনি। অতঃপর যখন তারা নিদ্রিত ছিল, আপনার রবের পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হল। ফলে সকাল পর্যন্ত তা কর্তিত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণসম হয়ে গেল। সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে খুব সকাল সকাল ক্ষেতে চল। অতঃপর তারা ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে চুপে চুপে চলল, যাতে আজ কোন মিসকীন তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে না পারে। সকালে তারা দ্রুতগতিতে সক্ষম ফল আহরণকারী হিসেবে সেখানে পৌছল। অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল, আমরা তো পথ ভুলে গেছি বরং আমরা বঞ্চিতই হয়ে গেলাম। — সূরা কালাম ঃ ১৭-২৭

www.pathagar.com

শব্দার্থ

صريم অর্থ কর্তিত। صرم অর্থ কর্তন করা। صريم এর আরেক অর্থ কালো রাত্রি। (আল-মুনজিদ)

حرد অর্থ নিষেধ করা, রাগা, বিরত রাখা, দ্রুততা ইত্যাদি। (আল-মুনজিদ)

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেছেন ঃ انا بلونهم .... اصحاب الجنة - অর্থাৎ আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। এ আয়াতগুলোতে বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদের সতর্ক করা হয়েছে। মক্কাবাসীদের পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ্ স্বীয় নিয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তেমনি আল্লাহ্ মক্কাবাসীদেরকেও নিয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সবচাইতে বড় নিয়ামত তো এই যে, রাসূল (স.)কে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে বরকত দান করেছেন। তারা এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে কিনা তার পরীক্ষা করেছেন।

উদ্যানওয়ালাদের কাহিনী

হযরত ইবন আব্বাস প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যানটি ছিল ইয়েমেনের রাজধানী সান্আ থেকে ছয় মাইল দূরে। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল ইথিওপিয়ায়। (ইবনে কাসীর) মালিকরা আহলে-কিতাব ছিল। ঘটনাটি হযরত ঈসার স্বর্গারোহণের কিছুদিন পরেই সংঘটিত হয়। (কুরতুবী)

উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৎকর্মশীল ও ধর্মপরায়ণ। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্যশস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। দিন দিন বাগানের ফল ও ফসলে বরকত হতে লাগল। ফসল কাটার সময় ফকীর-মিসকীনদের ভিড় বেড়ে গেল। উক্ত ধার্মিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র সেই বাগানের উত্তরাধিকারী হল। তাদের অধিকাংশ ছিল উচ্ছৃঙ্খল। তারা পরস্পর বলাবলি করল, আমাদের পিতা ছিলেন বেওকুফ, বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য দরিদ্রদের দিয়ে দিতেন।

www.pathagar.com

এখন আমাদের পরিবারের জনসংখ্যা বেড়ে গেছে, উৎপাদনও কম। সুতরাং এ প্রথা বন্ধ করে দেব। এ ঘটনাটি কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

اذ اقسموا .... لا يستثنون অর্থাৎ তারা পরস্পরে শপথ করে বলল, আমরা খুব প্রত্যূষে গিয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকীর-মিসকীন টের না পায়। এ পরিকল্পনার সময় তারা 'ইনশাআল্লাহ্' পর্যন্ত বলেনি। কোন তাফসীরবিদ বলেন لايستثنون -এর অর্থ আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব, ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দেব না।''' (মাযহারী)

فطاف .... من ربك অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই উদ্যানে একটি প্রাকৃতিক বিপদ আপতিত হল। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। তারা তখন নিদ্রামগ্ন ছিল। প্রত্যূষে একে অপরকে ডেকে তুলল এবং চুপিসারে খুব দ্রুতগতিতে ক্ষেতে পৌঁছল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ক্ষেত-বাগান না দেখতে পেয়ে প্রথমে তারা বলল, আমরা পথ ভুলে অন্যত্র চলে এসেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, এটাই তাদের ক্ষেত, তবে ফসল পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল ঃ يا نحن محرومون আমরা এ ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তাদের মধ্যে একজন সৎকর্মশীল ছিল। সে বলল, আমি তোমাদের আগেই বলেছি, তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর না কেন ? অতঃপর সবাই স্বীকার করল যে, তারা জুলুম করেছে। ফকীর-মিসকীনদের অংশ হজম করার পরিকল্পনা করা একটা জুলুম। তারপরও তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল এবং পরিশেষে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহ্গার।

–মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৮-৬৪০

মাওলানা মওদূদী লিখেছেন ঃ উক্ত উদ্যানের মালিকগণ স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্যে এতখানি বিশ্বাস ছিল যে, কিরা-কসম করে কোনরূপ রাখা ঝোঁকা ছাড়াই বলে দিয়েছিল যে, আগামীকাল আমরা অবশ্যই ফল পাড়ব। 'আল্লাহ্ চাইলে করব' এমন কথা বলার কোন প্রয়োজনই তারা বুঝেনি। এভাবে কথা বলা নিতান্তই দাম্ভিকতার পরিচায়ক।

অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাগানটি পুড়ে এমনভাবে ভস্ম হল যে, তার নাম-নিশানাও মিটে গেল। সকালে তারা সে স্থানে উপস্থিত হয়ে এটা যে তাদেরই বাগান ছিল তা বুঝতেই পারেনি। পরে পার্শ্ববর্তী নিদর্শন দেখে চিনতে পেরে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে লাগল, আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম। পোড়াকপাল আমাদের।

www.pathagar.com

এর প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, গরীব-মিসকীনকে কিছুই না দেবার সিদ্ধান্তের কারণে তাদের দাম্ভিকতার সাথে পরের হক আত্মসাতের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে একজন অবশ্য বলেছিল যে, আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং তাঁর নির্দেশমত বাগানের ফল আহরণ কর। কিন্তু অধিকাংশের মতের সামনে তাঁর পরামর্শ টিকেনি। ফলে আযাব ভোগ করতে হল সবাইকেই।

–তাফহীমুল কুরআন, উক্ত আয়াতের টীকা নং ১৩, ১৬, ১৭ অবলম্বনে

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

ইসলামী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এ যে, এখানে সর্বস্তরের জনগণের জীবিকার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। যারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে তারা তাদের প্রাপ্য অংশ উৎপাদিত পণ্য বা এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের বন্টনের মাধ্যমে পেয়ে থাকে, আর যারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না, তাদের জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট করে রাখার বিধানও ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে। যারা এ বিধান লংঘন করে তারা অর্থনৈতিকভাবে কিভাবে শাস্তি পায়, তার উদাহরণ আলোচ্য আয়াতগুলোতে রয়েছে। অবশ্য এ শাস্তি অর্থনৈতিকভাবে না হয়ে অন্যভাবেও হতে পারে। যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক অশান্তি। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও ধ্বংসের মাধ্যমে এটা বেশী করে আসত। বর্তমানে এ শাস্তি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবেই বেশী করে আসে।

- শামসুল আলম খান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নূহ

يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا. وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا

তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। – সূরা নূহ ঃ ১১-১২

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ "এ আয়াতের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ আলিম বলেন, গোনাহ্ থেকে তওবা ও ইস্তিগফার করলে আল্লাহ্ যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে রক্ষা করেন এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোন রহস্যের কারণে খেলাফও হয়; কিন্তু তওবা ইস্তিগফারের ফলে পার্থিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রচলিত রীতি। হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭৭

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ "কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্দ্রোহিতার আচরণ কেবল পরকালেই নয়। এই দুনিয়ায়ও মানুষের জীবন সংকীর্ণ-দুর্বিসহ করে দেয়। পক্ষান্তরে কোন জাতি যদি খোদার নাফরমানীর পরিবর্তে ঈমান, তাকওয়া ও খোদায়ী আইন বিধান মেনে

www.pathagar.com

চলার নীতি অবলম্বন করে, তাহলে কেবল পরকালেই নয় দুনিয়ায়ও উহার প্রতি অফুরন্ত নিয়ামতের বারিবর্ষণ শুরু করে (সূরা তাহা, আয়াত ১২৪; সূরা মায়েদা আয়াত ৬১; সূরা হুদ, আয়াত ৪২)।

কুরআন মজীদের এসব আদেশ-উপদেশ অনুযায়ী একবার দুর্ভিক্ষকালে হযরত উমর (রা.) বৃষ্টির জন্য দোয়া করার জন্য বের হলেন এবং শুধু ইস্তিগফার করেই ক্ষান্ত হলেন। লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনীন! আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন না। উত্তরে বললেন, 'আমি আকাশমণ্ডলের সেসব দুয়ারে ধাক্কা দিয়েছি, যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। অতঃপর সূরা নূহ্-এর ক'টি আয়াত পড়ে শুনালেন। (ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর) হযরত হাসান বসরীর সময়ও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। তাঁর সম্মুখে এক ব্যক্তি এসে চরম অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও। অন্য একটি লোক দারিদ্র্যের কথা বলে। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলল, আমার কোন সন্তান হচ্ছে না। চতুর্থ ব্যক্তি বলল, আমার জমিতে ফসল খুব কম ফলে। হাসান বসরী (র.) প্রত্যেককে একই জওয়াব দিতে লাগলেন। বললেন, খোদার নিকট মাগফিরাত চাও। লোকেরা বলল, ব্যাপার কি? আপনি বিভিন্ন প্রকার সমস্যার একই ধরনের সমাধান– সকল রোগের একই মহৌষধ বলছেন। এর কারণ কি? তিনি এর জওয়াবে সূরা নূহ-এর এ কয়টি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

–তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূহের তাফসীর, টীকা নং ১২, সংক্ষেপিত

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ্ (স.) নবুয়ত জীবনের মক্কী অধ্যায়ের প্রথম ভাগে এ সূরা নাযিল হয়। সূরার ৮-১০ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক তাঁর সঙ্গীকে দীনের দাওয়াত দেওয়া, তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে বোঝানো এবং আল্লাহ্র নিকট তাদেরকে ক্ষমা চাইতে আহবান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা ক্ষমা চাও এবং সংশোধিত হয়ে যাও, তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ্ বৃষ্টি দান করবেন, ধনসম্পদ দিয়ে ধন্য করবেন। তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করবেন ও ঝর্ণা প্রবাহিত করবেন।

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্ পাক অনেক সময় ঈমানদারদের কম সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করবেন (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৫), কিন্তু সব সময়েই তা হবে তা সত্য নয়। যেমন এ দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে। মুসলিম জাতি যখন সামগ্রিকভাবে ইসলাম অনুসরণ করেছে, ইসলামী শরীয়তকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তখন

www.pathagar.com

সাধারণত আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মালামাল ও সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। গত কয়েকশত বছর যে মুসলমানদের অবস্থা সাধারণভাবে খারাপ তার কারণ অন্য। এ সময়ে মুসলিম জাতি যথাযথভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চা করেনি, জিহাদের দায়িত্ব পালন করেনি, জাতির উন্নতির জন্য ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে কাজ করা দরকার তা পুরাপুরিভাবে করেনি। এ সময়ে তারা ইসলামের পরিবর্তে সাধারণভাবে কুসংস্কারে লিপ্ত হয়েছে। তা না হলে কোন কারণ নেই মুসলিম জাতির প্রতি আল্লাহ্র মেহেরবানী না করার।

তাফসীর অংশে হযরত উমর (রা.) ও হযরত হাসান বসরীর (রা.) কাজের তাৎপর্য এ নয় যে, কেবল ক্ষমা চাইতে হবে, কোন কাজ করতে হবে না। বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে কাজও করতে হবে, ক্ষমাও চাইতে হবে।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুযযাম্মিল

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَّنْ
تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَلِمَ اَنْ
سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ
مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ صلى فَاقْرَءُوْا
مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لا وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ
هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

আপনার রব তো অবশ্যই জানেন যে, আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দু'তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ রাতদিন পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসেব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই তা থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং

আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রে যা কিছু পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিত রূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। – সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেছেন ঃ আয়াত নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামায ফরয ছিল। এ আয়াতের আলোকে সে নির্দেশ রহিত হয়েছে। এরপর তাহাজ্জুদ নামায নিছক নফল ও মুস্তাহাব থেকে যায়।

فاقرءوا ما تيسر من القران অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায যা এখন ফরযের পরিবর্তে মুস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে যতটুকু কুরআন সহজে পাঠ করতে পারে পাঠ করুক।

واقيموا الصلوة এখানে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, ফরয নামায পাঁচটি যা মি'রাযের রাতে ফরয হয়েছে।

واتوا الزكوة বাক্যে ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের ২য় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে তাফসীরবিদ বিশেষত এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইব্ন কাসীর বলেন, যাকাত মক্কায় ফরয হয়েছিল তবে তার নিসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের ২য় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে।

واقرضوا الله قرضا حسنا আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহ্কে ঋণ দিচ্ছে। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে। যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেওয়া, মেহমানদের জন্য ব্যয় করা, গুণীজনদের সেবাযত্নে ব্যয় করা ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেন, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্ষে; যেমন পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। وما تقدموا لانفسكم... অর্থাৎ তোমরা জীবদ্দশায় যে যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়ত করে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন। ওসীয়ত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক ইবাদাত, সদকা-খয়রাত সহ নামায রোযা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

হাদীসে আছে, রাসূল (স.) একবার সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে নিজের ধনসম্পদের তুলনায় ওয়ারিশের সম্পদ বেশী ভালবাসে? সাহাবারা বললেন, না, এরূপ ব্যক্তি আমাদের মাঝে নেই। রাসূল (স.) বললেন, তোমার ধন তাই, যা তুমি স্বহস্তে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। তোমার মৃত্যুর পর যে ধন থেকে যাবে, তা তোমার নয়– তোমার ওয়ারিশের। (ইবনে কাসীর)

– মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২০-৭২২

মাওলানা মওদূদী লিখেছেন ঃ জায়েয ও হালাল পন্থায় রিযিক উপার্জনের জন্য বিদেশ যাত্রাকে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান বলে অভিহিত করা হয়। এখানে আল্লাহ্ পবিত্র রিযিক সন্ধানে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার কথা একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আর রোগকালীন অক্ষমতা ছাড়া এই দুইটি কাজকে তাহাজ্জুদ নামায ক্ষমা বা তাতে দায়িত্ব কিছুটা হ্রাস করার কারণ স্বরূপ দাঁড় করানো হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ইসলামে জায়েয উপায়ে রুযী-রোজগার করা অতি বড় ফযীলত ও মর্যাদার ব্যাপার। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন ঃ

ما من جالب يجلب طعاما الى بلدة من بلدان المسلمين فبيبيعه نسهر بومه الاكانت مقؤلته عند الله ثم قرأ رسول صلعم واخسرون يضربون فى الارض

যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন শহরে জনপদে শস্য নিয়ে আসে ও সেই দিনের বাজার দরে তা বিক্রয় করে দেয়, সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবে। পরে রাসূল (স.) উক্ত আয়াত পাঠ করেন। (ইবনে মারদুইয়া)

হযরত উমর বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা ছাড়া আর কোন অবস্থায় জীবন দান করা আমার নিকট প্রিয় হয়ে থাকলে, তা হল–আমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করতে করতে কোন পর্বতসংকুল পথ অতিক্রম করা অবস্থায় মৃত্যু আমাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করেন। (বায়হাকী)

واقرضوا الله قرضا حسنا অর্থাৎ যাকাত ছাড়াও স্বীয় ধনমাল আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কিংবা দুস্থ্ বান্দাদের সাহায্য, সাধারণ জনকল্যাণমূলক বা অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজ যাই হোক না কেন?

– তাফহীমুল কুরআন, টীকা নং ২২-২৩, ২৫; সূরা মুযযাম্মিল

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে তাহাজ্জুদ নামায ফরয থেকে নফল বা মুস্তাহাব করা এবং তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তিলাওয়াত সংক্ষিপ্ত করণ প্রসঙ্গে, তাহাজ্জুদ নামায ফরয থাকলে অন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ন্যায় তা সব মুসলমানকেই আদায় করতে হত। তাতে অসুস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তিদের তো কষ্ট হতই, অধিকন্তু যারা রুটি-রুযীর সন্ধানে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে, দূরের পথে অতিক্রম করে অথবা বিদেশ যাত্রা করে, তাদের জন্যও বেশী সময় রাত্রি জাগরণ খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এবং যারা দিনের বেলায় জিহাদে লিপ্ত হবে তাদের জন্যও অধিক রাত্রি জাগরণ জিহাদের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। এসব কারণে তাহাজ্জুদ নামায নফল বা মুস্তাহাব করা হয়েছে এবং তাহাজ্জুদ নামাযের সময় সংক্ষিপ্তকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতে অসুস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তিদের যে উল্লেখ আছে, তা তাদের শারীরিক মাজুরতা বা অক্ষমতার কারণে। রোযা-নামাযে এ ধরনের অসুস্থ ব্যক্তিদের যে অবকাশ দেওয়া হয়েছে, তাতে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার দিকটাই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রুটি-রুযীর সন্ধানে কর্মরত অথবা বিদেশ যাত্রাকারীর জন্য যে অবকাশ দেওয়া হয়েছে, তার আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আল্লাহ্‌র দীনের জন্য জিহাদ করলে তাহাজ্জুদ নামাযে সময় সঙ্কীর্ণ করার বা তাহাজ্জুদ নামায আদায় না করার অবকাশ (Concession) দেওয়া হয়েছে। রুটি-রুযীর (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ) সন্ধানে দূরের পথে যাত্রা করায়ও একই (Concession) বা অবকাশ দেওয়া এর অর্থ হালাল রুযী উপার্জন করার প্রচেষ্টা জিহাদে শরীক হওয়ার সব মর্যাদাসম্পন্ন। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের অর্থাৎ রুযী-রোজগারের প্রচেষ্টার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা জুমু'আয় বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

এবং সালাত শেষ হলেই পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে। আয়াতের তাফসীরে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও দেখা যায়– বাজারে প্রচলিত দরে শস্য কেনাবেচা একটি বড় ইবাদত, যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। এখানে প্রচলিত মূল্যের কথা উল্লেখ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মূল্য যা প্রচলিত আছে, সেই মূল্যেই কেনাবেচা করতে হবে। কোনও রূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে মূল্য কম বৃদ্ধি করা গর্হিত কাজ। কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা অর্থাৎ মজুদদারী বা

www.pathagar.com

কালবাজারী করা ঠিক নয়। তাতে এক শ্রেণীর লোক দ্বারা অন্য এক শ্রেণীর লোকের উপর শোষণ বা জুলুম চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা গর্হিত বা অবৈধ কাজ। এরূপ গর্হিত পন্থায় উপার্জনে কোনও নেকী থাকতে পারে না। বরং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যায়-অবৈধ পন্থায় লেনদেনের মাধ্যমে জুলুম ও শোষণ আসে। কিন্তু বৈধ ও ন্যায্য লেনদেনে জুলুম ও শোষণ আসতে পারে না। বরং তাতে সম্পদের সুষম বিলিবন্টন হয় এবং অর্থনৈতিক সুবিচার ও স্থিতিশীলতা (equillibrium) প্রতিষ্ঠিত হয়।

আয়াতে সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়ার সাথে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সালাত কায়েমের বিষয় আলোচনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন, যাকাত সম্বন্ধেও অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে যাকাত ছাড়া আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকেই আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেওয়া বলা হয়েছে বলে তাফসীরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির সম্পদ তার অধিকারে থাকে তার জীবদ্দশায়ই। তার মৃত্যুর পর তা তার ওয়ারিশদের হয়ে যায়। ওয়ারিশরা কিভাবে ব্যয় করবে, তা তারাই জানে। সুতরাং কোনও ব্যক্তি যদি তার সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে চায়– যার প্রতিদান সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই পাবে– তবে তা তার জীবদ্দশায়ই করতে হবে। এরূপ ব্যয় করা সম্পদ সমাজের ইয়াতীম-মিসকীন ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের কাছেই যায় এবং তাদের অভাব-অনটন লাঘব হয়, সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্য অনেকটা দূরীভূত হয়। ফলে সমাজে এক শান্তি-শৃঙ্খলার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এভাবে আল্লাহ্‌র পথে খরচকারী এ দুনিয়ায়ও যেমন এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে থাকতে পারবে, পরকালেও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক মহাশান্তির প্রতিদান পাবে।

- নূর মোহাম্মদ আকন

এবং

শামসুল আলম খান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা দাহ্‌র

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَاشُكُوْرًا.

এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে যারা খাওয়ায় আর তাদেরকে বলে– কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি এবং তোমাদের নিকট হতে কোন প্রতিদানও কৃতজ্ঞতা চাই না।

– সূরা দাহ্‌র ঃ ৮-৯

শব্দ টীকা

لوجه الله সরাসরি অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার চেহারার উদ্দেশ্যে ভাবার্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অথবা তার সৃষ্টির বৃহত্তর কল্যাণার্থে।

তাফসীরকারদের আলোচনা

মাওলানা সইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ দু'টি আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ "মূলের শব্দ হলো على حبه বহু সংখ্যক তাফসীরকার এর তাৎপর্য করেছেন। খাবারের প্রতি তাদের মনের আকর্ষণ, লোভ এবং নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা এই লোকদের খাওয়ায়। ইবন আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, দরিদ্র লোকদিগকে খাওয়াবার আগ্রহ ও উৎসাহে তারা এ কাজ করে। আর হযরত ফুজাইল ইবন আয়াজ ও আবূ মাসুদ দারানী বলেন, 'তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় এরূপ করে'। আমাদের দৃষ্টিতে ইহাই ঠিক। ইহার পরবর্তী বাক্য "আমরা তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের খাওয়াই"' এ কথা সমর্থন করে।

– তাফহীমুল কুরআন, সূরা দাহ্‌র, টীকা ১১

www.pathagar.com

তিনি আরো লিখেন ঃ "আলোচ্য আয়াতে 'কয়েদী' বলতে যে কোন বন্দীকেই বোঝায়, সে কাফির হোক কিংবা মুসলমান, যুদ্ধবন্দী হোক কিংবা কোন অপরাধের কারণে বন্দী।" – ঐ, টীকা নং ১২

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেন ঃ উপরে বর্ণিত সৎ লোকদের গুণাবলীর মধ্যে এটাও অন্যতম গুণ যে, তারা নিঃস্ব, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাদ্য দান করেন। আয়াতে على حبه অংশের على শব্দটির অর্থ مع অর্থাৎ সত্ত্বেও। মর্মকথা হল এই যে, তারা নিঃস্বদের খাদ্য দান করে থাকেন, যদিও এ খাদ্যে তাঁদের আসক্তি ও ভালবাসা আছে। শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার প্রদান করে এমন নয়।[১] দরিদ্র ও ইয়াতীমদের খাওয়ানো তো সওয়াবের কাজ ও ইবাদত বলে প্রকাশ্যেই বোঝা যায়। বন্দীদের ব্যাপারে এমন কাজও ইবাদত। কেননা, বন্দী— সে মুসলিম হোক বা কাফির– তাকে সাহায্য করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করে তাও সওয়াব হবে; কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দীদের খাওয়ানো ও সংরক্ষণ করা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে বন্টন করতেন। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের সাথে এ রূপ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ৬৩৮)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা দাহ্‌র-এর শুরুতে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার জীবনের শুরুতে কিছুই ছিল না এবং ক্রমে ক্রমে সে শ্রবণ ও দৃষ্টিসম্পন্ন মানবে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন, তাহার মন চাইলে শোকরগুযার বান্দা হিসেবে আল্লাহ্‌র পথে চলতে পারে অথবা অকৃতজ্ঞ কাফির হতে পারে। তারপর কাফিরদের শাস্তি ও সৎকর্মশীলদের গুণাবলী পর্যায়ে আলোচ্য আয়াত দু'টিতে কেবল আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন-ইয়াতীম ও কয়েদীদের খাওয়াতে বলা হয়েছে।

ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের অভাব-দারিদ্র্য ও অসুবিধা দূর করার কথা কুরআনের বহু স্থানে বলা হয়েছে। কয়েদীদের কথা এ আয়াতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কুরআনে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা পাওয়া যায় তার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে অভাবগ্রস্ত জনসমষ্টির অভাব-দুঃখ দূর করা। এ প্রসঙ্গে সূরা কাসাসে একটি ব্যাপক নীতি বর্ণিত হয়েছে।

"আমি ইচ্ছা করলাম যে যারা দুনিয়াতে নির্যাতিত তাদের প্রতি মেহেরবানী করব, তাদের নেতৃত্ব দান করব, তাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করব ও তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাব।" – সূরা কাসাস ঃ ৫

---

১. সূরা হাশরের নয় নম্বর আয়াতে এ ধরনের বিষয় রয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কার্যকরী করা প্রত্যেক মু'মিনের দায়িত্ব। সূরা দাহ্‌রে এ আয়াতদ্বয়েও ঐ মূলনীতির ব্যাখ্যা রয়েছে। এই নীতি কার্যকরী করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এ দু'টি আয়াতে ইসলামের ব্যয়নীতির একটি দিক পাওয়া যায়। মুসলমানদের ব্যয় আল্লাহ্‌র ভালবাসায় হতে হবে। ব্যয়ের অন্যান্য লক্ষ্য যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রয়োজন মেটানোর, বিনিয়োগ ইত্যাদি সবই থাকবে তবে তার উপর থাকতে হবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা। অর্থাৎ যাতে আল্লাহ্‌র মর্জী নেই এমন কাজে ব্যয় করা যাবে না। তেমনিভাবে ইসলামী সমাজে ব্যক্তি ও সরকারকে এমন অনেক ব্যয় করতে হবে, যা আপাতদৃষ্টিতে লাভজনক নয় কিন্তু যা করা মানবকল্যাণের দাবী।

বস্তুত ইসলামী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য এ যে, এটা এমন একটি Comprehensive System যেখানে অর্থনীতির যাবতীয় বিষয় অর্থনৈতিকভাবে সুসমন্বিত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার উৎপাদন প্রক্রিয়া (Production process) এর সাথে যারা প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের আবার এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত করার জন্য বিভিন্ন রকম পন্থা গৃহীত হয়েছে। দান-সাদকা, যাকাত ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়ে নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়েও একইভাবে তা করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতদ্বয়ের বাহ্যিক রূপ আধ্যাত্মিক হলেও সমষ্টির দিক দিয়ে এগুলো অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যবহ।

- শাহ্ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আবাসা

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ . اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا . فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا. وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا. وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا. وَّحَدَائِقَ غُلْبًا. وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا. مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ط

অতঃপর (ইহা ছাড়া) মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর বারিবর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, দ্রাক্ষা (আঙুর), শাক-সবজি, যয়তুন, খর্জুর, ঘন-সন্নিবেশিত উদ্যান। আর রকম-বেরকমের ফল ও উদ্ভিদ খাদ্য-তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ (আন'আম) জন্তুর জন্য জীবিকার সামগ্রীরূপে। – সূরা আবাসা ঃ ২৪-৩২

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

এ সূরার ১৯-২৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টির রহস্য, তাকে আকৃতি-প্রকৃতি দান, তার তকদীর বা নিয়তি নির্ধারণ, তার এ দুনিয়ার যিন্দেগীর চলার পথ সহজ-সরল করে দেওয়া, তার মৃত্যু, কবরে অবস্থান এবং আখিরাতে পুনরুত্থানের বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছেন। এক ফোটা শুক্র হতে মানুষের সৃষ্টি হয় মাতৃগর্ভে। মাতৃগর্ভেই মানুষকে তার পূর্ণ আকৃতি-প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদান করা হয়। তারপর এ দুনিয়ায় তার চলার পথ করে দেওয়া হয় সহজ ও সরল। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে করে দেওয়া হয় তার অধীন, যেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সেই সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তিসমূহকে কাজে লাগিয়ে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে সে দুনিয়ায় জীবন যাপন করতে পারে। দুনিয়ার যিন্দেগী শেষে আসে

www.pathagar.com

মৃত্যু এবং কবরে (বারযাখে) অবস্থান। এরপর পুনরুত্থান। তখনই এ দুনিয়ার যিন্দেগীর সব হিসেব-নিকেশ নেওয়া হবে এবং দেওয়া হবে তার ফলাফল।

এরপরই ২৪ নং আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করতে। মানুষ মনে করে সে তার খাদ্যদ্রব্য নিজেই উৎপাদন করে। একথা সত্য যে, খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানুষের শ্রমশক্তি কাজে লাগাতে হয়। হালচাষ করতে হয়, বীজ বপন ইত্যাদি করতে হয়। কিন্তু এতটুকু মানবীয় পরিশ্রমের ফলেই কি খাদ্য উৎপাদন হয়? খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভূমিতে যে পানির দরকার হয়, তা মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। সমুদ্র-নদীনালা ইত্যাদির পানি বাতাসের সাহায্যে জলীয় বাষ্পরূপে আকাশে উঠে মেঘের সৃষ্টি হয়। সেই মেঘ থেকেই হয় বারিবর্ষণ। তাতে জমি সিক্ত ও উর্বর হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানির সাহায্যে যে সেচকার্য করা হয়, তাও আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। তারপর মাটি বিদীর্ণ করে শস্য ও বৃক্ষলতার শিকড় যে মাটির গভীরে প্রবেশ করে তাও আল্লাহ্‌রই ব্যবস্থাপনা। তাছাড়া বীজ থেকে যে অঙ্কুরোদগম হয়, তা মানুষের সাধ্যায়ত্ত কোন কাজ নয়। তা সম্পূর্ণই আল্লাহ্‌র দান। এ ভাবেই উৎপন্ন হচ্ছে শস্য, দ্রাক্ষা, যয়তুন এবং ঘন-সন্নিবেশিত বাগ-বাগিচা। এসব থেকেই আসে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসমূহ। যেসব জীব-জন্তু বিশেষ করে চতুষ্পদ জন্তুসমূহ যা মানুষের চাষাবাদ এবং যানবাহনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাদের খাদ্যও এ ভাবেই উৎপন্ন হয়।

– মা'আরেফুল কোরআন, তাফহীমুল কুরআন এবং The Hoty Quran অবলম্বনে

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আলোচ্য পবিত্র কালামসমূহে মানুষ ও জীবজন্তুর খাদ্যোৎপাদনে নৈসর্গিক শক্তি ও উপাদানের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র দেয়া পানি না হলে এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে বীজ হতে অকুরোদগম না হলে মানুষ হাজারো চেষ্টা করেও এক কণা শস্যও উৎপাদন করতে পারবে না বা একটা বৃক্ষলতা বা শাক-সবজিও জন্মাতে পারবে না। পানি কোনও মানুষের সৃষ্টি নয়। কোনও এক নির্দিষ্ট এলাকার লোকেরা শত চেষ্টা করেও মানুষের সব রকম কলাকৌশল অবলম্বন করেও একটা ছোট নদীর পানিও সৃষ্টি করতে পারে না। বৃষ্টির পানি, নদীর পানি ও ভূগর্ভস্থ পানি– সবই একই উৎস হতে আসে। {এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না}। তাই আল্লাহ্‌র দেয়া এ পানি এর পাহাড়-পর্বতের চূড়া হতে প্রবাহিত বরফ গলা পানি হোক, নদীর পানি হোক অথবা ভূগর্ভস্থ পানি হোক, তা কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনসমষ্টি বা কোন দেশ বা জাতি কোনও কৃত্রিম উপায়ে আটকাতে বা বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তা' করা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অবৈধ। এ কারণেই কোনও নদীর পানির

www.pathagar.com

স্রোত কোনও দেশ যদি বাধাগ্রস্ত করে, তা হবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈধ। এ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির সম্পূর্ণ ন্যায্য অধিকার রয়েছে এরূপ বাঁধাকে অপসারিত করার। অনুরূপভাবে বহু লোকের ক্ষেত-খামারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীনালা বা অন্য কোনও রূপ প্রাকৃতিক পানির ধারাকেও কেউ আটকাতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খাদ্যোৎপাদনে আল্লাহ্‌র দানের আরও একটি দিক উল্লেখযোগ্য। যেহেতু খদ্যোৎপাদনে আল্লাহ্‌র দানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু কোনও জমিতে– সে জমি কোনও ব্যক্তির অধিকারে হোক বা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের অধিকারে হোক– উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য, শাক-সবজি, ফলমূল, কোনও ব্যক্তি বিশেষের ভোগেই ব্যবহৃত হতে পারে না। এতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি অন্য মানুষ ও জীবজন্তুরও হক বা অধিকার রয়েছে। সেই হক বা অধিকার অবশ্যই আদায় করতে হবে। এজন্যই জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর উশরও (খারাজ) আদায় করা বিধিসম্মত বা জায়েয করা হয়েছে। এছাড়া কোনও ব্যক্তির যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল ইত্যাদি থাকে, তা থেকেও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে।

জীবজন্তুর খাদ্যের উল্লেখও তাৎপর্যপূর্ণ। জীবজন্তু খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে। গৃহপালিত পশু থেকে দুধ ও গোশ্‌তের মত অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া যায়। তাই জীব-জন্তুকে, বিশেষ করে, গৃহপালিত জীব-জন্তুকে প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে মানুষের খাদ্যোৎপাদনে ভীষণ বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দেবে।

তাই, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহাকল্যাণময় ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাদের খাদ্যোৎপাদনে সচেষ্ট হতে হবে এবং সেই উৎপাদিত খাদ্যের বিলি-বন্টনও তাঁরই বিধি-বিধান অনুযায়ী করতে হবে। আর এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে মানব জাতি ও জীবকুলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

- নূর মোহাম্মদ আকন

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুতাফ্‌ফিফিন

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ. اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ.
وَاِذَا كَالُوْاهُمْ اَوْ وَّزَنُوْاهُمْ يُخْسِرُوْنَ.

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেওয়ার সময় কম দেয়। –সূরা মুতাফ্‌ ফিফিন ঃ ১-৩

শব্দের ব্যাখ্যা

مطففين শব্দটি تطفيف শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ ক্ষুদ্র ও নগণ্য জিনিস। পরিভাষা হিসেবে এর অর্থ ওজনে-পরিমাপে চুরি করে লুকিয়ে কম দেওয়া। যারা প্রত্যেক খরিদ্দারকে অল্প করে কম দিয়ে ঠকাতে থাকে, তাদেরকে মুতাফফিফিন বা ঠকবাজ বলে।

সাধারণ আলোচনা

সূরা মুতাফফিফিন মক্কায় নাযিল হয়। পরকালের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য এ সূরা নাযিল হয়। এ সূরার ৪ নং আয়াত হতে পরকালের আলোচনা শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

‘‘তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে এক মহাদিবসে। যখন সমস্ত মানুষকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে। ওজনে কম দেওয়া ছিল তৎকালীন সমাজের অসংখ্য দোষক্রটির মধ্যে একটি অত্যন্ত মন্দ দোষ।

www.pathagar.com

এতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকাল সম্পর্কে উপেক্ষা ও উদাসীনতা এর মূল কারণ। একদিন অবশ্যই আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে এবং পুরোপুরি হিসেব দিতে হবে। এই বিশ্বাস যতক্ষণ মানুষের মনে দৃঢ়মূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লোকের পক্ষে বৈষয়িক কাজকর্মে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

কুরআন মজীদে সঠিক ওজন দেওয়ার কথা বারবার বলা হয়েছে। সূরা আল-আন'আমে বলা হয়েছে "ইনসাফ সহকারে পুরোপুরি মাপে ওজন কর" (আয়াত ১৫২)

সূরা বনী ইসরাইলে বলা হয়েছে ঃ

"যখন পরিমাপ করবে, পুরা মাত্রায় পরিমাপ করো আর নির্ভুল দাড়ি পাল্লায় ওজন করো।" (আয়াত ৩৫)

সূরা আর-রহ্‌মানে তাকীদ করা হয়েছে ঃ

"ওজনে কড়াকড়ি করো না, ঠিক ঠিক ও ইনসাফ সহকারে ওজন করো এবং পাল্লায় ত্রুটি রেখো না।" (আয়াত ৮-৯)

সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে ঃ তোমরা পরিপূর্ণ কর এবং লোকদের জন্য ক্ষতিকারক হয়ো না। ওজন করবে সঠিক পাল্লায় এবং লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না ও বিপর্যয় ঘটাবে না। (আয়াত ১৮১-৮২)

– তাফহীমুল কুরআন অবলম্বনে

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

অর্থনীতিতে বিশ্বস্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বস্ততা ছাড়া অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অচল হয়ে পড়ে। এ জন্য ইসলাম ধোঁকাবাজি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে, সে আমাদের মধ্যে কেউ নয়।" মাপে বা ওজনে কম দেওয়াও ধোঁকাবাজি। এজন্য ইসলামে ওজন বা মাপে কম দেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম ইনসাফ সহকারে মাপের ও ওজনের কথা বলেছে।

দাঁড়িপাল্লা এবং ওজন-যন্ত্র সঠিক হতে হবে এবং তাতে কোন ত্রুটি রাখা যাবে

www.pathagar.com

না, যেমন সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা আর-রহমানে বলা হয়েছে। সূরা মুতাফফিফিনের উল্লিখিত আয়াতে দু'রকম মাপের নিন্দা করা হয়েছে। নিজের জন্য এক মাপ ও অন্যের জন্য এক মাপ– তা হতে পারে না।

মুসলিম সমাজের জন্য এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। তাদের জীবনে লোকদের সাথে সম্পর্কে ও পারস্পরিক কাজকর্মে এ নীতিই তাদের অবলম্বন করতে হবে। অতএব দুই রকমের পরিমাণ ও দুই ধরনের পাল্লায় ওজন করে কেনা-বেচা করা তাদের জন্য জায়েয নয়। একটা নিজের জন্য মানদণ্ড আর একটা অন্যদের জন্য। ইসলামে এরূপ নীতি বৈধ নয়।

এসব আয়াতের সামাজিক তাৎপর্যও রয়েছে। নিজের জন্য ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য এক রকম আচরণ ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের জন্য ভিন্ন রকম আচরণ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে অচল। কেননা এরূপ করা হলে সে নিজের জন্য পুরামাত্রায় আদায় করবে, বেশী নিয়ে নেবে আর অপর লোকদের জন্য কম দেবে এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে, যেমন সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে। কিন্তু এর মত অবিচার আর কিছু হতে পারে না।

ইসলাম অর্থনীতিতে পূর্ণ বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস করে। এজন্য ইসলাম সব ধরনের অন্যায় অর্থনৈতিক কার্যকমকে হারাম করে দিয়েছে। ওজন ও মাপের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা ও একই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে ইসলামের এ শিক্ষা কার্যকর করার লক্ষ্যে উপযুক্ত একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশে এ জন্য স্টান্ডার্ড ইন্সটিটিউট আছে। এ ধরনের সংগঠনকে ইসলামী রাষ্ট্রে কার্যকরভাবে গড়ে তুলতে হবে।

উপরে আয়াতটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ইসলামের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিষয়টি যুক্ত করে শোষণ, সম্পদ বন্টনে সুবিচারের অভাব, ঠকবাজির মত ব্যক্তিগত আচার-আচরণের কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু আয়াতটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরও কতিপয় বিষয় অর্থনৈতিক আলোচনায় আসতে পারে।

প্রথমত, আয়াতটি Theory of Unequal exchange-এর ভিত্তি হিসেবে মূল্যবহ। ইম্যানুয়েল বা ফ্রাংকের মত চিন্তাবিদরা বর্তমান অর্থনৈতিক শোষণের

www.pathagar.com

হাতিয়ার হিসেবে Unequal exchange-কে দায়ী করেন। এই Unequal exchange নানাভাবে সংঘটিত হয় ঃ

(ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ে- ব্যক্তিগত ও সামাজিক অর্থনৈতিক আচরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে।

(খ) জাতীয় পর্যায়ে- Inter Sectoral balance-এর অভাবে অর্থনীতি সুবিধাভোগী ও শোষিত শ্রেণী গড়ে উঠে।

(গ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে- ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলো Terms of trade-এর মাধ্যমে দরিদ্র তথা প্রাথমিক উপকরণ সরবরাহকারী দেশগুলোকে ঠকাচ্ছে। এর পরিণামে বিশ্ব অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিতে বাধ্য। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির হালই তার প্রমাণ।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা বালাদ

فَلَااقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا اَدْرٰكَمَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. اَوْاِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ. يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.

অতঃপর সে বন্ধুর গিরিপথ বা কষ্টসাধ্য পথে প্রবেশ করেনি। তুমি কি জান সে বন্ধুর গিরিপথটি কি? তা হচ্ছে– দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, ইয়াতীম আত্মীয়কে, অথবা ধূলি-ধূসরিত (দারিদ্র্য নিষ্পেষিত) মিসকীনকে। অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের। – সূরা বালাদ ঃ ১১-১৭

শব্দার্থ ও টীকা

عقبة বন্ধুর গিরিপথ, কষ্টসাধ্য ঘাঁটি ইত্যাদি। (লিসানুল আরাব) ذا متربة অর্থ-ধূলিমণ্ডল অর্থাৎ ধূলি ব্যতীত যার অন্য কোন অবলম্বন নেই। এটা একটা আরবী বাগধারা, যার আসল অর্থ দারিদ্র নিষ্পেষিত। اقتحام। নিজেকে নিজে কোন শক্ত ও কঠিন শ্রমমূলক কাজে জড়িত করা।

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

فلا اقتحم العقبة এ আয়াতের তাৎপর্য হল, আমি মানুষকে যে পথ দেখিয়েছি এ পথটি অতীব দুর্গম ও বন্ধুর। এ পথে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করতে হয়। এ পথের পথিককে নিজের প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা ও শয়তানী

www.pathagar.com

লোভ-লালসার সাথে রীতিমত লড়াই করে চলতে হয়। অন্য পথটি হল খুবই সহজ। কিন্তু তা নীচের দিকে গহ্বরের মুখে চলে গেছে। এ পথে চলার জন্য কোন প্রকার কষ্ট স্বীকারের বা শ্রম করার প্রয়োজন হয় না। এজন্য শুধু প্রবৃত্তির বাঁধনকে ঢিলা করে দেওয়াই যথেষ্ট। অতঃপর পথিক স্বতঃই নীচের দিকে নেমে যায়। যে মানুষকে আমি উভয় পথই দেখিয়েছি, সে নীচের দিকে যাবার সহজ পথ অবলম্বন করে বসল, উপরের দিকে যাবার কষ্টজনক পথে সে প্রবেশ করেনি।

সে কষ্টজনক বন্ধুর পথে চলতে ব্যক্তিকে নিজের প্রবৃত্তির উপর বল প্রয়োগ করতে হয় এবং নানাভাবে ত্যাগ ও তিতিক্ষা অবলম্বন করতে হয়, সেসব অর্থ ব্যয় ও সেসব খাতের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। আর তা হল, দাসমুক্ত করা, কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে ঋণ থেকে মুক্ত করা, নিরুপায় ব্যক্তিকে জীবিকার উপায় করে দেওয়া। অনুরূপভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্নদান করা– সে আত্মীয় ইয়াতীম হোক বা প্রতিবেশী ইয়াতীম এবং দারিদ্র্য প্রপীড়িত ও অসহায় ধূলি মলি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দান। এসব অর্থ ব্যয়ে কারো খাতিরে ঢোল বাজিয়ে উঠেন। এতে কারো ঐশ্বর্যশালী হওয়া বা দানশীল হবার খ্যাতি হয় না।

মিসকীন গরীবদের সাহায্য পর্যায়ে নবী করীম (স.) বলেন ঃ

الساعى على الارملة والمسكين كالساعى فى سبيل الله واحسبه اتل كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر-

তবে এসব সৎকর্ম গৃহীত হবার জন্য ঈমানদার হওয়া অপরিহার্য। বিভিন্ন আয়াতে এ সত্য তুলে ধরা হয়েছে।

–সূরা নিসা ঃ ১২৪, সূরা নাহল ঃ ৯৭; সূরা মু'মিন ঃ ৪০

সর্বশেষ যে গুণটি অর্জন করা দরকার, তা হল– ধৈর্য ও অনুকম্পা। রাসূল (স.)-কে অনুকম্পার মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

– তাফহীমুল কুরআন, টীকা নং ১১, ১২, ১৩ ও ১৪, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৫০

এ আয়াতের তাফসীরে মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেছেন ঃ মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আযাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎকর্মের মধ্যে প্রথমে فك رقبة অর্থাৎ দাসমুক্ত করা। দ্বিতীয় সৎকর্ম হল ক্ষুধার্তকে অন্নদান। বিশেষভাবে আত্মীয় ইয়াতীমকে অন্নদান করা এবং আত্মীয়-মিসকীনকে আহার্য দান করা। দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা তাড়িত অসহায় নিঃস্ব মানুষদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা। মু'মিনের সৎকর্মের মধ্যে আরো কর্তব্য হল,

www.pathagar.com

সে অপরাপর ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া সবরের অন্তর্ভুক্ত।

–মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২২

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

ইসলাম যে ধরনের অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের পথ-নির্দেশ পেশ করেছে তার মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে ক্ষমাশীল, দয়ালু এবং আর্ত-মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ রূপে গড়ে তোলা। সরাসরি দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করার মাধ্যমে যেমন মানবতার সেবা করা যায়, কল্যাণমূলক অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেও এটা করা যায়। অন্য কথায় ইসলাম কল্যাণমুখী welfare-oriented অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায়। শুধুমাত্র উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার (Growth Rate) দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির অবস্থান নির্ণয়ে এ ব্যবস্থা বিশ্বাসী নয়। আধুনিক অর্থনীতিতেও দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত মাপকাঠি হলো দারিদ্র্যসীমার উপরে জনগণের শতকরা কত ভাগ বাস করে এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রে অর্থনীতি কতটা সক্ষম। মাথাপিছু আয় অথবা জাতীয় আয় বা প্রবৃদ্ধির হার দিয়ে আজকাল আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিচার করা হয় না। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা দেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে যেসব প্রকল্প সাহায্য প্রদান করে তারাও অন্ততঃ বলে থাকে যে সবের অন্যতম লক্ষ্য হলো দরিদ্র্য দূরীকরণ বা alleviation of poverty। সাহায্য গ্রহীতা দেশগুলো এক্ষেত্রে কতটা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম, তা দিয়েই এ পর্যায়ে পরবর্তী সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে অর্থনীতির এ মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন একটি অতি দুরূহ বিষয়, সেজন্য এখানে এ কাজটিকে বন্ধুর গিরিপথের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

অবশ্য দারিদ্র্য বিশেষণের সাধারণ প্রেক্ষাপট ব্যতীত বিশেষ বিশেষ অবস্থা যেমন দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে সাহায্য করার বিষয়টিও এসব আয়াতের মর্মার্থের মধ্যে পড়ে।

- হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আদ-দোহা

وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى. فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ. وَاَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়। অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।

– সূরা আদ-দোহা ঃ ৮-১১

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

নবী করীম (স.)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন– আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রা.)-র ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়। অতঃপর খাদীজা (রা.)-কে বিয়ে করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়। (এ বিষয়ে) তিনটি নিয়ম উল্লেখ করার পর তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ ঃ فاما اليتيم فلا تقهر قهر–শব্দের অর্থ জবরদস্তি-মূলকভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধন সম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স.) ইয়াতীমের সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মুসলমানদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে গৃহে ইয়াতীম রয়েছে এবং যার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। (মাযহারী)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় নির্দেশ ঃ واما السائل فلا تنهر – نهر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া এবং سائل অর্থ সাহায্য প্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত– উভয় প্রকার সাহায্য প্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্য প্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায়, তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোন প্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেওয়াও জায়েয। তৃতীয় নির্দেশ ঃ واما بنعمة ربك فحدث ধমক تحدث শব্দের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটি একট পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে তারও শোকর আদায় করে না সে আল্লাহ্ তা'আলারও শোকর আদায় করে না। (মাযহারী)

– তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪২

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে নিঃস্ব অবস্থা থেকে ধনী বা ধনশালী হওয়ার প্রক্রিয়া এবং ধনশালী হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নবী করীম (স.)-এর উদাহরণের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। মানুষের জন্য সম্পদ ও রিযিক আল্লাহ্ পাক বিশ্বময় ছড়িয়ে রেখেছেন। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে সঠিক পন্থায় তা অর্জন করার জন্য পরিশ্রম করে যাওয়া। এই পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসেবে কোন কোন নিঃস্ব লোকও সম্পদশালী হয়ে যায়। অনেকে অনেক কৃচ্ছ্র সাধনার পরও তেমন কিছু লাভ করতে পারে না। এখানেই আল্লাহ্ পাকের মর্জি এবং রহমত ক্রিয়াশীল। তবে মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে চেষ্টা করে যাওয়া। সূরা নজমে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى

মানুষের জন্য চেষ্টা সাধনা করা ছাড়া করার কিছু নেই।

তবে মানুষ চেষ্টা-সাধনা করেও ভাগ্যের কোন তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি ঘটাতে না পারলে নিরাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে।

لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

www.pathagar.com

এ ধরনের প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যারা সম্পদ লাভ করে সে সম্পদ কিভাবে ব্যয় করা হবে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই সম্পদ লাভের পর নিঃস্ব, ইয়াতীম এবং মিসকীনদের প্রতি সদয় হওয়া ও যাকাত, দান ও সদকা করা তার উচিত। তার নিঃস্ব জীবনের বিষয় চিন্তা করে ইয়াতীমদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে থাকা উচিত নয় এবং কোন সাহায্য প্রার্থীকে বিমুখ করা উচিত নয়। শুধু তাই নয়, ইয়াতীম, দুঃস্থ এবং প্রার্থীদের প্রতি সদয় এবং হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ ছাড়াও তার উচিত আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং নিয়ামতের শোকর আদায় করে তার প্রশংসা করা।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে মূলত একজন Ideal Entrepreneur এবং consumer-এর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক আলোচনায় ইসলামী অর্থনীতির expenditure pattern উন্নয়নে উক্ত আয়াতগুলো দিক-নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আলাক

كَلاَّ اِنَّ الاِنْسَانَ لَيَطْغٰى. اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰى.

মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। – সূরা আলাক ঃ ৬

আয়াতদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবূ জাহিলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের উপর নির্ভর হয়ে চলে ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয় তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিত্তশালী শাসন ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধন-জন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরওয়াই করে না। আবূ জাহিলের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমন কি সমগ্র শহরের লোক তাকে সমীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রাসূলে করীম (স.)-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে এবং ভালমন্দ কর্মের হিসেব দেবে। অবাধ্যতার পরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে,

এ আয়াতে গর্বিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্যে বলা হয়েছে ঃ হে নির্বোধ মানুষ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর। কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, মানুষকে আল্লাহ্‌ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সে একা একা কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি দৃষ্টি দিলেও দেখতে পাবে যে, সে হাজারো মানুষের পরিশ্রমের ফল গিলে খাচ্ছে। এত হাজার মানুষকে কাজে নিয়োজিত করার সাধ্য কার আছে?

– তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭০

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের বিস্তৃত আলোচনা থেকে দেখা যায় অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে মানুষের সামাজিক আচরণের একটি সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ মানুষের ক্ষমতা (অর্থনৈতিক ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত) থাকলে এবং কারো উপর নির্ভরশীলতা না থাকলে সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিত্তবান লোকেরাই মূলত সামাজিক/রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা মানুষকে সীমালংঘনে প্ররোচিত করতে পারে। এ ব্যাপারে মানুষের নিয়ন্ত্রণকারী lever হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়, পরকালের শাস্তির ভয়, জবাবদিহির ভয়। তাই অর্থনৈতিক তত্ত্ব উদ্ভাবনে মানুষের এই আচরণ প্রবণতাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং তত্ত্ব নির্মাণের ভিত্তি নির্বাচনে ব্যবহার করতে হবে।

- মোঃ জহুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তাকাছুর

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ.

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। **– সূরা তাকাছুর ঃ ১-২**

কেউ কেউ আয়াত দু'টির বঙ্গানুবাদ করেছেন এভাবে ঃ প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে উদাসীন রাখে এমন কি, তোমরা যখন কবরস্থানে পৌঁছে যাও।

– তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ تكاثر শব্দটি كثر শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.) এই তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ (র.) এ অর্থই করেছেন। ইবন আব্বাস (রা.) একবার এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ-সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা। (কুরতুবী)

حتى زرتم المقابر এখানে কবরস্থান যিয়ারত করার অর্থ মৃত্যুবরণ করে কবরে পৌঁছা। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ حتى ياتيه الدن অর্থাৎ মৃত্যু আসা পর্যন্ত। (ইবনে কাসীর)

অতএব আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফিল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসেব-নিকেশের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং

www.pathagar.com

এমনি অবস্থায় মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তোমরা আযাবে গ্রেফতার হও। এ কথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। ... হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূল (স.) বলেন ঃ 'আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেও সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দু'টো উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো মাটি (কবরের) ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। (বুখারী)

তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা মওদূদী (র.) তাফহীমুল কুরআনে উক্ত হাদীসের উদ্ধৃতি সহ প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তবে الهكم التكاثر। 'তাকাছুর বেশী বেশী পাবার লোভ-লোকদিগকে নিজের মধ্যে গ্রাস করে। কোন্ জিনিস থেকে গাফিল করে দিয়েছে তা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এ কারণে এর তাৎপর্যেও অত্যন্ত ব্যাপকতার অবকাশ রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, তাকাছুর-বেশী বেশী পাওয়ার লোভ এমন প্রত্যেকটি জিনিস হতেই তাদেরকে গাফিল করে দিয়েছে, যা উহার তুলনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে, পরকালের পরিণতির ব্যাপারে নীতি নৈতিকতার সীমা সরহদ্দের মত, সকল ব্যাপারে গাফিল হয়েছে। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করে, দুনিয়ার চিন্তা মানুষকে এতই তন্ময় ও মশগুল রাখে যে উহা হতে উন্নততর কোন ভাল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার চিন্তাও করতে পারে না।

উভয়ের আলোচনা থেকে মানুষের মৌল বৈশিষ্ট্যের চিত্র পাওয়া যায়, যা অর্থনৈতিক তত্ত্ব নির্মাণে সহায়তা করতে পারে। বৈশিষ্ট্যগুলি এভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

১. মানুষের মধ্যে দুনিয়াবী স্বার্থ চিন্তা তার মৌল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মানুষ যেমন সামাজিক বা রাজনৈতিক জীব, তেমনি সে অর্থনৈতিক জীবও (Economic being) বটে।

২. এই স্বার্থ চিন্তা বা আত্ম-স্বার্থ চরিতার্থ করার কামনা তাদের বৈধ/অবৈধ পন্থা সম্পর্কে উদাসীন করে দিতে পারে। সে জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে এই স্বার্থরক্ষার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৩. স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য মানুষের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করার প্রবণতা প্রবল। এই প্রতিযোগিতা বর্তমান অর্থনৈতিক উদ্ভাবনীর ভিত্তিভূমি। কিন্তু ইসলাম এই প্রতিযোগিতার ধারণার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণা অর্থনৈতিক তত্ত্ব নির্মাণের ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করতে প্রয়াসী।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় ইসলামী অর্থনীতির আলোচনার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কতিপয় গুণকে হাক্কুল্লাহ্ এবং হাক্কুল ইবাদ সংক্রান্ত সকল ব্যাপারেই গাফিল হয়েছে। মওলানা মওদূদী আরও বলেন ঃ ধন-সম্পদ কেমন করে খুব বেশী বেশী অর্জন করবে সে চিন্তায় তারা দিশেহারা কিন্তু তা কোন্ উপায়ে পাওয়া যাবে, সে উপায় বৈধ কি অবৈধ, সংগত কি অসংগত সে বিষয়ে তাদের কোন চিন্তা-বিবেচনা নেই। আনন্দের সুখ ও শান্তি এবং দৈহিক স্বাদ-আস্বাদনের উপকরণ তাদের পেতে হবে; কিন্তু এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে এই লালসা-সমুদ্রে ডুবে সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ গাফিল হয়েছে। বেশী বেশী শক্তি, বেশী বেশী সৈন্য-সামন্ত ও বেশী বেশী অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে এবং এ ব্যাপারে তারা চরম প্রতিযোগিতায় নেমেছে, অন্যদের তুলনায় কি করে বেশী পরিমাণ ও অধিক মারাত্মক অস্ত্র সংগ্রহ করা যাবে তার চিন্তায় দিন রাত মশগুল হয়ে আছে। কিন্তু এ সবের ফলে আল্লাহ্‌র পৃথিবী জুলুমে ভরে যাবে, মানব জাতি মারাত্মকভাবে ধ্বংস হবে সে কথা একবারও তাদের মনে উদয় হয় না। এক কথায় 'তাকাসুর'– বেশী বেশী পেতে চাওয়ার লোভ অনেক রকমের, অনেক ধরনের ও নানা রূপের এবং তা দুনিয়ার ব্যক্তি ও জাতি, ব্যক্তি ও সমষ্টিকে নিজেদের মধ্যে গ্রাস করে নিয়েছে। দুনিয়া-দুনিয়ার স্বার্থ ও সুখ-আমাদের উর্ধ্বে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

মানুষের পার্থিব, বৈষয়িক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেশী বেশী ধন-সম্পদ, দুনিয়াবী স্বার্থ, মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে তারা ধ্রুব (axioms) হিসেবে ধরে নিতে চায়, ফলে এ তত্ত্ব বর্তমান পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পৃথক তত্ত্ব গড়ে তোলে।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হুমাযা

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَه. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَه. كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ.

যে অর্থ জমায় ও উহা বারবার গণনা করে, সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হুতামায়।

– সূরা হুমাযা ঃ ২-৪

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

শব্দার্থ

মূল শব্দ হল همزة لمزة। আরবী হুমাযাহ, লুমাযাহ, অর্থের দিক দিয়ে প্রায় সমার্থবোধক। অর্থের দিক দিয়ে শব্দ দু'টি এতই কাছাকাছি যে কখনও শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সে পার্থক্যও এমন যে, স্বয়ং আরবী ভাষাভাষী লোক 'হুমাযাহ' শব্দের যে অর্থ বলে অন্য কিছু লোক ঠিক সেই অর্থই বলে 'লুমাযাহ' শব্দের, পক্ষান্তরে কিছু লোক লামজ-এর যে অর্থ বলেন, অন্য কিছু লোকের মতে উহাই হলো হামজ-এর অর্থ। এখানে এ দু'টো শব্দ একই সংগে এক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে উভয়ে মিলিতভাবে এই অর্থ প্রকাশ করেঃ যে ব্যক্তির অভ্যাসই হয়েছে অন্য লোকদিগকে ঘৃণা ও অপমান করা। কাউকে দেখতে পেলে অংগুলি সংকেত করে, তাকে কটাক্ষ করে, কারও বংশের উপর অভিসম্পাত করে, কলংকিত করে, কারও ব্যক্তি চরিত্রে দোষারোপ করে। কাউকে সামনা-সামনি আঘাত হানে, অনুপস্থিতিতে চারিত্রিক কুৎসা রটায়। কোথাও চোখলখুরি

www.pathagar.com

ও কুটনাগিরি করে একজনের কথা অন্যজনকে বলে পরস্পরকে বোকা বানায়। এ ধরনের লোক সম্পর্কেই এখানে কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে তার ধ্বংস নিশ্চিত।

প্রথম কথাটির পর এই দ্বিতীয় কথাটি বলায় এর অর্থ স্বতঃই এ দাঁড়ায় যে, সেই লোক অন্যদের অপমান লাঞ্ছনার যে কাজ করে, তা তার ধনশীলতার অহংকারের দরুন করে। جمع مالا বলার অর্থ সে বিপুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করে। আর 'গুণিয়া গুণিয়া রাখে' বলায় সেই ব্যক্তির কার্পণ্য ও অর্থপূজার হীন মানসিকতা চোখের সামনে ভেসে উঠে। ৩য় আয়াতের প্রেক্ষিতে তাফহীমের ভাষ্য ঃ উপরে বর্ণিত অভিশপ্ত লোকেরা মনে করে যে, তাদের অর্থসম্পদ তাদেরকে চিরন্তনী জীবন দান করবে- চিরকাল বাঁচাবে, রক্ষা করবে। অর্থ ও ধনসম্পদ-সঞ্চয় করার এবং উহাকে গুনিয়া গুনিয়া রাখার কাজে সে এতই তন্ময় যে, তাদেরকে যে মরতে হবে সে কথাও তারা বেমালুম ভুলে বসেছে; তার মৃত্যুর কথা তার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। তাদেরকে যে এসব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দুনিয়া থেকে চিরদিনের তরে সম্পূর্ণ রিক্ত হাতে বিদায় নিতে হবে, সে কথা কোন অসতর্ক মুহূর্তেও তাদের স্মরণে আসে না।

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহ্র শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গোনাহ , তিনটি হচ্ছে همز، لمز ও جمع مال। প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে همز এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لمز এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ্। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে-যে এ গোনাহে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখ নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ্ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে لمز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার সম্মুখে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়, এর কষ্টও বেশী। ফলে শাস্তিও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন ঃ

আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রবিষ্ট করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

www.pathagar.com

যেসব বদ অভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থ লিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বারবার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা না হয়, কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দীনের জরুরী কাজ বিঘ্নিত হয়।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা তাকাসুরে অর্থ-সম্পদ অর্জনের জন্য অর্থহীন প্রতিযোগিতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। অত্র সূরার আলোচ্য আয়াতে এভাবে অর্জিত সঞ্চয় করে রাখার দুঃখজনক পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। যারা মাল-সম্পদ জমা করে এবং খরচ না করে বার বার গুণে গুণে দেখে যাতে মালের কমতি না ঘটে। ধনসম্পদ অর্জন করে যদি তা ব্যয় না করে তবে তা যেমন নিজের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় না, তেমনি তা সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণে কোন কাজে আসে না।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে উন্নয়নগামী দেশসমূহে Capital Formation একটি বড় সমস্যা। অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য Capital Formation সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। তাই ধনসম্পদ যক্ষের মত সঞ্চয় করে রাখার পরিণতি সামষ্টিক অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই সমষ্টিগত পুঁজি গঠন করে, যদি এ সঞ্চয় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাধীনে বিনিয়োজিত হয়।

দ্বিতীয়ত, অর্জিত ধন-সম্পদ থেকে খরচ করার ফলে কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতি সম্প্রসারিত হয়।

তৃতীয়ত, অত্যধিক সঞ্চয় প্রবণতা এবং খরচ না করার মানসিকতা অর্থনীতিকে সংকুচিত করে এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে মন্দার সৃষ্টি করে, যার ফলে গোটা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অর্থনীতিও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ পাক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অধীনে একটি সুষম অর্থনীতি সংগঠনের যে নীল নকশা পেশ করেছেন, তাতে পুঁজির ভূমিকা এবং পুঁজির যোগানের একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। এই ব্যবস্থার কোন অবাঞ্ছিত লংঘন হলে তা যেমন ব্যক্তিকে তেমনি সমষ্টিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কুরায়শ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ. اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ. الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ. وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.

কুরায়শের আসক্তির কারণে, তাদের আসক্তির কারণে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের অতএব তারা যেন ইবাদাত করে এ ঘরের পালনকর্তা, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।

– সূরা কুরায়শ

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেছেন, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচা এমন ছিল না যে, ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। এ জন্যেই কা'বা প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করেছিলেন, واورزق اهله হে আল্লাহ্! এতে বসবাসকারীদেরকে রিযিক দান করুন। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রপিতামহ হাশিম কুরায়শকে ভিনদেশে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠান্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়ায় সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়েমেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বিধায় শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদেম হবার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সরদার হাশিমের নিয়ম ছিল এই যে, ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি কুরায়শের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বন্টন করে

www.pathagar.com

দিতেন। ফলে তাদের দরিদ্র ও ধনী সমান গণ্য হত। আলোচ্য আয়াতে মক্কাবাসীদের এসব নিয়ামতের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গৃহের মালিকের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুখী জীবনের জন্য যা দরকার তা সমস্তই তাদের দেওয়া হয়েছিল। পানাহারের সাজ-সরঞ্জাম এবং দস্যু-শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

– মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১৬-১০১৭

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি এ আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, আল্লাহ্‌ তার জন্য উভয় জাহানে নিরাপদ ও শংকামুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

– তফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৩

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ সূরার প্রেক্ষিতে তাফসীর থেকে যে জিনিসটি গুরুত্ব লাভ করেছে, তা হল ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলতে হয়। কোন্ মৌসুমে কোন্ অঞ্চলে ব্যবসায় লাভবান হওয়া যাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। ধনসম্পদ ও বাণিজ্যিক সামগ্রী পরিবহনের জন্য নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করা দরকার। রাহাজানি, লুটতরাজ, হাইজ্যাক ইত্যাদি অনভিপ্রেত ঘটনা থেকে সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করতে হবে। আদর্শ সমাজ কাঠামোতে ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র ইবাদত বা দাসত্ব স্বীকার করানোর মত ব্যবস্থাই বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। কেননা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ও ধর্মভীরু জনগণ এটা নিশ্চিতভাবে মেনে নেয় যে, রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র হাতে; সুতরাং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া পার্থিব নিরাপত্তা ও পরকালীন আযাবের ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এমন ধর্মভীরু সমাজ জীবনে মানুষ সর্বত্রই শান্তির নীড়ের সন্ধান পায়।

বর্তমান সমাজে আমরা এহেন শান্তির সন্ধান সুদূরপরাহত মনে করি; কেননা বস্তুবাদী দর্শন ও অর্থনৈতিক অকল্যাণকামিতা মানুষকে দিন দিন অস্থিমতায় নিমজ্জিত করছে। হত্যা, লুণ্ঠন, অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি এবং পরের সম্পদ আত্মসাতের মত ভয়ানক কাজ সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির মূল কাঠামো

www.pathagar.com

তৈরি করতে হলে আল্লাহ্ ভীতির মূল্যায়ন অপরিহার্য। তা হলেই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিরাপত্তার অধীনে সবাই সুখের মুখ দেখবে।

বস্তুত ইসলামী দর্শনের মূল কথাই এটা যে, মানুষের পার্থিব সকল কাজ কর্মের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অথবা অ-অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন– মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তিনিই আমাদেরকে সবকিছু প্রদান করেছেন। ফলে মানুষের সকল কাজকর্মে এর প্রতিফলন থাকবে। বস্তুবাদী দর্শনের সাথে এখানেই ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন তথা ইসলামী দর্শনের মৌলিক পার্থক্য।

- শামসুল আলম খান

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

ইসলামী অর্থনীতিতে মৌল প্রাকৃতিক সংজ্ঞা ও ভাবধারণা

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা ও পরিধি আধুনিক অর্থনীতির বিবর্তিত সংজ্ঞা ও পরিধি থেকে যথেষ্ট ভিন্নধর্মী ও ব্যাপক। ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষের জীবনের কল্যাণকে অনুসরণ করাই লক্ষ্য নির্ধারিত। এ শুধু জড় জীবনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সাহায্যে positive economics প্রতিষ্ঠিত করে না। মানুষের কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যকে সফল করার জন্য সামগ্রিক ও সমন্বিত বৃহত্তম জীবন সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে। এ ক্ষেত্রে জীবন শুধু জড় জীবন নয়, শুধু ইহকালের জীবনও নয়। অর্থনৈতিক আচরণকে যাতে সেই সামগ্রিক ও সমন্বিত ইহকাল-পরকালের সর্বোত্তম সমৃদ্ধি ও কল্যাণ অর্জনের উপযোগী করা যায় এবং অর্থনীতির ব্যবস্থাপনাকেও তেমনি উপযোগী করা যায়, ইসলামী অর্থনীতির পরিকল্পনাতে ও ভাবধারণাতে তারই ব্যবস্থা অন্তর্নিহিত রয়েছে। এই ভিত্তিগত পরিকল্পনা ও ভাবধারণা আল-কুরআনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আয়াতের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায়।

বর্তমানকালের অর্থনীতির বিজ্ঞানরূপে তত্ত্বগত দিক এবং ব্যবহারিক দিককে মানুষের নৈতিক চরিত্রগত বিবেচনা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা হয়। সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণেও জড় অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জন ও বিতরণ ব্যবস্থার যুক্তিবাদকে মূল্যায়ন করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ইসলামী জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্যের জন্য তেমনি বিবেচনা ও পদ্ধতি প্রয়োগ সংকীর্ণধর্মী। কারণ এতে মূল্যাবোধের নিরীক্ষা (norm) যেমন ধর্তব্য থাকে না, তেমনি আবার ইহকাল-পরকালের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসৃত সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যও নির্ধারিত থাকে না।

www.pathagar.com

সংকীর্ণ অর্থনৈতিক আধুনিক সংজ্ঞার অধীনে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় মৌল সম্পদকে বলা হয় factor of production (উৎপাদনের উৎপাদক)। আবার সমষ্টিগতভাবে এ সকল উৎপাদককে productive resources-ও বলা হয়। এ সকল উৎপাদক বা সম্পদকে অর্থনীতির ক্লাসিক্যাল যুগের পণ্ডিত এডাম স্মিথ থেকে শুরু করে বিবর্তিত প্রথায় চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে বলা হয়- ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন (উদ্যোগ)। ইংরেজীতে বলা হয় Land, Labour, Capital and Organization (enterprise entrepreneurship)। ইসলামী অর্থনীতিতেও এ সকল উৎপাদক বা সম্পদের ব্যবহার ভিত্তি করেই উৎপাদন প্রক্রিয়া সংগঠিত ও প্রচলিত থাকবে। কিন্তু প্রত্যেকটি উৎপাদক বা মৌল সম্পদের সংজ্ঞা ও ভাবধারণাতেই এক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য প্রবেশ করে। এ পার্থক্য মৌলধর্মী। কারণ কৃত্রিমভাবে এ ক্ষেত্রে সংজ্ঞা ও ভাবধারণার পরিধিকে সীমিত এবং বাজারে বিনিময়ের উপযোগী পণ্য বা সেবা উৎপাদন লক্ষ্যেই নির্ধারিত করা হয় না। ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে শুধু land and natural resources বলে আখ্যায়িত করলেই চলে না। এ সকল সম্পদের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হয়। তেমনি শ্রমকে দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতার ঘন্টা, মাস, বছরের মেয়াদে প্রয়োগকরলেই চলে না। শ্রমকে মানুষের জীবনের সংগে এবং সমাজের সংগঠিত জীবনের সংগে সম্পর্কিত করতে হয়। আর উক্ত সম্পর্কিত করা ব্যাপারেই আবার মানুষের স্রষ্টার বিধানের প্রয়োগকে বিবেচনার পরিধিতে আনতে হয়। পুঁজি ও সংগঠনকে প্রচলিত পদ্ধতিতেও মৌল ধরা হয় না। ইসলামী অর্থনীতির কাঠামোতেও তাই। তবে অমৌল ছাড়াও তখন নতুন বৈশিষ্ট্যের বিবেচনা আসে। শুধু ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে উদাহরণ হিসেবে ধরে এখানে আমরা ইসলামী অর্থনীতির অধীনে গ্রহণযোগ্য এ উৎপাদকের ভিন্নধর্মী সংজ্ঞা আর ভাবধারণা বিবেচনা করে আধুনিক পাশ্চাত্য অর্থনীতির স্বীকৃত তত্ত্ববিদ আলফ্রেড মার্শালের মতে 'ভূমি' শব্দটিকেই জমি সংক্রান্ত সম্পদ সুবিধাসহ প্রকৃতি প্রদত্ত অন্যান্য সম্পদ সুবিধাকে একত্রিতভাবে বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। তার কথায় 'ভূমি' (Land) বলতে বোঝায়ঃ The materials and of the forces which nature gives freely for man's aid, in land and water, in air and light and heat (Alfred Marhal-Principles of Economics 1939) এখানে তবু ভূমির সংজ্ঞাতে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রায় সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত রাখার প্রয়াস রয়েছে। শুধু প্রকৃতি (Nature) যে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিগত সম্পদ শক্তি এবং তার বিধি বিধান বোঝায় এটুকু ধরে নিলেই ইসলামী দর্শন ও ভাবধারণার কাঠামোর সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে ইসলামী দর্শন ও ভাবধারণার কাঠামোকে আমরা প্রধানত দেখতে পাই সূরা ইব্‌রাহীমে; সূরা হিয্‌রে এবং সূরা নাহ্‌লে।

সূরা ইব্‌রাহীম (৩২-৩৪)

"তিনিই আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের জন্য রিযিক উৎপাদন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন। যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদনদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।"

"এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে (অভ্যস্ত সেবক হিসেবে) আর দিন-রাত্রিকেও তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন।"

"যে সকল বস্তু তোমরা (প্রকৃতিগতভাবে) চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত (অর্থাৎ প্রদত্ত দান সম্পদ) গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না......।"

সূরা হিজ্‌র (১৯-২২)

আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি।" "আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও সৃষ্টি করেছি, যাদের তোমরা রিযিক দাও না।"

"আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা প্রদান করি।"

"আমি বৃষ্টিগর্ভ বাতাস পরিচালনা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে পান করাই। তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই।"

সূরা নাহ্‌ল (১০-১৬)

"তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।"

"এ পানি দ্বারা (তিনিই) তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল-যায়তুন, খেজুর, আঙুর ও সব রকমের ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

www.pathagar.com

"তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে। নক্ষত্র তারকা সকল তাঁরই বিধানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যে সকল বিভিন্ন ও বিচিত্র বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা (ও গবেষণা) করে।"

"তিনিই কাজে লাগিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা (মৎস্যের) তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলংকার। তুমি তাতে জলযানসমুহকে পানি চিরে চলতে দেখবে-যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র কৃপা অন্বেষণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার কর।"

"এবং তিনি পৃথিবীর ওপর ভারী পর্বত স্থাপন করেছেন যেন তা তোমাদের নিয়ে (ভারসাম্যহীনভাবে) আন্দোলিত না হয়, আর নদী ও পথ তৈরী করেছেন যাতে তোমরা পথপ্রদর্শিত হও।"

"এবং তিনি পথ নির্ণায়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন এবং নক্ষত্র তারকা দ্বারাও মানুষ পথের দিক নির্ণয় করতে পারে।"

উপরোক্ত আয়াতগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করলে দেখা যাবে-এখানে কতকগুলো ভাবধারণাগত বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানত উল্লেখ্য হলোঃ

(ক) প্রকৃতি প্রদত্ত দান বা সম্পদের স্থলে স্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট দান বা সম্পদ বলা হয়েছে।

(খ) এ সকল দান ও সম্পদ মানুষেরই কল্যাণের জন্য।

(গ) যথাযথ কল্যাণের কাজে এ সকলের ব্যবহার করতে হলে অন্বেষণ, অনুসন্ধান, চিন্তাভাবনা বুদ্ধি-বিবেচনা (প্রয়োগের গবেষণা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রয়াস) এবং সম্পদের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

(ঘ) গ'তে উল্লিখিত প্রয়াস ও চিন্তাশক্তির সম্পদও আল্লাহ্‌রই প্রদত্ত।

(ঙ) আকাশ, বাতাস, বায়ুমণ্ডল মৌল ধাতু, মৌল উপাদান(অনু-পরমাণু). পাহাড়. পর্বত, ভূগর্ভস্থ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ, আবহাওয়া, বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ পানির উৎস, বনজ সম্পদ ইত্যাদিসহ এসব কিছু থেকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করার বৈজ্ঞানিক বিধি-বিধানও আল্লাহ্ অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল করে রেখেছেন। সে

www.pathagar.com

সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে মানুষ কল্যাণের লক্ষ্যকে অনুসরণ করবে প্রযুক্তি প্রয়োগ সাহায্যে সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের অধীনে মানুষকে সাহায্য করার জন্য কর্মনিয়োজিত রয়েছে আকাশ, বাতাস, দিন, রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-মহাসাগর, ননদী, জলপথ, স্থলপথ, আকাশ পথ এবং প্রযুক্তি-নির্ভর চলাচল ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুঁজিদ্রব্য, জীবিকাদ্রব্য, নৌযান, স্থলযান ও আকাশ যান ইত্যাদি।

(চ) মৌল সম্পদ সৃষ্টি অবস্থায় পড়ে থাকাই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য নয়, তার যথাযথ ব্যবহার সাহায্যে মানুষের ইহকাল-পরকালের-কল্যাণকে সর্বোচ্চ সম্ভব স্তরে উন্নিত করার লক্ষ্যেই মানুষকে সার্বিক জীবন সাধনার অংগ হিসেবে অর্থনৈতিক প্রয়াস পরিচালনা করতে হবে। এ জন্যই ইসলামী ভাবধারণাতে মানুষের ভূমিকা সর্বপ্রধান। সেজন্যই প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের মানসিক/আত্মিক/আধ্যাত্মিক শক্তিকে একত্রিতভাবে ইসলামী অর্থনীতিতে স্বীকৃত হয় মৌল উপাদান, উৎপাদক বা সম্পদ হিসেবে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে মানুষের মৌল মানসিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করলে সংক্ষেপে ইসলামী অর্থনীতির 'প্রাকৃতিক সম্পদ, ভাবধারণা হবে ব্যাপকতম। এর মধ্যে আলফ্রেড মার্শালের সংজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করে আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের সব, রকম মৌল গুণাবলী ও শক্তিকে সামাজিকভাবে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে অর্থনীতির ও সমাজের কল্যাণ লক্ষ্যের অনুসরণ উপযোগী করা প্রয়োজন। ইসলামী সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন প্রয়াসে এমনি উপযোগী শিক্ষা প্রশিক্ষণের উপস্থিতি হলো পূর্বশর্ত!

আধুনিক অর্থনীতির পাশ্চাত্য বিজ্ঞানরূপ আলফ্রেড মার্শালের সংজ্ঞা থেকেও সংকীর্ণ হয়ে দূরে সরে এসেছে। বর্তমানকালে সৃষ্ট জগতের বিপুল বিশাল অনাবিষ্কৃত সম্পদের পরিধির কথা বিবেচনা না করে শুধু যেসব সম্পদকে মানুষ নিজ প্রয়াসে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধীনে আনয়ন করতে পেরেছে এবং আনয়ন করার সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাকে সংজ্ঞার অধীন করেছে। এমন কি অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অসাধারণ সীমাহীনতা বৈশিষ্ট্যটিকে নির্বাসন দেওয়ার লক্ষ্য শুধু 'ভূমি' (Land) শব্দ ব্যবহার দিয়েই সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে বোঝাতে পদ্ধতিগত চেষ্টা চলেছে এবং তাই প্রথাগত হয়ে গেছে। বলা হয় "Land stands for all natural resources which yield an income or which have an exchange value. It represents those natural resources which are useful and scarce,

১. Dewett and Chand, Modern Economic Theory, Shyam Lal Charitable Trust, New Delhi, 21st Revised ed. (1984) p. 98.

www.pathagar.com

actually or potentially.[১] এ প্রথাগত পদ্ধতিতে অন্যান্য উৎপাদক সম্পদের তুলনায় 'ভূমি' উৎপাদক সম্পদের স্বতন্ত্রকারী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয় এমনিভাবে ঃ

(১) ভূমি মানুষের কাছে প্রকৃতির দান;

(২) ভূমি পরিমাণে অপরিবর্তনীয়;

(৩) ভূমি নিজস্ব গুণে চিরস্থায়ী যেজন্য ভূমির ক্ষমতাকে ডেভিড রিকার্ডো বলেছেন 'মৌল ও ধ্বংসহীন;

(৪) ভূমির ভৌগোলিক স্থানান্তর ক্ষমতা নেই;

(৫) ভূমির গুণাগুণে সীমাহীন বিভিন্নতা রয়েছে;

উপরোক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রধানত জমির ব্যাপারেই এগুলো লক্ষণীয়। কিছুটা অবশ্য ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে। সমুদ্রের ও নদীনালার মৎস্য সম্পদের ব্যাপারেও তাই। কিন্তু আকাশ-বাতাসের উপাদান এবং অণু-পরমাণুর সম্পর্কে উক্ত ধরনের ভাবধারণা প্রযোজ্য নয়। বৈশিষ্ট নির্ধারণও সম্ভব নয়। পদার্থবিদ্যা থেকে শুরু করে অণু-পরমাণুর বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য অনুধাবন করার জ্ঞান ও চিন্তাভাবনা নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা অন্বেষণ করেন, তাঁরাই অসীম অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রের অসীম সম্পদ সম্ভাবনার সন্ধান লাভ করেন। তাঁরা ইসলামী তত্ত্বের অন্তর্গত সৃষ্ট সম্পদের অসীমত্বের প্রমাণ তথ্য পান। মুসলিম বিজ্ঞানী আল-কুরআনের বর্ণিত 'সৃষ্টির সম্প্রসারণশীলতা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পান।

পাশ্চাত্য পাঁচটি বৈশিষ্ট্যকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক মনে করা যায় না। বিশেষ করে প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারেই ইসলামী অর্থনীতিবিদদের প্রতিবাদ। তাদের যুক্তি কাঠামোতে –

(১) ভূমি এবং সকল প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত দান;

(২) ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় নয়, বরং যথেষ্ট পরিবর্তনশীল:

(৩) ভূমির নিজস্ব গুণ চিরস্থায়ী নয়;

প্রথম বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যটি ভাবধারণাতে মৌল প্রভেদ এনে দেয়। প্রকৃতির সত্তাকে সাধারণ মানুষ বুঝে না। প্রকৃতির যা কিছু আছে তার মধ্যে রূপ, সৌন্দর্য ও সম্পদকে মানুষ উপভোগ করে। প্রকৃতি থেকে আহরণকে অনেকটা অপহরণই বলা চলে। প্রকৃতির প্রতি সম্পদ অপহরণকারী কোন দায়িত্ব পালন করে না। সেজন্যেই

www.pathagar.com

Ecological System-এ ভারসাম্য দ্রুত গতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে বর্তমানকালে সভ্য দেশের বিজ্ঞানীরাও শংকিত। তাঁরা নতুন দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারছেন, এ শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে সভ্য সমাজের ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তিবাদের জন্য, সংকীর্ণ অর্থনৈতিক মূল্যবোধের উর্ধ্বলোকের কোন স্থায়ী মুল্যবোধ গ্রহণ না করার জন্য। অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি দায়িত্বশীলতার মূল্যবোধকে (Meta-economic value) ভিত্তি স্বীকার না করার জন্য। ইসলামী দৃষ্টিকোণ সে ভ্রান্তিটিই ধরিয়ে দেয়।[১]

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতি এবং ভূমি পরিবর্তনশীল। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার জন্য এবং প্রকৃতির উপর মানুষের দায়িত্বহীন শোষণ ক্রিয়া পরিচালনার জন্য। ভূমির পরিমাণ নিয়ে ভাংগাগড়া প্রাকৃতিক নিয়ম চলছে-তার নিদর্শন দেখা যায় নদীর প্রবাহ পরিবর্তনে বৃষ্টি বর্ষণ ও পর্বতের বরফগলা স্রোতের পরিবর্তনে নদীর এক পার ভেঙ্গে অন্য পারে চরভূমি গড়াতে আর সাগরের মোহনা। উপকূলের কাছে বিশাল দ্বীপ সৃষ্টিতে। আবার ভয়ংকর ভূ-কম্পনের ফলেও। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'দিকেই আসে পরিবর্তন। বাংলাদেশের বাস্তবতায়ও দৃষ্ট হয় তেমনি নিদর্শন। তার উপর বর্তমানকালে নতুন প্রভাব মানুষের অকল্যাণকর ভূমিকা থেকেই প্রকট হয়েছে। আকাশের ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টির ভয়াবহতা এনেছে।

তৃতীয়ত, ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর বর্ণিত 'মৌল ও ধ্বসহীন' (Original and indestructible) ভূমিগুণ বর্তমান কালের নতুন বিজ্ঞান প্রযুক্তির জন্য অপরিবর্তিত থাকে। কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট অঞ্চলে ভূমি উর্বরতা হারিয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ফারাক্কা বাঁধের প্রতিফল হিসেবে বিশাল পদ্মা নদীর বুকে জন্ম নিচ্ছে ধূ-ধূ বালুকার বালিয়াড়ি আর তীরে তীরে বিশাল এলাকায় উৎপাদিকা শক্তি হচ্ছে বিপুল ক্ষতি। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি সম্পদের প্রাকৃতিক মূল্য রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকলে কল্যাণমুখী পদ্ধতির ব্যবহার করা হতো এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে

---

১. পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ দার্শনিক শুমেকার বলেন ঃ -"As a society we have no firm basis of belief in any meta-ceonomic values, and when there is no such belief the economic calculus takes over. Nature abhors a vacuum and when the available 'spiritual space' is not filled some higher motivation, then it will necessarily be filled by some-thing lower by the small, mean, calculating attitude to life which is rationalised in the economic calculus. (E.F Schumacher, Small is Beautiful, Abacus, London 1978 p. 96 vide chapter on proper use of land).

www.pathagar.com

দায়িত্বশীলতার সংগে কাজে লাগানো হতো সর্বক্ষেত্রে। আর প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমন্বয় এবং সমঝোতার নীতি অবলম্বন সম্ভব হতো।

উল্লেখ্য, ইসলামী, যুক্তিবাদের কাঠামোতে মানুষকে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার কল্যাণ বিধি পালন করে প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব নিতে হয়। সে দায়িত্ব পালন না করলেই স্রষ্টার বিধানের সীমালংঘন হয়। তাওহীদ ভিত্তিক বিধান পালনের সংগে সংগে ইসলামী অর্থনীতির বিধান থেকে পথচ্যুত হলেও তেমনি সীমালংঘন ঘটে। তার ফলে সীমালংঘনকারী মানুষের সমাজে আসে অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সে বিপর্যয় কখনো আসে মন্থর গতিতে আবার কখনো আসে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে। ইসলামী সমাজ অবশ্য তার নিদর্শন ও ইতিহাস আল-কুরআন থেকেই অধ্যয়ন অনুশীলন করে সীমালংঘন পরিহার করে।

সংকীর্ণ অর্থের ভূমিও প্রাকৃতিক সম্পদ' ধরে অর্থনীতিকে সমাজের ও মানুষের কল্যাণ লক্ষ্য অনুসরণ করতে গেলেও দেখা যাবে মানুষের প্রয়োজনের চেয়ে সরবরাহের সসীমতা বা স্বল্পতা এসেছে মানুষেরই অকল্যাণমুখী ভূমিকা অবলম্বনের জন্য। যেমন ঃ

(ক) পৃথিবীর আয়তনের তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। সে পরিস্থিতিতেও পৃথিবীর জল, স্থল ও আকাশ-বাতাসের সম্পদকে পৃথিবীর সকল মানুষের কল্যাণ প্রয়োগের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে ভোগ-বিলাসী স্বার্থপর অহংকারী রাজ্য ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠা গোষ্ঠি। সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ প্রচেষ্টাকে সংকীর্ণ জাতিগত অধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞাভূক্ত করে স্বল্প সংখ্যক জনগোষ্ঠির জন্য বিপুল মৌল সম্পদকে কুক্ষিগত করে নিয়েছে তারা যুদ্ধ কৌশল, অস্ত্র ও সৈন্যবলের জোরে।

(খ) পরবর্তী পর্যায়ে ধাতু ও কারিগরী জ্ঞান প্রয়োগে বিপুল পরিবর্তন ঘটে মানুষের উদ্ভাবনী কৃতিত্বে, যার ফলশ্রুতিতে আসে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও সমর কৌশলে দ্রুত পরিবর্তন, আসে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ও বাণিজ্য বিপ্লব। তার নতুন শ্রম চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হয় এ সব জনবিরল সম্পদশীল দেশের জন্য দাস ব্যবসা সাহায্যে মানুষ শক্তি আমদানী করার। শুরু হয় বাণিজ্যের নামে ঔপনিবেশিক অভিযান এবং কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। মুসলিম সভ্যতার আদর্শবাদী খিলাফত সুলতানাত এ সকল প্রকিয়ার সংগে যথাযথ মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে বাণিজ্যিক ও মৈত্রীচুক্তি সাহায্যে করে যায় সহযোগিতা।

www.pathagar.com

(গ) তৃতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কঠোর দ্বন্দ্বের ফলে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যেই ঘটে সহিংস বিরোধও সংঘর্ষ। এলো দু'টি বিশ্বযুদ্ধ। সে পরিস্থিতিতে দেশ ও রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ধ্বংসলীলার ফলে সারাবিশ্বে এলো আমূল পরিবর্তন।

যুদ্ধজয়ী পাশ্চাত্য মিত্রশক্তিগুলো তাদের স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূলে সৃষ্টি করল নতুন মানচিত্রের দেশ ও জাতি। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হলো তথাকথিত উন্নত দেশের নতুন উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার। তারই মধ্যে বিচিত্র বেশে মঞ্চস্থ হতে থাকল পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য আর সমাজতন্ত্রবাদী সোভিয়েট জোটের পরাশক্তি ভূমিকা এবং দুই পরাশক্তির কল্যাণধ্বংসী পারমানবিক ও অন্যান্য সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতা। সে প্রতিযোগিতার অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের শিকার হলো জনবহুল সম্পদশোষিত তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো। তারই অন্তর্গতভাবে সংগ্রামশীল অস্তিত্ব চলল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শক্তিহীন কাঠামো, যাকে বলা হয় মুসলিম উম্মাহ্। সে কাঠামোর মধ্যেই এখনো সংগ্রাম করে চলছে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বহীন অধুনা ঘোষিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র।

(ঘ) মুসলিম উম্মাহ্র অধীনে দেশগুলো যার যার জাতীয় নেতৃত্বাধীনে বাস্তবতার সংগে সমঝোতা করে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সে সমঝোতাতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্র ছাড়াও বিজ্ঞান প্রযুক্তি আর আত্মরক্ষার অস্ত্র সরবরাহ ব্যাপারে রয়েছে দুই পরাশক্তি জোটের উপর নানা মাত্রার নির্ভর-শীলতা। এমনি বাস্তবতায় ইসলামী আদর্শবাদের অর্থনীতি কাঠামো অব্যাহত থাকতে পারে না, নিজস্ব শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে পরাশক্তিগুলোর মুকাবিলাও করতে পারে না। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর সমাজ ও মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা ও আদর্শবাদ সম্পর্কে সচেতনতা নতুন রেনেসাঁ যুগের সূচনা করেছে অনেকগুলো দেশ। তার প্রেক্ষিতে নতুন গবেষণা ও নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যম নতুন ভাবে আদর্শবাদী কাঠামোকে সক্রিয় ও ক্রমে ক্রমে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর করার সাধনায় কর্মতৎপরতা সব দেশেই চলছে। সে প্রেক্ষিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার এবং পাঠ্যপুস্তকের অনুসরণে আমাদের বাংলাদেশের মতো অন্য আরো দেশেও পাশ্চাত্য সংজ্ঞা আর ভাবধারণা নিয়েই অনেক পরিমাণে চলে আসছিল। মুসলিম দেশগুলোতে তার পরিবর্তন আনয়ন করার দায়িত্ব এসব দেশের নেতৃত্বের। সারা পৃথিবীকে একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় একক ধরে 'ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ' উৎপাদক (Factor of Production) ভিত্তি করে কোন মুসলিম রাষ্ট্র বা

www.pathagar.com

উম্মাহ্ই অর্থনৈতিক কাঠামো সংগঠন করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু গবেষকরা তুলনামূলকভাবে অনুশীলন বিশ্লেষণ করে নিশ্চয়ই দেখাতে পারেন, তেমনি আদর্শ কাঠামোতে মানুষের জন্য কতো অধিকতর কল্যাণ সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে এবং সারা বিশ্বের মানুষের কল্যাণের স্বার্থ সে পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হওয়ার মতো আন্তর্জাতিক ও সমন্বিত জাতীয় প্রয়াসের উন্নয়ন পরিকল্পনা আর তার বাস্তবায়ন 'বুদ্ধিমান' ও চিন্তাগোষ্ঠিরই তো কর্তব্য এবং দায়িত্ব। এ দিকে অগ্রসর হতে হতেই নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানীরা এবং অর্থনীতিবিদরা সংস্কার সাহায্যে খুঁজে পাবে ব্যাপক কল্যাণের অনুসারী তত্ত্ব সংগঠনের প্রাথমিক মৌল ভিত্তিরূপে 'ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের' যথাযথ সংজ্ঞা ও ভাবধারণা।

- অধ্যাপক রায়হান শরীফ

www.pathagar.com

শব্দসূচি

অ

অস্ট্রেলিয়া ২৫৮, ৩০৩

অক্সিজেন ২৫৯

আ

আইকা সম্প্রদায় ২৯৮

আকসাম ইব্‌ন সায়ফী (রা.) ৩১৯

আহ্‌মাদ মুস্তফা আল-মারাগী (র.) ৩৮, ৪২, ৬৪, ৭০, ১৩৭, ১৩৯, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০

আকীদা ৩৮, ৭১, ১৫৪, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৩, ১৬৫, ২৭১, ২৭৮, ৩৩৭, ৪০৯, ৪২১

আঙুর ৭৮, ৩০৫, ৩০৭, ৩১২, ৪১১, ৪১২, ৪৮৪, ৪৮৮, ৫৩৫, ৫৬২,

আপেল ২৫৮

আত্-তিব্বুন নবী ২২৪

আদল ৪০, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪

আদ ১১৯, ২০৭

আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী ২৭৬

আনার ৭৮

আন্ডার ইনভয়েসিং ৪৪৮

আনফাল ১৩৯

আবুল হাশিম ৮৯

আবূ আবদুল্লাহ্ রাযী ৩২০

আবূ দাউদ (র.) ৯২, ১৩৫, ১৩৬, ১৮৫, ২৬২

আবূদ দারদা (রা.) ৫১৬, ৫১৮

আবূ দারদা (রা.) ৫৩২

আবূ যার (রা.) ৫৬, ৯৫

আবূ লুবাবা আওস ১৮৭, ১৮৯

আবূ সুফিয়ান ১৪৭

আবহাওয়া ১৯৩

আবূ হুরায়রা (রা.) ১২৪, ৪৭৩

আবদুর রশীদ নূ'মানী ৪২, ১০৩, ১১৮, ১৮০, ১৯১

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ১০৫

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওমর (রা.) ৩৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদয়ান ৩৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ ৫২৯

আমর ইব্‌ন হযম (রা.), হযরত ৩৫

আমলে সালেহ ৩৭৭

আমালুস সালেহাত ৪০৪, ৪০৬, ৪০৭

আমীরুল হজ্জ ১৫৭

www.pathagar.com

আল্লামা আবূ সউদ ২৯৫
আল্লামা আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী ৭৯, ৮২, ৯৯, ১১২, ১১৮, ২১০, ২১১, ২২৭, ২৬৩, ২৯৩, ৩৩১, ৩৩৮, ৩৮১, ৫৮৮, ৪৯৯, ৪০১, ৫০৩, ৫০৯
আল্লামা মাহমুদ আলূসী ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮২, ৯৩
আল্লামা রাগেব ইসফাহানী ৩৯, ৭৫, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১৩৪, ২২৯, ২৬৮, ২৭৫, ২৮৩, ৩৮৩
আল-কুরআনুল করীম ২২৯
আল-কাউসার ৩৬২, ৩৮৩
আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন ৭২, ৯৮, ১১৮, ১২১, ১৪২, ১৬৬
আল-জাস্সাস (র.) ৩৫
আলফ্রেড মার্শাল ৫৬০
আল-মুফরাদাত ৭৫, ৯৮, ১১৯, ২২৯, ২৬৮, ২৭৫, ২৮৩
আলী আলী আবদুর রসূল, ড. ১৬৬
আলী আহমদ রুশদী ১৯৪
আসমান যমীন ৬৮
আসহাবে সুফফা ৩৬২
আসহাবে কাহ্ফ ৩৬৬, ৩৬৭
আশরাফ আলী থানবী (র.) ২৫৫
আহযাব ১৪৮
আহলে কিতাব ৩৪, ৪৯, ৫১, ৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৫, ৫২১
আসমানী কিতাব ১৫৯
আয়শা ১৬৫

ই
ইউহান্না ইব্ন রুইয়া ১৬৫
ইউসুফ আল কারযাভী ৩৫৪
ইকবাল ৮৯
ইকরামা ১৫৯
ইখওয়ানুল মুসলিমিন ১৪৯
ইজতিহাদ ৯০
ইজমা ২৩২, ৩২৯
ই'তিকাফ ৩৪
ইথিওপিয়া ৫২১
ইনজীল ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৮, ৪৭২
ইফাদ ২০৫
ইব্ন আব্বাস (রা.), হযরত ৩৫, ৩৭, ৭৪, ১০৫, ১৩৫, ১৩৯, ১৮২, ১৮৯, ২৪২, ৩৬৩, ৩৭৩, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪৪০, ৫২১, ৫৩২, ৫৫০, ৫৫৬
ইব্ন আবি হাতেম (রা.) ৩৯৮
ইব্ন ইসহাক (র.), হযরত ৩৬৬
ইবনুল আরাবী (র.), হযরত ৩৪, ৩১৯
ইব্ন কাসীর (র.), হযরত ৬১, ৭৮, ৮২, ৮৪, ১০১, ১১০, ১১১, ১৪৮, ১৭৫, ১৮২, ১৮৯, ২৭৬, ২৮৩, ৩১৪, ৩৫৮, ৩৬৬, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪১৪, ৪২১, ৪৪৬, ৪৭৩, ৪৭৮, ৪৯৯, ৫০১, ৫০৩, ৫০৫, ৫০৯, ৫২১, ৫২৫, ৫২৮, ৫৫০
ইব্ন কুদামা ১৬৫
ইব্ন জারীর আত্-তাবারী ৪৬, ১৮৯

www.pathagar.com

ইব্ন জুরাইজ (র.), হযরত ৩৪

ইব্ন মাসউদ (র.), ৪২৯

ইব্ন মাজা ৯২

ইব্ন মুনযির ১৫৯

ইব্ন শিহাব (র.), হযরত ৩৫

ইমাম বায়হাকী ১১২

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম ৪০৪

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ১৪০, ৪২৯

ইমাম আবূ রাযীল ১১২

ইমাম আহমদ (র.) ১৩৫

ইমাম মালেক (র.) ১৪০, ১৬৫, ২৩২, ৪২৯

ইমাম শাফেয়ী ১৬৫, ১৬৬, ৪২৯

ইম্যানুয়েল ৫৪০

ইরাক ১৬৫

ইসরাফ ৮৪, ১০৫, ১০৭, ২৭৯, ৪৪১

ইসলাম ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ ৩৫৪

ইসলামে হালাল হারাম বিধান ৩৫৪

ইসলামী অর্থনীতি ৪০, ৪১, ৫৮, ৯০, ৯১, ১০৬, ১০৭, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১৪৫, ১৫০, ১৫৪, ১৬২, ১৭১, ১৮৫, ১৯১, ২১০, ২১৩, ২৩৩, ২৭৮, ২৯২, ২৯৬, ২৯৮, ৩১৫, ৩২৪, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৬৪, ৪০০, ৫১৯, ৫২৩, ৫৫৯, ৫৬০

ইসলামী ব্যাংক ৪১

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ১৫১

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ১৫১, ৩৫৩

ইস্তিদরাজ ১৬৯

ইস্তিহ বাব ২৭৪

ইহসান ৪০, ৩১৯, ৩২০, ৩২৩

ইহুদী ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫১, ১৩৯, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ১৮৪, ২২৭, ৪৭৪

ইয়েমেন ৫২১, ৫৫৬

উ

উবাদাতা ইবনুস সামেত ১৩৭

উমর (রা.), হযরত ৩৮

উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.), হযরত ২৩২

উম্মে আবদুল্লাহ্ বিনতে শাদ্দাদ (রা.) ৪১৪

উহুদ যুদ্ধ ১৪৭, ১৪৮, ১৭৭, ১৮৭

উবাদাতা ইবনুস সামেত, হযরত ১৩৭

উশর ৫৩৭

উসমান ইব্ন মাযউন (রা.), ৩১৯

এ

এ. এইচ, এম, সাদেক, ড. ৪৮, ১২৯, ১৫২

এ. এ. রুশদী ২১৮

এডাম স্মিথ ২৮৭, ৫৬০

এলহাউট ২১৫

ও

ওজোন স্তর ৫৬৫

ওভার ইনভয়েসিং ৪৪৮

www.pathagar.com

ওলী ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা ৩১৯

ওয়াদীয়া ১৮৭

ওয়াজিব ১৮৮

ওয়াহ্ দানিয়াত ৫০৫

ক

কনটেইনার ২৯২

কমপিউটার ৩৯০

কমিউনিস্টবাদ ২০৩

কর ১৬৪

করাচী ১১৮, ১৮০, ১৯১

কাউলে সাবেত ২৮৫

কাতাদাহ্ (রা.), হযরত ২৪২, ৪২২, ৪৪০, ৫৫০

কারূন ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫

কালাবা ৩৯৩

কালেমায়ে খবীসা ২৮৫

কালেমা তাইয়েবা ২৮৪, ২৮৫

কা'বা ১৬২

কা'বাঘর ১০৫

কার্বন-ডাই-অক্সাইড ২৬৬

কায়রো ৮২, ৯৮, ১১৮, ১২৯

কিতাবিল মুবিন ২১০

কে. টি. হোসাইন, ড. ১২১, ১৮৩

কেইন্সীয় তত্ত্ববাদ ৩৫১

কোক ৩৩২

কুরআন ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৫০, ৫৭, ৬৪, ৭৪, ৮০, ৯০, ৯৬, ১২১, ১২৮, ১৮২, ২০১, ২০৫, ২৩৯, ২৭০, ২৮২, ২৯৮, ৩১০, ৩৩৫, ৩৪১, ৩৬০, ৩৬৬, ৩৭৬, ৩৮০, ৩৯৩, ৪০২, ৪০৩, ৪০৬, ৪০৮, ৪২০, ৪৩০, ৪৩২, ৪৪৯, ৪৫৬, ৪৬৩, ৪৬৮, ৪৭৩, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৯০, ৪৯১, ৫০৯, ৫১১, ৫১৪, ৫৩৩, ৫৫৪

কুরতুবী (র.), ইমাম ৩৪, ৬১, ৬৮, ৭২, ৯৫, ১১১, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৫৯, ১৬৬, ১৭৬, ২৪৯, ৩২০, ৩২৮, ৪০২, ৪১৬, ৪৯০, ৫২১, ৫৫০

খ

খলীফা ১৯৫, ১৯৬

খাবীস ১১২

খারাজ ১৪০

খায়রাত ১৭৬

খুলাফায়ে রাশেদুন ১৬৫, ২৮৩, ৪০২, ৪০৩

খেজুর ৭৮, ৮৩, ৩০৫, ৩০৭, ৩১২, ৩৬৮, ৪১১, ৪১২, ৪৮৪, ৪৮৭, ৪৮৮, ৫৬২

খিলাফাত ৫৩, ৬২, ১৯৫

খৃস্টান ৪৬, ১৫৭, ১৬১, ১৮৪, ২২৭

www.pathagar.com

গ

গম ৬৭, ১০১

গ্রীক ৩৮২

গির্জা ৪০১

চ

চন্দ্র ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯৬, ৩০৫, ৩০৭, ৫১১, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩

চীন ২১৫, ৩৫৩, ৩৭১, ৩৮২

জ

জান্নাতুল ফেরদাউস ১৭৫

জলপাই ৪১২

জলবায়ু ১৯৩

জালালুদ্দীন-আল-কাসেমী (র.) ৬৯, ৭২, ১৬৮

জায়েদ ইব্‌ন আসলাম ২৩২

জিবরাইল (আ.) ২৪৫

জিযিয়া ১৫৬, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫

জিহাদ ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ৪০৮, ৪৭৪, ৫২৬, ৫২৯, ৫৩০

ট

টাইগ্রিস নদী ২২৭

য়াজুজ ও মাজুজ ৩৭৮, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২

ত

তাইয়েব ১০৪, ১১২

তাওবা ১৮৮, ১৯০

তাওহীদ ৬৪, ৬৮, ৭১

তাকওয়া ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৭৩, ৪২৩, ৪২৪

তাকাসুর ৫৫০, ৫৫১

তাতফীফ ২৩২,

তাবুক ১৫৯, ১৮৭

তারকাযুদ্ধ ১৫১

তুলা ১০১

তেহরান ১২৯, ১৫২, ১৮০

তিরমিযী ১৩৫, ৪৩৩

তফসীরে আশরাফী ১৮৩

তফসীরে আল-মাযহারী ৪২, ১০৬, ১০৮, ১২১, ১২৯, ১৮২, ৫২২, ৫৪৬

তফসীরে আল-মারাগী ৪২, ৬৬, ৭২, ১৪২, ১৬৬, ১৭৩

তফসীরে ইবনে কাসীর ৮২, ৮৬, ১০৩, ১০৮, ১১৮, ১৫২, ১৮০, ১৮৩, ১৯১, ২৭৬, ২৮৩, ৩৬১, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭২, ৩৮৫, ৩৯৯, ৪২২, ৪৪৮, ৫১৮, ৫৫৭

তফসীরে উসমানী ২৯৫

www.pathagar.com

তফসীরে কবীর ৫৯, ৭৫, ৯৪, ৯৮, ১০৩, ১০৮, ১২৯, ১৩১, ১৫২, ১৮০, ১৯৩, ২৭৬, ২৮৩, ৩৮৫, ৩৯৯, ৪০৫, ৪৮৮, ৪৯৭

তফসীরে কুরতুবী ১২৯, ২৩২, ২৩৩

তফসীরে জালালাইন ৩৫৮, ৩৬১, ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৯৯

তফসীরে তাবারী ৩৫৮

তফসীরে ফাতহুল কাদীর ৪২, ১২১, ১৫২, ১৮০, ১৯১, ১৯২, ২২৯

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৯২, ১০৩, ২০৮, ২১৬, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৭, ২৪৮, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯ ২৬২, ২৬৮, ২৯৪, ৩১২, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৬৭, ৩৭২, ৪০৩

তফসীরে মাহাসিনিত তাবীল ১৭৩

তফসীরে হাক্কানী ৩৬৬

তাফহীমুল কুরআন ১৪২, ১৪৬, ১৯৫, ২২১, ২৩৯, ২৫৭, ২৫৯, ২৮৪, ২৮৫, ২৯৬, ৩২১, ৩২৬, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫৫, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৭২, ৩৮১, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৯, ৪১০, ৪১৬, ৪২০, ৪২১, ৪২৬, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৮, ৪৫৯, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭৪, ৪৭৮, ৪৮২, ৪৮৭, ৪৯০, ৪৯৪, ৫১২, ৫১৮, ৫২৩, ৫২৫, ৫৩২, ৫৩৬, ৫৩৯, ৫৪৩, ৫৫১

দ

দাকিয়ানুস ৩৬৬

দারুল ইরযাইত তুরামিল আরাবী ৯৮, ২২৯

দারুল কিতাবিল ইলমিয়া ১৫২

দারুস সালাম ২০০

দারুল হরব ১৪০

দাহক ১৫৯

দিল্লী ১২১

দি গ্লোরিয়াস কুরআন ৫০৯

দৈনিক ইনকিলাব ৩৫৪

ধ

ধান ১০১, ৩৮০

ন

নবী করীম (স.) ৩৫, ৩৭, ৪৯, ৫০, ১৩৫, ১৩৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬২, ১৯৯, ২৭১, ২৭৮, ৩৬৩, ৩৮৫, ৩৯৮, ৪০২, ৪২৯, ৪৪১, ৫৪৬

নাজদ ১৫৯

নাজরান ৩৫

নাজাস ১৫৭, ১৫৮, ১৬০

নাদওয়াতুল মুসান্নিফিন ১২৯

নাফাল ১৩৫

নাফলুন ১৩৪

নাসায়ী ১৩৫

নূর মোহাম্মদ আকন্দ ৯৮, ১৩৩, ২৮৩, ৩৬১, ৩৭৭, ৪১৯, ৪৯৬, ৫৩১, ৫৩৭

www.pathagar.com

নেপাল ২১৫

নিউজিল্যাণ্ড ৩০৩

নোবেল পুরস্কার ২৯৩

প

পদ্মা নদী ৫৬৬

পারস্য সাম্রাজ্য ৩৮২

পেনশন স্কীম ৩১৬

পেপসি ৩৩২

প্রকৃতি উর্ধ্বতত্ত্ব ৬৪

পিটার্সন ৪৯

পিরামিড ৩৭০

পুঁজিবাদ ২০৩, ৩৫৪

ফ

ফখরুদ্দীন আর-রাযী (র.), ইমাম ৪৯, ৫৯, ৭৪, ৭৫, ৯৪, ৯৮, ১০১, ১০৫, ১২৩, ১২৫, ১২৯, ১৪৭, ১৭৬, ১৮০, ১৮৭, ১৮৮, ১৯২, ১৯৩, ২২৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৮৩, ২৯৫, ৩৮৫, ৪৮৭, ৪৯১,

ফকীহ ১৮৫, ৩৫৩, ৪৬৯

ফাই ১৩৫

ফাউযুল আজীম ১৭৬

ফারাক্কা বাঁধ ৫৬৬

ফালাহ ১৭৬

ফালাহ্-ই-আম ট্রাস্ট ৪৩, ২১৬, ২৩৭, ২৫৪, ২৬৮, ২৯৪

ফাহেল ৬৪

ফুজাইল ইব্‌ন আয়াজ ৫৩২

ফিকাহ একাডেমী ৩৫৩

ফিতনা ১৪৫

ফী-যিলালিল কুরআন ৪২, ৫৯, ৬৬, ৮২, ৮৬, ৯৮, ১০৬, ১১৮, ১২৯, ১৫৫, ১৭৩, ১৮০, ১৯১, ২২৯ ২৭৬, ২৭৭, ২৮৩, ৪০৬, ৪৩৫, ৪৪১, ৪৫৯, ৪৮৭

ফিরাউন ৪৫৪

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ৫৬৭

ব

বখতে নসর, বাদশাহ ৪৯

বদর যুদ্ধ ১৩৯, ১৪০, ১৪৭, ১৪৮, ১৮৭

বনু কায়নুকা ১৪০

নবী ইসরাঈল ৩৩৫, ৪৫৩

বয়ানুল কুরআন ৩৬৬

বুখারী শরীফ ৩৮, ৩৯৭, ৪২৯, ৫৫১

বাইবেল ২২৭

বাইয়েনা ১২৫

বাংলাদেশ ২১৫, ২৬৪, ২৬৫, ৫৬৫

বায়তুলমাল ১৪০

বায়দুসীস ৩৬৭

বায়হাকী ৫৫৮

বিবি হাওয়া ১৩০, ১৩১

বৈরুত ৮২, ৮৬, ৯৮, ১১৮, ১২১, ১২৯, ১৮০, ২২৯

www.pathagar.com

ভ

ভাত ৪৮৬

ভারত ২১৫, ২৬৭, ৫৬৬

ভিসিআর ১২৭

ভুটান ২১৫

ম

মক্কা ৩৬, ৩৮, ৬৪, ৭১, ১৩৯, ১৫৭,১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৯৯, ২৭২, ২৮৯, ৩৯৭, ৩২৮, ৩৩৬, ৩৭৮, ৪৭১, ৫০৫, ৫২৮,

মক্কী সূরা ৩৮

মদীনা ৭৯, ১০৯, ১১৪, ১৩৯, ১৫৮, ২২৮, ২২৯, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০১ ৪০২, ৫১৪

মদীনা সনদ ৪১২

মধু ৩১৩, ৩১৪, ৩১৭,

মানসূখ ৩৭, ৫৭,

মসজিদ ১০৬, ১৮১, ৪০১

মসজিদে হারাম ১৫৮, ১৬০, ১৮১,

মসজিদে নববী ১৮৭

মহানবী (স.) ১১৯, ১২৮

মিযান ৫১৪

মিসর ১৪৯, ১৫৫, ১৬৫, ২৫২

মা'আরেফুল কোরআন ১০৩, ১৪৬, ১৮৫, ১৯৫, ২২১, ২২৪, ২৩৮, ২৪২, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৮৮, ৩১০, ৩১৯, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩৩, ৩৪২ ৩৪৭, ৩৫৮, ৩৯৩, ৪১২, ৪১৬, ৪২৫, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৮, ৪৬২, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৮১, ৪৮৪, ৪৯০, ৪৯৭, ৫১২, ৫১৭, ৫২২, ৫২৪, ৫২৯, ৫৩৬, ৫৪৪, ৫৫৭

মাকান ৬১,

মাওলা ৬৭

মাওবাদ ২০৩

মাজমায়ূল বায়ান ৭২

মাদইয়ান জাতি ২৩৩

মাদানী সূরা ৩৮

মাবূদ ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

মার্মাডিউক পিকথল ৯৯

মারুফ ৪০১, ৪০৩, ৪০৪

মালিক ৬৭

মাহরানা ৩৮

মাহাসিনিত তা'বিল ৭২

মুআত্তা ইমাম মালিক ১৮৩,২৩২

মুতাফফিফিন ৫৩৯

মুদারাবা ১২৮

মুনকার ৪০১, ৪০৩

মুনাফিক ৩৮

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) ৯২, ১০১, ১৪৪, ১৮২, ১৮৩, ১৯৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২৪, ২২৯, ২৩২, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৮, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৯, ২৬২, ২৬৮, ২৬৯, ২৯০, ২৯৪, ৩১২, ৩১৩, ৩১৯, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৬৭, ৩৭২, ৩৮৪, ৪০২,

www.pathagar.com

৪০৩, ৪০৯, ৪১২, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩২, ৪৩৮, ৪৬২, ৪৭১, ৪৮০, ৪৯০, ৫১২, ৫১৭, ৫২১, ৫২৪, ৫২৮, ৫৩৩, ৫৪৩, ৫৫৬

মুফরাদাতে রাগেব ৭২

মুফলিহুন ১৭৬

মুশারাকা ১২৮

মুশরিক ৩৮, ৬৮, ৭২, ৭৪, ১২৩, ১৩৯, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ২৩১, ৩০৯, ৩২৯, ৩৬৬

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, মওলানা ৪২, ৫৯, ৬৬, ৭২, ১৪২, ১৬৬, ১৭৩, ৪৩০

মুহাম্মদ কুতব ৮৯

মুহাম্মদ বিন সাদ, হযরত ১৮৯

মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম ১০৩, ২৫৯, ৩১৭, ৩৬৪, ৪০৭, ৪২৪, ৪৮৯, ৫৪৯

মুহিউদ্দীন খান, মওলানা ২১৬, ২২৯, ২৩২, ২৩৭, ২৬৮, ২৯৪, ৩১৯, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩৩, ৩৪২

মোঃ আবুল হাসনাত দেওয়ান ৩৯৬, ৫১৯

মোহাম্মদ তাহের ১৮৩

মোঃ শামসুল আলম খান ৪০০, ৪১৪, ৪১৯, ৪৩৭, ৪৬০, ৪৯২, ৪৯৬, ৫৩১, ৫৫৮

মৌমাছি ৩১৩

মুসতাওদা ২০৯

মুসতাকার ২০৯

মুসলিম ১৮২

মুসলিম উম্মাহ ৪৭

মুসলিম শরীফ ৪২৯

য

যাকাত ৮৪, ১৪০, ১৬৪, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯৪, ২৮৩, ৩৫০, ৪০৩, ৪০৭, ৪০৮, ৪১০, ৫২৮

যায়তুন ৭৮, ৮৩, ৩০৫, ৩০৭, ৫৬২

যিলকুরবা ১৩৮

যীনাত ১০৪, ১০৫, ১০৬

যুল কারনায়ন ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২

র

রবুবিয়াত ৭০

রাসূলে করীম (স.) ৩৫, ৩৬, ৪৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৬৪, ১৬৫, ১৭২, ১৮৫, ১৯৯, ২০৬, ২০৯, ২৩২, ৩৩৬, ৩৬৩

রাসূল (স.) ৪০, ১৩৬, ১৪৫, ১৪৭, ১৬৮, ১৭২, ২৭৬, ৪৪৬, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৫৫১

রাসূলুল্লাহ্ (স.) ৪৬, ৭৬, ৮০, ৮৩, ৮৯, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১২, ১১৪, ১২০, ১৩০, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ২০১, ২০৬, ২১৮, ২২৬, ২৪৫, ২৪৬, ২৬০, ২৬১, ২৮৩, ২৮৯, ২৯৬, ২৯৭, ৩০৫, ৩০৬, ৩১৮, ৩১৯, ৩২৮, ৩৩৫, ৩৪৫, ৩৬৩, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮৮, ৪৩৩, ৪৩৬,

www.pathagar.com

৪৩৭, ৪৬৭, ৪৯৬, ৫২১, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩৯, ৫৪৫, ৫৪৮, ৫৫০, ৫৫৪, ৫৫৬
রায়হান শরীফ, অধ্যাপক ৪৫, ৮২, ৮৬, ১১৭, ১৮০, ১৯১, ২০৫, ২১৬, ২২৯, ২৩৬, ২৬৮, ২৯৩, ৩০০, ৩০৮, ৩২৬, ৩৪২, ৩৪৭, ৩৫৪, ৩৭২, ৩৮২, ৩৯১,
রিকার্ডিয়ান তত্ত্ব ১১৬
রিকার্ডো ডেভিড ২৮৭, ৫৬৪,
রিযিক ৫২, ৫৩, ৫৪, ৬৭, ৭৮, ৮৩, ১১১, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৯০, ২৯৬, ৩০৭, ৩১০, ৩১২, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩২৮, ৩৩৬, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৯, ৩৬০, ৪০৫, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮, ৪৩৯, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৭৩, ৪৭৮, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯৩, ৪৯৬, ৪৯৯, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫২৯, ৫৫৬, ৫৬১,
রিযকুল কারীম ৪০৫
রিসালাত ৬৪, ১৫৯, ২৭৮, ৩৮৫, ৩৯৯
রোযা ৪২৯
রুকূ ৮৮, ৪৮০
রূহ ৩৭, ১৬০,
রূপা ১৮৪, ১৮৫

ল

লামজ ৫৫৩
লেবানন ৯৮, ১২৯, ২৭৮
লুগাতুল কুরআন ৪২, ৭২, ৩৭৩
লুমাযাহ ৫৫৩

শ

শাওকানী (র.) ইমাম ৩৬, ৪২, ১২০, ১২১, ১৪৭, ১৭৬, ১৮০, ১৮৮, ১৯১, ১৯২, ২২৪, ২২৯
শাব্বীর আহমদ উসমানী ২৭২, ২৯৫
শাহ আবদুল হান্নান ৭৫, ৯২, ১০৮, ১৪৬, ১৫৫, ২৭০, ২৭৩, ২৮৭, ২৯৬, ৩০৪, ৩৮৪, ৩৮৭, ৪০৪, ৪১০, ৩১৩, ৪২৬, ৪৩০, ৪৭৯, ৪৮৩, ৫১৩, ৫২৬
শায়খ আবূ আলী তাবরাজী (র.) ৬৮, ৭২
শিরক ৬৮, ৮৪, ৮৮, ১৫৭, ১৬৩, ৩৫৫
শুক্রকীট ৩৫৩

স

সাউদী আরব ২১৬
সকন ১৩১
সমাজতন্ত্রবাদ ২০৩,
সিরিয়া ১৬৫, ৫৫৬
সিয়াম ৩৪
সুন্নাহ ৩৩, ৩৬, ২০১, ২০৫, ২৮২, ৩৩৭, ৪৬৮, ৪৮২
সূর্য ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯৬, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৫১১, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩
সূরা আদিয়াত ২৭৯
সূরা আবাসা ৫৩৫

www.pathagar.com

সূরা আম্বিয়া ৩৮৩, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৩, ৩৯৫, ৫১১
সূরা আর-রহমান ৫১৪,৫৩৯
সূরা আলাক ৫৪৮
সূরা আহযাব ৪৬৬
সূরা ইয়াসীন ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৭, ৪৯০
সূরা ওয়াকিয়া ৪৮৫
সূরা আত-তাওবা ৩৭, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৭, ১৭৪, ১৮১, ১৮৪, ১৮৭, ২৭০, ২৭৩, ২৮১, ৪১০, ৪২১, ৪৩৬, ৪৪৫, ৪৭৪
সূরা আদ-দোহা ৫৪৫
সূরা আন-নিসা ৩৮, ১৪৫, ২৪০, ২৭৩, ৫৪৩,
সূরা আন-নূর ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯,
সূরা আনকাবুত ৪৫৮
সূরা আল-আ'রাফ ৩৯, ৯৯, ১০৪, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৯, ১২২, ১৩০, ২৪০, ৪২১, ৪৭৩
সূরা আল-আন'আম ৬০, ৬৭, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮৩, ৮৭, ৯৩, ১০৯, ২০০, ২০৭, ৩২৮, ৩৫৩, ৪৪৩, ৪৭৩, ৫১১, ৫৩৯,
সূরা আল-আনফাল ১৩৪, ১৩৬, ১৩৯, ১৪০, ১৪৭, ১৭৮
সূরা আল-ইমরান ৩৪, ২১৩, ৩৭৪, ৪৭৪
সূরা আল-ফাতাহ্ ৩৬
সূরা ফাতির ৪৭৭, ৪৮০
সূরা-আল-ফাজর ২৭৯
সূরা আল-বাকারা ১৪৫, ১৭৯, ১৯৫, ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ৩২৭, ৩৫০, ৪২১, ৪৩০, ৪৩২, ৪৪৪, ৪৬৬, ৪৭৩, ৪৮২, ৪৯৭, ৫২৫
সূরা আল-মায়িদা ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৩২৮
সূরা ইউনুস ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২১১
সূরা ইউসুফ ২৪০, ২৪২, ২৪৫, ২৪৬, ৫৩৮
সূরা ইবরাহীম ২৭৪, ২৭৮, ২৮৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৫, ৩০৭, ৩৪৫, ৫৬১
সূরাতুল উকুদ ৩৮
সূরা কাহ্ফ ৩৬২, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৮, ৩৮৯, ৪৭৩, ৪৭৬
সূরা কাসাস ১৯৬, ২৮২, ৪৫১, ৪৫২, ৪৯৯, ৫৩৩
সূরা কালাম ৫২০
সূরা কুরাইশ ৭০, ৫৫৬
সূরা জারিয়াত ২৭৩, ৪৪৪
সূরা জুমআ ২৭৩, ২৭৯, ৫৩০
সূরা ফুরকান ৪২৫, ৪২৬, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৪০
সূরা তীন ৩৫৮
সূরা তাকাছুর ৫৫০, ৫৫৫
সূরা তাহা ৫২৫
সূরা-দাহ্র ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪
সূরা দুখান ৫১১, ৫১২, ৫১৩
সূরা নাজম ২১৪
সূরা নামল ৪৪৯
সূরা নাযিয়াত ২৮১

www.pathagar.com

সূরা নাহল ৩০১, ৩০২, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১২, ৩১৪, ৩১৮, ৩২৭, ৩৫৬, ৫৬১

সূরা নূহ ৫২৪, ৫২৫

সূরা নবী ইসলাঈল ২৭০, ২৮০, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৮৪, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৭৩, ৫৩৯

সূরা বালাদ ৫৪২

সূরা মারইয়াম ৩৬৯, ৪৭৩

সূরা মায়িদা ৫২৫

সূরা-মুতাফফিফিন ৫৩৮, ৫৪০

সূরাতুল মুনকিয়াত ৩৮

সূরা মুনাফিকুন ২৮০

সূরা মমতাহিনা ৪৮

সূরা-মু'মিনুন ৪১১, ৪১৪, ৪২০, ৪৭৩, ৪৯৩, ৫১১

সূরা মুলক ৫১৬

সূরা মুহাম্মদ ৪৪৫

সূরা মুযযাম্মিল ৫২৮, ৫২৯

সূরা যুখরুফ ৪৭৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৮

সূরা যুমার ৪৯৯

সূরা রাদ ২৫৪, ২৫৫, ২৬০, ২৬৯, ২৭১, ২৭২, ২৮৯, ৩৪০, ৩৯৫, ৪৭৩,৪৯৯

সূরা রুম ৪৬০, ৫১২

সূরা শু'আরা ৪৪৭, ৪৯৭, ৪৯৯, ৫০১, ৫০২

সূরা সাবা ৪২২, ৪৭১, ৪৭৪

সূরা হজ্জ ৩৯৪, ৩৯৭, ৪০১, ৪০৩, ৪০৫, ৪১০

সূরা হাদীদ ৪৯৮

সূরা হাশর ২৭৩

সূরা হামীম আস-সাজদা ৩৭৫

সূরা হিজর ২৯৭, ৫৯৫

সূরা হূদ ১৯৪, ১৯৬, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১৭, ২২৩, ২৩০, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৫, ৪২১, ৪৫৪, ৪৭৩, ৫৫৩

সূরা হুমাযা ২৮০, ৪৪৫, ৫৮৬

সূরা হুজুরাত ৫০৯

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ৪৩, ৮০, ৮৯, ৯২, ১১৮, ১৩৭, ১৪৪, ১৯৫, ১৯৯, ২০৫, ২০৬, ২১৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৬, ২৪৭, ২৫৪, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬৮, ২৭১, ২৮৫, ২৯৪, ২৯৫, ৩১৪, ৩২১, ৩২৬, ৩৩৬, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৬৩, ৩৭২, ৩৮৫, ৩৮৬, ৪০৩, ৪০৯, ৪১৫, ৪২৫, ৪২৮, ৪৪১, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৭৩, ৪৭৭, ৪৮১, ৪৮৬, ৪৯০, ৪৯৪, ৫১২, ৫১৭, ৫২২, ৫২৪, ৫৩২, ৫৫১, ৫৫২

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) ৩৭, ৪২, ৫১, ৫৯, ৬১, ৬৬, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ৯৪, ৯৮, ১০৬, ১১২, ১১৮, ১২৫, ১২৯, ১৫৪, ১৫৫, ১৬০, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৬, ১৮০, ১৮৯, ১৯১, ২২৪, ২২৯, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৩, ৪০৬, ৪৩৪, ৪৪১, ৪৫৯, ৪৮৭

সাইথিয়ান ৩৮২

সাগির ১৬৬

সাদকা ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ৪৮৩

সান্‌য়া ১৫৯, ৫২১

সানাউল্লাহ্ পানীপত্তি (র.), আল্লামা ৩৭, ৪২, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১৮২

সাফওয়াতুত তাফসীর ৩৫৮, ৩৯৯, ৪১৬, ৪২৩

সামুদ জাতি ১২০, ২০৭

সালাত ৫০, ১০৬, ৩৫০, ৪০৩, ৪৮০, ৪৮৩, ৫৩০, ৫৩১

সালাহ্ উদ্দীন আহমদ ড. ১৮৬, ২৪৩, ৩১০

সায়াদ ইবনে আবূ আক্কাস (রা.) ১৩৫

সায়ীদ ইবনুল আস ১৩৬, ১৩৭

সোভিয়েত রাশিয়া ৩৫২, ৩৭১

সিজদা ৪৮০

হ

হযরত আদম (আ.) ১৩০, ১৩১

হযরত আনাস (রা.) ৫৫১

হযরত আবূ বকর (রা.) ১৫৭, ১৮৯, ২০৬

হযরত আলী (রা.) ১৫৮, ১৬২, ২৫৮

হযরত আয়েশা (রা.) ৪৩৪

হযরত ইউসূফ (আ.) ৯৯, ১০০, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩

হযরত ইবরাহীম (আ.) ২৯০, ৩১৯, ৩২৯, ৫৫৬

হযরত ইয়াকুব (আ.) ২৪৬

হযরত ঈসা (আ.) ৩৪, ৪৪, ৩৮৪, ৪১৪, ৫২১

হযরত ওসমান গনী (রা.) ৪০২

হযরত উমর ফারুক (রা.) ২৩২, ৪৯৬, ৫২৫, ৫২৬

হযরত খাদীজা (রা.) ৪৪৫

হযরত দাউদ (আ.) ২১৬, ৪১৪, ৪৩৩, ৪৩৬

হযরত নূহ (আ.) ১১০, ২১৯, ২২০, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ৪৫৪, ৫২৫

হযরত মূসা (আ.) ৩৪, ৩৫, ৪৪, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৫

হযরত মুহাম্মদ (স.) ৫৮, ৬৮, ৬৯, ৭১, ১৪৮, ১৫১, ২৮৬, ৩৯৩, ৪১৭, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৫০

হযরত লূত (আ.) ২৩০

হযরত শুআইব (আ.) ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৮, ৪৬৫

হযরত সালিহ (আ.) ১১৯, ১২০

হযরত সোলায়মান (আ.) ২২৬, ৪৩৩, ৪৩৬

হযরত হাসান (র.) ১৭৬, ১৮৮

হযরত হাসান বসরী (র.) ৩৪, ১২০, ৪৩৪, ৫২৫, ৫২৬

হাইড্রোজেন ২৫৯

হাক্কুল্লাহ্ ৫৫২

হাক্কুল এবাদ ৫৫২

হাজ্জ ৩৪

হাদীসে কুদসী ৫৬

হাফেজ মোহাম্মদ আবূ জাফর ৪০০, ৪৪৮, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৭, ৪৬৫, ৪৬৯,

www.pathagar.com

৪৯৮, ৫০০, ৫০১, ৫০৩, ৫০৭, ৫১০, ৫১৫, ৫৪৪

হাফেজ শামসুদ্দীন ২২৪

হামজ ৫৫৩

হাযুরা ৩৯৩

হারাম ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৫১, ৫৬, ৭৩, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১৩৫, ১৫৬, ২০৮, ২৩৩, ২৭৭, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩১, ৩৪৫, ৩৫৩, ৩৭৫, ৪০৯, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪৪০, ৪৫৫, ৪৬৪, ৪৬৮, ৪৯৬, ৫৫৫

হালাল ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৭৩, ৮৪, ১০৬, ১০৮, ১৩৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮২, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩১, ৩৪৫, ৩৭৫, ৪০৯, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪২৩, ৪৯৬, ৫৩০

হাশিম ৫৫৬

হিজরত ১৮১, ১৮২, ১৮৭

হিলফুল ফুজুল ৩৬

হেজাজ ৪৩

হেরাকল ১৪৯

হুমাযাহ ৫৫৩

ইফাবা-২০০২-২০০৩-প্র/৫২১৯/গ(উ)-৩২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ